সোনার ছেলেদের সেকাল-একাল

আবদুল আউয়াল ঠাকুর

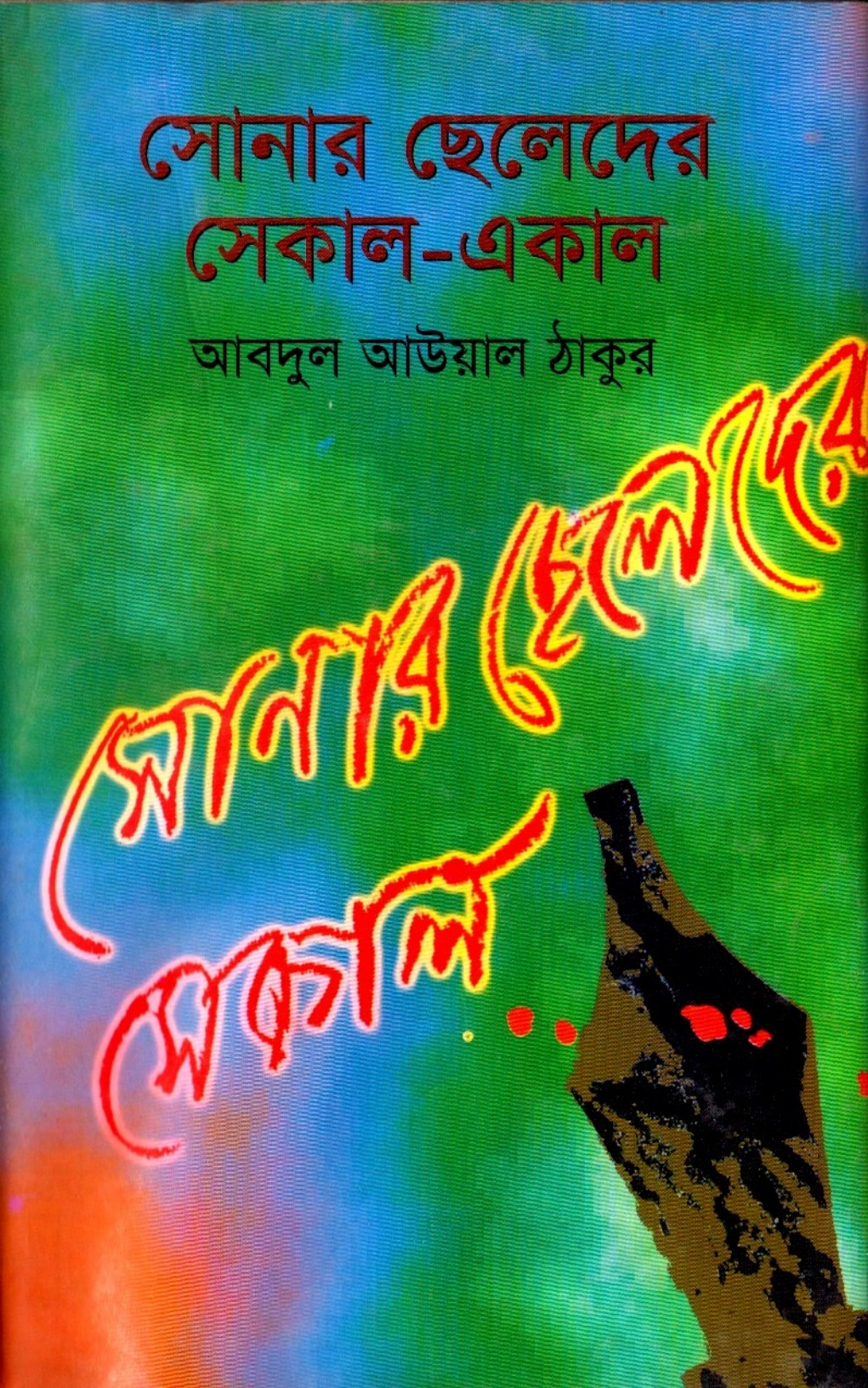

সোনার ছেলেদের সেকাল-একাল

আবদুল আউয়াল ঠাকুর

গতিধারা
৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

www.pathagar.com

©
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০২
ফাল্গুন ১৪০৮

প্রকাশক
সিকদার আবুল বাশার
গতিধারা
৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
সিকদার আবুল বাশার

পরিবেশক
বইপত্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ
গতিধারা কম্পিউটারস্
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
জি. জি. অফ্‌সেট প্রেস
৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন
নয়াবাজার ঢাকা ১১০০

মূল্য : ২০০ টাকা

ISBN 984-461-155-X

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বই প্রকাশের আগে যিনি প্রায় পুরোটা পাঠ করে দোয়া করে গেছেন এবং যার রক্তের আমি উত্তরাধিকার সেই পিতা মরহুম আবদুর রাজ্জাক ঠাকুর'সহ দেশের স্বাধীনতা প্রিয় সকল নাগরিকের উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার কৈফিয়ত

সোনার ছেলেদের সেকাল-একাল আমার মূল চিন্তার দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ড প্রতিরোধ দূরন্ত দুর্বার বইটির কাজ শেষ করতে গিয়েই দ্বিতীয় বইয়ের তাগিদ অনুভব করেছিলাম। ঠিক অনুভব বলতে যা বুঝায়, তা নাকি বোধের মধ্যে নাড়াচাড়া হয়েছিলো তা বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। আমাদের সমাজের চলমান সমস্যা, স্বাধীনতার সংকট, জাতির ভবিষ্যৎ, অতসব বড়বড় বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি অথবা এসব চিন্তা মনন ও মেধায় নাড়াচাড়া করেছে এমন দাবি করা খানিকটা হয়তো বাড়িয়ে বলা বলে মনে হতে পারে। কারও কারও কাছে এটা এক ধরনের স্পর্ধা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে স্বাধীনতা লাল সবুজ পতাকার একটি দেশের নাগরিক হিসেবে নিজেদের কন্টকাকীর্ণ জীবন উৎরিয়ে নতুন সম্ভাবনার উপায় খোঁজার চেষ্টা করেছি। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সেই পুরোনো সংজ্ঞায় বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও নানা ঘাটে প্রতিনিয়ত পদানত হতে হয় আমাদের অথবা পদানতের চেষ্টা হয় প্রতিনিয়ত। কিন্তু কেন? এই প্রশ্ন ও দেখা দিয়েছে বারবার। একজন আমলা, কামলা বা ক্ষমতার সিংহাসনে যারা থাকেন তারা দেশ রাষ্ট্র সমাজ দেখেন কাঁচের দেয়ালের ভেতর থেকে। তাই সময়ে সময়ে তাদের বিপ্লবী বক্তৃতায় নানা ঘটনার উদ্ধৃতি পাওয়া গেলেও রাষ্ট্র সমস্যার সমাধানে কোন মৌলিক পথের সন্ধান পাওয়া যায় না।

প্রথম বইয়ের কাজ করতে গিয়েই অনুভব করেছি ৭১২ থেকে ১৭৫৭, ১৭৫৭-১৯৪৭, ১৯৪৭-১৯৭১ এবং '৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে '৭৫ এর ২৫ জানুয়ারি শুধুমাত্র সন বা তারিখ নয় বরং এগুলো আমাদের পথ চলার সুনির্দিষ্ট স্টেশন হিসেবে ধরা যেতে পারে। ৭১২ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছর এই উপমহাদেশে যে মুসলমানরা শাসন করেছেন, ১৭৫৭ সালে বৃটিশ বেনিয়ার সাথে দেশীয় হিন্দু বণীকেরা মিলে খুঁজে বের করেছিল একজন মীরজাফরকে, এই মীরজাফরকে দিয়েই বেনিয়া ইংরেজরা মুসলিম শাসকদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল এবং তাতে সফলও হয়েছিল। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে যে ইংরেজ বণিকরা মুসলমানদের অনুমতি নিয়ে ভারতে ব্যবসা করতে এসেছিল তারা প্রায় দেড়শ বছরের মাথায় বণিক শক্তি থেকে রাজশক্তিতে পরিণত হল। এবং ক্রমাগতভাবে মুসলমানদেরকে পদানত করার যে নীতি ও কৌশল গ্রহণ করেছিল প্রকৃতপক্ষে এখনও তার অবসান হয়নি।

প্রায় দু'শ বছর ধরে যে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের কুন্ডলীকৃত অগ্নিরোষ বৃটিশ বিতাড়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে তার সূত্রপাত করেছিলো বাংলার

www.pathagar.com

মুসলমানেরা। পলাশীর যুদ্ধের আট বছরের মধ্যেই ফকিররা বৃটিশের বিরুদ্ধে দাবাগ্নি জ্বালিয়েছিলেন। ১৯৪৭ এ বৃটিশ যখন ভারত ছেড়ে গেল তখন উপমহাদেশে জন্ম নিল দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র। আমরা পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হলাম। এরপর শোষণ আর বঞ্চনার প্রতিবিধানে স্বাধীকার থেকে যে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়েছিলো তার রাজনৈতিক সমাপ্তি হলো ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। নতুন যে রাষ্ট্রের জন্ম হলো সেখানে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। কেন হয়নি এর কারণ খুঁজতে গিয়েই যা পেয়েছি, তা দিয়েই– 'সোনার ছেলেদের সেকাল একাল'।

প্রাক ও পরবর্তী বাংলাদেশের প্রতিটি নির্বাচনে একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আকাংখা উচ্চারিত হয়েছে তেমনি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে জাতি বিনাশী চক্র। এই চক্রের নাম রেখেছি আমরা সোনার ছেলে।

বইটি রচনার পিছনে প্রেরণা যুগিয়েছেন বন্ধু মারুফ কামাল খান। বইটি রচনা করতে গিয়ে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সৈয়দ জাফর, আহম্মদ মুসাসহ অনেকেরই প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিতে হয়েছে। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। পাঠকের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গতিধারার স্বত্বাধিকারী সিকদার আবুল বাশার আন্তরিকতার সাথে যে সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছেন তা লিখে শেষ করা যাবে না। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হয় তিন দশকের প্রবীণ সাংবাদিক জনাব ইউসুফ শরীফের প্রতি। তাঁর উৎসাহ এই বই প্রকাশের নেপথ্য কাহিনী। এও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাপ্তাহিক উষা ও দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত নিবন্ধই বর্তমান গ্রন্থ। জীবন সঙ্গিনী রায়হান আখতারের নাম অন্তত: একারণে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে একটি বই প্রকাশিত হোক এই আন্তরিকতাটুকু তার ছিল।

ধন্যবাদান্তে

আবদুল আউয়াল ঠাকুর কোরাইশ
সাংবাদিক আবাসিক এলাকা, মিরপুর
ঢাকা।

www.pathagar.com

সোনার ছেলেদের সেকাল

এখন দুঃসময়, নাকি সময় দুঃসহ হয়ে উঠেছে? অথবা দুটোই সত্য কিনা বলা খুবই কঠিন। সময়ের নিজস্ব কোনো গতি নেই তবে অনন্তকালের অবিভাজিত সময়কে আমরা নিজেদের প্রয়োজনে মেপে মেপে নিয়েছি। সভ্যযুগের ব্যস্ত মানুষের কাছে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সময়কে যদি সংজ্ঞায়িত করা যায়, তাহলে হয়ত এভাবে বলা যাবে যে, দিন-রাত এবং ঋতুর পরিবর্তনের নিয়মই সময়। আসলে সময়কে আমরা সবাই চিনি এবং সে কারণেই সময় নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। তবে ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড যে হিসেবে আমরা করে থাকি তার সূত্রপাত ১৩০০ সালে। মানুষ দিন- রাত্রিকে ২৪ ভাগে বিভক্ত করে ঘন্টার প্রবর্তন করে। এই সময়ই ইউরোপে সর্বপ্রথম যান্ত্রিক ঘড়ির আবিষ্কার এবং তখন থেকেই সময় নিয়ে বিপ্লবের সূচনা হয়। তার অর্থ এই নয় যে, এর আগে মানুষ সময়ের কোনো পরিমাপ রাখতো না। বলে রাখা ভাল, সানডায়াল নিয়ে মানুষ আগেও সময়ের পরিমাপ করতো।

ধারণা করা হয়ে থাকে, মানুষ একসময় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনকে একমাত্র সময় বলে বিবেচনা করতো। মানুষের চিন্তা আরো অগ্রসর হলে রাত এবং চন্দ্রকে বিবেচনায় আনতে থাকে। ইংরেজি Moon থেকেই Month-এর সূচনা হয়। সময় হিসাবের ক্ষেত্রে দিনপঞ্জির আবিষ্কার প্রাথমিক বিপ্লবের সূচনা করে। বর্তমান সময়ে সময় বলতে নতুন করে কিছু বুঝাবার দরকার নেই। এখন প্রতিটি মুহূর্তই গুরুত্বপূর্ণ। কম্পিউটারের আবিষ্কারের ফলে সময়ের ব্যবহার এত পরিমাণে বেড়ে গেছে যে, এখন ২৪ ঘন্টাকে মানুষের প্রয়োজনে খুব কম সময় বলে মনে হয়। অবশ্য সময় সব সময় এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বহুকাল ধরে সময় কালস্রোতে ভেসে ভেসে আছড়ে পড়েছে মহাকাল-সমুদ্রে। কিন্তু এই বহতা সময়ে মানুষের সমাজের উত্থান-পতনের নানা পর্ব থেকে যাচ্ছে ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাস বলতে আসলে যা বুঝায় বর্তমান সময়ে সেরকম কিছু নেই। এক সময়ে রাজা আর রাজ্যজয়ের কাহিনী নিয়ে যে ইতিহাস রচিত হতো আজকে সেই ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় মানুষ অথবা মানুষরূপী পশুদের নানা কাহিনী। আর সেই সাথে স্মরণ করিয়ে দেয় ইতিহাসের সেই নির্মম শিক্ষা—মানুষ ইতিহাস থেকে শিখে না। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের কিছু কাহিনী বলে রাখা দরকার। পাঠকদের মনে থাকার কথা ৭২ থেকে ৭৫ এর দুঃসহ দিনগুলোর স্মৃতি। সে দিনগুলো সম্পর্কে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকরা নানামুখী মন্তব্য করেছেন। বহু মন্তব্যের মধ্য থেকে ১৯৭৪ সালের ১৮ অক্টোবর ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটরের একটি রিপোর্ট আলোচনা করা যেতে পারে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছিলো, "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তিন বছর আগে যেমন জনপ্রিয় ছিলেন আজ আর তেমনটি নন। দুর্নীতি, জীবনযাত্রা মানের দারুণ অবনতি এবং ব্যাপক খাদ্যাভাব অনেকেরই মোহ ভেঙ্গে দিয়েছে। দেশের কোনো কোনো গ্রামে হয়তো আজও শেখ মুজিব সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কিন্তু শহরের গরিব জনগণের মধ্যে তার বিরুদ্ধে সমালোচনা বেড়েই চলেছে। গত দু'মাস যে ক্ষুধার্ত জনতা স্রোতের মতো ঢাকায় প্রবেশ করেছে তাদের মধ্যে সরকারের সমর্থক একজনও নেই। বন্যা আর খাদ্যাভাবের জন্য গ্রামাঞ্চল ছেড়ে তারা এসেই রাজধানী ঢাকার রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয়

www.pathagar.com

নিচ্ছে। কিন্তু মনে হচ্ছে সরকার এদেরকে রাজপথের ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকতে না দিতে বদ্ধপরিকর। এরই মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যককে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে সারাদিনে দু'এক টুকরা রুটি খেতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে দু'একটা পিঁয়াজ ও একটু আধটু দুধ মেলে। ক্যাম্পে একবার ঢুকলে আর বের হওয়া যায় না। যে দেশে মানুষকে এমন খাঁচাবদ্ধ করে রাখা হয় সেটা কি ধরনের স্বাধীন দেশ? ক্রুদ্ধ হয়ে বললো ক্যাম্পবাসীদেরই একজন। ক্যাম্পের ব্লাকবোর্ডে খড়িমাটি দিয়ে জনৈক সরকারি কর্মচারী আমার (রিপোর্টারদের) সুবিধার্থে প্রত্যেকবার রুটি খাওয়ার সময়সূচির তালিকা লিখে রেখেছেন। তালিকায় বিশ্বাস করবেন না— ক্যাম্পের অনেকেই বললো। তারা অভিযোগ করলো যে, রোজ তারা একবেলা খেতে পায় এক কি দুই টুকরো রুটি।

কোনো এক ক্যাম্পের জনৈক স্বেচ্ছাসেবক রিলিফকর্মী জানালো যে, সরকারি কর্মচারী জনসাধারণের কোনো তোয়াক্কা করে না। তারা বাইরের জগতে সরকারের মান বজায় রাখতে ব্যস্ত। এ কারণেই তার লোকদেরকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বিদেশীরা ভুখা জনতাকে রাস্তায় দেখুক এটা তারা চায় না।

দুস্থ মানুষের অসন্তোষ কখনও সুগঠিত বিরোধী আন্দোলনের খাতে ধাবিত হবে কিনা ভবিষ্যৎই তা জানে। যারা এদেশে দীর্ঘকাল বসবাস করেছেন তারা বলেন যে, বাঙালি মুসলমানরা অন্তহীন দুঃখ সইতে সক্ষম।

কিন্তু বাংলাদেশে বিরোধী দল রয়েছে—তা যত ক্ষুদ্র বা বিচ্ছিন্নই হোক না কেন, তারা বিপ্লব চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। দরিদ্র জনগণকে এই বিরোধী দলগুলোর পরিচালিত করতে এখনো দেরি আছে। তবে কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা যারা বাংলাদেশের মুক্তির পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছে এবং আজ মনে করছে যে, শেখ মুজিব ও তার অনুচরেরা তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে, তারা বিরোধী দলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।"

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনীতিতে যে দুর্নীতি, তেলেসমাতি কারবার এবং স্বজনপ্রীতি শুরু হয় তার বিবরণ ৭২ সাল থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। সরকার দলীয় এমপি এবং নেতারা লাইসেন্স, পারমিট এবং রেশন লুটপাট করতে শুরু করেন। হত্যা, রাহাজানির রাজনীতির শুরুটাও এই সময়ে হয়। ১৯৭৩ সালের ৫ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় নিবন্ধে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে লেখা হয়, "শুধু চাকরিবাকরির ক্ষেত্রে নয়; এজেন্সী, ইনডেনটিং, ব্যবসা বাণিজ্য, কন্ট্রাকটরী, লাইসেন্স পারমিট ইত্যাদি সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রেও আপনজনদের মহিমা শিকড় গেড়ে বসিয়াছে। সরকারী তথ্য পরিসংখ্যান মতে ২৫ হাজার আমদানীকারকের মধ্যে ১৫ হাজার ভুয়া। এই সব ভুয়া আমদানীকারকের লাইসেন্স বাতিল কিংবা কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎকারীকে চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা ন্যায়বিচার নহে কিন্তু কারও বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থাও গৃহীত হওয়ার নজীর আমাদের চোখের সামনে নাই। এর হেতু দুর্বোধ্য তবে অনুসন্ধান করিলে হয়ত দেখা যাইবে এখানেও যাবতীয় অনাচার হইয়াছে আপনজনদের নামে।"

এই আপনজনরা কারা—সম্ভবত জনগণকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার প্রয়োজন নেই। বরং রাতরাতি যারা কুঁড়েঘর থেকে শ্বেতপাথরের মার্বেল ভবনে জীবনযাপন শুরু করেছেন তারাই এ আপনজন। আরো খোলাখুলি বললে এই দাঁড়ায় যে, এরাই ছিলো ৭২-৭৫ এর সোনার ছেলে। যাদের দোর্দণ্ড প্রতাপে নগরবাসী, গ্রামবাসী এবং গোটা দেশের জনগণ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ক্ষমতা কি জিনিস! স্কুলগামী কিশোরী থেকে শুরু করে গৃহবধূ পর্যন্ত কেউ

www.pathagar.com

রক্ষা পায়নি সেই সোনার ছেলেদের হাত থেকে। সেই সোনার ছেলেদের উত্তরাধিকার সোনার সন্তানেরা আবার জেগে উঠেছে। এখন দেশ-বিদেশে সর্বত্রই তাদের গুণগান ছড়িয়ে পড়ছে। সম্প্রতি যে কয়টি চাঞ্চল্যকর ঘটনা-সংঘটিত হয়েছে তার সবকটিতেই এই সোনার সন্তানদের জড়িত থাকার খবর পাওয়া গেছে। জুয়েল, ইমন, এনামুল, কাদের এবং আরো বহু সন্তান ছড়িয়ে আছে আমাদের সমাজে। এরা সরকারি ছত্রছায়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনজীবনে দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সোনালি সন্তানেরা একদিনে জন্মায় নাই। ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আলোচনা করতে গেলে নানা প্রসঙ্গ চলে আসবে। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটু ঘুরে দেখার প্রয়োজন আছে।

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের বিজয়ের মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সেই নির্বাচনে বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করলেও তৎকালীন বিরোধী দল এই নির্বাচনকে মেনে নেয়নি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেই দেশের গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশনকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য তারা 'যেমন খুশি তেমন সাজো' ছদ্মবেশ ধারণ করলো। সত্য-মিথ্যার নানা বেসাতি করে এক সময় বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে নামানোর একটা সুযোগও তাদের এসে গেল। তবে তারা যেভাবে বিএনপি এবং মিত্রদের চিহ্নিত করতে চাইল জনগণ তা গ্রহণ করলো না। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণের জন্য পদত্যাগ করলেও সেদিন পল্টনের বিশাল জনসমুদ্র জাতীয়তাবাদী শক্তির পাশে দাঁড়িয়েছিল। তা সত্ত্বেও নির্বাচনে গোপন ষড়যন্ত্র এবং পর্দার অন্তরালের ক্রিড়ানকরা নির্বাচনে বিএনপির বিজয়কে নিশ্চিত করতে দেয়নি। বিএনপি সরকারবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়েই তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী দেশের যে সকল শক্তির সাথে আঁতাত করেন বর্তমান কর্মকাণ্ড তারই ধারাবাহিকতা।

অতীত ইতিহাস লক্ষ্য করলেও দেখা যায় যে, ১৯৭২ সাল থেকে ৭৫ সালেও পরিস্থিতি একই রকম ছিল। পুরনো পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী তখনও দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষ অপারগ ছিল। ১৯৭২ সালে ১৬ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে খবর প্রকাশিত হয়: 'দেশে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে সুপারিশও: পুলিশ নিরুপায়।' ঐ একই দিন ঐ পত্রিকায় আর একটি খবরে বলা হয় : 'নয় মাসে রংপুরে ৩০২টি খুন, ২২৬টি ডাকাতি।' ২৯ অক্টোবর ঐ পত্রিকার অন্য রিপোর্টে বলা হয় : শুধু রাজধানী ঢাকা নগরী নহে, দেশের সর্বত্র অপরাধপ্রবণতা আবার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজধানীতে গড়ে প্রতিদিন তিনটি করে ডাকাতি হয়। সমগ্র দেশের হিসেব নিয়ে দেখা গিয়াছে, চলতি মাসে গড়ে প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর তিনটি করে ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়াছে।

৪ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের খবরে বলা হয়, গত জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে দেশে প্রায় ১৪ হাজার ৩ শত ৫৫টি চুরি সংঘটিত হইয়াছে।

১১ জানুয়ারি ৭৩ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের খবরে বলা হয়, গত এক বছরে ৩১টি ব্যাংক ডাকাতি, ১ হাজার ৪ শত ৬৭টি গুপ্ত হত্যা, ২০৩৯টি ডাকাতি এবং ১৭৩৪১টি ছিনতাই ঘটনা ঘটিয়াছে।

২৬ জুলাই ৭৩ সালের দৈনিক ইত্তেফাকে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন স্থান হতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির গুরুতর খবর আসিতেছে। সাধারণ গুপ্ত হত্যা নহে, গতকাল বৃহস্পতিবার খবর আসিয়াছে ফাঁড়ি ও বাজার লুটের, খবর আসিয়াছে লঞ্চ ও ট্রেন

www.pathagar.com

ডাকাতির। দুষ্কৃতকারীদের জিঘাংসার শিকার হইয়াছে ৭ ব্যক্তি। গত বুধবার রাতে দুষ্কৃতকারীরা ঘিওর থানার কামড়া পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র লুট করে। দুর্ধর্ষ ডাকাত দল সুরমা নদীতে লঞ্চ ডাকাতি করিয়া যাত্রীদের সর্বস্ব ছিনিয়া লয়।

১১ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকের রিপোর্টে বলা হয়, নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় পূর্বাঞ্চলের তিনটি থানা এলাকা সন্ত্রাসের রাজত্বে পরিণত। দৈনিক ইত্তেফাকে 'পাঠক যে খবর আর পড়িতে চাহে না' শিরোনামে বলা হয়, গতকাল মঙ্গলবার সংবাদপত্রে আরেকটি থানা ও ব্যাংক লুটের খবর প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিদিনের খবরের কাগজে কোনো না কোনো খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, থানা ফাঁড়ি কিংবা ব্যাংক লুটের খবর ছাপা হইতেছে। বিদগ্ধ পাঠকমহল হতে মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, আমরা প্রতিদিন এই খবর আর পড়তে চাহি না। এ পর্যন্ত যতগুলো ঘটনা ঘটিয়াছে এর শতকরা ৫ ভাগ ক্ষেত্রেও প্রকৃত অপরাধীদের ধরা কিংবা তাদের বিরুদ্ধে আইনগত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

১৫ এপ্রিল ৭৪ সালে সোনার বাংলা পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়, গত সপ্তাহে সারা দেশে ৪০০-এর বেশি ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। ডাকাতেরা প্রায় কোটি টাকার সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। শুধুমাত্র খুলনা জেলার একটি গ্রামে একই রাতে ৩৬টি বাড়িতে ডাকাতি হয়। অনেক স্থানে ডাকাতরা কারফিউ দিয়ে ডাকাতি করে। ডাকাতি করতে গিয়ে জনতার হাতে ১৯ জন ডাকাত নিহত হয়। ডাকাতি করার সময় ডাকাতদের গুলিতে ৯ জন গ্রামবাসী নিহত হয়। এ ছাড়াও গত সপ্তাহে প্রাপ্ত সংবাদ মতে, ৬টি বড় বড় বাজার লুট হয়। ডাকাতরা অনেক স্থানে কারফিউ দিয়ে ও গান গেয়ে লুট করে। ঢাকার কালিয়াকৈর বাজারে ডাকাতরা সারারাত ধরে নির্বিঘ্নে লুট করেছে। লুট ছাড়াও গত সপ্তাহে পুলিশের হাতে টাঙ্গাইলের রামপুরা ও কুকরাইল গ্রাম দুটি লুণ্ঠিত ও তছনছ হয়। এখানে একজন পুলিশও মারা যায়।

রামপুরা-কুকরাইলের ঘটনা সম্পর্কে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক প্রচারক, প্রবাসী সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী দৈনিক জনপদে লিখেছেন ঃ "গত সাতই এপ্রিল রবিবার টাঙ্গাইল শহর থেকে মাত্র পনের মাইল দূরে অবস্থিত কালিহাতী থানার রামপুর ও কুকরাইল গ্রাম দেখতে গিয়ে মনে হলো, আমরা বড় বেশি আশা করেছিলাম। ক্ষমতা যারা হাতে পেয়েছেন, তারা তা ব্যবহার করতে শিখেননি। তাই অপব্যবহারের মাত্রা বেড়েছে। পুরনো শাসকদের পরিত্যক্ত প্রশাসনিক যন্ত্র আর গদি নিজেদের দখলে পেয়ে তারাও পুরনো কায়দায় ক্ষমতা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন, ভাবছেন এটাই বুঝি নিয়ম। ব্যবহার না জানলে অপব্যবহারটাও কেউ দক্ষতার সাথে করতে জানে না। এখন ক্ষমতার নির্যাতন তাই আরো মাত্রাহীন।

কিন্তু রামপুর-কুকরাইল থেকে বল্লা হয়ে টাঙ্গাইল ফেরার পথে আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। তিন বছর আগের ধ্বংসযজ্ঞ এবং এবারের ধ্বংসযজ্ঞ। নৃশংসতায় কোনটি বড় এবং কোনটিকে ধিক্কার দেব? আমরা প্রথমে ঢুকলাম কুকরাইল গ্রামে। এক নজর দেখেই মনে হলো, একটা বন্য হাতী যেন সারা গ্রামটাকে লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেছে। আর বন্যতার সেই তাণ্ডব থেকে রক্ষা পায়নি কেউ। এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশু, নারী এবং অবলা জীবজন্তুও নয়। একটার পর একটা আগুনে পোড়া বাড়ি। টিনগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। চাল, ডাল, কলাই, তিসি, তাঁত, সুতা, সুতার রং ভস্মীভূত। যে বাড়িগুলো আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছে, তা নির্মমভাবে লুণ্ঠিত। মেয়েদের শরীর থেকে পর্যন্ত সোনা আর রুপার গয়না ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। গরু পুড়েছে, হাঁস-মুরগি, ছাগল পুড়ে ছাই হয়েছে, তার কঙ্কাল চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। যারা সব হারিয়ে সর্বশান্ত হয়েছে, তাদের সংবিত এখনো ফেরেনি। আমাদের

www.pathagar.com

দেখে একদল সর্বহারা নরনারী যারা দশদিন আগেও ছিল সম্পন্ন গৃহস্থ এবং তাঁতি, তারা সমস্বরে কেঁদে উঠল। লজ্জা ভুলে মায়ের বয়েসী কয়েকজন মহিলা এসে আমার পা জড়িয়ে ধরল। তাদের কারো কারো দেহে নির্মম প্রহারের চিহ্ন। তাদের কান্নায় আল্লার আরশ কেঁপে ওঠে। জানি না, মানুষের গদি কেঁপে ওঠে কিনা! কার কথা লিখবো? শয়ে শয়ে পরিবার সর্বশান্ত হয়েছে। অসংখ্য বাড়িঘর, দোকান, তাঁত ভস্মীভূত হয়েছে। এমন হয়েছে বহু পরিবারের আজ মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। এক মুঠো খাবার সংগ্রহের সংস্থান নেই। মানুষের মধ্যে পশু প্রবৃত্তি এতটা মাথাচাড়া দিতে পারে, তা আমার জানা ছিল না।

অত্যাচারীরা গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে তাদের সর্বস্ব লুট করে সন্তুষ্ট হয়নি, গ্রাম দুটোর প্রত্যেকটি ইদারায়, প্রত্যেকটি পুকুরে পেট্রোল আর কেরোসিন ছিটিয়ে পানীয় জল পানের অনুপযুক্ত করে রেখে এসেছে। একটি চৌদ্দ বছরের ছেলের সারা গায়ে মারের দাগ, এক বদনা পানি ইদারা থেকে তুলে এনে আমাকে দিল। বললো, একটু মুখে দিয়ে দেখুন। মুখে দিতে হলো না, নাকের কাছে নিতেই দেখি, কেরোসিনের উৎকট গন্ধ। দগ্ধ, লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত গ্রামটিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়া নারী-পুরুষের পাশ কাটিয়ে হাঁটছিলাম আর ভাবছিলাম তিন বছর আগের কথা।

আমি কাঁদতে ভুলে গেছি। কিন্তু কুকরাইলের সাত সন্তানের মা আছিয়া খাতুন, বৃদ্ধা করিমন্নেসা আর আবদুল হালিমের মেয়ে সাহেরা খাতুনকে দেখে আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিলো। অত্যাচারীরা একেবারে পশু না হলে মেয়ে মানুষের গায়ে এমনভাবে হাত তুলতে পারে না। করিমন্নেসার মাথা ফাটানো। সাহেরা খাতুন যুবতী। তার সর্বাঙ্গে রোলারের প্রহার এবং নখরাঘাতের চিহ্ন। আছিয়া খাতুনের পিঠ ফুলে ঢোল হয়ে আছে। চোখের ওপর কিছুটা অংশ কেটে গিয়ে রক্তজমাট বেঁধে আছে। মনোয়ারা নামে একটি মেয়ের অবস্থা দেখে আমি রাগে ক্ষোভে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কুকরাইল গ্রামে এমন একজন সম্পন্ন মানুষ নেই, যার বাড়ি লুট হয়নি। ডাঃ মোহাম্মদ নিজাম উদ্দীন একজন এম. বি. বি. এস ডাক্তার। সরকারি চাকুরে। থাকেন ঢাকার নওয়াবগঞ্জে। তার বাড়িতে ঢুকে দুর্মূল্য ডাক্তারি যন্ত্রপাতি পর্যন্ত নষ্ট করা হয়েছে। ঘরের খাট-পালঙ্ক, লেপ-তোষকে আগুন দেয়া হচ্ছে। ব্লাড প্রেসার মাপার একটা আনকোরা নতুন যন্ত্র দেখি ভেঙ্গে বারান্দায় ফেলে রাখা হয়েছে। পাশের বাড়ি থেকে লুট করা হয়েছে রেডিও। পুরনো আমলের একটা গ্রামোফোন যন্ত্র আছড়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। দু'হাতে লুটপাট করা হয়েছে কুকরাইল ও রামপুর গ্রামে। লুটেরারা গরুর গাড়ি বোঝাই করে লাখ লাখ টাকার লুটের মাল নিয়ে গেছে। যা নিতে পারেনি, তা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে। রামপুরের ইদ্রিস মিয়া যথেষ্ট মান্যগণ্য লোক। তার বাড়িতে টিনের ঘর চৌদ্দটি। তাঁত ৩৫টি। গোলায় ৩৫ মণ ধান। ঢেঁকিতে ছেঁটে তোলা হয়েছে ১৫ মণ চাল। তাছাড়া আছে সরিষা, কলাই। ঘরে ছিল তাঁতের কাপড়ের কয়েকশো পাউন্ড রং। যার প্রতি পাউন্ডের দাম দেড় হাজার। ইদ্রিস আলী কিছু লেখাপড়া জানেন। তাই শখ করে তার তাঁত শিল্পের নাম করেছেন 'দেশবন্ধু হ্যান্ডলুম'। এই হ্যান্ডলুমের ৩৫টি তাঁতই এখন বিধ্বস্ত। দু'একটা যা বেঁচে আছে তার সুতা ছিঁড়ে দেয়া হয়েছে। ১৪টি টিনের ঘরই ভস্মীভূত। ৩৫ মণ ধান, ১৫ মণ চাল, সরিষা-কলাই, কয়েকশ পাউন্ড রং সব শেষ। রামপুরের আজিজুর রহমানের অবস্থা আরো শোচনীয়। ৩২ বছরের যুবক। গ্রামের সবচেয়ে বড় তাঁতি। ৮০ হাজার টাকার তৈরি তাঁতের কাপড় ও সুতা ছিল তার ঘরে। সব লুণ্ঠিত। তার ও তার ভাইয়ের যুবতী বৌয়ের পরনের কাপড় ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই যা লুণ্ঠিত হয়নি। আজিজুর রহমানের বিধ্বস্ত ঘর থেকে যখন বেরুচ্ছি, তখন শুনি মেয়েকণ্ঠে উচ্চৈস্বরে রোদন।

www.pathagar.com

উঠানে না নামতেই পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন একটি মেয়ে। নাম সখীনা। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। একটি তাঁত চালিয়ে কোনোরকমে দিন কাটান। সেই তাঁতটি ধ্বংস করা হয়েছে। সখীনার এখন জিজ্ঞাসা : তিনি কিভাবে দিন গুজরান করবেন?

এই প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

আমরা সবাই ঘেমে নেয়ে উঠেছি। তবু কুকরাইল থেকে রামপুর গ্রামে গিয়ে উঠলাম। সেই একই ইতিহাস, একই ধ্বংসের স্বাক্ষর। যে গৃহস্থের ছটি গরু গোয়ালে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে, তার বুকে পুত্রশোকের মতো ব্যথা। আমাদের দেখে সে হাহাকার করে উঠল। বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে ছটি গরুর দগ্ধ কঙ্কাল।

হাঁটতে হাঁটতে একটা ব্যাপার বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল। বাংলাদেশের গ্রাম। কিন্তু কোনো বাড়িতে হাঁস-মুরগির, সাড়া শব্দ নেই। বৃদ্ধ করিম মিয়াকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, কিছু পুড়ে মরেছে, কিছু লুটেরারা নিয়ে গেছে। দু'শ থেকে আড়াইশ ছাগল ওরা লুট করেছে।

কী লুট করেনি ওরা? রামপুর হাটের বৃদ্ধ আবদুস সবুর মিয়া। এ বছরই হজ করে দেশে ফিরেছেন। হাটে তার কাপড়ের দোকান। বেশি রাখেন কাফনের কাপড়। ত্রিশ হাজার টাকার কাপড় ছিল তার দোকানে। সব লুট। দোকানটিও ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। নিজের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে হাজী সাহেব শিশুর মতো অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমি জানি, এই কান্না বৃথা যাবে না। বাংলার দুঃখী মানুষের এই কান্না থেকে আবার একদিন বাষ্প হবে, মেঘ হবে। ঝড়ের অশনি সংকেতও দেখা দিতে পারে আজকের শান্ত নীলাকাশে।

রামপুর-কুকরাইল গ্রামে মোট ক্ষতির পরিমাণ কোটিখানেক টাকারও বেশি হবে। কিন্তু দুজন ছেলে মানুষ ম্যাজিস্ট্রেট তা যদি চার-পাঁচ লাখ টাকা দেখায় আমি বিস্মিত হব না।

রামপুর-কুকরাইল এত বড় ধ্বংসযজ্ঞের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি আইজি একবার গ্রাম দুটোতে যেতে পারতেন না? এ গ্রামের মানুষেরা তো বিদেশী নয়, এ দেশের মানুষ। আমাদেরই বাবা-মা-ভাই-বোন। এদের কাছে বাঙালি পুলিশের হয়ে ক্ষমা চাইতে, দুঃখ প্রকাশ করতে লজ্জা কি? এদের ক্ষতিপূরণের সামান্য ব্যবস্থা করতেই বা কার্পণ্য কেন? এ দুটো ব্যবস্থা করলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। তা না করে বিদেশী শাসকদের মতো প্রভুসুলভ মনোভাব ও অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং সেই সঙ্গে 'আমরা যা করছি ঠিকই করছি' ধরনের আচার-আচরণ কেন?

যদি তদন্তে দেখা যেত, ডাকাত ও দুষ্কৃতকারী আসলে পুলিশের মধ্যে রয়েছে, তাহলে তাদের সাজা দিতে হতো। আর যদি দেখা যেত কয়েকজন গ্রামবাসীর হঠকারিতার ফলে একজন পুলিশকে কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ দিতে হয়েছে, তাহলে দোষী গ্রামবাসী কয়েকজনের বিচার ও শাস্তি দেয়া চলতো। তা না করে পুলিশের দু'দুটো গ্রাম ধ্বংস করা এবং নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়া অমার্জনীয় অপরাধ। এটা একটা জঘন্য নজির। এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত অশুভ ও সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। এত বড় ধ্বংসযজ্ঞ যারা চালিয়েছে, তাদের চৌদ্দজনকে মাত্র গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে, আজ পর্যন্ত ঘটনার তদন্ত বা দোষী ব্যক্তিদের বিচারের ব্যবস্থা হয়নি, এ খবর আমার কাছে বিস্ময়কর ও লজ্জা দুই-ই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলি, 'মনসুর ভাই, দুষ্কৃতকারী শুধু দেশের মানুষের মধ্যে নয়, আপনার পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও রয়েছে। তাদের খুঁজে বের করুন। শাস্তি দিন। বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীকে জনগণের আদর্শ সেবক বাহিনীরূপে গড়ে তুলুন।'

টাঙ্গাইলের নতুন বিষাদ-সিন্ধু কাহিনী সরকারি কাগজে গুরুত্বসহ ছাপা হয়নি,

www.pathagar.com

বেতারে-টেলিভিশনে চাপা দেয়া হয়েছে। কিন্তু গণ-কবির কণ্ঠ বেতারে তা আজ ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাংলাদেশে।

কথা উঠতেই একজন উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি বহু নির্যাতন দেখেছি। ব্রিটিশ আমলে, পাকিস্তানী আমলে অনেক হত্যাকাণ্ডও দেখেছি কিন্তু এ রকম সম্পদ ধ্বংস জীবনেও দেখিনি।' দেশের পুলিশ দেশের এমনভাবে ধ্বংস করে এ অভিজ্ঞতা আমার প্রথম।'

এই কাহিনীর ওপর যবনিকা পড়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট, বিশিষ্ট সাংবাদিক এনায়েতুল্লাহ খান ওই শাসনকালকে বলেছেন 'পুতুল নাচের ইতিকথা।' তিনি তার ইতিকথার উপসংহার টানেন এইভাবে— 'শেখ মুজিবুর রহমানের তিন বছরের দুঃশাসন সহস্র জননীর বুক ভেঙ্গে গিয়েছে, শত শত বীর দেশপ্রেমিকের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, দেশীয় সম্পদ পাচারের নয়া ইতিহাস রচনা করেছে, মনন ও সাংস্কৃতিকে বিকিয়ে দিয়েছে। অর্থনীতির আর কানাকড়িও অবশিষ্ট নেই। অতএব কালান্তরের এই সন্ধিক্ষণে যদি আমরা সেই রাজনীতিকে পরাস্ত না করতে পারি, শেকল ভাঙ্গার সংগ্রামে অবতীর্ণ না হতে পারি এবং দেশপ্রেমিক, বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, কৃষক-শ্রমিকের ঐক্যজোট না গড়তে পারি তবে আবার পুতুল রাজ কায়েম হবে। পুতুলের রাজাকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তবে আবার পরদেশী পটুয়া নতুন আদলে পুতুল গড়বে। পরিশেষে তবুও বলব, শেখ মুজিবুর রহমান আমার চোখে গ্রিক ট্রাজেডির করুণ চিত্র। শ্রেণী চেতনায় সংকীর্ণ, ঈর্ষায় বিদ্বিষ্ট, ভালোবাসায় অকৃত্রিম কিন্তু দুর্বলতায় আকীর্ণ একজন নশ্বর মানুষ। ক্ষমতার অঙ্গনে তাঁর সদম্ভ পদচারণা কখনও ভীতি, কখনও করুণার সৃষ্টি করেছে। সত্য ভাষণে তিনি ভ্রূকুটি করেছেন, প্রতিবাদীকে রোষানলে ভস্ম করতে চেয়েছেন এবং মিথ্যা ভাষণে তুষ্ট হয়েছেন। দেশকে ভালবাসতে গিয়েও তিনি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। জীবন দিয়ে তাকে সেই মূল্য শোধ করতে হয়েছে।" এরপর ২১ বছর অতিবাহিত হয়েছে। প্রতিশোধের নতুন স্পৃহায় আবার যারা ক্ষমতাসীন হয়েছেন তাদের সোনার সন্তানদের কাহিনীর শুরুটা যেভাবে হয়েছে বিস্তৃতি সেভাবেই চলছে।

পল্টন অথবা সরকার নির্ধারিত কোনো জনসভার স্থানে অথবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্যানপেসিফিক কোনো হোটেলে কঠিন ও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে কোনো শীর্ষ ব্যক্তিত্ব এই সোনার ছেলেদের কর্মকাণ্ডের উদ্বোধনী ঘোষণা দেননি। লাল বা নীল ফিতার বেষ্টনী কেটেও কেউ বলেননি আমরা আমাদের সোনার ছেলেদের এইসব কর্মকাণ্ডকে চালিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ প্রদান করছি।

তবে কি আপনাআপনি ফাকা শহরের কংক্রিট ভেঙে এইসব দুষ্কৃতকারীদের উদ্ভব ঘটেছে? না তা নয়। একেবারেই স্বাভাবিক এবং সহজ গতিতে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় এইসব সোনার ছেলেরা বেড়ে উঠেছে এবং আস্তে আস্তে বিস্তার লাভ করেছে ও তারা টিকে আছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে ২১ বছরের ঝঞ্ঝালওয়ালা প্রশাসনের নির্জাস হিসাবে এরা বেড়ে উঠেছে কি না। অনেকে এই প্রশ্নের সহজ সমাধান দিতে গিয়ে বলেন, সন্ত্রাস আগেও ছিল এখনও আছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে সন্ত্রাস থাকা আর সন্ত্রাসী সমাজ অথবা সন্ত্রাসের মধ্যে বসবাস করা এক কথা নয়। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে যে সব সন্ত্রাসী ঘটনার খবর ছাপা হয় তার সবকিছুর গোড়ায় পাওয়া যায় সরকারি দলের সোনার ছেলেদের। ব্যাপারটি কিভাবে শুরু হয়েছে তা হয়ত একেবারে দিন তারিখ ধরে বলা যাবে না। তবে পাঠকদের সুবিধার্থে কিছুটা পেছন ফিরে তাকানো যায়। ব্যাপারটি সম্ভবত এভাবে

www.pathagar.com

ঘটতে শুরু করে যে সরকার প্রশাসন থেকে বিরোধীশক্তিকে নির্মূল করার জন্য প্রথমে বিএনপি সমর্থক পরে গত ২১ বছরের সমর্থকদের বেছে বেছে তালিকা তৈরি করতে শুরু করলেন। এই প্রক্রিয়ায় প্রশাসনের মধ্যে একদিকে যেমন দলীয় এবং দলপ্রেমিক শাখায় বিভক্তি ঘটে তেমনি অন্যদিকে যোগ্য এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের পার্থক্য গুলিয়ে যায়। নগরীর শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে পুলিশ বাহিনী রয়েছে, সরকার প্রথমেই সেই বাহিনীর মধ্যে দলীয়করণের প্রক্রিয়া শুরু করলেন। শুধু দলীয়করণ নয় বরং আত্মীয়করণও শুরু হয়। সরকারের বিরুদ্ধে দলীয় ও আত্মীয়করণের অভিযোগ দুটি বিরোধী দলের। এই অভিযোগের ভিত্তি সবল বা দুর্বল যাই হোক একে রাজনীতির ভাষায় নিয়ে আসা ঠিক নয় বরং দেখা প্রয়োজন কোন ব্যক্তি যোগ্য এবং অযোগ্য। গোবরে পদ্মফুল ফোটে না—এ কথা ঠিক নয়। অনেকেই আজকাল সমাজে নিজেদেরকে যোগ্য হিসাবে প্রতিপন্ন করছেন। সেদিক থেকে বর্তমান আমলেও কেউ যদি সত্যিকারের যোগ্য থাকেন তাহলে তার অবশ্যই যোগ্যতার আসনে বসা উচিত। যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অতীতে যদি কেউ কারো আত্মীয়স্বজন বিধায় উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করে থাকে তাহলে সেটিও অন্যায়। যাহোক সোনার ছেলেদের উত্থান প্রসঙ্গে প্রশাসনের যে অবদান রয়েছে সে প্রসঙ্গে প্রথমে পুলিশ পরে আমলা প্রশাসনের কথা উল্লেখ করতে হয়। সরকার তার নিজের লোক খুঁজতে গিয়ে পুলিশ প্রশাসন থেকে রাতারাতি ১১ জন পদস্থ কর্মকর্তাকে সরিয়ে দিলেন যাদের বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ হচ্ছে ২১ বছর আগে তারা সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাদের শূন্যপদে যারা উঠে এসেছে তারা শূন্যকে পূর্ণ করেছেন না যোগ্যতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছেন এই প্রশ্ন অমূলক নয়। বর্তমান সরকারের পূর্বসুরি '৭২-৭৫ পর্যন্ত যখন ক্ষমতায় ছিলেন তাদেরও সবক্ষেত্রে অটোপ্রমোশন দেয়ার প্রবণতা কাজ করেছে। আর এ কারণে দেশের ছাত্র সমাজ থেকে শুরু করে সবখানেই সৃষ্টি হয়েছে অনিয়ম এবং অন্যায়ের। এর জন্য কারা দায়ী? অতীত ঘাঁটলে দেখা যায় ১৯৭২ সালে ১৫ আগস্ট ইত্তেফাকে বলা হচ্ছে, 'স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে বাংলাদেশের তৎকালীন অধিকৃত অঞ্চলে ব্যাংক ও ট্রেজারী হইতে স্বর্ণ, রৌপ্যসহ প্রায় ১০০ কোটি টাকার কারেন্সি নোট মুজিব নগরে লইয়া যাওয়া হয়। আরো জানা গেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় গণপরিষদ সদস্য, স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তা এবং মুক্তিযোদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই এই অর্থ মুজিব নগরে নিয়াছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অফিসে দৈনন্দিন ব্যয়ের জন্য রক্ষিত প্রচুর টাকাও ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী অফিসাররা সঙ্গে নিয়াছিলেন।

প্রকাশ সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ পাওয়া যায় বগুড়ার বিভিন্ন ব্যাংক হইতে। বগুড়ার ব্যাংকগুলো হইতে নাকি ৩৫ কোটি টাকা, রাঙ্গামাটি হইতে ৪ কোটি, ভৈরব ব্যাংক হইতে ৬ কোটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্যাংক হইতে ৬ কোটি ও দিনাজপুর ব্যাংক হতে ১০ কোটি টাকা বিভিন্ন সময় মুজিব নগরে নিয়া যায়। কিন্তু সেই ১০০ কোটি টাকার হিসেব কোথায়?'

১৯৭২ সালের ২০ নভেম্বর দৈনিক গণকণ্ঠের রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুনে সকলে অবাক হবেন, মিরপুর-মোহাম্মদপুর এলাকা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ঢাকা শহরে পৌর এলাকায় সাধারণের জানামতে ১৯৮১টি আওয়ামী লীগ শাখা, উপশাখা, প্রশাখার অফিস রয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের আশ্রিত একটি ছাত্র সংগঠনেরও অসংখ্য অফিস খোলা হচ্ছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিরোধী ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়িতে রাতারাতি এইসব অফিস স্থাপন করা হয়েছে। ফলে পরিত্যক্ত বাড়ি উদ্ধার অভিযান ব্যর্থ। ২১ নভেম্বর দৈনিক গণকণ্ঠের খবরে বলা হয়, 'দুর্নীতি তেলসমাতি কারবার এবং স্বজনপ্রীতি এদেশের নতুন

www.pathagar.com

কোনো ঘটনা নয়। নরসিংদীর এমসিএ জনাব মোসলেমুদ্দিন ভুঁইয়া দুর্নীতি আর স্বজননীতির যে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন তা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে দিয়েছে জানা গেছে, এই এমসিএ আমদানি লাইসেন্স, কাপড়ের হোল সেইলার, সিমেন্ট, সুতা, বিলাস দ্রব্যাদির, ডিলারশিপ, সার ও মূল্যবান বিদেশী কাপড়চোপড় আমদানি ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে এ পর্যন্ত মোট ২১টি পারমিট লাইসেন্স তার আত্মীয়স্বজনকে ইস্যু করেছেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সালে দৈনিক গণকণ্ঠের খবরে বলা হয় আসন্ন নির্বাচনে পাবনা জেলার ঘাটঘরিয়া থানা নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব মহিউদ্দিন আহমেদকে রেডক্রসের মাল চুরি করে বিক্রির দায়ে জনতা আটক করে। ঈশ্বরদী থেকে পাবনার রাস্তায় আনুমানিক রাত ১০টায় উক্ত আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনৈক ব্যবসায়ীর কাছে রেডক্রসের ১৬৫ বস্তা সিমেন্ট, ১ গাইট কম্বল ও ১ গাইট কাপড় চুরি করে বিক্রি করে। যে ট্রাকটি উক্ত রিলিফের দ্রব্য নিয়ে যাচ্ছিল তার সাথে ১টি মোটরসাইকেলে জনাব মহিউদ্দিন যাচ্ছিলেন।

এই ধরনের অসংখ্য উদাহরণ থেকে পরিষ্কার বুঝায় যায় সোনার ছেলেদের উত্থানের পেছনে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তাই প্রধান কারণ ছিল। ৭২ পরবর্তী সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতা সংযোজন করে প্রশাসন এবং দেশের সর্বত্র রাজাকার খুঁজে খুঁজে বের করে তাদেরকে প্রশাসনের নীতি নির্ধারণী থেকে বাদ দিয়ে তদস্থলে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। এতে দেখা গেলে যারা দায়িত্ব পেলেন তারা যোগ্যতার পরিবর্তে বড় ভাইদের খুশি করার জন্য সর্বদাই জী হুজুর করতে থাকলেন। অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে বিগত তিন বছরে। ক্ষমতায় এসে প্রশাসন থেকে সাবেক কর্মকর্তাদের বেছে বেছে কম গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পোস্টিং দিয়ে তুলনামূলক অদক্ষ কোনো কোনো কর্মকর্তাকে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসার ফলে একদিকে যেমন প্রশাসনিক শূন্যতা অন্যদিকে জী হুজুর প্রবণতা বেড়ে যায়। সরকারি এসি আর প্রক্রিয়াকে অনুসরণ না করে প্রথমেই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পোস্টিং দেয়া শুরু হলে যে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয় তার মধ্য দিয়ে সোনার ছেলেদের উত্থানপর্ব শুরু হয়। বরং বলা যায় এইসব সোনার ছেলেরাই তাদের প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গা থেকে এদেরকে নিয়ে এসেছে। আর সে কারণেই গোটা দেশে সোনার ছেলেদের লজ্জাজনক কর্মকাণ্ড লোকমুখে ছড়িয়ে থাকলেও প্রশাসনের কর্মকর্তারা তাদের খুঁজে পান না। সাম্প্রতিককালের জুয়েল, ইমন, এনামুল, কাদেরদের কথাই যদি আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে ওরা সকলেই আমাদের চোখের সামনেই ছিল। যেন কোনো এক জাদুকর সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ছুঁ মন্তর ছুঁ বলে ভুয়া পাসপোর্টে হারিয়ে দিল। আসলে যাদের সামনে থেকে মন্ত্র পড়তে পড়তে এরা নিখোঁজ হয়ে গেল তাদের কিছু করার নেই। কারণ সাপের চোখে ধুলো দিলে সাপ চোখে দেখে না, সাপের চোখে পর্দা নেই বলে সাপ ও মাছ যেমন ঘুমোতে পারে না তেমনি পর্দাহীন আমাদের দায়িত্বশীল সর্পরাজী রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণকারী হলেও যারা তাদের গুরুর দোহাই দিয়ে চোখে ধুলো দেয় তাদেরকে দেখে না। এই না দেখার পেছনে যে রাজনৈতিক কারণ লুকায়িত আছে তার বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরে করবো। তবে পাঠকদের সুবিধার জন্য ১৯৭৩ সালের ১৮ মার্চ দৈনিক গণকণ্ঠে প্রকাশিত একটি রিপোর্টের অংশ বিশেষ তুলে ধরতে চাই। 'তারা আওয়ামী লীগার তাই পাসপোর্ট লাগে না' শীর্ষক বলা হয়েছে, ভারত গমনাগমনের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতা, উপনেতা, পাতিনেতা এবং তাদের পরিবার-

www.pathagar.com

পরিজনদের বেলায় পাসপোর্ট প্রযোজ্য নয় বলে বিশ্বস্তমহল সূত্রে জানা গেছে। তারা আওয়ামী লীগের কর্মী এটা তাদের বড় পরিচয় এবং তাদের দাপটে সীমান্তরক্ষীসহ আইন প্রয়োগকারী বিভাগগুলো অসহায় বলে মনে হচ্ছে। আজকের দিনেও এই পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি বরং এই সুবিধা থাকার কারণে দলীয়করণ এবং আত্মীয়করণের পালে বাতাস পেয়েছে। এই বাতাস খোলা চোখে দেখলে হয়ত কিছুই দেখা-যাবে না। হয়ত গায়ে লাগলে কিছুটা হয়ত আচ করা যাবে কিন্তু গভীরভাবে তাকালে সত্যি সত্যি অনুভব করা যাবে যে আমরা অসহায়। আনুষ্ঠানিক কোনো সভায় সোনার ছেলেদের উত্থান শুরু না হলেও পর্দার পেছনে থেকে বেরিয়ে যারা ঢুকে পড়েছে তারা কিন্তু যে মঞ্চের অপেক্ষায় ছিল সেই মঞ্চের নাটক '৯৬ সালেই মঞ্চস্থ হয়।

নির্বাচন সন্ত্রাসের জন্ম দেয় নাকি সন্ত্রাসের নির্বাচন জাতিকে সন্ত্রাসী করে তুলে এই বিষয়টিও সোনার ছেলেদের উত্থান পর্বের সাথে যুক্ত এবং আলোচিত হতে পারে। '৯৬-এর নির্বাচন পরবর্তী ফলাফল জাতি এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, ক্ষমতার মানমন্দির থেকে ক্ষমতার উৎস জনগণকে হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে। হত্যা দিয়ে হত্যার মোকাবেলা করার এক হত্যাযজ্ঞ পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে স্বদেশ। আর এই যজ্ঞের নেতৃত্ব দিচ্ছে আমাদের সোনার সন্তানেরা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে জাতির এই দুর্ভোগ কি নির্বাচনের জন্যই এসেছে? নাকি অন্য কোনো কারণ আছে? দেশবাসীর মনে থাকার কথা, পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিরপেক্ষতা রক্ষায় বাংলাদেশের হীরক পদক পাওয়া উচিত। কারণ বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে নির্বাচনের আগে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের আইনগত বিধান পাওয়া যাবে এবং সেই সাথে প্রজাতন্ত্রের কিছু দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকেও খুঁজে পাওয়া যাবে যাদের ক্ষমতায় যাওয়ার একটি রাস্তা খোলা রয়েছে। আক্ষরিক অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এ পর্যন্ত দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে আইন করে একবারই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে সংসদে এই তত্ত্বাবধায়ক বিল পাস হলো সেই সংসদ এবং ঐ সংসদের সদস্যদের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার স্বীকৃতি দিতে নারাজ। বর্তমান সংসদের প্রথম অধিবেশনে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঐ সংসদের স্বীকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। এমনকি সেদিনও ঐ সংসদের কোনো কোনো সদস্যকে খুনি বলে গালি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। বিএনপির শাসনামলের শেষ দিনগুলো বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য এক বিশেষ শিক্ষা হয়ে রয়েছে। কারণ নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর পরাজিত দল সম্পর্কে বিজয়ীদের কোনো মন্তব্য না থাকলেও পরাজিত শক্তি বিজয়ীদেরকে অস্বীকার করতে থাকে। বিষয়টি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, শেষমেশ সরকারকে অচল করে দিতে লাগাতার সংসদ বর্জন শুরু হয়। তখন অন্য দিকে চলতে থাকে আন্দোলন। ভেতরে বাইরে পতনের কৌশল প্রণীত হওয়ায় বিএনপির নির্ধারিত পাঁচ বছরের মেয়াদকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস করা যায়নি। পাঠকদের স্মরণ থাকবে যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও বিরোধী দল এবং আমলাদের একাংশ রাজপথে সরকার হঠানোর আন্দোলনে নেমে পড়ে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেছেন, শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্যই বাধ্য হয়ে নির্বাচন করতে হয়েছে। অর্থাৎ তিনি দেশকে একটি সাংবিধানিক নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিতে চাননি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশের টালমাটাল পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামে যে সরকার গঠন করা হলো তা

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বাবধায়ক না হয়ে তল্পীবাহকে পরিণত হলো। এমনকি এই অন্তবর্তীকালীন সময়ে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। সবকিছুরই যেমন একটি পরিণতি থাকে তেমনি তল্পীবাহক সরকারের নির্দেশনায় যে নির্বাচনী ফলাফল জনগণের কাছে এলো তার পরিপূর্ণ ফল এখন জনগণ হাড়ে হাড়ে পেতে শুরু করেছে।

তাহলে কি নির্বাচনকেই সোনার ছেলেদের উত্থানের কারণ হিসাবে বিবেচিত করে নির্বাচন প্রতিহত করার চিন্তা করা যাবে? না! তা হয়ত নয়। আসলে নির্বাচন হচ্ছে গণতান্ত্রিক ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় কে কত ভালো করবে সেটি বিবেচ্য নয়, তবে পাস করাটা জরুরি। এখানে লাল পাস, কালো পাস বলে কিছু নেই। ৪৯, ৫১-র মারপ্যাঁচে যিনি ৫১ পাবেন তিনি বিজয়ী হবেন। সুতরাং শান্তি ও সন্ত্রাসের সংখ্যা হচ্ছে দুই। যিনি ৪৯ পান তিনি যদি সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়ে ২ যোগ করতে পারেন তাহলেই আসল ৫১ হেরে গিয়ে ২ নম্বরী ৫১-র বিজয় হবে। আমাদের সমাজে এই প্রতিযোগিতা একেবারে নতুন নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশগুলোতে এই ধরনের জোচ্চুরি পদ্ধতি চালু রয়েছে। আবার অনেক মানবাধিকারপন্থী দেশও তাদের আদর্শ ও দর্শন জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্যে জনগণের ৫১কে উল্টে দেয়ায় মদদ দেয়। যেমনটি ঘটেছে আলজেরিয়ায়। তা সত্ত্বেও নির্বাচন প্রক্রিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং আমাদের দেশে বহাল রয়েছে। বলা ভালো আমাদের দু'দুবার স্বাধীনতার পেছনেও রয়েছে নির্বাচনের রায়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট যে পাকিস্তান কায়েম হয়েছিল তার পেছনেও কাজ করেছিল ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন।

১৯৪৫ সালের ৯ মে জার্মানী ও ইতালির আত্মসমর্পণের পর আফ্রো ইউরোপীয় রণভূমিতে যুদ্ধ বন্ধ হয়। এর অব্যবহিত পরেই যুক্তরাজ্যে ১৯৪৫ সালের ২৬ জুলাই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শ্রমিক দল বিজয়ী এবং সরকার গঠন করে। অক্ষশক্তির অন্যতম অংশীদার জাপান ২ সেপ্টেম্বর (৪৫) আত্মসমর্পণ করলে এশিয়া রণভূমিতে যুদ্ধ বন্ধ হয়। মহাযুদ্ধোত্তরকালে পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন অনুধাবন করে ভারতীয় জনমত যাচাই করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ভারতে নিযুক্ত তদানিন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল কর্তৃক ২৫ জুন (৪৫) আহূত সিমলা কনফারেন্স ব্যর্থ হলে ২৯ আগস্ট তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতীয় উপমহাদেশে স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম আবাসভূমি পাকিস্তানের দাবিতে দশ কোটি ভারতীয় মুসলিম অধিবাসীর নিকট শান্তিপূর্ণ রায় দানের সুযোগ গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান। ঐ নির্বাচনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলিম লীগ ১১৯টি আসনের মধ্যে ১১৩টিতে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। ২ এপ্রিল (৪৬) জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি দলের সর্বসম্মত নেতা নির্বাচিত হন এবং ২২ এপ্রিল (৪৬) বঙ্গীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে পার্লামেন্টারি বোর্ড জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়ে সর্বক্ষণ কর্মী পরিচালিত নির্বাচনী বোর্ড গঠন করেন। সর্বভারতীয় নির্বাচনী ফলাফল ছিল নিঃসন্দেহে পাকিস্তান দাবির পক্ষে। ভারতীয় ১০ কোটি মুসলমানের দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের সাক্ষ্য।

www.pathagar.com

এই নির্বাচনী পথ ধরেই ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট পাকিস্তান কায়েম হয়। এই নির্বাচন ছিল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রায় ২০০ বছরের সংগ্রামের ফসল। এখানে বলে রাখা দরকার পলাশীর যুদ্ধের মাত্র ৮ বছরের মধ্যে ফকির ও সন্ন্যাস বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন মুসলমান পীর, ফকির। ভারতবর্ষে মুসলমানদের বিন্দুমাত্র কোনো সুযোগ-সুবিধার সম্ভাবনা দেখা দিলে তা ঠেকাবার জন্য এদেশীয় হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজদের সাথে মিলে কাজ করতে থাকে। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ রদকল্পে এদেশের আপামর হিন্দু সমাজ যেভাবে মাঠে নেমেছিলেন তার অংশ হিসাবে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ হিসেবে অনুশীলন সমিতির জন্ম হয়। ১৯০৬ মুসলিম লীগের জন্ম থেকে শুরু করে ৪৭ পর্যন্ত রাজনীতির যে অধ্যায় রচিত হয় তার মাইলস্টোন হিসাবে কাজ করে ৪৬-এর নির্বাচন। এই নির্বাচনে এক অধ্যায়ের সমাপ্তি হলেও নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সাধারণ নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর মুসলিম লীগ নেতা কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ৭, ৮ ও ৯ এপ্রিল (৪৬) দিল্লিতে এ্যাংলো এরাবিক কলেজে মুসলিম লীগ লেজিসলেটারস কনভেনশন আহ্বান করেন। এই কনভেনশনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পেশকৃত যে ৪টি প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হচ্ছে—

১) ভারতবর্ষের উত্তরপূর্বে বঙ্গদেশ ও আসাম এবং উত্তর পশ্চিমে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্দু ও বেলুচিস্তান অঞ্চলগুলো যাহা পাকিস্তান অঞ্চল নামে অভিহিত এবং যেখানে মুসলমানরা প্রধান সংখ্যাগুরু তাহাদের সমবায়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হোক এবং অবিলম্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা কার্যকর করার নিমিত্ত দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি দেয়া হোক।

২) স্ব-স্ব সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের জনগণ কর্তৃক দুটি পৃথক সংবিধান রচনাকারী সংস্থা গঠন করা হোক।

৩) ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক লাহোরে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক।

৪) মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির স্বীকৃতি ও অবিলম্বে ইহার বাস্তবায়নই কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে মুসলিম লীগের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের অপরিহার্য শর্ত।

দিল্লী কনভেনশনের গৃহিত প্রস্তাবাবলী ১৯৪০ সালে ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের গৃহীত প্রস্তাবাবলীর সম্পূর্ণ বিরোধী বলে যে বিরোধী উপস্থাপিত হয় তা ক্রমশ: দানা বাঁধতে থাকে। লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিষ্কার অঙ্গীকার ছিল। দিল্লী কনভেনশনে তার বিপরীত অবস্থান নেওয়া হয়। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব অনুযায়ী একাধিক রাষ্ট্রগঠনের পরিবর্তে একটি রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনের রায়কে পুঁজি করে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন অবসানের যাত্রা শুরু হলেও বিষয়টি খুব সহজভাবে সম্পন্ন হয়নি। কারণ, ভারতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন নবনির্বাচিত নেতা জহরলাল নেহেরু হঠাৎ করেই একটি অখণ্ড ও সর্বভারতীয় চিন্তা মাথায় নিয়ে সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। বিষয়টি মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকেও ভাবিয়ে তুলে। আসলে এই বিষয়ে ফয়সালা হয় প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবসের মধ্য দিয়ে। খাজা নাজিমউদ্দিন, নবাব ইসমাইল ও চৌধুরী খালেকুজ্জামানের সমন্বয়ে ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস পালনের অ্যাকশন কমিটি গঠিত

www.pathagar.com

হয়। এই দিবস পালনের আহ্বানে একদিকে যেমন ইংরেজ সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে অন্য দিকে পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। খাজা নাজিমউদ্দিন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরেজদের নয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে। তার এই বক্তব্যে ভারতের বিদ্যমান পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। যদিও প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস ছিল মূলত একদিনের হরতাল কিন্তু সত্যিকার অর্থে পরিস্থিতি একইভাবে সর্বত্র পরিচালিত হয়নি।

কোথাও কোথাও ঐদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমানরা মেতে ওঠে। সুতরাং ১৯৪৬-এর নির্বাচন ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করলেও পাকিস্তানে নতুন অসন্তোষের সূত্রপাত করে। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পূর্ব থেকেই ভাষা নিয়ে যে বিরোধের সূচনা হয় তা ক্রমান্বয়ে দানা বাঁধতে থাকে। বিষয়টি শুধু যে মুখে মুখে বা মনে মনে ছিল তা নয় বরং পাকিস্তানের তৎকালীন নেতৃবৃন্দের কাছেও তা প্রমাণিত হয়। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের পশ্চাদমুখী চিন্তার কারণে পূর্ববঙ্গের স্পর্শকাতর এলাকায় শাসনভার চালাবার পরিস্থিতি তার ছিল না। তিনি নিজে উর্দুভাষী হবার কারণে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে। পাকিস্তানের তৎকালীন শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে বিরোধী ভাবের সূচনা হয় তার প্রভাব ক্রমান্বয়ে পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ এবং পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পড়তে থাকে। এর প্রথম প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ১৯৪৯ সালের টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে। আসাম থেকে আগত প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দক্ষিণ ঘাটাইল নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হন। এই নির্বাচন নিয়ে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর সাথে যে বিরোধ উপস্থাপিত হয় তার সফল পরিণতি ঘটে ১৯৫৪ সালে। '৫৪ সালের নির্বাচনকে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। মার্চ মাসে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রধান এ. কে. ফজলুল হক ৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান নিজামে ইসলাম পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল, পাকিস্তান খেলাফতে রাব্বানী পার্টির সহযোগিতায় যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। সম্মিলিতভাবে আসন্ন নির্বাচন মোকাবেলা করাই ছিল এই ফ্রন্টের উদ্দেশ্য।

যুক্ত ফ্রন্টের ২১ দফা ছিল নিম্নরূপ :

নীতি : কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে। উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩। পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করত পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাট চাষীদের পাটের ন্যায্যমূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা আমলের পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি

www.pathagar.com

বাজেয়প্ত করা হইবে।

৪। কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইবে এবং সরকারী সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫। পূর্ব পাকিস্তানকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈরি কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং লবণ কেলেঙ্কারির জন্য দায়ী মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার সদস্যদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা করা হইবে।

৭। পূর্ব পাকিস্তানকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৮। শিল্পী ও কারিগর মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করা হইবে।

৯। দেশে একযোগে প্রাথমিক, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ও কার্যকরী করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং বেসরকারী স্কুলসমূহের বর্তমান প্রভেদ দূর করিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল স্কুলকে সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কালাকানুন বাতিল ও রহিতপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া শিক্ষাকে সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসে অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা হইবে।

১২। শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগী সমস্ত সরকারী কর্মচারীর বেতন কমাইয়া ও নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীর বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩। দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারীর ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪। জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করতঃ বিনাবিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা সমিতি

www.pathagar.com

করিবার অধিকার অবাধ ও নিরংকুশ করা হইবে।

১৫। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬। যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাসস্থান করিবেন এবং বর্ধমান হাউসের আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭। বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে যাহারা মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভার গুলীতে শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮। ২১ ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করিতে হইবে।

১৯। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে। এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়ে (অবশিষ্ট ক্ষমতাসহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল বাহিনীর হেড কোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থান করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে স্বতন্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্যে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে। এবং পর পর তিনটি নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

সোনার ছেলেদের উত্থানপর্বে ৭০ সালের নির্বাচন একেবারে কোনো ভূমিকা রাখেনি একথা সঠিক নয়। বরং একথাই ঠিক যে, ঐ সময়েও সোনার ছেলেদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। তবে এই ভূমিকা সেই সময়ের জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে এতো বেশি একাট্টা হয়েছিল যে, তখন এসব ব্যাপারে কারো তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না। বরং অনেকেই মনে করেছেন ওরা যা করছে করুক না। ৭০-এর নির্বাচন সামরিক আইনের আওতায় অনুষ্ঠিত হলেও এর অভ্যন্তর ছিল ফোকলা। তৎকালীন ভোট কেন্দ্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে যারা জানেন তারা প্রায় সকলেই একমত হবেন যে, ঐ নির্বাচনে নির্বাচনী কোনো নিয়মবিধি মানা হয়নি বরং সম্মিলিতভাবে ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরের সকলেই বলেছেন, 'সিল মারো ভাই সিল মারো নৌকা মার্কায় সিল মারো।' আসলে এই পরিস্থিতি বেশ আগে থেকেই অনুমান করা হয়েছিল এবং দেশের সমাজের বিভিন্ন স্তরের শ্রেণী পেশার মধ্যেও এই ধারণা জন্মেছিল। ৭২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রাণশক্তি ৫৪-এর নির্বাচনের বিজয় জনগণতান্ত্রিক স্বাধীন পূর্ব বাংলায় বিশ্বাসীরা ৭০-এর নির্বাচনকে নির্বাচনের মাঠে আসার আগেই বারোটা বাজিয়েছিল। যে নৌকাকে যুক্তফ্রন্ট জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত করেছিল সেই নৌকায় উঠে পড়ে তথাকথিত গণতন্ত্রীরা। ৭০-সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচন

www.pathagar.com

কেন সুন্দর হতে পারেনি তার কারণ খুঁজতে গেলে অবশ্যই বলতে হবে ভাষানী ন্যাপের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো। শুধু নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো নয়, বরং তারা নির্বাচন অনুষ্ঠানে গুরুতর বিরোধিতা করেছেন। নির্বাচনের প্রায় পূর্ব মুহূর্তে এসে মুসলিম লীগ, আতাউর রহমান খানের ন্যাশনাল লীগও নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায়। যার ফল দাঁড়ায় এরকম যে, নির্বাচনের মাঠে আওয়ামী লীগ ছাড়া কার্যত আর কেউ থাকলো না। ৪৭-থেকে ৭০ এই ২৩ বছরের পাকিস্তানী রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ যে প্রথম বারের মতো কার্যকর ক্ষমতা পেতে যাচ্ছে এ বিষয়টি প্রায় সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। সত্যি কথা বলতে কি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পরাজয় মূলত আওয়ামী লীগের বিজয়কে নিশ্চিত করে তুলেছিল। জনগণের কাছে মামলার সত্যাসত্য তখন বড় কথা ছিল না বরং কথা ছিল রাজনৈতিক শক্তি পরীক্ষার। এর পরীক্ষায় কে কতটা বিজয়ী তা দেখার জন্যই সকলে উন্মুখ ছিল। ৬৫-সালের ১৭ দিনের পাক ভারত যুদ্ধ ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের একটি বড় উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। পুনরায় পাক ভারত যুদ্ধ হলে পূর্বপাকিস্তানের অবস্থা কি দাঁড়াবে এই ধারণা এ অঞ্চলের জনগণকে যুদ্ধত্তোর পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন করে তুলে। আর সে কারণেই আগরতলা মামলা পাকিস্তানের ঐক্য সংহতির জন্য কতটা প্রয়োজনীয় অথবা অপ্রয়োজনীয় এ নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানীদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

বাংলাদেশের চলমান রাজনীতিতে সোনার ছেলেদের উত্থান এবং বিরাজমান আলোচনায় আগরতলা মামলা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালীন রাজনীতির পরিস্থিতিতে ১৯৬৭ সালের মধ্য ডিসেম্বরে ঢাকা নগরে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে পূর্ব পাকিস্তানকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও তার সহচরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সকল জল্পনাকল্পনা ও গুজবের অবসান ঘটিয়ে সরকার ৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি এক প্রেস নোটে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের প্রথম সচিবের যোগসাজশে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে ১৮ জন সামরিক বেসামরিক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সংবাদ জনসম্মুখে প্রকাশ করে। ১৮ জানুয়ারি অপর এক প্রেস নোটে ঘোষণা করা হয় যে, রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রে জড়িত শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ৬৬-সালের ৮ মে থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিনাবিচারে তিনি আটক ছিলেন। ১৭ জানুয়ারি দিবাগত গভীর রাতে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এক আদেশ বলে সুপ্রিমকোর্টে প্রধান বিচারপতি এস. এ রহমান, ইস্ট পাকিস্তানের হাইকোর্টের বিচারপতি মুজিবুর রহমান ও বিচারপতি মকসুমুল হাকিমের সমন্বয়ে বিশেষ আদালত গঠন করে এবং অন্য এক আদেশ বলে কেন্দ্রীয় সরকার ঢাকা ক্যান্টনমেন্টকেই বিচারের স্থল হিসাবে ঘোষণা করে। ৬ জুন ঘোষণা করা হয় যে, ১৯ জুন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগনাল মেস প্রাঙ্গণে বিশেষ আদালতে বিচার শুরু হবে। এই মামলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯ জুন থেকে নিম্নলিখিত ৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ হয়-১। শেখ মুজিবর রহমান, ২। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ৩। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, ৪। এল, এস সুলতানুদ্দিন আহমদ, ৫। এল. এস. সি. ডি. নূর মোহাম্মদ, ৬। আহমদ ফজলুর রহমান, সি. এস. পি ৭। ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, ৮। প্রাক্তন করপোরাল আবুল বাশার মোহাম্মদ

www.pathagar.com

আবদুস সামাদ, ৯। প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন, ১০। ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক, ১১। খন্দকার রুহুল কুদ্দুস, সি, এস, পি, ১২। ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী, ১৩। বিধান কৃষ্ণ সেন, ১৪। সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, ১৫। প্রাক্তন হাবিলদার ক্লার্ক মুজিবর রহমান, ১৬। প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, ১৭। সার্জেন্ট জহুরুল হক, ১৮। প্রাক্তন এ. টি. মোহাম্মদ খুরশীদ ১৯। খান এম. শামসুর রহমান সি, এস, পি, ২০। হাবিলদার এ. কে. এম. শামসুল হক, ২১। হাবিলদার আজিজুল হক, ২২। এস. এ. সি. মাহফুজুল বারী, ২৩। সার্জেন্ট শামসুল হক, ২৪। মেজর শামসুল আলম, ২৫। ক্যাপ্টেন মোঃ আবদুল মোত্তালেব, ২৬। ক্যাপ্টেন এম. শওকত আলী, ২৭। ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা, ২৮। ক্যাপটেন এ. এন. এম. নুরুজ্জামান, ২৯। সার্জেন্ট আবদুল জলিল, ৩০। মোহাম্মদ মাহবুবুদ্দিন চৌধুরী, ৩১। ফাস্ট লে. এম. এস. এম. রহমান, ৩২। প্রাক্তন সুবেদার এ. কে. এম. তাজুল ইসলাম, ৩৩। মোহাম্মদ আলী রেজা, ৩৪। ক্যাপটেন খুরশীদ উদ্দিন আহমদ, ৩৫। ফাস্ট লে. আবদুর রউফ।

মামলার বিবরণ প্রকাশে আদালত সংবাদপত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে। আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ ও ছাত্র লীগ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে মিথ্যা মামলা বলে গোড়া থেকেই কানাঘোষার আন্দোলন শুরু করে। প্রকারান্তরে একথাও ঠিক যে, প্রকাশ্যত এই মামলার বিরোধিতা করলেও দলীয় প্রচারণায় এর সত্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহ তাদের ছিল না। এই মামলাকে কেন্দ্র করে ঢাকা নগরে বিভিন্ন সমাবেশে 'জাগো বাঙালী' আওয়াজ তোলা হয়। আগরতলা মামলার আগেই ৬ দফা দেওয়া হয়েছিল। এই ছয় দফার ভিত্তিতেই শুরু হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের নতুন আন্দোলন। ৪৬ পরবর্তী আন্দোলন থেকে এই ধারা একদিকে যেমন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, তেমনি মূল আন্দোলনের ধারাবাহিকতা সেকথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা যাবে না। কারণ, ৪৬ নির্বাচন পরবর্তী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন। কার্যত লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিমূলে ছিল এ অঞ্চলের স্বাধীনতা হারা নিগৃহীত মুসলমান এবং নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর ওপর দুইশ বছরের ব্রিটিশ নির্যাতনের নির্যাস। আর তাই ৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সংকট ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। কেন এবং কি কারণে, ওই প্রস্তাব নিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক কর্ণধারেরা ছিনিমিনি খেলেছেন তা নিয়ে বর্তমানে আলোচনা নিরর্থক হলেও এই ধারাবাহিকতার অনুসন্ধান দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের জন্য একেবারে মূল্যহীন নয়। যে সন্ত্রাসী রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব এবং বিকাশ হয়েছে তার গভীরে যে রাজনৈতিক সংকট রয়েছে, তা সৃষ্টির পেছনে রয়েছে এক গভীর চক্রান্ত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ সংকট সৃষ্টিতে দেশের প্রবীণ ও প্রথিতযশা অনেক রাজনৈতিকই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন। যে কারণে, আন্দোলন এবং আন্দোলনের ফলাফল কখনো কাঙ্ক্ষিত হয়নি। অথবা বলা যায় নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার জন্যই আন্দোলনকে নানা বাঁকে ঘুরিয়ে পরিচালিত করা হয়েছে। তবু বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তব প্রেক্ষিত অনুধাবনে ৬ দফার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত বিবেচনা করে ৬ দফা উল্লেখ করছি।

১। শাসনতন্ত্র ও সরকারের কার্যকরী পদ্ধতি গঠিত হইবে সত্যিকার 'ফেডারেশন অব পাকিস্তান' কাঠামোর ভিত্তিতে। যদিও পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রিপাবলিক হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছিল তথাপি অদ্যাবধি যতগুলো শাসনতন্ত্র প্রণীত হইয়াছিল তাহার কোনোটিতেই ফেডারেল পদ্ধতির সরকারের

www.pathagar.com

বাস্তব রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হয় নাই।

২। ফেডারেল সরকারের হাতে কেবল দুইটি বিষয় থাকিবে যথা দেশ রক্ষা এবং বৈদেশিক বিষয়।

৩। মুদ্রা বিষয়ে নিম্নোক্ত যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ক) দুইটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করা যাইতে পারে। অথবা

খ) সমগ্র দেশের জন্য একটি মুদ্রা চালু করা যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে এমন কার্যকর শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকতে হইবে যাহাতে পূর্বপাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানের মূলধন পাচার বন্ধ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

গ) পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। ট্যাক্সেশন সকল ট্যাক্স ও ডিউটি আদায়ের ব্যবস্থা থাকিবে। ফেডারেশন সরকারের ট্যাক্স আদায় করিবার কোনো অধিকার থাকিবে না, তবে কেবলমাত্র প্রদেশের বা স্টেটের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে খরচপত্রাদি বহন করিবার জন্য প্রাদেশিক ট্যাক্সের উপর লেভি বসাইতে পারিবে। এইভাবে সকল স্টেট ব্যাংকের উপর সমহারে লেভির দ্বারা অর্জিত অর্থে ফেডারেল ফান্ড গঠিত হইবে।

৫। বৈদেশিক বাণিজ্য

ক) প্রতিটি প্রদেশের জন্য পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্য একাউন্টের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

খ) বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্টেটের হাতে থাকিবে।

গ) প্রতিটি প্রদেশ বা স্টেটের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার একটি সমহার প্রদানের মাধ্যমে ফেডারেল সরকারের মুদ্রার প্রয়োজন মিটানো হইবে।

ঘ) এক প্রদেশ অথবা স্টেট হইতে অন্য প্রদেশ বা স্টেটে জিনিস-পত্রের আদান-প্রদানে কোনো ট্যাক্স বা ট্যারিফ নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না।

ঙ) বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং নিজেদের স্বার্থে বাণিজ্যিক আলোচনা করিবার অধিকার প্রদেশ বা স্টেটের থাকিবে। এই অধিকার ফেডারেল সরকারের নীতির বিষয়ে নিরপেক্ষ হইবে।

৬। রাষ্ট্রীয় অখণ্ড ও শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন স্থানীয় বাহিনী বা প্যারা মিলিশিয়া গড়িয়া তোলার অধিকার প্রদেশ বা স্টেটের থাকা উচিত।

সোনার ছেলেদের উত্থানপর্বে ৭০-এর নির্বাচন প্রসঙ্গে গত সপ্তাহে আলোচনা শুরু করেছিলাম। ঐ লেখায় আমরা এ কথা উল্লেখ করেছি যে, ৭০-এর নির্বাচন হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয় বরং এটি ছিল এক রাজনৈতিক ধারার সমাপ্তি এবং নতুন অধ্যায় শুরু। ৫৪ সালের নির্বাচনে যে ধারার যৌথ যাত্রা শুরু হয়েছিল তার মধ্যে দেশ প্রেমিক ধারার মৃত্যু এবং তথাকথিত গণতান্ত্রিক ধারা নামে নতুন অধ্যায়ের শুরু হয় এ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। সত্যি বলতে কি নতুন অধ্যায়ের জন্মসূত্র হচ্ছে পাকিস্তানের প্রথম

www.pathagar.com

সামরিক শাসন। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন ও সামরিক শাসক একই সমান্তরাল ছিল না। ব্যাপারটি শুনতে খটকা লাগলেও এ কথাই ঐতিহাসিকভাবে সত্যি বলে প্রমাণিত যে ৫৮ সালের সামরিক শাসনের প্রয়োজনীয়তার সাথে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক ছিল না। ঐ সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিল পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান গণতান্ত্রিক ধারাকে প্রতিহত করার জন্য। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক সে ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। পাকিস্তানের ১০ বছরের সামরিক শাসক জেনারেল আইউব খান তার শেষ আবেগময়ী বক্তৃতায় পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনই তার পরিকল্পিত এবং বাস্তবায়িত শাসনের নেপথ্যের কথা জাতিকে জানিয়ে যাননি। পাকিস্তান নিয়ে আলোচনার জন্য নয়, তবে ধারাবাহিকতার প্রয়োজনে আমরা দুএকটি বিষয় আলোচনায় রাখছি। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করে ৯২ (ক) ধারা জারি করা হয়। ৩০ মে গভর্নর জেনারেল কমিউনিস্ট বিশৃংখলা দমনে ব্যর্থতার অভিযোগে শেরে-বাংলার মন্ত্রিসভা বাতিল করেন অর্থাৎ ৫৪-এর নির্বাচনী রায় অকার্যকর করার নেপথ্য কারণ ছিল আসন্ন সামরিক শাসন। ৪০-সালের লাহোর প্রস্তাবের কার্যকারিতাও এই সিদ্ধান্তের কারণে সম্পূর্ণরূপে নস্বাৎ হয়ে যায়। এই ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয় ৭০-এর নির্বাচন। এই নির্বাচন সম্পর্কে ন্যাপের এককালের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান যাদুমিয়ার একটি উদ্বৃতি উল্লেখযোগ্য। মওলানা আমাদের ঐতিহ্য শীর্ষক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, '৭০-সালে আমরা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতাম এবং নির্বাচন করতাম তবে ২৫টি আসন অন্তত নিশ্চয়ই পেতাম।' তিনি ঐ নিবন্ধে আরো লিখেছেন, 'যদি প্রথম থেকেই নির্বাচনের ব্যাপারে পার্টি পজেটিভ হতো এবং ২৫টি আসন নিতে পারতো তাহলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরেই আঞ্চলিক প্রশ্নের সমাধানের ব্যাপারে আমরা কার্যকরী পদক্ষেপ এবং ভূমিকা রাখতে পারতাম। অন্য দিকে স্বাধীনতা সংগ্রামেও ভারত পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্ব করতে পারতো না।'

৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল তৈরি হয়েছে টানা সামরিক শাসনের মধ্যদিয়ে। এর অর্থ এই যে, কমিউনিস্ট বিতারণের নামে পাকিস্তানে যে সামরিক শাসনের আগমন ঘটে তার মধ্যদিয়েই রাজনৈতিক নতুন প্রবণতা শুরু হয় এবং এ কথাও সত্য যে, সামরিক শাসনের আগমনী বার্তার ঘোষণা এবং তার কার্যকারিতায় যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরীক দল আওয়ামী লীগের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও সহায়তা ছিলো। ঐ সময়কার ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সামরিক শাসনের আগেই মওলানা ভাসানী যখন বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য বার্লিনে যান তখন পাকিস্তানে ইস্কান্দার মির্জা দম্ভোক্তি করে হুংকার দেয় যে, 'মওলানা ভাসানীর মতো রাষ্ট্রদ্রোহী প্রত্যাবর্তন করলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে'। এদিকে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা বরখাস্ত ও ৯২ (ক) ধারা প্রবর্তনজনিত উদ্ভুত পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য ৫৪ সালের ১ জুন বিকেল ২টায় সদরঘাটের ৫৬ সিমসন রোডে যুক্তফ্রন্ট পালার্মেন্ট পার্টির এক সভা আহ্বান করা হয়। নতুন গভর্নরের নির্দেশে পুলিশ ঐ বাড়ির দোতলা তালাবদ্ধ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত অর্থমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকারের সরকারী বাসভবনে নিজামী-ই-ইসলাম পার্টির নেতা আসরাফ উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেরে-বাংলাকে নজরবন্দী এবং শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আসলে প্রকাশ্য মৃদু প্রতিবাদ আর গোপনে সরকারের কার্যক্রমকে সমর্থনের মধ্যদিয়েই রাজনৈতিক পালা বদল চলতে থাকে। সোজা কথা বলতে গেলে এই অধ্যায়ের নায়কের ভূমিকায় ছিল পাকিস্তানের

www.pathagar.com

সামরিক শাসন আর নাট্যমঞ্চের নট-নটি ছিল আওয়ামী লীগ। নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতেই এগুতে থাকে আন্দোলন, নির্বাচন। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রভাব তৎকালীন পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর ও পরে চীন সোভিয়েত সম্পর্কের টানাপড়েন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। আর এই পালা বদল ও পরিবর্তনের মধ্যদিয়েই সোনার ছেলেদের রিক্রুট এবং তাদের লালন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ৭০-সালের নির্বাচনের পথ ধরেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ঐ নির্বাচনে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের আগাম জানান্ হিসাবে কাজ করে। তবু কথা থাকে কারণ, ঐ নির্বাচনে নির্বাচন গ্রহণ ও বর্জন দুই ধারাই কার্যকর ছিল। অর্থাৎ নির্বাচনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধারাই কাজ করেছে। তবুও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব কম নয়। লক্ষ জনতার সমাবেশে যে রাজনৈতিক ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। এই ঘোষণা স্বাধীনতার পক্ষে কতটা সরাসরি অথবা কৌশলগত ছিল তা নিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা এ বিষয়ের দিকে না এগিয়ে ৭ মার্চের ভাষণের পূর্বাপর দু-একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। মইদুল হাসান মূলধারা একাত্তুরে বর্ণনা করেন যে, '৫ অথবা ৬ মার্চ শেখ মুজিবের নির্দেশে তাজউদ্দিন গোপনে সাক্ষাৎ করেন ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার কে. সি সেনগুপ্তের সাথে।

উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের শাসকেরা যদি সত্যি সত্যি পূর্ব বাংলায় ধ্বংস তাণ্ডব শুরু করে তবে, সে অবস্থায় ভারত সরকার আক্রান্তকারীদের রাজনৈতিক আশ্রয়দান বা সম্ভাব্য প্রতিরোধ সংগ্রামে কোনো সাহায্য সহযোগিতা করবে কি না জানতে চাওয়া। উত্তরের অন্বেষণে সেনগুপ্ত দিল্লী যান। সারা ভারত তখন সাধারণ নির্বাচন নিয়ে মত্ত। সেখানে সরকারী মনোভাব সংগ্রহে তার বেশ কয়দিন কেটে যায় এবং ঢাকায় ফেরার পর সেনগুপ্ত ১৭ মার্চ ভাসাভাসাভাবে তাজউদ্দিনকে জানান যে, যদিও পাকিস্তান আঘাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে ইসলামাবাদস্থ হাই কমিশন সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন তবুও আঘাত যদি নিতান্তই আসে তবে ভারত আক্রান্ত মানুষের জন্য সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদান করবেন। এই বৈঠকে স্থির হয় তাজউদ্দিন শেখ মুজিবের সাথে পরামর্শের পর সেনগুপ্তের সাথে আবার মিলিত হবেন এবং সম্ভবত তখন তাজউদ্দিন সর্বশেষ পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতার প্রকার ও ধরন সম্পর্কে নির্দিষ্ট আলোচনা চালাতে সক্ষম হবেন। ২৪ মার্চ এই বৈঠকের কথা ছিল।' ২৫ মার্চের ঘটনা স ম্পর্কে লিখতে গিয়ে জনাব এম. আর. আক্তার মুকুল লিখেছেন, 'ইয়াহিয়ার আকস্মিকভাবে ঢাকা ত্যাগ ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক ঢাকা নগরী আক্রমণে শেখ মুজিব কিছুটা হতবাক হয়েছিলেন বৈকি। সন্ধ্যা থেকেই তিনি একে একে সমস্ত আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে গোপন স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এমনকি সৈয়দপুর ও চট্টগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগের সময় পর্যন্ত পেয়েছিলেন। শেখ মুজিব নিজেও গোপন স্থানে চলে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় নিয়ে সুটকেস তৈরি করলেন। একে একে সবাই বিদায় নিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে শেখ মুজিব তার ৩২ নম্বরের বাড়ি ত্যাগ করলেন না। তাহলে টেলিফোনে কার কাছ থেকে আশ্বাস পেলেন, যে আশ্বাসের উপর নির্ভর করে তিনি পাথরের মতো নিশ্চুপভাবে গ্রেফতারের প্রতীক্ষায় বসে রইলেন। এ প্রশ্নের সমাধান তো আজো পর্যন্ত হলো না। এই ব্যাপারে তিনি একটা কৈফিয়ত দিয়েছিলেন বৈকি। কিন্তু ঢাকায় যে ভাবে গণহত্যা হয়েছে তার এই কৈফিয়ত তো যথার্থতা তাতে প্রমাণিত হয় না।'

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মুজিবের ঢাকা অবস্থান বিতর্কের কোনো সুরাহা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আমরা যে সোনার ছেলেদের নিয়ে আলোচনায় বসেছি, তাদের উত্থানপর্ব এই সব ঘটনায় অত্যন্ত সক্রীয় ভূমিকা রেখেছে। প্রতিটি সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই এদেশের রাজনীতিতে যে নতুন ইস্যুর জন্ম হয়েছে এবং নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়েছে তার প্রমাণ মিলে এইসব ঘটনায়। মুক্তি বাহিনীকে বিভক্তিকরণ দেশপ্রেম নিয়ে নানা বিতর্ক উত্থাপন এবং মুজিব বাহিনীসহ আরো যে সব নামীয় বাহিনীর জন্ম হয়েছিল তার সূত্র এবং উৎস রয়েছে এসব রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে। এ ধারাবাহিকতা এদেশের রাজনীতি থেকে কখনই নষ্ট করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে স্বাধীনতার দাবীদার নিয়ে যে প্রচণ্ড বিতর্ক শুরু হয়েছে এবং বিশেষ করে মেজর জলিলসহ দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির শূন্যমাঠে শুরু হয় সোনার ছেলেদের লাঠির দাপট এবং দম্ভোক্তি। আর এই ধারায় তারা ৭০ থেকে ৭২ পর্যন্ত যে প্রাকটিস করেছে তার সফল বাস্তবায়ন করে ৭৩-এর নির্বাচনে। যদিও ঐ নির্বাচনে তাদের অনুকূলে কিছু সুবিধা তারা গ্রহণ করেছিল।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে যে সংবিধান রচিত হয়, ঐ সংবিধানে ভারতীয় সংবিধানের অনুকরণে তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যদিও বলা হয়েছিল ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ। আসলে নিষিদ্ধ করা হয় ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং ধর্মশিক্ষাকে। ব্যাপারটি এইভাবে তারা প্রচার করতে থাকেন যে, ধর্মই যেন সকল অনিষ্টের মূল। অথচ যে বাংলাদেশ আমরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে অর্জন করি তার ভিত্তি হচ্ছে ৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব। ১৯৪০ সালের ২২ ও ২৩ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সপ্তবিংশতম অধিবেশন মি. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অধিবেশনে আবুল কাশেম ফজলুল হক ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিকরূপ সম্পর্কে এক প্রস্তাবে বলেন, 'এদেশে কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই কার্যকর কিংবা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যদি না অতঃপর বর্ণিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে তা পরিকল্পিত হয়। যথা—ভৌগোলিক নৈকট্য সংবলিত ইউনিটগুলো প্রয়োজনানুসারে স্থানিক রদবদলপূর্বক সীমানা চিহ্নিত করে অঞ্চল গঠন করতে হবে এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল যেমন-ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল সমন্বয়ে অবশ্যই স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে। যোগদানে অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে।'

ইউনিট ও অঞ্চলগুলোতে সংখ্যালঘুদের সাথে পরামর্শক্রমে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার এবং স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্তে সর্ব বিষয়ে পর্যাপ্ত কার্যকর ও মেন্ডেটরী নিরাপত্তার সুনিশ্চিত বিধান সংযোজন করতে হবে এবং ভারতের যে সকল অংশে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে তাদের সাথে পরামর্শক্রমে তাদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও সংবিধানে পর্যাপ্ত কার্যকরী ও বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত বিধান সংযোজন করতে হবে।' এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছিল ৬ দফা বা পাকিস্তানের কনফেডারেশনের প্রস্তাব। অথচ বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময় অন্যতম মৌলিক ধারা হিসাবে অনুপ্রবেশ ঘটে ধর্মনিরপেক্ষতার। কখন কিভাবে এ বিষয়টি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার কোনো নির্ভরযোগ্য দলিল খুঁজে পাওয়া যাবে না, তবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতীয় পত্রপত্রিকায় এ বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে

www.pathagar.com

স্থান পায়। ভারতে প্রকাশিত প্রায় সবগুলো ইংরেজী, বাংলা দৈনিকেই এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য দৈনিক যুগান্তরে কিছু লেখা থেকে শুরু করছি। ৭১-সালের ১ ডিসেম্বর যুগান্তর বাংলাদেশ থেকে পাক সৈন্য সরাও শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে যে, 'জোড়াতালিতে কোনো সমাধান মিলবে না ধর্ষিত বাংলাদেশে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্থ একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।' ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দীরা গান্ধীর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার খবর পরিবেশন করে ৭ ডিসেম্বর যুগান্তরে লেখা হয়, 'বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ভারতের অনুরূপ সেজন্যই স্বীকৃতি জ্ঞাপনে কোনো বাধা নেই। বাংলাদেশ ও ভারতের আদর্শ একটি।' এই ধারণার আরো বিস্তৃত আলোচনা করেছে যুগান্তর ও আনন্দবাজার। ৭ ডিসেম্বর যুগান্তরের সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক বদ্ধ জলার মধ্যে বাংলাদেশ ফুটন্ত পদ্ম। তার সারা অঙ্গে রয়েছে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ছাপ। আদর্শের এই ঐক্য চেতনা ভারত এবং বাংলাদেশকে টেনে এনেছে কাছাকাছি। তাই নবীনের মাথায় প্রবীণ ঢেলেছে প্রথম অভিষেকের কল্যাণ বারী। তার হতে পরিয়ে দিয়েছে সৌভ্রাতৃত্বের রাখি। দুহাতে তাকে আড়াল করে রেখেছে ভারত।' ৮ ডিসেম্বর যুগান্তরের উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, 'চারপাশে কোনোদিক থেকে বহিশত্রুর আক্রমণ আসার আশংকা নেই। তাই অস্ত্রশস্ত্র এবং সেনা নৌ-বিমান বহর মোতায়েন রাখার জন্য বছর বছর সাধ্যাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করার কোনো প্রয়োজন হবে না। আভ্যন্তরীন শান্তি রক্ষার জন্য কিছু পুলিশ থাকলেই চলবে।' ঐ তারিখে যুগান্তরে উল্লেখ করা হয়, 'যুগান্তর ১৯৪৭ এর বিপন্ন বিভক্ত দিন থেকে এই রক্তিম সূর্যোদয় কামনা করছে। এ মোহের মেঘ জাল ছিন্ন করে সত্যসূর্য একদিন প্রকাশিত হবেই এই বিশ্বাস নিয়ে একটা সতর্ক দৃষ্টি রেখে আসছে যুগান্তর পূর্বের দিকে। অস্ফুট কাতরোক্তি কান পেতে শুনেছে। মহাল্লোসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠান ক্ষণ থেকে একটা বছর কাটতে না কাটতেই গুঞ্জনধ্বনি এল কানে। ১৯৪৮ এ বাঙ্গালী সত্তার একটা বিদ্রোহ চাপা গোঙ্গানি শোনা গেল। অস্ফুট-অশ্রুত চাপা এই কারণে যে, সেখানকার উল্লাস বেদনার কথা-কাহিনী এই বঙ্গের আসবার সকল রন্ধ্র পথই পাকিস্তানী শাসকেরা সযত্নে রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। উভয় বঙ্গের মাঝখানে ছিলো দুর্লঙ্ঘ্য নিরেট প্রাচীর। ১১ ডিসেম্বর যুগান্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ করে যে, সেই পরিকল্পনা বাংলাদেশ সরকারের রূপায়নে দরকার জনদরদী ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা। প্রকাশ, বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ভারত সরকার কিছু অভিজ্ঞ অফিসার নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা পত্তনে বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করবেন। অন্যান্য ব্যাপার যেমন মুদ্রা ও ডাকটিকিটের ছাপে ভারতের সাহায্যের দরকার হবে। (রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের চুক্তি স্বাভাবিক কিন্তু প্রশাসন চালাতে বিদেশী প্রশাসক নিয়োগের অর্থ ঔপনিবেশিকতা। সুতরাং এ পদ্ধতি সমর্থনের অর্থ হলো বাংলাদেশকে ভারতের করদরাজ্য হিসাবে মনে করা।) ১৩ ডিসেম্বর ঢাকার মুক্তি দরকার এক্ষুনি শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয়তে যুগান্তর লিখে, ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। ভারতের সেনাবাহিনী এর মধ্যে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করেছে। ঢাকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জওয়ানদের অগ্রসরের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে। যুদ্ধের শুরুতে ভারতীয় জওয়ানরা যে রণকৌশল গ্রহণ করেছিল তাকে জার্মান সেনাবাহিনীর অন্যতম কৌশলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।'

৭০-এর নির্বাচন ও ৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সোনার ছেলেদের বড় হয়ে উঠা শুরু হয়েছিলো, তাদের প্রকৃত চরিত্রের উন্মেষ ও বিকাশ হতে শুরু করে ৭৩-এর

www.pathagar.com

নির্বাচন এবং নির্বাচনের পরবর্তী ৭৪-৭৫ সালে। ওই সময়ে সরকারী ও বেসরকারী বাহিনীর নির্মম নির্যাতনে অন্তত ২৫০০০ ভিন্ন মতাবলম্বী নিহত হয়েছেন। যার দায়-দায়িত্ব এই সোনার ছেলেদের উপর বর্তায়। ঐ সময়কে বুঝতে হলে সেই সময়ের কিছু সরকারী সিদ্ধান্ত এবং কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। শুরু করা যাক, ৭৩-সালের নির্বাচন দিয়ে। ৭৩ সালে যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ঐ নির্বাচনে সত্যিকার অর্থে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো না। কারণ, ৭২-এর সংবিধান অনুযায়ী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ হবার পর যারা মাঠে ছিলো, তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ। ন্যাপ ভাসানী মাঠে থাকলেও রাজনৈতিকভাবে তখন তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। তা সত্ত্বেও ৭৩-এর নির্বাচনে সরকার দলীয় নৌকা মার্কায় সীল মারার যে হিড়িক পড়েছিল তার অনেক প্রত্যক্ষদর্শী এখনো জীবিত। একজন জানিয়েছেন তেজগাঁ এলাকায় সরকার দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সীল মারার জন্য দুদিকে পিস্তল ধারণ করে সোনার ছেলেরা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করে তাদের বিজয়কে নিশ্চিত করেছে। শুধু জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন নয়, সোনার ছেলেরা স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ৭৩-এর ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সম্পর্কে ২১ ডিসেম্বরের খবরে বলা হয়, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দ্বিতীয় দিন হত্যা, অবাধে জাল ভোট, পোলিং সেন্টার লুট, অগ্নিসংযোগ, গোলাগুলি অস্ত্রের মুখে আরো বিশটি ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন বন্ধ। ২২ ডিসেম্বর খবরে বলা হয়, ২৪টি কেন্দ্রে নির্বাচন বাতিল, ব্যালট বাক্স হাইজ্যাক, জাল ভোট, দুই জন পোলিং অফিসার খুন। ২৫ ডিসেম্বর লেখা হয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের হালচাল, মারামারি, ছিনতাই, বুলেটের অবাধ ব্যবহার।

৭৩ সালের নির্বাচনে সরকারী সন্ত্রাস ও ক্ষমতা অপব্যবহারের পিছনে প্রধানত যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হচ্ছে একটি সরকারী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তটি জাতীয় জীবনে কলংকজনক আধ্যায় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এবং আরো বলা যেতে পারে যে, বেসরকারী সোনার ছেলেদের সমর্থনে সরকারের অভ্যন্তরে যে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছিলো এরাই তারা। অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ সরকার জাতীয় রক্ষীবাহিনী নামে একটি নতুন বাহিনী গঠনের আদেশ প্রদান করেন এবং ১ ফেব্রুয়ারী থেকে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেন। সত্যি কথা বলতে কি এটি ছিলো একটি বেআইনী বাহিনী। পাকিস্তান আমলে সাবেক পূর্বপাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করার জন্য ৬ দফায় যে প্যারামিলিটারি ফোর্স গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিলো, স্বাধীন বাংলাদেশে সেই বাহিনী রক্ষীবাহিনী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই বাহিনী গঠনের নামে প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন শান্তিরক্ষা, নিরাপত্তা এক প্রকার বিদেশী শক্তির কাছে হস্তান্তর করা হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যায়, এই বাহিনীর উপর প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের কোনো কর্তৃত্ব ছিলো না, যদিও তারা বাংলাদেশের জনগণের বাজেটেই প্রতিপালিত হতো। সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন ওই আধাসামরিক বাহিনী গঠনের ব্যাপারে আগেই ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছিলো যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে শান্তিরক্ষার পথে বড় রকমের বিপর্যয় আসা মোটেই অপ্রত্যাশিত হবে না। উপরোক্ত সমস্যার কথা বিবেচনায় রেখে ভারতীয় উপদেষ্টাদের পরামর্শ অনুযায়ী রক্ষীবাহিনী গঠনের মূল ধারণাটি কোলকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মনেই রেখাপাত

www.pathagar.com

করেছিলো। ধারণা করা হয়েছিলো যে, এই বাহিনী হবে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত। দেশের অভ্যন্তরে আইনরক্ষার জন্য এই বাহিনী পুলিশকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে এবং প্রয়োজনবোধে সাহায্য করবে সেনাবাহিনীকে। অন্যদিকে এই বাহিনী থাকবে পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। এক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয়েছিলো যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশে একটি সুসজ্জিত আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের কাজটি অবশ্যই অসঙ্গত হবে না। প্রকৃতপক্ষে সামরিক সংগঠনের সঙ্গে ভারসাম্য বিধানের জন্য রাজনৈতিক প্রেরণা থেকেই এই বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো।

রক্ষীবাহিনী গঠনের জন্য তাই স্বাভাবিকভাবেই নতুন একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বাহিনীতে সদস্য নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য এ সময় ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হবার আগেই এই বাহিনী তার কাজকর্ম শুরু করে দেয়। এভাবে ভারতীয় উপদেষ্টা এবং সামরিক পরামর্শকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হবার সাথে সাথেই ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ প্রণয়ন করা হয় এবং ১ ফেব্রুয়ারী তারিখ থেকে তা কার্যকর বলে গণ্য করার নির্দেশ দেয়া হয়।

একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যা প্রয়োজন সেনাবাহিনী বা পুলিশ আইনের মতো তেমন একটি আইনগত কাঠামো রক্ষীবাহিনী আদেশে ছিলো অনুপস্থিত। একটি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের বিষয়টি আইনে উল্লেখ করা হলেও এর মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনায় এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এই আইনের সংজ্ঞায় 'রক্ষী' শব্দটি বাহিনীর অফিসার ব্যতিরেকে সাধারণ সদস্যদের জন্য ব্যবহার করা হয়। এতে বলা হয়, জাতীয় রক্ষীবাহিনী নামে একটি বাহিনী গঠন করা হবে। সরকার-নির্ধারিত পন্থায় এর জন্য 'রক্ষী' এবং অন্যান্য অফিসার নিয়োগ করা হবে (অনুচ্ছেদ ৪)। এই বাহিনীর উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সম্পর্কে আইনে বলা হয় যে, সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এই বাহিনীকে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলার কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করতে পারবে। সরকার আহ্বান করলে এই বাহিনী সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করবে এবং সরকার নির্দেশিত অন্য দায়িত্ব পালন করবে (অনুচ্ছেদ-১৮)। উক্ত বাহিনী পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অন্য আইনে উল্লেখ করা হয় যে, এই বাহিনী তদারকীর দায়িত্ব সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হবে এবং সরকারের আদেশে উল্লেখিত আইন ও তার বিধানাবলীর ভিত্তিতে পরিচালকের মাধ্যমে এই বাহিনী প্রশাসিত, পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা হবে। অথবা সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী এ বাহিনী কাজ করবে (অনুচ্ছেদ ৭)। সরকার তার সুনির্দিষ্ট নিয়মে এই বাহিনী পরিচালনার জন্য একজন পরিচালক এবং অন্য অফিসার বিশেষ শর্তাবলীর ভিত্তিতে নিযুক্ত করবেন। আইনের আওতাধীন রক্ষী এবং অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তি এবং শৃঙ্খলাবিধি আরোপ করা হচ্ছে বলে আইনের ১১ ও ১৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়। ১০নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, উক্ত আদেশবলে চাকুরীর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, কিংবা বিশেষভাবে নির্দেশিত নিয়মে, এই আদেশের আওতাধীন কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চাকুরীচ্যুত করা যাবে।

আদেশের ১৬ নং অনুচ্ছেদে বাহিনীর পরিচালক ও অফিসারদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। ১৭নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, সরকার একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উক্ত আইনের উদ্দেশ্যাবলী পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন এবং বাহিনীর গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ,

www.pathagar.com

প্রশাসন, হুকুমদান, নিয়ন্ত্রণ কিংবা শৃঙ্খলা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করবেন।

এই ছিলো রক্ষীবাহিনী আদেশের মূল গঠন বৃত্তান্ত। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিলো যে, 'অপরাধ দমন এবং সূত্র অনুসন্ধানের' জন্য পুলিশ বাহিনী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রক্ষীবাহিনী আদেশ ছিলো পুরোপুরিভাবে নীরব এবং ৮নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত রক্ষীবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ও যুক্তি এ প্রস্তাবনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই আইনটি ছিলো একটি খসড়া ধরনের এবং বাহিনীর বিস্তারিত কার্যধারা, জনগণের কাছে এর ভূমিকা, এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, কিংবা আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে এর গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি ব্যাপারে কোনো গভীর চিন্তার ছাপ ছিলো না। কিন্তু সুনির্দিষ্ট নিয়ম জারি কিংবা সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ গঠন করা পর্যন্ত এই বাহিনী অপেক্ষা করেনি। সরকার খুব শিগগিরই এই বাহিনী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন এবং আইন প্রণয়নের আগেই রক্ষীবাহিনী তার কাজ শুরু করে দেয়। পরবর্তীকালে আদেশ জারির মাধ্যমে কেবলমাত্র এদের কর্মতৎপরতাকে পেছনের তারিখ থেকে আইনগত সমর্থন দেয়া হয়। রক্ষীবাহিনী প্রধানত: যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে তাহলো: বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করা, সীমান্তে চোরাচালান রোধ করা, অবৈধ গুদামজাত ও কালোবাজারী বন্ধ করা এবং চূড়ান্তভাবে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নিশ্চিহ্ন করা। ঝটিকা বাহিনীর মতো এবং বিদ্যুতের ন্যায় আকস্মিকভাবে এই বাহিনী তার কার্যধারা পরিচালনা করতে থাকে। পুরা গ্রাম ঘেরাও করে এই বাহিনী অস্ত্র, দুষ্কৃতকারী এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে ভুয়া রেশন কার্ড উদ্ধার করতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় তারা বেপরোয়াভাবে হত্যা, লুণ্ঠন এমনকি ধর্ষণও করতে থাকে। এদের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহি নিরুপণের কোনো বিধান ছিলো না। অচিরেই রক্ষীরা আইনের সাধারণ আওতাবহির্ভূত বেসরকারী বাহিনী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। তারা যে কোনো বাড়িতে প্রবেশ করতে পারতো। যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারতো, দেশের গোটা গ্রামাঞ্চলে শিবির স্থাপন করে তারা নারী-শিশু নির্বিশেষে যে কাউকে সেই শিবিরে আটক রাখতে পারতো। বাহিনীর প্রতিটি অপারেশনে প্রচুর সংখ্যক নির্দোষ মানুষকে বিপন্ন করা হতে থাকলে প্রতিটি অপারেশনের মাধ্যমে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। জনগণের মধ্যে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে ভীতি জন্মাতে থাকে এবং এর ফলে জনমনে ক্রমশ: ঘৃণাবোধ সঞ্চারিত হয়। এভাবে কাজ শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যেই রক্ষীবাহিনী জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

যে কোনো আদালতে রক্ষীবাহিনীর তৎপরতাকে চ্যালেঞ্জ করা ছিলো দুঃসাধ্য। এর প্রধান কারণ ছিলো এই যে, সেনাবাহিনী, পুলিশ কিংবা এ ধরনের সংস্থার মতো কঠিন নিয়মের নিগড়ে তারা আবদ্ধ ছিলো না। তাদের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য আইনের প্রক্রিয়া অনুসরণ, যে কোনো গৃহ তল্লাশী বা সম্পত্তি সীজকরণ, কিংবা নিজেদের ব্যবহৃত গোলাবারুদের হিসাব রাখার কোনো বালাই ছিলো না। জনগণের সম্পত্তি সংক্রান্ত কাঠামোগত শৃঙ্খলার অস্তিত্ব ছিলো না।

যখন রক্ষীবাহিনীর আচরণ এবং ভূমিকা নিয়ে জনগণের অসন্তোষ চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয় এবং দেশের সংবাদপত্রগুলো তাদের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও ভূমিকা নিয়ে অব্যাহতভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে, তখন ২০ মাস কার্যধারা পরিচালনায় ঢালাও লাইসেন্স দেয়ার পর সরকার রক্ষীবাহিনীর কোনো কোনো তৎপরতাকে আইনসিদ্ধ বলে

www.pathagar.com

প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেও একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। এই অধ্যাদেশের মূল আদেশে প্রথমবারের মতো একটি সংশোধনী আনা হয় এবং ৮ক নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে অনেক পিছিয়ে ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারী থেকে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়। এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, ফৌজদারী দণ্ডবিধি বা অন্য যে কোনো আইনের পরিপন্থী না হলে রক্ষীবাহিনীর যে কোনো সদস্য বা অফিসার ৮নং অনুচ্ছেদ বলে বিনা ওয়ারেন্টে (১) যে কোনো আইনের পরিপন্থী অপরাধে লিপ্ত থাকার সন্দেহবশত: যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার; (২) যে কোনো ব্যক্তি, স্থান, যানবাহন, নৌযান ইত্যাদি তল্লাশী বা আইনশৃঙ্খলা বিরোধী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, এমন যে কোনো সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং তার সম্পত্তি হস্তগত করার পর একটি রিপোর্টসহ তাকে নিকটবর্তী থানার হেফাজতে প্রেরণ করে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আইনের এই সংশোধনীর মাধ্যমে অতীতে বা ভবিষ্যতে সম্পাদিত রক্ষীবাহিনীর সমস্ত কার্যকলাপের উপর বৈধতার প্রলেপ দেয়া হয়। উপরন্তু এতে ১৬ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করে বলা হয় যে, রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা তাদের যে কোনো কাজ সরল বিশ্বাসে করেছেন বলে গণ্য করা হবে এবং এ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের, অভিযোগ পেশ করা আইনগত কোনো পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।

রক্ষীবাহিনী সরকারের কোনো নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এই বাহিনী পরিচালিত হতো। এক রহস্যজনক পদ্ধতিতে এরা কাজকর্ম করতো। বিভিন্ন শ্রেণী জনগণ এবং সংবাদপত্রগুলোর অব্যাহত দাবির পরেও এদের গঠনপ্রণালী বা বাজেট সম্পর্কে সরকার কোনো তথ্য প্রকাশিত করেননি।

জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশে অভিযোগ করতেন যে, রক্ষীবাহিনী ছিলো ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একটি সম্প্রসারিত অংশমাত্র। কেবলমাত্র প্রশিক্ষণ নয়, তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত রসদও ভারত থেকে আসতো। এদের পোশাকের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর পোষাকের সাদৃশ্য ছিলো এবং জনগণ প্রায়ই ভারতীয় বাহিনীকে রক্ষীবাহিনীর নির্মাতা বলে দাবি করতো। রক্ষীবাহিনীর আওয়ামী লীগপন্থী আচরণের ফলেই জনমনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিলো। রক্ষীবাহিনীর গঠনপ্রণালী এবং কাজের ধরন ও পদ্ধতি ছিলো ভারতের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের অনুরূপ। এটা সত্য যে, ভারতে এবং বাংলাদেশে ভারতীয় প্রশিক্ষকরাই প্রথম রক্ষীবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়। তবে রক্ষীবাহিনীর মধ্যে ভারতীয়বাহিনী থাকার অভিযোগ সত্য ছিলো বলে মনে হয় না।

যাই হোক, জাতীয় রক্ষীবাহিনী কোনো ভালো কাজই করেনি, একথা ঠিক নয়। বিপুল পরিমাণ বেআইনী অস্ত্র এরা উদ্ধার করেছে এবং আটক করেছে প্রচুর পরিমাণে চোরাচালানকৃত পণ্য। কালোবাজারী এবং অবৈধ গুদামজাতকারীরা রক্ষীবাহিনীর নাম শুনেই আতঙ্কবোধ করতো। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার করায় এই সুনাম তারা ধরে রাখতে পারেনি। চোরাচালানকারী, মজুতদার, দুর্বৃত্ত এবং বেআইনী অস্ত্রধারীদের যে বিশাল অংশ আওয়ামী লীগের আশীর্বাদপুষ্ট ছিলো, অভিযানকালে রক্ষীবাহিনী অনেক সময় তাদের উপর চড়াও হয়নি। আওয়ামী লীগের সমর্থকদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমানে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করতেও রক্ষীবাহিনী স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়েছিলো। কাজেই যথার্থ একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে রক্ষীবাহিনী অচিরেই এর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে

www.pathagar.com

ফেলে। তাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি প্রায়ই সাধারণ এবং নিরপরাধ লোকদের জীবন যাপনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতো। সরকারের বিরোধী দলীয় যে কাউকে তারা দেশবিরোধী বলে মনে করে অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে। ফলে দুর্ভ্যাজনকভাবে সরকারের একটি ফ্যাসিস্ট বাহিনী হিসেবেই রক্ষীবাহিনী তার পরিচিত অর্জন করে।

সুনির্দিষ্ট কোনো আচরণবিধি এবং প্রশাসনিক কাঠামোর অনুপস্থিতিতে রক্ষীবাহিনীর আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলাও অচিরেই ভেঙ্গে পড়ে। পদমর্যাদার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এরা প্রায় নিজেদের মধ্যে কলহ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। পদমর্যাদা নির্ধারণ থেকে শুরু করে খাদ্য, রেশন সামগ্রীর পরিমাণ পর্যন্ত ছিলো এই কলহের কারণ। জনগণের কাছে ভাবমূর্তি হারাবার সাথে সাথে রক্ষীবাহিনী থেকে পলাতকের সংখ্যাও দিনে দিনে বেড়ে চলেছিলো। রক্ষীবাহিনীর আয়তন বাড়ার সাথে সাথে এদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনার লক্ষ্যে সরকার পরবর্তীকালে রক্ষীবাহিনীর আদেশে একটি সংশোধনী আনেন। একটা বিশেষ বিষয় হলো যে, সরকার রক্ষীবাহিনীর জন্য কোনো আচরণবিধি প্রণয়ন না করে পক্ষান্তরে আইনেরই সংশোধনী এনে বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের চেষ্টা চালান।

প্রধানত: বাহিনীর সদস্যদের পদমর্যাদা নির্ধারণ এবং আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপনের লক্ষ্যেই এই সংশোধনী আনা হয়। আদেশের সংজ্ঞা বা অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী গোটা বাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করে ব্যাটেলিয়ন, কোম্পানী, প্লাটুন, রেজিমেন্ট, জোন ইত্যাদি গঠন করা হয়। এর আগে এসবের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। শৃঙ্খলা বিধানের লক্ষ্যে দুর্বৃত্ত, বিশেষ আদালত, বিশেষ সংক্ষিপ্ত আদালত ইত্যাদি এবং পদমর্যাদা নিধারণের লক্ষ্যে উর্ধ্বতন অফিসার, অধঃস্তন অফিসার ইত্যাদির সংজ্ঞাগুলো ব্যাখ্যায়িত করা হয়। এর ৪ নং ধারায় নতুন একটি বিধান সংযোজিত করে বলা হয় যে, রক্ষীবাহিনী হবে একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী এবং সংবিধানের ১৫২ (ক) অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে বিরাট সংখ্যার উর্ধ্বতন অফিসার এবং একটি নতুন শ্রেণীর অধঃস্তন অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়। এই সংশোধনী বলে যুগ্ম, উপ এবং সহকারী পরিচালক এবং লীডার, সিনিয়র ডেপুটি লীডার ও ডেপুটি এসিস্ট্যান্ট লীডারের পদও সৃষ্টি করা হয়।

অফিসার এবং রক্ষীদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য দুটি বিশেষ ইউনিট গঠন করা হয় এবং এতদুদ্দেশ্য দুটি নতুন অনুচ্ছেদ ১০ (ক) ও ১৩ (খ) সংযুক্ত করা হয়। ১০ (ক) অনুচ্ছেদ ছিল পরিচালক বাদে সমস্ত অফিসার এবং রক্ষীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে সমস্ত অপরাধের প্রেক্ষিতে বিচার ও সিডিপ্লিনারী অ্যাকশনের বিধান থাকে সেগুলোর মধ্যে ছিলো বিদ্রোহ ও উস্কানি, উর্ধ্বতন অফিসারের সঙ্গে অন্যায় আচরণ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো শত্রু বা অস্ত্রধারী কোনো রাষ্ট্রবিরোধী স্বার্থ সংরক্ষণ, অনধিকারের সঙ্গে কমান্ডিং অফিসারকে পরিত্যাগ করা, কলহে লিপ্ত হওয়া, ছুটি ছাড়া গার্ড ত্যাগ করে চলে যাওয়া, বিনানুমতিতে কোনো সম্প্রতি লুটের উদ্দেশ্যে কারো বাড়িতে হানা দেয়া ইত্যাদি। এসব কারণে সর্বোচ্চ সাত বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান থাকে এবং বিশেষ আদালতে এ সমস্ত বিচার পরিচালনার ব্যবস্থা রাখা হয়।

একইভাবে ১০ (খ) অনুচ্ছেদে পরিচালক ব্যতীত অফিসার এবং রক্ষীদের জন্য ২৫টি বিশেষভাবে চিহ্নিত অপরাধের প্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত বিশেষ আদালতে বিচারের বিধান রাখা হয়। সেগুলোর মধ্যে ছিলো উন্মত্ততা, কোনো সেন্ট্রিকে আঘাত করা, কর্তব্য পালনকালে জুয়া খেলা কিংবা অন্যান্য আইন বহির্ভূত কাজ করা, অধঃস্তনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা

www.pathagar.com

ইত্যাদি। বিশেষ সংক্ষিপ্ত আদালতে বিচারের মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড এবং ২০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান থাকে। ১৭নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে এই আইন আদেশ জারির দিন থেকে কার্যকর বলে ঘোষণা করা হয়।

এটা আবারও উল্লেখ করা যেতে পারে, রক্ষীবাহিনী আয়তনে প্রসারিত হবার অনেক পরে এই সংশোধনী আনা হয় এবং অনেক পিছনের তারিখ থেকে তা কার্যকর করার কথা হলেও প্রকৃতপক্ষে ইতোমধ্যেই তা বলবৎ করা হয়েছিলো। রেজিমেন্ট, প্লাটুন ইত্যাদি নামকরণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে আসলে রক্ষীবাহিনীকে একটি নতুন বিশেষ ধরনের সামরিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছিলো। সংশোধনীর মাধ্যমে রক্ষীবাহিনীর মধ্যে আভ্যন্তরীন শান্তি শৃঙ্খলা বিধানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু আচরণবিধির অনুপস্থিতিতে জনগণের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের আচরণ আগের মতোই থেকে যায়। বরং এই সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা এটাই প্রমাণ করে যে, রক্ষীবাহিনীর অভ্যন্তরে বিশৃংখলা বিদ্যমান ছিলো এবং রক্ষীবাহিনীর বাড়াবাড়ি সম্পর্কে জনসাধারণের অভিযোগও একেবারে ভিত্তিহীন ছিলো না।

(ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ: বাংলাদেশ 'দ্য এরা অব শেখ মুজিবুর রহমান' থেকে। গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন জগলুল আলম)।

রক্ষীবাহিনীর উৎস যে কত শক্তিশালী এবং এর হাতে যে রাজনৈতিকভাবে কত প্রসারিত ছিলো হায়দার আকবর খান রনো তাঁর এক লেখায় সেটা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, ঝিনুকের জীবনটা শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল। না-ও বাঁচতে পারতো। যদি ভাগ্যক্রমে ঘটনার যোগাযোগ এমনভাবে না হতো তাহলে সেদিন যে তক্ষক পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেত, ক'জনই বা তার নাম জানত? বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই সদ্য ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর দমন অভিযানের শিকার যারা হয়েছেন, তাদের কজনের নাম আমরা জানি? বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন বামপন্থী দল বলেছে, আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরের রাজত্বকালে কয়েক হাজার দেশপ্রেমিক বামপন্থী কর্মীকে মারা হয়েছে। কিন্ত সঠিক সংখ্যা কে দিতে পারে? হত্যা হয়েছে অনেক এবং তা যে হাজারের ঘরে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

সেদিন এক আড্ডায় রাজনীতির নানা ব্যাপারে-স্যাপার নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে উঠল শেখ হাসিনার প্রয়শ: উচ্চারিত একটি বক্তব্য প্রসঙ্গে। ৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর থেকে নাকি এদেশে হত্যার রাজনীতি শুরু হয়েছে। কথাটা যে কত বড় মিথ্যা তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। কারণ, '৭৫-এর পূর্ববর্তী আর কোনো হত্যার খবর কেউ না রাখলেও সিরাজ সিকদারের হত্যার খবরতো কারো অজানা নয়। তবে এই সময়কালে একমাত্র সিরাজ সিকদারকেই হত্যা করা হয়নি। এই হত্যার তালিকায় কয়েক হাজার নাম হবে। ওই তালিকায় হয়তো আরো একটি নামযুক্ত হতো ঝিনুকের নাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝিনুক বেঁচে গিয়েছিল। সে দিনকার আড্ডায় ওই আলোচনার প্রসঙ্গ ধরেই বলেছিলাম ঝিনুকের কাহিনী।

ঢাকার নিকটস্থ শিবপুর উপজেলার যুবক মুজিবুর রহমান। ডাক নাম ঝিনুক। ১৯৭১ সালে সে ছিল একজন সাহসী তরুণ মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭৪ সাল। তারিখটা ঠিক মনে নেই। ঝিনুককে গ্রেফতার করা হলো। মতিঝিলের এক রেস্তোরাঁ 'মধুবন' থেকে। তখন বিকেল চারটা-সাড়ে চারটা হবে। খবরটা নিয়ে এল ঝিনুকের এক বন্ধু। এতটুকুই শুধু খবর নয়, আরো খবর আছে। আজই রাত ১১টার মধ্যে ঝিনুককে মেরে ফেলা হবে, রক্ষীবাহিনীর

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত। ঝিনুক ভাসানী ন্যাপ করতো। বন্ধুটিও পাকিস্তান আমলে তাই করত। কিন্তু স্বাধীনতার পর সে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগে যোগদান করেছে এবং সামান্য কিছু ব্যবসার সুযোগ পেয়েছে। দলীয় সোর্স থেকেই সে জেনেছে রক্ষীবাহিনীর এই সিদ্ধান্তের কথা। বন্ধুটি যতই এখন আওয়ামী লীগ যুব লীগ করুক না কেন, পুরনো বন্ধুর এই খবর তাকে বিচলিত না করে পারেনি। কিন্তু কি ভাবে বন্ধুর জীবন রক্ষা করা যায়। সে নিজে দলের যে নিচু পর্যায়ে অবস্থান করে, তাতে তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। তাই সে প্রায় উদভ্রান্তের মতো হয়েই ছুটে এসেছে আমাদের কাছে— আমরা যারা তখন বিরোধী দলে ছিলাম। দলীয় কার্যালয়ে তখন ছিলাম আমি, বন্ধু মেনন ও কাজী জাফর আহমদ। কিন্তু আমরাই বা কিভাবে বাঁচাবো। ফোন করলাম রক্ষীবাহিনীর প্রধানকে। তাকে পাওয়া গেল না। যোগাযোগ করলাম ঢাকার ডিসি ও এসপিকে। তারা জানালেন, রক্ষীবাহিনী ধরেছে, তাদের কিছু করার নেই। উপায়ন্তর না দেখে গেলাম জনৈক প্রভাবশালী মন্ত্রীর কাছে। তিনি এখন মৃত। তাঁকে ঘটনাটা বললাম। মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, কখন ধরেছে। বললাম, বিকেল চারটায়। মন্ত্রী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দিনের বেলায় সবার সামনে থেকে ধরলে মারা হবে না, ভয় নেই। বলা বাহুল্য এই অভয় বাণীতে আশ্বস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বললাম, যদি মারে? মন্ত্রী বললেন, দেন আই শ্যাল নট লেট ইট গো আন প্রোটেসটেড। আমি বললাম, প্রোটেস্ট করে কি হবে, জীবন কি ফিরে পাওয়া যাবে? যাই হোক, কোন কাজ হলো না। ফিরে এলাম। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, সর্বোচ্চ অথরিটিকেই একবার এপ্রোচ করা যাক। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকেই সরাসরি টেলিফোন করা হলো। তিনি তখন ৩২ নম্বরের বাসভবনে ছিলেন। তিনি ফোন ধরলেন এবং আমাদের কথা শুনলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কে ধরেছে— রক্ষীবাহিনী না স্পেশাল পুলিশ? তিনি আরো বললেন, রক্ষী বাহিনীর এই অথরিটি নেই। এই কথার তাৎপর্য তখন ঠিক বুঝিনি। বোধ হয় ঢাকা শহরে রক্ষীবাহিনীর তৎপরতা চালানোর এখতিয়ার ছিল না। ঢাকার জন্য রয়েছে স্পেশাল পুলিশ। স্পেশাল পুলিশেরও বহু লোমহর্ষক কাহিনী তখন আমাদের জানা ছিল। তবে ঝিনুকের কেসটা শিবপুরের, ঢাকার বাইরের, তাই রক্ষীবাহিনী গ্রেফতার করেছে। যাই হোক, প্রধানমন্ত্রী কথা দিলেন, 'আমি এখনই খবর নিচ্ছি।' পরে জানতে পেরেছি, তিনি তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ করেন এবং ঝিনুককে আর মারা হয়নি। শুধু তাই নয়, পরদিন সকালে সে মুক্ত হয়ে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলো। এমনকি তার বিরুদ্ধে কোনো মামলাও দায়ের করা হয়নি। বস্তুতঃ বিরোধী দল করে— এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার মতো কোনো ঘটনাও ছিল না।

ঝিনুক নিশ্চয়ই প্রাণ রক্ষার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু গোটা ঘটনাটিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবো? এটা কি ক্ষমতার শীর্ষ ব্যক্তির মহানুভবতারই একটি দৃষ্টান্ত? তিনি যদি মহানুভব হয়েও থাকেন, তবুও তো প্রশ্ন থেকে যায়। কয় জায়গায় ক'জন এই রকম সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জীবন ভিক্ষার আর্জি পেশ করার সুযোগ পেয়েছে? বস্তুত তখন সারাদেশেই রক্ষীবহিনীর হত্যাকাণ্ডের এক তাণ্ডবলীলা চলছিল। যশোরের (ঝিনাইদহের) কালীগঞ্জের এক রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প উঠে গেল সেখানে এক গণকবর আবিষ্কার করা গেল। ৬০টি কংকাল পাওয়া গিয়েছিল।

রাজনৈতিক হত্যা প্রধানত হয় বিরোধী দলকে নিঃশেষ করার জন্য। সব হত্যার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থাকে না। শাসক দলের স্থানীয় নেতারাই সাধারণত স্থানীয়

www.pathagar.com

প্রতিপক্ষকে শেষ করে ফেলার জন্য কাপুরুষের মতো হত্যার পথ বেছে নেয়। আবার একই দলের মধ্যে প্রতিপক্ষকে শেষ করার জন্যও খুনাখুনি হয় বাংলাদেশে এই ঘটনাও অনেক আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এক মাসের মধ্যেই আগরতলা মামলার আসামী স্টুয়র্ট মুজিবকে হত্যা করা হলো। এখানে খুনী এবং যাকে খুন করা হলো উভয়পক্ষই আওয়ামী লীগের। ১৯৭২ এর জানুয়ারী মাসে ঢাকায় প্রকাশ্য রাজপথ থেকে সশস্ত্র ব্যক্তিরা স্টুয়ার্ট মুজিবকে তুলে নিয়ে হত্যা করে। প্রায় কাছাকাছি সময়েই হত্যা করা হয় নরসিংদীর বীর মুক্তিযোদ্ধা নেভাল সিরাজকে। নেভাল সিরাজ ছিলেন ভাসানী ন্যাপের লোক এবং নরসিংদী অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নেতা। একদিন বিকেলে কোনো অজানা গুপ্তঘাতকের গুলিতে তিনি নিহত হলেন। তবে গুপ্তঘাতক কারা তা একেবারে অজানা ছিল না। তারা ছিল স্থানীয় মুজিব বাহিনীর লোকজন। স্বাধীনতার উষালগ্নেই এইভাবে শুরু হলো হত্যার রাজনীতি। সেই সময়ের কথা যাদের স্মরণ আছে তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মহসীন হলের চিভি রুমে সাতজন ছাত্রকে গুলি করে হত্যার কাহিনী। এই ঘটনাটি ঘটেছিল শাসক আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের অন্তর্বিরোধের কারণে। হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত হন শফিউল আলম প্রধান। তখন তিনি মুজিববাদী ছাত্রলীগ নেতা। প্রধান পরে গ্রেফতার হন, জিয়াউর রহমান আমলে তিনি মুক্তও হন। মহসীন হল হত্যাকান্ডের কিছুদিন আগে আরেকটা ঘটনা ঘটে জগন্নাথ হলের কাছে। সন্ধ্যাবেলায় চারজন যুবককে হাতপা বাঁধা অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। কে বা কারা তা জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয় একটি সরকারী সংস্থাই পরিকল্পিতভাবে এই হত্যা সংগটিত করে। বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করা প্রয়াসে সরকারী পর্যায়ে সংগঠিত করা হয় স্পেশাল পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী। তাছাড়া আরো ছিল শাসক দলের রাজনৈতিক কর্মীদের উচ্ছৃংখল সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী। তারা সন্ত্রাস চালাতো। ইচ্ছামতো খুন করার স্বাধীনতা তাদের ছিল। পুলিশ তাদের দেখেও না দেখার ভান করতো অথবা পরোক্ষভাবে সাহায্যই করতো। ফ্যাসিস্ট ইতালীর বর্ণনা দিতে গিয়ে মার্কিন সাংবাদিক জে কার্টার নিউ ইয়র্ক টাইমসে লিখেছিলেন (১৯২১), সারা ইতালিতে ফ্যাসিস্টরা তাদের বিরোধীদের মারধর করা অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে, অথচ সরকার নিরপেক্ষতার ভান করছে। 'লা ফ্যাসিজম' বইয়ে ফ্যাসিস্ট সম্বন্ধে জি প্রজোলিনী লিখেছেন, তারা (ফ্যাসিস্টরা) সশস্ত্র বাহিনীরূপে চলাফেরা করতে পারতো, খুশিমতো হত্যা করতে পারতো। তারা নিশ্চিত যে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কিছু করবে না। আওয়ামী লীগ আমলে অবস্থাটি হুবহু এই রকমই ছিল। রাজশাহীর তানোর অঞ্চল রক্ষীবাহিনী চালিয়েছিল সংগঠিত হত্যাকাণ্ড—বিরোধী সাম্যবাদী দলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। জাসদ গঠনের পর পরই শাসক দলের সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী হত্যা করল সাজদ নেতা সিদ্দিক মাস্টারকে (১৯৭২, ১২ নভেম্বর)। একই ভাবে ৭৪ সালে হত্যা করা হলো জাসদ নেতা এডভোকেট মোশাররফকে (৩ জুন '৭৪)। খুন করা হরো জাসদ সমর্থক ছাত্র নেতা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক রোকনকে। একদিন গভীর রাতে প্রেমানন্দের বাসগৃহ ঘিরে ফেলল রক্ষীবাহিনী। প্রেমানন্দ দাস মুন্সীগঞ্জের লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। রক্ষীবাহিনী জানালার ফাঁক দিয়ে রাইফেলের নল তাক করলো ঘুমন্ত প্রেমানন্দের দিকে, তারপর গুলি চালিয়ে হত্যা করলো। আরো কত ঘটনা বলব? বলে কি শেষ করা যাবে।

(স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড: তারকালোক ডাইজেস্ট)।

সোনার ছেলেদের সেকালের উত্থান পর্ব আলোচনায় রক্ষীবাহিনীর গঠন নিয়ে আমরা

www.pathagar.com

আলোচনা করেছি। এই বাহিনী এবং দলীয় বাহিনীর নির্যাতন ও নিগ্রহে সে সময় অন্তত ২৫ হাজার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মী এবং ভিন্নমতাবলম্বীকে হত্যা করা হয়েছে। এদেরকে নিয়ে সঠিক জরিপ কখনোই করা হয়নি, তবুও ব্যক্তিগত এবং দলীয় উদ্যোগে যে সব জরিপ সম্পন্ন হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, এ সব হত্যাকাণ্ডের পেছনে ক্ষমতার শীর্ষ থেকে মদদ প্রাপ্ত সোনার ছেলেরাই দায়ী। বর্তমানেও প্রতিদিন যে সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে, তার পূর্ণ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে না যা আর ছাপা হচ্ছে তা হয়তো প্রকৃত ঘটনার সিকি অংশেরও কম। তা সত্ত্বেও প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের পেছনেই জড়িয়ে পড়ছে বর্তমানের সোনার ছেলেরা।

১৯৭২-৭৫ সালে আওয়ামী শাসনামলে যে সব প্রকাশ্য গোপন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সরকার ও তার নীতির বিরোধিতা করেছে সেসব দলের নেতাদের দাবি মতে সে আমলে ২৫ হাজার ভিন্নমতাবলম্বীদের হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ। এ হতভাগাদের হত্যা করা হয়েছে চরম নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার মধ্যে দিয়ে। খুন, সন্ত্রাস, নির্যাতন, হয়রানি, নারীধর্ষণ, লুণ্ঠন কোনো কিছুই এই নির্যাতন থেকে বাদ পড়েনি।

আবু জাফর মোস্তফা সাদেক তার বৈপ্লবিক প্রেক্ষাপটে কমরেড সিরাজ সিকদার গ্রন্থে রক্ষীবাহিনী, মুজিববাদী ও আওয়ামী লীগারদের হাতে নিহত কিছু অংশের একটি ছোট তালিকা প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে তাৎক্ষণিকভাবে যিনি যাদের কথা জানতে পেরেছেন তাদের কথাই লিখেছেন। তাছাড়া তিনি তৎকালীন কয়েকটি গোপন সংগঠনের নিহত কর্মীদের সম্পর্কে লিখেছেন। জাসদ ও ভাসানী ন্যাপসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ বিরোধী সংগঠনের নিহতদের নাম এই তালিকায় নেই। তার সংগৃহীত নামগুলো তুলে ধরা হলো। তিনি লিখেছেন,

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম. এল) ঃ

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানায় মুজিববাদীদের হাতে শহীদ হন :

১। পাকুড়িয়া গ্রামের মন্টু, ২। শাহপুরের আনছার, ৩। আবদুল করিম, ৪। আবদুল মান্না, ৫। ভোলা, ৬। আসহাব, ৭। মজিবর রহমান (মেজবর), ৮। মানিক নগরের আফতাব, ৯। আব্দুল, ১০। মোসলেম, ১১। শাহাপুরের ননী সরদার, ১২। জহিম উদ্দিন সরদারের দুই ছেলে-মন্টু, ও ১৩। আবদুল গাফফার, ১৪। রক্ষীবাহিনীর হাতে- দলিল (পাখী), ১৫। ছাত্রনেতা আশেকুর রহমান চুনু (তারা), ১৬। আফছার (ফেলু), ১৭। মুজিববাদীদের হাতে—ঈশ্বরদীর আবদুস সাত্তার, ১৮। লাভলু, ১৯। পাবনার ছাত্রনেতা ওসমান, ২০। ওহিদ হাসান হিল্লোল, ২১। ছাত্রনেতা সামছুর রহমান, ২২। ছাত্রনেতা আজিজুল হক (পাগলা), ২৩। মন্তাজুর রহমান, ২৪। রিপু বিশ্বাস ২৫। তালিশ, ২৬। দাপুনিয়ার প্রামাণিক সাহেব তার ছেলে, ২৭। আবদুল গাফফার ও তার স্ত্রী, ২৮। লুলু বিশ্বাসসহ আরও তিনজন, ২৯। কমরেড জমশেদের বৃদ্ধা মাতা (জমশেদ পাক বাহিনীর হাতে নিহত হন), ৩০। কাশীনাথপুরের কৃষক নেতা আবদুর রহমান, ৩১। ছাত্রকর্মী আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, ৩২। কৃষক কর্মী রতন, ৩৩। শাহজাদপুরের আলাউদ্দিন, ৩৪। সিরাজ গঞ্জের বিখ্যাত নেতা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুনিরুজ্জামান তারা, ৩৫। গাড়াদহে আব্দুল হামিদসহ ৩২ জন। ৩৬। রক্ষী বাহিনীর হাতে শৈলজানার ডাক্তার আব্দুল গাফফার (ঘটু) [ইনি কমরেড মতিনের আপন ছোট ভাই। [তাঁদের পিতাকে

www.pathagar.com

রাজাকার এবং অপর ছোট ভাই পাক বাহিনীর হাতে শহীদ হন] ৩৭। আব্দুস সামাদ, ৩৮। চাটমোহরে আব্দুল হামিদ, ৩৯। কুষ্টিয়ার শহীদ (রঞ্জন) ৪০। মুজিববাদীদের হাতে বাবুলচারা গ্রামের কমরেড আশরাফের ছোট ভাই (কমরেড আশরাফ মামু), কৃষক নেতা সাবের আলীসহ ১৬ জন পাক-বাহিনীর সাথে যুদ্ধে শহীদ হন], ৪১। শাহপুরের শহীদুল, ৪২ কুষ্টিয়ার কামালপুরের ফজিলাতুন্নেসা [ইনি ছিলেন ঈশ্বরদীর নেতা কমরেরেড ফজলুর রহমান মোল্লা (জামায়াতে ইসলামীদের হাতে শহীদ-এর বোন এবং আত্রাই-এর নেতা কমরেড ওহিদুর রহমানের শাশুড়ি, ৪৩। চুয়াডাঙ্গার মহাম্মদ আলী, ৪৪। কৃষক নেতা, কবি ও গায়ক আবতাব আলী, ৪৫। মহির উদ্দিন ও তার ভাই, ৪৬। কুষ্টিয়ার জীবন নগরের কদম, ৪৭। ঢাকায় এনায়েত, ৪৮। দামুকদিয়ার ইয়াদ আলী (শিক্ষক), ৪৯। ইনসার আলী এবং ৫০। নোয়াখালী নিবাসী, আত্রাই কলেজের অধ্যাপক বাদল দত্ত (কামাল) এবাদৎ রাবিয়া বেগম বেলী, ফজলুসহ আরও ৫ জন।

মুজিববাদীদের হাতে পাবনা জেলার অপর যে সব নেতা-কর্মী ও সমর্থক শহীদ হয়েছেন তাহা নিম্নরূপ :- ৫১। শালগাড়িয়ার হেনা, ৫২। আলতু, ৫৩। লুটু, ৫৪। রানু, ৫৫। হেলাল, ৫৬। আকমল, ৫৭। রশিদ, ৫৮। আজাদ, ৫৯। পুষ্পপাড়ার মজনু, ৬০। হানিফ, ৬১। সাধুপাড়ার রানু (কুন্দুস), ৬২। বদন কাজী, ৬৩। মহসীন আলী, ৬৪। ফিরোজ, ৬৫। তানু, ৬৬। চুনু, ৬৭। চেতন, ৬৮। মাখন, ৬৯। ছিদু, ৭০। রানু, ৭১। গেদা, ৭২। খেরু, ৭৩। ছাত্তার, ৭৪। রাধা নগরের বিলাত, ৭৫। মতিন, ৭৬। মোসলেম, ৭৭। মালেক, ৭৮। মোজাম্মেল, ৭৯। বুড়ো, ৮০। খসরু, ৮১। বদো, ৮২। বাবু, ৮৩। কাঞ্চন, ৮৪। সদু, ৮৫। রুসনা, ৮৬। ফরহাদ ফোরা, ৮৭। আবেদ, ৮৮। আমিরুল, ৮৯। আবু, ৯০। নুরপুরের আনোয়ার, ৯১। জেলাপাড়ার চাঁদ, ৯২। সিরাজ শেখ, ৯৩। আফতাব, ৯৪। বাচ্চু, ৯৫। আকুব্বর, ৯৬। মনছের, ৯৭। আনছা, ৯৮। বদর, ৯৯। মানিকদিয়াড় চরে মকবুল হোসেন, ১০০। লুলু বিশ্বাস, ১০১। পিনু বিশ্বাস, ১০২। বেলাল বিশ্বাস, ১০৩। লতিফ, ১০৪। সোনা প্রাং, ১০৫। আবুল প্রাং, ১০৬। সামু মালিতা, ১০৭। আবদুল প্রাং, ১০৮। রিয়াজ উদ্দিন প্রাং, ১০৯। ইয়াজ উদ্দিন, ১১০। কেরামত প্রাং, ১১১। লাটু প্রাং, ১১২। বারু প্রাং, ১১৩। চাঁদ প্রাং, ১১৪। আঁটয়ার নওসের খান, ১১৫। আজাহার খাঁন, ১১৬। শাবান, ১১৭। বান্ডাবাড়িয়ার মোহন মণ্ডল, ১১৮। বাঘবপুরের জলিল, ১১৯। বিশু, ১২০। দাপুনিয়া, শ্রীপুরের মহসীন, ১২১। চয়েন, ১২২। ভাদু, ১২৩। ইসহাক, ১২৪। আফতাব, ১২৫। আয়েজ বেপারী, ১২৬। নজরুল, ১২৭। দেলোয়ার, ১২৮। মনসুর ১২৯। মজিদ, ১৩০। দুরান, ১৩১। গোপালপুরে মোতালেব, ১৩২। কামু, ১৩৩। হামিদ, ১৩৪। আঞ্জু, ১৩৫। ইমু, ১৩৬। তপন প্রমুখ। এছাড়া রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনার ৩৩টি থানায় এ পার্টির কয়েকশত কর্মী সমর্থক মুজিববাদী সশস্ত্রবাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছেন বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মোঃ লেঃ) ঃ

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসেই ঢাকা জেলার শ্রীপুর থানায় মুজিববাদী সশস্ত্র গুণ্ডারা এপার্টি [তৎকালীন ই.পি.সি.পি (এম.এল)-এর সাত জন কর্মীকে হত্যা করে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এই বাহিনীর হাতে নবাবগঞ্জ থানার সোল্লা গ্রামের ১। বাদশা, ২। আন্দার কোটার আব্দুর রশীদ (অনি), ৩। সিঙ্গাইর, উদিয়মান কবি আবদুল গফুর (বিক্রমাদিত্য) ১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর লৌহজং থানার ৪। হুমায়ুন কবীর (বাদল), ৫। ২৫ ডিসেম্বর শওকত হোসেন (লিটন)। এছাড়াও ঢাকা জেলার ঢাকা সদর, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, ডেমরা, নরসিংদী,

www.pathagar.com

মুন্সীগঞ্জ, দোহার, মানিকগঞ্জ, সিঙ্গাইর, শ্রীনগর, শ্রীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কয়েকশ পার্টি সভ্য ও কর্মী শহীদ হয়েছেন মুজিবের রক্ষীবাহিনীর হাতে (সবার নাম সংগ্রহ করা গেল না)।

১৯৭১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের নাপোড়া পাহার গ্রামে এই পার্টির নিজস্ব বাহিনীকে মুজিব বাহিনী বন্ধুত্বের ভান করে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যায় এবং ঘুমন্ত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। এই শহীদ কমরেডদের নাম—১। আঞ্চলিক নেতা প্রাণ কুমার ভট্টাচার্য, ২। কমান্ডার জাহেদ (ছালে আহমদ), ৩। কৃষক নেতা আবু ছাদেক, ৪। ডাক্তার তুহীন (কুষ্টিয়া), ৫। এম. এ. মোস্তফা চৌধুরী, ৬। আমানত খাঁন চৌধুরী, ৭। মামুন, ৮। হাবিলদার রুস্তম, ৯। আসাদুল্লাহ, ১০। বজল আহমদ, ১১। নুরুল ইসলাম, ১২। আবুল হাসেম, ১৩। কালুমিয়া, ১৪। শের আলী এবং ১৫। বিপ্লবী ছাত্র-কবি দবরুদ্দুজা।

১৯৭৩ সালে রক্ষী বাহিনী বন্দী অবস্থায় হত্যা করে সিলেটের কমরেড আবদুর রহমানকে।

১৯৭৩ সালের ২৫ অক্টোবর তানোরে রাজশাহী শাখার বিশিষ্ট নেতা কমঃ মাহমুদুর রহমান উজ্জ্বল রক্ষী বাহিনীর হাতে শহীদ হন। ডিসেম্বরে রাজশাহীর তানোরে, রুশ-ভারতের পুতুল ও রক্ষী বাহিনীর সাথে এক যুদ্ধে গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় ১৮ জন কমরেড ধরা পড়েন। বন্দী (হাত বাঁধা) অবস্থায় তানোর থানার গোল্লাপাড়ায় ১১ ডিসেম্বর এই পার্টি নেতা-কর্মীদের এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং একই দিনে মান্দা থানার হৃদয় পুকুর পাড়ের বরেন্দ্র ভূমিতে আরও ২৬ জন বন্দী কর্মীকে হত্যা করা হয়। এই কমরেডদের স্মরণে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল মোঃ লেঃ এখনও ১১ ডিসেম্বরকে পার্টিতে 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালন করে। এই শহীদ কমরেডররা হলেন— ১। এরাদ আলী, ২। এমদাদুল হক বাবু (মন্টু মাস্টার), ৩। ওয়ায়েজ, ৪। আঃ জব্বার, ৫। মনি, ৬। শামসুদ্দিন, ৭। হারুন, ৮। ওমর, ৯। মুজিবর, ১০। আঃ রশীদ, ১১। ঈসহাক, ১২। আজাক, ১৩। মনসুর, ১৪। মজিবর, ১৫। তৈয়ব, ১৬। আমির (মধু) ১৭। আলাউদ্দিন, ১৮। হযরত, ১৯। আজাহার, ২০। মহির উদ্দিন, ২১। ছলেমান, ২২। আলা উদ্দীন, ২৩। এজাম উদ্দিন, ২৪। মেজাফফর ২৫। আনসার, ২৬। মজিদ, ২৭। রিয়াজ, ২৮। আবছার, ২৯। খোকা মণ্ডল, ৩০। আহাদ, ৩১। তৈয়ব আলী, ৩২। রবু, ৩৩। নাজিম, ৩৪। এরাজ, ৩৫। আমির, ৩৬। আছের, ৩৭। নিন্দা ফকির, ৩৮। কুদ্দুছ, ৩৯। রশিদ, ৪০। শফি, ৪১। আবুল, ৪২। নজরুল, ৪৩। সিদ্দিক, ৪৪। সৈয়দ আলী (সিরাজুল)।

১৯৭৩ সালের ২৪ এপ্রিল, ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুর পাকুন্দিয়া ও নিলকীতে রক্ষী বাহিনীর হাতে শহীদ হন— ১। কমরেড আতাউর রহমান। ১৯৭৪ সালের ২০ এপ্রিল শহীদ হন, ২। কমরেড মজিবর রহমান, ৩। হাবিবুর রহমান, ৪। ফারুক, ৫। মাহবুব এবং মুজিববাদীদের হাতে শহীদ হন, ৬। শামছুল আলম, ৭। রশিদ, ৮। আমিনা, ৯। আনোয়ার, ১০। সালাম, ১১। মনুমিয়া ১২। খলিলুর রহমান, ১৩। আবদুল মান্নান, ১৪। নারায়ণ, ১৫। নুরু, ১৬। লতিফ, ১৭। বাতেন, ১৮। আলমসহ অত্র অঞ্চলের প্রায় দেড় শত পার্টি কর্মী ও সমর্থক।

নোয়াখালী জেলার দক্ষিণাঞ্চল প্রগতিশীলদের প্রভাবিত এলাকা হিসাবে সুপরিচিত। এই এলাকায় পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা স্বশরীরে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে ইয়াহিয়ার বাহিনী ও তাদের সহকারী আলবদর ও রাজাকার বাহিনীকে চরম মার দিয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে রুশ-ভারতের পুতুল সরকার

www.pathagar.com

কমিউনিস্টদের ভয়ে ১৯৭৩ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এই অঞ্চলে বিশেষ করে নোয়াখালী সদর, রামগতি ও লক্ষ্মীপুর থানায় ১৯টি রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প বসিয়ে, ভারতীয় অফিসারদের নেতৃত্বে 'কমিউনিস্ট হত্যার এক নীল নকশা তৈরি করে। এই ১৯টি ক্যাম্পের প্রায় তিন হাজার রক্ষী ও মুজিববাহিনী (হেলিকপ্টারের সাহায্যে) ১৩ ডিসেম্বরে ব্যাপক অভিযান শুরু করে। এই মাসে ৯০ জন রমণীকে ধর্ষণ ও হত্যার মাধ্যমে শুরু হয় এক নৃশংস অত্যাচারের করুণ ইতিহাস। এই এলাকায় যে কয়েকজন শহীদ কমরেডের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি, তারা হলেন— ১। রামগতির তোরাবগঞ্জের কমরেড নূরেজ্জামান, ২। লক্ষ্মীপুরের সমাসপুর গ্রামের আলম (রতন), ৩। গন্ধব্যপুরের খোকন, বি.এস.সি., ৪। ধর্মপুরের কালু নাপিত, ৫। হাজির হাটের আবুল হালিম, ৬। ফেনী কলেজের ছাত্র নাসের, ৭। রায়পুরের আয়াত উল্ল্যাসহ অনেকে। মুজিব বাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছেন, ৮। রামগতির চর লরেঞ্জের নেতৃত্বস্থানীয় কমরেড ফয়েজ, ৯। সদর থানার লালপুরের বাবর, ১০। বাঁধের হাটের সোলেমান, ১১। লক্ষ্মীপুর থানার পেয়েরা পুরের বজুসহ নাম না জানা শতাধিক কমরেড।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) ঃ

(বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)]

যশোর জেলা : ১৯৭২ সালে- ১। নাহিদ, ২। ভোলা (রক্ষীবাহিনীর হাতে), ১। ১৯৭৩ সালে-১। নুরুল হক, ২। মানিক ভাই (রক্ষীবাহিনীর হাতে), ১। মধু খালীর শাহাবুদ্দিন, ২। আঃ সালাম, ৩। খয়ের ৪। আজিম, ৫। আয়ুব, ৬। জব্বার, ৭। জামাত আলী, ৮। নজরুল (নান্টু) ৯। সাত্তার, ১০। ইনছার, ১১। রন্দী, ১২। হানেফ, ১৩। খালেক, ১৪। বাবর আলী, ১৫। আফসার, ১৬। রইছ, ১৭। ওয়াজেদ, ১৮। ধীরেন, ১৯। নন্দলাল, ২০। শমসের, ২১। আক্কাচ, ২২। খালেক, ২৩। কালিগঞ্জ, থানার দোগাছি গ্রামের হাসেম আলী, ২৪। পাঁকা গায়ের সভামিয়া, ২৫। কিসমত গাড়িয়ালের আবদুল খালেক, ২৬। মুরাদ আলী, ২৭। মমতাজ, ২৮। বারেক আলী, ২৯। ছোবহান আলী ৩০। মনিরুল ইসলাম ৩১। যাত্রাপুরের আতিয়ার রহমান খোকন, ৩২। মন্টু, ৩৩। শহীদ, ৩৪। মজিদ আলী, ৩৫। কাওসার, ৩৬। জামাত আলী, ৩৭। জলিল, ৩৮। সফি, ৩৯। নূর আলী, ৪০। আলতাফ, ৪১। তসিম, ৪২। বদর, ৪৩। জাহাঙ্গীর, ৪৪। আজিজ, ৪৫। মতিয়ার, ৪৬। কোটচাঁদপুরের কামরুজ্জামান।

১৯৭৪ সালে ৪৭ পুরাতন কসবার আবুবকর জাফরোদৌলা দিপু (গৌরা), ৪৮। কালীগঞ্জ থানার পাইকপাড়ার ওয়াহেদ আলী (রহমান) ৪৯। ঝিনেদা থানার চোরকোলের মহিউদ্দিন (শওকত), ৫০। নরসিংপুরের কামরুজ্জামান (রাজু) ৫১। নুরমোহাম্মদ (বাবু) ৫২। অভয়নগর থানার কান ফুলের আবুল হাসান (জসীম), ৫৩। কোট চাঁদপুর থানার গজরাপুরের হায়দার আলী (গাজী), ৫৪। কালীগঞ্জ থানার কাবিলপুরের রাশিদা খাতুন (ঝর্ণা), ৫৫। তিজারত তাজুল।

১৯৭৫ সালে- ৫৬। কোটচাঁদপুর থানার তাল্লের শুকুর আলী, ৫৭। কালীগঞ্জ থানার বেথলীর আকবর (আলী), ৫৮। ভাটাডাঙ্গার বজলু, ৫৯। চিত্ত, ৬০। দোগাছির ইনছাব আলী।

কুষ্টিয়া জেলা : ১৯৭২ সালে- ১। এডভোকেট বদরুদ্দোজা, ১৯৭৩ সালে ২। লিয়াকত আলী, ৩। শাহ আবদুল হামিদ, ৪। শাহাজাহান, ৫। আবুল কাশেম, ৬। ফজলুল হক, ৭। আঃ সাত্তার, ৮। নূর হোসেন, ৯। সিরাজুল ইসলাম, ১০। মন্টু, ১১। নবীন।

১৯৭৪ সালে- ১২। আবেদ আলী, ১৩। খয়বার আলী ১৪। আমান উল্লাহ পল্টু, ১৫।

www.pathagar.com

রজব আলী, ১৬। আবদুর রহমান, ১৭। সামছুল, ১৮। ভিকু, ১৯। মোকলেছ, ২০। কাবের, ২১। রশিদ, ২২। ইসমাইল, ২৩। জামাল, ২৪। আরনার, ২৫। এলাহী।

১৯৭৫ সালে- ২৬। সামছুল আলম, ২৭। বোরহানুল কবির, ২৮। মোশাররফ হোসেন, ২৯। মোঃ শরীফ, ৩০। আঃ সালাম, ৩১। হায়দার আলী, ৩২। ইসরাফিল, ৩৩। উকিল উদ্দিন, ৩৪। পলান, ৩৫। আঃ ছাত্তার, ৩৬। জহিরুদ্দিন, ৩৮। শমসের আলী।

খুলনা জেলা : ১৯৭৩ সালে-১। শান্তি ব্যানার্জি (রক্ষীবাহিনীর হাতে)। ১৯৭৪ সালে-২। মুজিববাদী গুণ্ডাদের হাতে ননী গোপাল হাওলাদার (নরেশ) এবং ৩। রক্ষীবাহিনীর হাতে— আবদুল ওহাব, ৪। রনজিত কুমার মালাকার, ৫। হরিমুহলী, ৬। শম্ভু।

ফরিদপুর জেলা : ১৯৭৩ সালে-১। জামাল বিশ্বাস, ১৯৭৪ সালে-২। আতাহার হোসেন, ৩। আতা (মতি) ৪। মনি (হুজুর), ৫। পালং থানার আবদুল আলী (মাসুম), ৬। কামাল তালুকদার (ইদ্রিস), ৭। আনোয়ার হোসেন রতন (মানিক) ৭। আজমল ৮। জয়নাল সর্দার (বশীর), ৯। আবু (আসাদ), ১০। মজিদ, ১১। রাজ বাড়ি থানার আমিনুল ইসলাম (ফরোজ), ১২। ছিদ্দিক মোঃ সোলাইমান ছোলাই (ছোহরাব)।

১৯৭৫ সালে-১৪। পাংশা থানার আতিকুর রহমান তারু (কাদের মিয়া), ১৫। আবদুর রাজ্জাক রাজা (তাহের), ১৬। তোফাজ্জেল হোসেন (মামুন), ১৭। হানিফ (কলিম), ১৮। রিজিয়া বেগম (রাহী), ১৯। রাঁদ বিবি (হেনা), ২০। খায়রুল ইসলাম (স্বপন)। ইহা ছাড়া ২১ জন পার্টি দরদি শহীদ হন।

রংপুর জেলা : ১৯৭২ সালে রক্ষীবাহিনীর হাতে-১। নাহিদ, ২। ভোলা। ১৯৭৩ সালে-৩। নুরুল হক, ৪। মানিক ভাই।

ময়মনসিংহ জেলা ঃ ১৯৭৫ সালে রক্ষীবাহিনীর হাতে কমরেড আনোয়ার (পাকুন্দিয়া)।

ঢাকা জেলা : ১৯৭৫ সালে রক্ষীবাহিনীর হাতে কমরেড আবদুল মান্নান (কাইরাইদ)।

ময়মনসিংহ জেলা ঃ ১। কেন্দুয়ার নুরুল আমিন, ২। ঈশ্বরগঞ্জের নাসির, ৩। মতিন ঢাকা জেলা, ৪। কমঃ সাঈদ।

ফরিদপুর জেলা-৫। কালকিনীর আনোয়ার পাশা (আবুল), ৬। জাজিরার জাহেদ আলী সরদার, ৭। আজিজুল হক, ৮। খালেক, ৯। মুনির (আতিক), ১০। মাদারী পুরের মাখন, ১১। কোতোয়ালীর খসরু, ১২। কালকিনীর হিরণ, ১৩। পালং এর সামাদ (শহীদ)। ঢাকা জেলা-১৪। লরেন্স, ১৫। রফিক, ১৬। মনোহরদীর ফজলু।

১৯৭৫ সাল : ময়মনসিংহ জেলা-১৭। ইশ্বরগঞ্জের উজ্জ্বল, ১৮। ত্রিশালের প্রবীর, ১৯। খোকা (মঞ্জ), ২০। শামসু (আলম), ২১। মাহবুব, ২২। সুতিয়াখালীর বাঘা, বরিশাল জেলা, ২৩। কোতোয়ালীর মতিলাল বড়াই (মনোজ), ২৪। ভোলার গাজী, ২৫। বাবুগঞ্জের সত্য, ফরিদপুর জেলা ২৬। মাদারীপুরের আবুল কালাম, ২৭। আজাদ, ২৮। পালং-এর সেকেন্দার হাওলাদার (শহীদ) এবং ২৯। বগুড়া জেলার সালাম।

উল্লেখিত কমরেডগণ প্রায় সবাই রক্ষীবাহিনীর হাতে শহীদ হন। এছাড়া ঢাকা জেলার সাভারে হত্যাযজ্ঞে রক্ষীবাহিনীর হাতে শহীদ হন— ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে (বিপ্লবী যুদ্ধে অংশেগ্রহণের জন্য) আগত কমরেড তাহের; বরিশালের মনি দা, সাঈম ও খোকন। অন্যত্র শহীদ হন কুষ্টিয়ার পলাশ, জিল্লু, পিন্টু এবং ঢাকার চুন্নু।

www.pathagar.com

সর্বহারা পার্টির কর্মীরা ব্যাপকহারে প্রাণ দিয়েছিলো— ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমায়। এখানে রক্ষীবাহিনীর বর্ষাকালীন অভিযানে গ্রামের পর গ্রামের যুবকদের পাইকারী হত্যায় পার্টির কর্মীরাও জীবন দেয়। প্রকাশ থাকে যে, এখানে রক্ষীবাহিনীর ডিলারসহ বেশ কিছু রক্ষী পার্টির গেরিলাদের হাতে নিহত হয়। তবে সর্বহারা পার্টিতে কঠোর বিপ্লবী শৃঙ্খলা থাকাতে ব্যাপক হারে সাধারণ গেরিলা সদস্যরা মারা পড়েনি। বরিশাল, কুমিল্লাহ ও মুন্সিগঞ্জসহ বেশ কয়েকটি জায়গায় শহীদ কমরেডদের মৃত্যু তালিকা সংগ্রহ করতে পারিনি বলে প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

বলা হয়ে থাকে পুঁজিবাদের গর্ভেই জন্ম নেয় সর্বহারার একনায়কত্ব। তেমনি সন্ত্রাসের গর্ভেই বেড়ে ওঠে সন্ত্রাস নিধনের শক্তি। পবিত্র কোরআনে হযরত মুসা (আঃ) এর জামানার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তিনি বেড়ে উঠেছিলেন খোদাদ্রোহী ফেরাউনের ঘরে। গণকরা ফেরাউনকে জানিয়েছিল যে, তার বিরোধীশক্তি তার আশ্রয়ে এবং প্রশ্রয়ে বড় হবে। আর সেই কারণেই ফেরাউন সমস্ত গর্ভাবস্থা নারীদের হত্যা করেছিলো অথবা তাদের গর্ভপাত ঘটাতে বাধ্য করেছিলো। মুজিবি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠার সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যেমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছিলো সোনার ছেলেদের তেমনি গড়ে উঠেছিলো জনতার প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ কুসুমাস্তীর্ণ পথে গড়ে উঠেনি। বরং ক্ষমতার দেউলের বিরুদ্ধে কণ্ঠকাসনে বসেই নিক্ষেপিত হয়েছে বান। ৭২ থেকে ৭৫ সরকারের পতনের পর যে কয়জন সাংবাদিক এবং সতেচন রাজনৈতিক কর্মী ঐ দুঃশাসনের কাহিনী চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম জনাব আহমেদ মুসা। তিনি তার বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনা পর্ব ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ গ্রন্থে ঐ সন্ত্রাসের প্রত্যক্ষ বিবরণী তুলে ধরেছেন। তার ভাষায়, আওয়ামী লীগ আমলে যে সব এলাকায় সবচেয়ে বেশি হত্যা ও সন্ত্রাস চালানো হয়েছে তিনি নিজে সে সকল এলাকায় গিয়েছেন এবং নিহতদের আত্মীয়ের সঙ্গে আহতদের সাথে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা যারা ঐসময় রক্ষীবাহিনী মুজিব বাহিনী তথা নামে বেনামে সরকারি বাহিনী টার্গেট ছিলো তাদের সাথে কথা বলেছেন। তার বিবরণী আমরা নিম্নে তুলে ধরছি।

সন্ত্রাস: বাজিতপুর

পুরো কিশোরগঞ্জ জেলায়ই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাস হয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয়েছে বাজিতপুরে। এখানে প্রাধান্য ছিলো পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (মালে)-এর। পরবর্তীকালে এই অংশ সাম্যবাদী দল গঠন করেন। পার্টির নেতা, কর্মী, সমর্থক, সহানুভূতিশীল, তাদের আত্মীয়-স্বজন এবং মুজিববাদীদের ব্যক্তিগত শত্রু ছিলো হত্যার টার্গেট। পার্টির প্রথম সারির স্থানীয় নেতা ছিলেন প্রফেসর ইয়াকুব আলী। বাজিতপুর কলেজের শিক্ষকতা করতেন তখন। তারপরের নেতা ছিলেন সাইফুল ইসলাম। তিনি বাজিতপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি মুজিববাদীদের হাতে ধরা পড়ছিলেন দুজন সঙ্গীসহ। সঙ্গী দুজনকে হত্যার পর মুজিববাদীরা তাকে জবাই করে চলে যায়, কিন্তু অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন তিনি। তার গলায় এখনো জবাইয়ের দাগ। প্রথম : আমি তার সঙ্গেই কথা বলেছি। তার মতে বাজিতপুরে ১২৬ জনকে রক্ষী বাহিনী ও মুজিববাদীরা হত্যা করেছে। তাঁর ভাষায়ই তুলে ধরছি :

'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা ভারতে না গিয়ে এলাকায় থেকেই যুদ্ধ করছি। আমরা

www.pathagar.com

আগাগোড়াই মনে করেছি, আওয়ামী লীগকে দিয়ে মুক্তি আসবে না। এ কথা প্রচারও করেছি।'

স্বাধীনতার পরপরই এই অঞ্চলে মুজিববাদীরা হিন্দুদের বাড়ি দখল, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন, ডাকাতিসহ ব্যাপকভাবে বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত হয়। জনগন প্রতিবাদ করলে তাদের ওপর নেমে আসে চরম নির্যাতন।

১৯৭২ সালের গোড়ার দিকেই এলাকার জনগণ মুজিববাদীদের বিভিন্ন অপকর্মের প্রতিকার করার দাবি আমাদের কাছে আসতে থাকেন।

এলাকায় আমাদের প্রভাব ছিলো, বিশ্বস্ততাও ছিলো। প্রকাশ্যেই আমরা তখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলাম। জনগণের বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে পর্যালোচনার জন্য প্রফেসর ইয়াকুব, আনিসুর রহমান ও আমিসহ এলাকার নেতৃস্থানীয় পার্টি কর্মীরা আলোচনায় বসলাম। সময় হবে ১৯৭২ সালের মার্চ মাস। ঠিক করলাম আমাদের পার্টিকে গ্রামে গ্রামে সংঘঠিত ও বিকশিত করে মুজিববাদীদের জুলুমের প্রতিবাদ করবো। পার্টি নেতা নগেন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। এ সময় পার্টির সিদ্ধান্তও অবহিত হলাম। প্রথমদিকে আমরা চেয়েছি প্রতিবাদী জনগণকে সংগঠিত করতে। বলতে থাকলাম যে, এই স্বাধীনতায় শুধু পতাকারই পরিবর্তন করতে হবে। জনগণ আমাদের কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেন। এর কারণ ছিলো, মুজিববাদীদের প্রত্যক্ষ স্বরূপ তারা স্পষ্টই দেখছিলেন। হেন অপকর্ম নেই যা তারা করছিলো না। আমাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লো স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা। তারা যোগাযোগ করলো কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে। শুরু হলো আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগারদের মদদাতা। তারা আক্রমণ শুরু করলো আমাদের উপর। আমরা প্রথম অবস্থায় হানাহানি এড়াতে চাইলাম। কিন্তু তবুও পরিত্রাণ পেলাম না।'

'এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে ১৯৭৩ সালের নির্বাচন এলো। আমরা নির্বাচন বর্জনের ডাক দিলাম। এই অভিযোগে আলিয়াবাদের মজিবুর নামক আমাদের এক কর্মীকে মুজিববাদীরা জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চাইলো। আমরা বাধা দিয়ে তাকে রক্ষা করলাম। এরপর সে আত্মগোপনে চলে গেলো। এরপর আক্রমণ আসতে থাকলো একের পর এক। যার উপর আক্রমণ এসেছে সে পালিয়ে আত্মগোপনে চলে গেছে। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে রক্ষীবাহিনী এলো বাজিতপুরে। তারা আমাদের কর্মী বোয়ালীর জেলে বলরাম দাসকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে হত্যা করলো। এই ঘটনায় আমরাও সতর্ক হয়ে গেলাম। মুজিববাদীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিলো, এমন বহু লোককে তারা 'নক্সাল' নাম দিয়ে রক্ষীবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে এবং অত্যাচার করিয়েছে তখন। সরিষাপুরের মুর্শিদ, জনু মিয়া আজো সে আঘাত-নির্যাতন বহন করছে তাদের শরীরে। আমি পালিয়ে আমাদের গ্রাম বালিগাঁও চলে গেলাম। রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাদীরা আমাকে ধরার জন্য তখন হোস্টেলে খোঁজ করেছিলো।'

আমাদের পার্টি ও জাসদ মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম বলরাম হত্যার প্রতিবাদের। সমবেতভাবে আমরা সভা ও মিছিল করলাম। রক্ষীবাহিনী মাসখানেক সন্ত্রাস চালিয়ে তখনকার মতো চলে গেলো। অবশ্য কিছুদিন পরই আবার এসেছিলো তারা। আমরা আত্মগোপন থেকে আবার বাজিতপুর ফিরে এসে কাজ শুরু করলাম। জুলাই-আগষ্টে (৭৩) দলে দলে লোকজন আমাদের পার্টিতে যোগ দিতে লাগলো। আমরা স্টাডি সার্কেলসহ

www.pathagar.com

বিভিন্ন গ্রুপ দাঁড় করালাম। কেন্দ্র থেকে সুখেন্দু দস্তিদার, নগেন সরকার, শান্তিসেন প্রমুখ এসে দেখে গেলেন।

১৯৭৩ সালে আগষ্টের মাঝামাঝি সময় অধ্যাপক ইয়াকুবকে কলেজে যাবার পথে গ্রেফতার করলো। আমি ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কর্মীরা পালিয়ে গেলাম আবার। গোপনে সিদ্ধান্ত নিলাম পার্টিকে রক্ষা করার। আমি ও পার্টি কর্মী ইদ্রিস গ্রামে গিয়ে দেখলাম, ইয়াকুবের গ্রেফতারের খবর শুনে বিভিন্ন গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে লোকজন বাজিতপুর আসছে। আমাদের এক কর্মী মুজিবুর, বি.এ ভর্তি হবার জন্য নরসিংদী কলেজে যাচ্ছিলো। গ্রেফতারের খবর শুনে কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলে প্রতিবাদে যোগ দিল এবং লেখা পড়ায় ইস্তফা দিয়ে পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী হয়ে কাজ করার কথা ঘোষণা করলো। মা-বাবার একমাত্র ছেলে মুজিবুরকে পরবর্তীকালে নির্মমভাবে হত্যা করে।

গ্রামের লোকজনকে জড়ো করে আমরা থানা ঘেরাও করলাম। দাবি করলাম প্রফেসর ইয়াকুবকে ছেড়ে দিতে। রাত ১২টা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখলাম। যখন বুঝতে পারলাম তাকে ছাড়া হবে না, রাস্তা থেকে ছিনিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং একটি পরিকল্পনাও তৈরি করলাম। কিন্তু কিছু ভুলের জন্য সফল হইনি। শেষরাতে ইয়াকুবকে কিশোরগঞ্জ নিয়ে গেলো। পরদিন কয়েক হাজার লোক কিশোরগঞ্জ কোর্ট ঘেরাও করলো। পুলিশ সেখান থেকে ২২জনকে গ্রেফতার করে।

অধ্যাপক ইয়াকুব জেলে যাবার কয়েকদিন পরই মুজিববাদীরা আমাদের কর্মী আতাউর রহমানকে হত্যা করলো। আতাউরের বাড়ি ছিলো নিলোকী। রাজনীতিই ছিলো তার জীবনের ব্রত। ঢাকার তেজগাঁয়ে তাকে হত্যা করা হয়। তার মৃত্যুর পর আমি নেতৃস্থানীয় কর্মী মুজিব, ফারুক, রফিক, ওহাব, নাসির, হাবিব, গিয়াস, সামসুদ্দিন, নুরুন্নবী, যুবরাজসহ অনেককে নিয়ে বসলাম। যোগাযোগ করলাম নগেন সরকারের সঙ্গে। সিদ্ধান্ত নিলাম, আর কোনো অত্যাচারই বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেবো না। প্রফেসর ইয়াকুব তখন জেলা সেক্রেটারী, আমি সদস্য।

সংগঠনে তখন আর্থিক অনটন চলছিলো। দুর্ভিক্ষাবস্থা দেশে। এরমধ্যেও কৃষকরা আমাদের সাহায্য করতে থাকেন। আমাদের সাহায্য-সহায়তা করার অপরাধে অনেকেই ধরে নিয়ে যেতে রক্ষীবাহিনী-অকথ্য অত্যাচার চালাতো তাদের উপর। মুজিববাদীরা সাহায্য করতো রক্ষীদের। মিথ্যা মামলাও দেয়া হয় অনেকের বিরুদ্ধে। মুজিববাদীরা তাদের ব্যক্তিগত শত্রুদেরও ঘায়েল করতে থাকে এই সুযোগে।

১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রীট করে অধ্যাপক ইয়াকুবকে ছাড়িয়ে আনলাম। তার মুক্তির পরও আমরা কেউই রাতে বাড়িতে থাকতাম না। কারণ জানতাম এরপরে হাতে পেলে আমাদের সরাসরি খুন করবে। আমাদের আশঙ্কাই সত্যি হলো। নিসারকান্দি নামক এক গ্রামে রাত যাপন করে ইয়াকুব ও আমি এক ভোর রাতে বাড়ি ফিরছিলাম। ইয়াবুকের বাড়ির কাছে এসে দেখি রক্ষীবাহিনী বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে। গুলির শব্দও শুনলাম। বাড়িতে না গিয়ে তখন অন্য পথ ধরলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, শেখ মুজিবের পতন না হওয়া পর্যন্ত আর ঘরে ফিরব না, মরলে মরব। আমরা বুঝতে পারছিলাম, রীটের ফলে সরকার ইয়াকুবকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও অপমানের জ্বালা ভুলতে পারছিলো না। নইলে মুক্তির সাথে সাথেই আবার রক্ষীবাহিনী আসার কি কারণ থাকতে পারে? এদিকে আমাদের লোকজনের ওপরও চলছিলো অবর্ণনীয় অত্যাচার। কর্মীদের মাঠে ডেকে আত্মগোপন ও

www.pathagar.com

প্রতিরোধের নির্দেশ দিলাম। ভাগ করে দিলাম বিভিন্ন স্কোয়াডে। যে ক'দিন আমাদের হাতে অস্ত্র ছিলো সে কদিন মোটামুটি নিরাপদেই ছিলাম। কিন্তু ৭৪ সালের এপ্রিল মাসে পার্টি থেকে নির্দেশ এলো অস্ত্র ডাম্প করে ফেলতে। প্রথমে অবাক হলেও পার্টির নির্দেশ পালন করলাম। অবাক হলাম এজন্য যে, শত্রু যেখানে প্রবল ও সশস্ত্র সেখানে আমাদের নিরস্ত্র করার কারণ কি? পার্টি থেকে বলা হলো, সামরিক শাসন আসতে পারে কিংবা কম্বাইন্ড অপারেশন চলবে। আসলে সেটা ছিল কেন্দ্রীয় নেতাদের একাংশের চক্রান্ত। প্রতিবাদ করলেও পরে পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে নিলাম। অধিক পরিশ্রমের কারণে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। পার্টি থেকে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম যেতে বললো। আমার সঙ্গে থাকবে হাবিব ও মুজিব। হাবিব আমার ও মুজিবের সঙ্গে আশুগঞ্জে যোগ দিলো। দেখা হবার পর হঠাৎ সে বললো যে, চট্টগ্রাম যাওয়া যাবে না, সেখানে গেলে বিপদ হবে বলে জানতে পারছি। চলুন ময়মনসিংহে চিকিৎসা করাবো। ময়মনসিংহ গিয়ে চিকিৎসা করালাম। সেখান থেকে একরাতে কিশোরগঞ্জ এলাম। কিশোরগঞ্জ থেকে আরেক রাতে যাত্রা করলাম বাজিতপুরের দিকে। রাস্তায় নেমে এলো বিপর্যয়।

সময়টা হচ্ছে ১৯৭৪ সালের ২০ এপ্রিল। কটিয়াদির জুল্যাবাজ গ্রামে দিনে লুকিয়ে থেকে বিকেলের দিকে রওয়ানা হলাম বাজিতপুরের দিকে। সব সময় রাতেই চলাফেরা করতাম। কিন্তু এই এলাকাটা ছিলো পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট আন্দোলনের (একটি কমিউনিস্ট সংগঠন) প্রভাবাধীন এলাকা। তাই ভাবলাম এখানে কোনো বিপদ হবে না। কিন্তু আমরা জানতাম এর আগের রাতে মুজিববাদীদের হাতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মী শাহজাহান নিহত হয়েছেন। সে এলাকার মুজিববাদীরা দিনে আমাদের অবস্থানের কথা টের পেয়ে রাস্তায় ওঁৎ পেতে বসেছিলো। আমরা তিনজন যখন খড়গাঁও মাহমুদপুরের মাঝামাঝি হাওর অতিক্রম করছিলাম হঠাৎ ১০ জনের মতো একটি দল আমাদের পেছন থেকে আক্রমণ করলো। তাদের হাতে স্টেনগান, কাটা রাইফেল, বল্লম, দা প্রভৃতি। আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম পালানো যাবে না। আমাদের কারো হাতে কোনো অস্ত্র নেই, পার্টির নির্দেশে আগেই জমা দিয়েছি। কয়েকজন আমাকে ঘিরে রেখে হাবি ও মুজিবকে একশ গজের মতো দূরে নিয়ে গেলো। আমি তৈরি হলাম মৃত্যুর জন্য। মুজিববাদীদের কয়েকজন আমাকে চিনতো। একজন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বললো, 'আচ্ছা স্যার, আপনি তো এখন মারাই যাবেন। মৃত্যুর আগে আপনার কিছু বলার আছে?'

জবাবে বললাম, হ্যাঁ, এক নম্বর কথা হচ্ছে, তোমরা তো আমাকেই খুঁজছিলে, এখন পেয়ে গেছো। এবার বাকি দুজনকে ছেড়ে দাও। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমাকে হত্যার পর তোমরা আমার পার্টির কাছে গিয়ে অস্ত্র ও আত্মসমর্পণ করে বলবে, মৃত্যুর আগে স্যার আমাদের ক্ষমা করে গেছেন আপনারাও ক্ষমা করে দিন।

একজন প্রশ্ন করলো, 'তা যদি না করি?' বললাম, তা না করলে তোমরা নির্ঘাত মারা যাবে। যে বিভীষিকার রাজত্ব তোমরা কায়েম করছো তাতে তোমাদের শেখ মুজিবের পতন হবেই এবং জনগণ তখন তোমাদের কচুকাটা করবে। এ সময় হঠাৎ দুটো গুলির শব্দ শুনলাম। বুঝতে পারলাম হাবিব ও মজিবকে হত্যা করা হচ্ছে। তাদের বিদায়ী চিৎকার শুনলাম। মরণ চিৎকারের সময়ও বিপ্লবের জয়গান গেয়ে গেলো তারা। আমিও উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিলাম ঘিরে রাখা চারজন মুজিববাদীর সঙ্গে। এক পর্যায়ে উত্তেজনায় আমার হাত উপরে উঠে এলো। এতে লোক চারজন হঠাৎ ভড়কে গিয়ে একটু দূরে সরে গেলো।

www.pathagar.com

এই ফাঁকে একটি গ্রাম লক্ষ্য করে প্রাণপণে দৌড় দিলাম আমি। পেছনে পেছনে দৌড়ে এলো তারা। ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। অন্ধকারে তারা ঠিক ঠাহর করতে পারলো না। গ্রামের কাছের এক ঝোঁপে লুকিয়ে পড়লাম। এই গ্রামটি আমার চেনা। নাম গোদারপোড্যা। গ্রামের একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন। মুজিবাদীরা খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হয়ে চলে যাবার পর আমি সেই শিক্ষকের বাড়িতে গেলাম। কিন্তু সেই শিক্ষক সেদিন আমাকে কোন সাহায্যই করলেন না। হয়তো ভয়ে। মুজিববাদীরা গ্রামে হয়তো আগেই জানিয়ে রেখেছিলো। সেই শিক্ষকের বড় ছেলে তখন হঠাৎ বললো, 'চলুন আপনাকে এক জায়গায় রেখে আসি।' আশান্বিত হয়ে আমি তার পিছু নিলাম। কিন্তু সে আমাকে কসাইদের হাতেই তুলে দিলো। তারা তখন আমাকে না পেয়ে এক বাড়িতে বসে ফুর্তি করছিলো। আমাকে দেখে হৈচৈ করে ছুটে এলো। তারপর টানতে টানতে আবার নিয়ে গেলো হাওড়ে। একজন বললো, কোনো চান্স দেওয়া যাবে না। জবাই করবো। অন্ধকার রাত। চিৎকার করে সাহায্য চাইছিলাম, হাত-পা ছুড়ছিলাম। জোর করে মাটিতে ফেললো আমাকে। আমি চিৎ হয়ে না শুয়ে উপুড় হয়ে শুইলাম। অনেক টানাটানি করে ঘাড়েই দা চালালো একজন। আমি আমার রক্ত টের পাচ্ছি, টের পাচ্ছি আমার হাড়ে দায়ের গড় গড় শব্দ। বেশ ততক্ষণ চললো এভাবে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ইনকেলাব, জিন্দাবাদ' এবং 'মেহনতি জনতার জয় হোক' স্লোগান দিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। কসাই মুজিববাদীটি বললো, শেষ চল ফিরে যাই। যাবার সময় ছোরা দিয়ে মেরুদণ্ডের একপাশে জোরে আঘাত করে উল্লাস করতে করতে তারা ফিরে গেলো। আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি একটি বিভ্রমের মধ্যে আছি। একটি দুঃস্বপ্ন যেনো। ভয়ে ঘাড়ে হাত দিতে পারছি না, যদি দেখি আমার মাথা আমার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন? স্বাভাবিক চিন্তা লোপ পেয়েছে তখন। হঠাৎ মনে হলো, নিশ্চয়ই বেঁচে আছি আমি, নইলে চিন্তা করছি কি করে? ভয়ে ভয়ে ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখি হাড় পর্যন্ত কাটা। আর কয়েকটি চাপ দিলেই হয়তো গলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। পিঠের আঘাত পেট ভেদ করেছিলো। মনে হচ্ছিল নাড়িভুঁড়ি হয়তো বের হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে সেখানেও হাত নেড়ে দেখলাম বেশ পিচ্ছিল। বুঝতে পারলাম, নাড়িভুঁড়ি নয়, রক্ত। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। লুঙ্গি ছিঁড়ে পেট ও পিঠের ক্ষতস্থান বাঁধলাম। ভোর রাত হয়ে গেছে তখন। দিগজ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছি। আন্দাজের ওপর নির্ভর করে বাহিতপুরের দিকে হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু আমার আন্দাজ ছিল সম্পূর্ণ ভুল। আমি আসলে উল্টো দিকেই হাঁটছিলাম, যেদিকে শত্রু বেশি। কৃষকরা মাঠে যাওয়া শুরু করেছেন। কিন্তু আমার কাছে তখন সবাইকে শত্রু মনে হচ্ছিল। কাউকে দেখলেই গাছ বা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। ছোটোখাট খালও পার হলাম কয়েকটা। কতক্ষণ সাঁতার কেটেছি। আজ অবাক লাগে সেসব সম্ভব হয়েছিলো কি করে? সকালে মাসুদপুর নামে এক গ্রামের সর্ব দক্ষিণের বাড়িটির কাছে গেলাম। বাড়িটা মূল গ্রাম থেকে সামান্য দূরে তাই ভাবলাম হয়তো শত্রুরা এখানে আসবে না। ঘর থেকে একজন বৃদ্ধ লোক বের হয়ে এলেন। অত্যন্ত গরিব। বললেন, 'বাবা, আপনি কে জানি না, কিন্তু আমি গরিব মানুষ, খুব ভয়ে আছি, আমাকে বিপদে ফেলবেন না। 'আমিও ভেবে দেখলাম, এই নিরীহ লোকটাকে বিপদে ফেলে আর কি হবে? আবার হাঁটতে থাকলাম। লাওন্দ গ্রামের কাছে এসে আর চলতে পারছিলাম না। এক গাছের নিচে বসে পড়লাম। ভীষণ ব্যথা করছিলো তখন। হাঁটা, বসা, শোওয়া কোনটাতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। এর মধ্যে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেলো। নানা রকম মন্তব্য করছিলো তারা। ইতিমধ্যে মুজিববাদীরাও জেনে ফেলেছে যে আমি মরিনি। চারদিকে হুশিয়ার করে

www.pathagar.com

লোক পাঠিয়েছে যেনো আমাকে রাত পর্যন্ত চোখে চোখে রাখা হয়। রাত হলে আবার হত্যা করবে। ভিড়ের মধ্যে থেকে আব্বাস নামক একজন সাহস করে এগিয়ে এলো আমার সাহায্যে। পানি এনে দিলো খেতে। অনুরোধ করলো, 'চলুন ভাই আমার বাড়িতে চলুন।' বললাম, না ভাই আপনার বিপদ বাড়িয়ে লাভ নেই, তার চেয়ে এই গাছের নিচেই একটা হোগলা পেতে দেন। একটা হোগলা আনা হলো।

গ্রাম থেকে লোকজন নানা রকম খাবার নিয়ে আসতে লাগলো। আমি কিছুই খেতে পারছিলাম না। আব্বাস একজন কম্পাউন্ডারকে ডেকে আনলো। ইনজেকশন দেবার পর ব্যথা কমলো। ডাবের পানি খেলাম একটু। এরপর সমস্যা দেখা দিলো আমাকে রাখবে কোথায়? কয়েক হাজার লোক তখন জমা হয়েছে। অনেকে চিনলো আমাকে। সন্ধ্যার আগে লুকোতে না পারলে আবার আক্রান্ত হবো। এর মধ্যে ডাক্তার এলেন। সেখানেই ওষুধ দিয়ে বললেন, 'আমরা আপনাকে বাঁচাতে চাই, লোকজন সব চলে যেতে বলুন, লুকিয়ে রাখব আপনাকে।' আমার অনুরোধে লোকজন চলে গেলো। ডাক্তার প্রথমে ডিসপেনসারিতে নিয়ে গেলেন। ডিসপেনসারির ভেতর দিয়ে গোপনে ইউনিয়ন কাউন্সিলের অফিসে পার করে দিলেন আমাকে। ডিসপেনসারিতে তালা দিয়ে চলে যাবার পর সবাই ভাবলো আমি বোধ হয় সেখানেই আছি। রাতে গোলাগুলি শুরু হলো। মুজিববাদীরা ডিসপেনসারির তালা ভেঙে দেখলো আমি নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর চলে গেলো। ডাক্তারকে আগেই পুলিশে খবর দিতে বলেছিলাম। সকালে কটিয়াদি থানা থেকে ওসি, সিআই ও এসডিপিওসহ বহু পুলিশ এলো। পুলিশ না এলে মারা পড়তাম। তারা খুব সহানুভূতি দেখিয়েছে। আমাকে খাটিয়ায় করে কিশোরগঞ্জ নেবার জন্য পুলিশ সেখান থেকে ৮ জনকে গ্রেফতার করলো। এরা পালাক্রমে খাটিয়া বয়ে আমাকে কিশোরগঞ্জ হাসপাতালে পৌঁছে দেবার পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। এই হাসপাতালে থাকার সময়ও আমার ওপর মুজিবাদীরা আক্রমণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু বহুসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন থাকায় সম্ভব হয়নি। কিছুটা সুস্থ হবার পর প্রথমে কিশোরগঞ্জ জেলে এবং সেখানে নিরাপদ নয় বলে ময়মনসিংহ পাঠিয়ে দিলেন পুলিশ কর্মকর্তারা। আমার বিরুদ্ধে কিছু মামলা আনা হয়েছিল শুধু জেলে পাঠিয়ে আমাকে রক্ষা করার জন্য। তাই আমাকে কোর্টে যেতে হয়নি, সেসব মামলা এমনিতে খালাস হয়ে গেছে। খালাস হবার পর ডিটেনশনে আটক রাখা হয়। শেখ মুজিবের মৃত্যু ও আওয়ামী লীগের পতনের মাস দুয়েক পর আমি ছাড়া পেয়েছি।'

অন্যান্য হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সাইফুল ইসলাম বলেন : 'একোয়াটিয়ার রশিদকে তার বাপের সামনে গুলি করে হত্যা করে। তার বাবা আবদুল আলীর হাতের কুঠার দিয়ে বলেছে তার ছেলের মাথা কেটে দিতে। নির্যাতনের এক পর্যায়ে আবদুল আলী বাধ্য হয়েছে ছেলের মাথা কেটে দিতে। সেই মাথা নিয়ে ফুটবল খেলেছে মুজিববাদীরা। ইউসুফকে হত্যা করার পর তার লাশ গাছে টানিয়ে রেখেছে তিনদিন। ফারুক ধরা পড়েছিলো খাগড়ায়। সেখানকার মুজিববাদীরা তাকে বাজিতপুর মুজিববাদীদের হাতে তুলে দেয়। আওয়ামী লীগ অফিসে তাকে নির্মমভাবে পিটাতে পিটাতে হত্যা করা হয়েছে। ফারুক এলাকায় খুব জনপ্রিয় ছিলো। এলাকার বহু লোক তাকে ছেড়ে দেবার জন্য অনুনয় বিনয় করেছিলো। মাহবুবকে হত্যা করা হয় থানা থেকে নিয়ে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা নাকি থানায় চিঠি দিয়েছিলো মুজিবাদীদের হাতে মাহবুবকে তুলে দিতে। অবশ্য পরবর্তীকালে থানার দারোগারও ১৪ বছর জেল হয়েছে। মাহবুবের একটি একটি একটি করে অঙ্গ কেটে লবণ-

www.pathagar.com

মরিচ মাখিয়ে ধীরে ধীরে হত্যা করেছে। তার কাটা হাত পা ও মাথা তার আত্মীয়-স্বজনকে দেখিয়ে বলেছে মুজিবাদের বিরুদ্ধে রাজনীতি করলে এই অবস্থা হবে। হোমায়পুরের নুরুল ইসলাম বাজিতপুর এসেছিলো বিয়ের বাজার করতে। তাকে ধরে বুকে মই দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে নারকীয়ভাবে হত্যা করেছে মুজিববাদীরা।'

দল বেঁধে রক্ষীবাহিনী ও মুজিবাদীরা গ্রামে আসতো। লোকজনকে দাঁড় করিয়ে অকথ্য নির্যাতন করতো। লাঠি-বুটের আঘাত ছাড়াও হাত-পা বেঁধে উল্টো করে নাকে গরম পানি ঢেলেছে বহু লোককে। মহিলাদেরও রেহাই দেয়নি। আমাদের কর্মীদের শেল্টার দিতো বলে সন্দেহ করে পিরোজপুরের আমিনার সারা গায়ে কম্বল জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ঝলসানো শরীর নিয়ে এখনো ধুঁকছে আমিনা। বালিগাঁয়ে আমাদের কর্মী আকবরকে ধরতে না পেরে তার মা'র ওপর নারকীয়ভাবে অত্যাচার করেছে। আমাদের রাজনীতি করতো না এমন বহু লোককেও তারা হত্যা এবং অত্যাচার করেছে। সচরাচর টাইগার হোল নামক একটি নির্যাতন ক্যাম্প করেছিলো তারা। আলো-বাতাসহীন সেই গর্তে দিনের পর দিন লোকজনকে আটক রেখে নির্যাতন করতো। অধ্যাপক ইয়াকুবের ভগ্নিপতি হাকিম মাস্টারকে পিটিয়ে আধমরা করে ছালায় ভরে পানিতে চুবিয়েছে।

মুজিববাদীরা নিজেরা ডাকাতি-চুরি করে বলতো 'নক্সালরা' করেছে। আমাদের কর্মীদের গোলা ও মাঠ থেকে হাজার হাজার মণ ধান নিয়ে গেছে। আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে এক হাজার মণ ধান লুট করেছে তারা। ইয়াকুব ও তার আত্মীয়েরা কয়েক বছর কোনো ফসলই তুলতে পারেননি।

বাজিতপুরের বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে পরবর্তীকালে অনেকগুলো মামলা করা হয়েছিলো। চারজন মাঝি হত্যার কারণে মুজিববাদী আবু লাল, কাঞ্চন ও সামসুদ্দিনের ফাঁসি হয়েছে। আবদুর রহমানসহ অনেকের দীর্ঘমেয়াদি জেল হয়েছে। আওয়ামী লীগ এই ফাঁসি রদ করার জন্য জিয়ার আমলে একটি হরতালও আহ্বান করেছিলো যা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলো। অনেক মুজিবাদী এখনো বাজিতপুরে যেতে পারে না। মুজিব আমলে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলামের আত্মীয়।

আমাদের কাঁদতেও দেয়নি—

—নিহত আবসার উদ্দিনের ভাই সামসুদ্দিন : 'হার্মাদরা আমাদের মার চোখের সামনে গুলি করেছে আমার ভাই আবসার উদ্দিনকে। যাবার সময় বলে গেছে, এর লাশ শৃগাল কুকুরে খাবে, কেউ কবর দিলে তাকে হত্যা করা হবে, কেউ কাঁদলে তাকেও হত্যা করা হবে। সকালে মেরে বিকেলে আবার এসে দেখে গেছে লাশ কেউ কবর দিয়েছে কি না, কেউ কাঁন্নাকাটি করছে কি না।'

ইকোরাটিয়ার সামসুদ্দিন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন কথাগুলো। বললেন, আমরা চার ভাই, সবাই দূরে দূরে থাকতাম অবস্থা খারাপ দেখে। আবসার ভাই খুলনা মিলে চাকরি করতেন। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে বাড়িতে এসেছিলেন। সকালবেলা দাওয়ায় বসে দড়ি পাকাচ্ছিলেন। শাহজাহান, আজিজ, বাচ্চু এদের নেতৃত্বে একদল মুজিববাদী ঘেরাও করল আমাদের বাড়ি। আবসার ভাইকে ধরে বাড়ির নামায় নিয়ে গিয়ে মাথায় গুলি করল। মরার পরও ক্ষান্ত হলো না। কবর দিতে দিলো না, কাঁদতে দিলো না। রাতের অন্ধকারে গাঁয়ের মানুষ শেষে বিলে পুঁতে রাখলো ভাইয়ের লাশ। সারা গ্রামের মানুষকেই পিটিয়েছে তারা। ক্ষেতমজুর সরুজ ও মতিকে কোদাল দিয়ে কুপিয়েছে। মরে গেছে মনে করে ফেলে রেখে গেছে।'

www.pathagar.com

আবসার উদ্দিনের হত্যাকাণ্ডে ১১ জনের বিরুদ্ধে পরে হামলা হয়েছিলো। এদের কয়েকজনের ফাঁসি হয়েছে অন্য আরেক মামলায়। এই মামলায় যাবজ্জীবন হয়েছে কয়েকজনের। তিনজন খালাস পেয়েছে?'

নিহত রশিদের বাপ আবদুল আলী বলেন, 'আমার সামনে ছেলেকে গুলি করে হত্যা করলো। আমার হাতে কুঠার দিয়ে বলল, মাথা কেটে দে ফুটবল খেলব। আমি কি তা পারি? আমি যে বাপ! কিন্তু অত্যাচার কতক্ষণ আর সহ্য করা যায়? সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে ছেলের মাথা কেটে দিয়েছি।'

পার্টির লোকেরা আমার বাড়িতে একদিন ভাত খাইছিলো, এই ছিলো আমার অপরাধ। রশিদ নাকি রাজনীতি করতো, আমি জানতাম না। একদিন মাতু ও শাহজাহান এসে ধরে নিয়ে গেলো। আওয়ামী লীগ অফিসে সারারাত মারলো। সকালে বললো, এক হাজার টাকা দিলে ছেড়ে দেবো। রশিদ স্বীকার করে এলো এক হাজার টাকা দেবার। আমার কাছে টাকা চাইলো। কিন্তু আমি দিন আনি, দিন খাই, হঠাৎ তিনদিনের মধ্যে এক হাজার টাকা কোত্থেকে দেবো? বললাম, তুই বরং পালিয়ে সিলেট চলে যা। রশিদ সিলেট চলে গেলো। কিন্তু ১০/১২ দিন পরে ফিরে এসে বললো, বাবা, মন মানে না তোমাদের ফেলে থাকতে। সিলেট থেকে আসার পরই অসুখে পড়লো। টাইফয়েড অসুখ সারার পর একদিন তার মাকে বললো, মা আজ ভাত খাবো, তার মা শৈল মাছ দিয়ে তরকারি রান্না করলো। এমন সময় মুজিববাদীরা ঘেরাও করলো বাড়ি। অসুস্থ মানুষ। কোনোরকমে বাড়ি থেকে বের হয়ে মাঠের দিকে দৌড় দিলো। বাবা আমরা জানতাম না সেখানেও বসে আছে সিরাজ। দৌড়ে এসে ধরলো তাকে। রশিদ সিরাজের পা ধরে বললো, সিরাজ ভাই বিমারী মানুষ আমায় ছেড়ে দেন। ছাড়লো না। আমি দৌড়ে গেলাম। আমাকে ধরলো। তারপর বাপ-বেটা দুজনকে বেঁধে মার শুরু করলো। কত হাতে-পায়ে ধরলাম। এরপর মাতু গুলি করলো রশিদকে। ঢলে পড়লো রশিদ। আমি নির্বাক তাকিয়ে রইলাম। মরার পর একজন বললো, চল ওর কল্লাটা নিয়ে যাই, ফুটবল খেলবো। মাতু বললো, হ্যাঁ তাই নিবো। তবে ওর কল্লা আমরা কাটবো না, তার বাবায় কেটে দেবে। বলেই আমার হাতে কুঠার দিয়ে বললো কেটে দিতে। আমার মুখে রা নেই। বলে কি পাষণ্ডগুলো? চুপ করে আছি দেখে বেদম পেটাতে শুরু করলো। বুড়ো মানুষ, কতক্ষণ আর সহ্য হয়। সিরাজ এসে বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে বললো, এক্ষুণি কাট, নইলে তোকে গুলি করবো। তখন দেড় ঘণ্টার মতো পার হয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম না কাটলে আমাকেও গুলি করবে। শেষে কুঠার দিয়ে কেটে দিলাম মাথা। নিয়ে গেলো তারা। আল্লাহ্‌য় কি সহ্য করবো? এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মামলা করা হয়েছে। অভিযুক্তদের অনেকের অন্য মামলায় ফাঁসি ও যাবজ্জীবন হয়েছে।

জনাব সাইফুল ইসলামের মতে, বাজিতপুরে সাম্যবাদী দলের ১২৬ জন কর্মী, সমর্থক ও পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি মুজিববাদী ও রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি যাদের কথা স্মরণ করতে পেরেছেন তারা হচ্ছেন : নিলোখীর আতাউর (২২), বলাইর বলরাম দাস (২০) ইউসুফ (৩২) বড়ইকান্দার রশিদ (২২) গজারিয়ার হামিদ (২২) করোটিয়ার আবসার উদ্দিন (২৫) দিঘিরপাড়ের আরফানসহ চারজন মাঝি, ছয়ছেড়ার আবদুর রহিম (৪০) সাত্তার, গরুইর নুরুল ইসলাম (২০) নেহাম (২৫) নোয়াপাড়ার মাহবুব (২৪) ফারুক (২২) ইকোরাটিয়ার রশিদ, হোমরায়পুরের নূরু (২২), দিঘিরপাড়ের সেকেন্দার প্রভৃতি।

www.pathagar.com

তৎকালীন পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা জনাব আয়ুব রেজা চৌধুরী কিশোরগঞ্জে তার সংগঠনের দুজন কর্মীকে মুজিবাদীরা হত্যা করেছে বলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। তিনি বলেন মোহাম্মদ শাহজাহান (১৮) ছিলো প্রথম কলা বিভাগের ছাত্র। তার বাড়ি কটিয়াদী উপজেলায় ফরগাঁও গ্রামে। ১৯৭৪ সালের মে মাসে ইটনারজয়সিদ্দি গ্রামে শাহজাহান এক ঘরে বসে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। এ সময় ৪/৫ জন মুজিববাদী সেই অবস্থায়ই স্টেনগানের গুলি করলে শাহাজাহান নিহত ও কয়েকজন আহত হন। আহতরা কোনো রকম পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে। পুলিশ তার লাশ কিশোরগঞ্জে নিয়ে গেছে। ভয়ে কেউ তার লাশ গ্রামের বাড়িতে আনতেও সাহস পায়নি।

মুজিববাদীদের দ্বিতীয় টার্গেট শ্রী রায়মোহন দাস (২৭) ছিলেন বিএসসি শিক্ষক। বাড়ি মিটামন উপজেলার কেওড়ারজোর গ্রামে। তিনি নৌকায় ভৈরব থেকে কেওড়ায় আসার সময় অষ্টগ্রামের মুজিববাদীরা কদমচালের কাছে নৌকা ঘেরাও করে রামদা দিয়ে কুপিয়ে মেরে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তার লাশও পাওয়া যায়নি। পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট আন্দোলন ছাড়াও শাহজাহান ছাত্র ইউনিয়ন ও রায়মোহন কৃষক সমিতির সদস্য ছিলেন। রায়মোহন দুই সন্তানের পিতা ছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রধান স্লোগান ছিলো অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা। কিন্তু স্বাধীনতার পর এ দাবির তো কোনো সুরাহা হয়নি বরং নাগরিকদের জীবন দিনের পর দিন মানবেতর হতে থাকলো। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশাবঞ্চিত ক্ষুব্ধ জনতা দু'হাতের বজ্রমুষ্ঠি ঊর্ধ্বে তুলে ধরে স্লোগান তুলেছিলো—'ভাত দে হারামজাদা নইলে মানচিত্র খাবো।' বলার অপেক্ষা রাখে না এই রোষে ফুলে ওঠা বিক্ষুব্ধ জনতাকে শায়েস্তা করতে সেদিন গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, নগরের অলিতে-গলিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো সোনার ছেলেদের। আশীবিষের বিষাক্ত ছোবলে সেদিন ঝলসে গিয়েছিলো নিরন্ন মানুষের হাড্ডিসার দেহ। তবুও ছাড়া পায়নি। ওদের পিতৃপুরুষের নামে জনগণকে পৈত্রিক ভিটাছাড়া করতে যে সব দস্যুতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিলো তার অংশবিশেষ আমরা বর্ণনা করছি। দুঃশাসনের সমুদ্র থেকে দু-এক ফোঁটা পানি আমরা তুলে আনার চেষ্টা করছি মাত্র। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীতে আমরা শুনছিলাম বাক্তিতপুরের সন্ত্রাসের বীভৎস কাহিনী। এ নিবন্ধিতে পরের কাহিনী।

সন্ত্রাস ঃ শরীয়তপুর

বামপন্থী নেতা শান্তি সেনের ষাট বছর বয়স্কা স্ত্রী অরুণা সেনের ওপর রক্ষীবাহিনী যে অত্যাচার করেছে তা ইলামিত্রের ওপর নির্যাতনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার নির্যাতনের কাহিনী আংশিক বিবৃতি আকারে ছাপা হয়েছিল একটি অনিয়মিত পত্রিকায়। আমি শরীয়তপুর অঞ্চলের হত্যা ও সন্ত্রাস সম্পর্কে জানার জন্য কথা বলেছি অরুণা সেন, তার স্বামী শান্তি সেন ও ছেলে চঞ্চল সেনের সঙ্গে। অরুণা সেনের সাক্ষাৎকার ও বিবৃতিটি পাশাপাশি তুলে ধরছি :

১৯৭৩ সালের আগস্ট মাস হবে। উত্তর রামভদ্রপুর গ্রামে রক্ষীবাহিনী এলো। মুক্তিবাহিনীর ফজলু ও আমাদের দলের সমর্থক কৃষ্ণ ধরা পড়লো তাদের হাতে। প্রথমে খুব মারলো তাদের। কৃষ্ণ ছিলো স্কুল শিক্ষক। রক্ষীবাহিনীর কাছে পানি খেতে চেয়েছিলো কৃষ্ণ,

www.pathagar.com

রক্ষীরা তাকে প্রস্রাব খেতে দিয়েছে। কাহিল ও বিধ্বস্ত কৃষ্ণ উঠে দাঁড়াতে পারছিলো না। একজন রক্ষীবাহিনী বললো, আমার সোনার বাংলা গাইতে জান? কৃষ্ণ বললো, হ্যাঁ জানি। গাও তাহলে। কৃষ্ণ কাঁদতে কাঁদতে গাইলো, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। কিছু খেতে দিলো না। ধরে নিয়ে গেলো তাদের। আর ফিরে আসেনি তারা। পরে আমি যখন রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরা পড়লাম, তখন তাদের মুখেই শুনলাম, ধরে আনার সময়ই তাদের এমন মার দিয়েছে যে, পথেই মরে গেছে, রাস্তায় ফেলে দিয়েছে তাদের লাশ। কেউ কেউ অবশ্য মনে করে তাদের মাদারীপুর নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে।

এর কিছুদিন পর অষ্টমী পূজা এলো। খবর পেলাম রক্ষীবাহিনী আসছে। বাড়িতে আমি একা। বস্তির ডেরার মতো একটা ঘরে থাকি। শুধু পরনের কাপড় ছাড়া সবই লুট করেছিলো ওরা। যাহোক, রক্ষীবাহিনী এসে ঘেরাও করলো আমাকে। জিজ্ঞেস করলো, ছেলে কই? বললাম, আপনারা গ্রামে হামলা করেন বলে পালিয়ে গেছে। তারপর আমাকে নিয়ে গেলো থানার কাছে। স্বামী ও ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলো প্রথম। বললাম, জানি না। সেখান থেকে আমাকে নড়িয়া নিয়ে গেল। আমার সঙ্গে গ্রামের লক্ষণ বলে একটি ছেলেকেও ধরেছিলো। তাকেও সঙ্গে নিয়ে চললো। নড়িয়া নিয়ে একটা খালি ঘরে বসালো আমাকে। একই কথা জিজ্ঞেস করতে থাকলো। এমন কথাও বললো, 'আমরাও কিন্তু সমাজতন্ত্র পছন্দ করি।' তখন কিছু খাওয়া হয়নি আমার। ক্ষুধা লেগেছিলো। একটা রুটি খেতে দিলো। আবার থানায় পাঠালো। সেকেন্ড অফিসারের বউ রাতে খেতে দিলো, থাকতে দিলো। পরদিন চলে এলাম।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে আবার এলো রক্ষীবাহিনী। আমাকেও ধরলো। সে ঘটনা আমি বিবৃতিতে বলেছি।

গত ১৭ আশ্বিন রক্ষীবাহিনীর লোকেরা আমাদের গ্রামের ওপর হামলা করে। ঐ দিন ছিলো হিন্দুদের দুর্গাপূজার দ্বিতীয় দিন। খুব ভোরেই আমাকে গ্রেফতার করে। গ্রামের অনেক যুবককে ধরে মারপিট করে। লক্ষণ নামের একটি কলেজের ছাত্র এবং আমাকে তারা নড়িয়া রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার স্বামী শান্তি সেন এবং পুত্র চঞ্চল সেন কোথায়? তারা রাষ্ট্রদ্রোহী, তাদের ধরিয়ে দিন। আরও জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্ধ্যার দিকে তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। লক্ষণকে সেদিন রেখে পরদিন ছেড়ে দেয়। সে যখন বাড়ি ফিরে, দেখি মারধরের ফলে সে গুরুতর অসুস্থ। চার পাঁচদিন পর আবার তারা রাত্রিতে গ্রামের ওপর হামলা করে। অনেক বাড়ি তল্লাশি করে। অনেককে মারধর করে। কৃষ্ণ ও ফজলু নামের দুটি যুবককে মারতে মারতে নিয়ে যায়। আজও তারা বাড়ি ফিরে আসেনি। তাদের আত্মীয়রা ক্যাম্পে গেলে বলে দিয়েছে তারা সেখানে নেই। তাদের মেরে ফেলেছে বলেই মনে হয়। এরপর থেকে রক্ষীবাহিনী মাঝে মাঝেই গ্রামে এসে যুবকদের খোঁজ করতো। কিন্তু তেমন কোনো ব্যাপক হামলা হয়নি। গত ৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৪) রাত্রি থাকতে এসে রক্ষীবাহিনীর একটি দল সম্পূর্ণ গ্রামটিকে ঘিরে ফেললো। ভোরে আমাকে ধরে নদীর ধারে নিয়ে গেলো। সেখানে দেখলাম গ্রামের উপস্থিত প্রায় অধিকাংশ সক্ষমদেহী পুরুষ এমনকি বালকদের পর্যন্ত এনে হাজির করেছে। আওয়ামী লীগের থানা সম্পাদক হোসেন খাঁ তদারক করছে। আমার সামনে রক্ষীবাহিনী উপস্থিত সকলকে বেদম মারপিট করে। শুনলাম এদের সকলকে ধরতে গিয়ে বাড়ির মেয়েদেরও প্রচণ্ড মারপিট করেছে এবং অশ্লীল আচরণ করেছে। তাদের এক দফা মারপিট করে রক্ষীরা আমাকে বললো পানিতে নেমে দাঁড়াতে।

www.pathagar.com

সেখানে নাকি আমাকে গুলি করা হবে। আমি নিজেই পানির দিকে নেমে গেলাম। কিন্তু নদীর পানি দূরে সরে যাওয়ায় হাঁটু সমান কাঁদাতেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। ওরা তাক করে রাইফেল ধরলো গুলি করবে বলে। কিন্তু পরস্পর কি যেন বলাবলি করে রাইফল থামিয়ে নিলো। কাদার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। কমান্ডার গ্রেফতার করা লোকদের হিন্দু-মুসলিম দুই ভাগ করে দুই কাতারে দাঁড় করালো। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে বললো: মালাউনরা আমাদের দুশমন। তাদের ক্ষমা করা যাবে না। তোমরা মুসলমানরা মালাউনদের সাথে থেকো না। তোমাদের এবারকার মতো মাফ করে দেওয়া হলো। এই বলে কলিমদ্দি ও মোস্তফা নামে দুইজন মুসলমান যুবককে রেখে আর সবাইকে এক এক বেতের বাড়ি দিয়ে বললো: ছুটে পালাও। তারা পালিয়ে গেলো।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওরা কলিমদ্দি ও মোস্তফাসহ ২০ জন হিন্দু যুবককে নিয়ে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হলো। তিনজন ছাড়া এরা সবাই জেলে। মাছ মেরে কোনোরকমে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। আর তাদের মা-বাপ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা আকুল হয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলো। সে এক মর্মবিদারী করুণ দৃশ্য। সন্ধ্যার সময় কলিমদ্দি, মোস্তফা, গোবিন্দ নাগ ও হরিপদ ঘোষ ছাড়া বাকি সবাই গ্রামে ফিরে এলো। আমি গেলাম তাদের দেখতে। দেখলাম সবাই চলতে অক্ষম। সর্বাঙ্গ তাদের ফুলে গিয়েছে। বেত ও বন্দুকের দাগ শরীরে ফেটে ফেটে বসে গেছে। চোখ-মুখ ফোলা। হাত-পায়ের গিরোতে রক্ত জমে আছে। তাদের কাছে শুনলাম, সারাদিন তাদের দফায় দফায় চাবুক মেরেছে। গলা ও পায়ের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে পানিতে বারবার ছুড়ে ফেলে চুবিয়েছে। পিঠের নিচে ও বুকের ওপর বাদ দিয়ে দুদিক থেকে দুজন লোক তাদের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। মই দিয়ে ডলেছে। এদের কাউকে কাউকে আত্মীয়রা গিয়ে বয়ে এনেছে। এদের অবস্থা দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেলো। ভাবলাম, যারা দিনরাত্রি পরিশ্রম করেও আজ এক বেলা পেটপুরে খেতে পায় না, অনাহার, দুঃখ, দারিদ্র্যের জ্বালায় আজ অর্ধমৃত তাদের 'মড়ার ওপর খাড়ার ঘা'র কবে অবসান হবে। যে শাসকরা মানুষের সামান্য প্রয়োজন ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারছে না। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, শোষণ, নির্যাতন যারা বন্ধ করতে পারছে না তারা কোন অধিকারে আজ নিঃস্ব মানুষের ওপর চালাচ্ছে এই বর্বর নির্যাতন।

অবশেষে চরম নির্যাতন আমার ওপরও নেমে এলো। ৬ ফেব্রুয়ারি '৭৪ রাত্রি ভোর না হতেই রক্ষীবাহিনী আমাকে ঘুম থেকে তুললো। আমাকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এলে দেখলাম রীণাও রয়েছে। আমাদের নিয়ে তারা দুই মাইল দূরে ভেদরগঞ্জ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হলো। রাস্তায় রীণার প্রতি তারা নানা অশ্লীল উক্তি করছিলো। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখলাম; সেখানে কলিমদ্দি, মোস্তফা, গোবিন্দ নাগ ও হরিপদ ঘোষও রয়েছে। চেহারা দেখেই বোঝা গেলো, তাদের ওপর গুরুতর দৈহিক নির্যাতন হয়েছে। বিশেষ করে কলিমদ্দি ও মোস্তফাকেই বেশি অসুস্থ দেখলাম। কলিমদ্দি, মোস্তফা দুই ভাই। এদের সংসারে আর কোনো সক্ষম ব্যক্তি নেই। অপরের জমি চাষ করে এরা কোনোমতে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের রয়েছে স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

আমরা ক্যাম্পে আসতেই অনেক রক্ষীবাহিনী এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। কেউ অশ্লীল মন্তব্য করে, কেউ চুল ধরে টানে, কেউ চড় মারে, কেউ খোঁচা দেয়, এমনি সব বর্বরতা। কিছুক্ষণ পর আমাদের রৌদ্রের মধ্যে বসিয়ে রেখে তারা চলে গেলো। সন্ধ্যায় আমাদের একটি কামরায় ঢুকালো। অনেক রাত্রিতে রীণাকে তারা উপরে দোতলায় নিয়ে

www.pathagar.com

গেলো। কিছুক্ষণ পরই শুনলাম রীণার হৃদয়বিদারী চিৎকার। প্রায় আধঘণ্টা পর আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে থেমে গেলো। নিঃস্তব্ধ রাতের অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসছিলো শুধু বেতের ক্ষীণ সপাং সপাং শব্দ আর পাশবিক গর্জন। রীণাকে যখন তারা এনে কামরার মধ্যে ফেললো, রাত্রি তখন কত জানি না। রীণার অর্ধচেতন দেহ বেতের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত রক্ত ঝরছে। রীণার জ্ঞান এলে পানি চাইলো। আমি তাকে পানি খাওয়ালাম। রীণা আস্তে আস্তে কথা বলতে পারলো। রাত্রি তখন ভোর হয়ে এসেছে। রীণার মুখে শুনলাম ওপরে ভেদরগঞ্জ ও ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সম্পাদকরা এবং ঐ দুই স্থানের ক্যাম্প কমান্ডাররা উপস্থিত ছিলো। তারা শান্তি সেন ও চঞ্চল কোথায় আছে, তাদের ধরিয়ে দিতে বলে এবং অস্ত্র কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করে। রীণা কিছুই জানে না বলায় তাকে এমন সব অশ্লীল কথা বলে, যা কোনো সভ্য মানুষের পক্ষে বলা তো দূরের কথা, কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসা ও গালি বর্ষণের পর ভেদরগঞ্জ ক্যাম্পের কমান্ডার বেত নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাতাড়ি এমন পিটাতে থাকে যে পরপর তিনখানা বেত ভেঙ্গে যায়। আবার জিজ্ঞাসা করে, শান্তি সেন ও চঞ্চল কোথায়? রীণার একই উত্তর। ক্ষিপ্ত হয়ে রাণীকে তারা সিলিং-এর সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় এবং দুই কমান্ডার দুইদিক থেকে একসঙ্গে চাবুক চালাতে থাকে। মারার সময় রীণা বলেছিলো, আমাকে এভাবে না মেরে একেবারে গুলি করে মেরে ফেলুন। জবাবে তারা বলে সরকারের একটা গুলির দাম আছে, তোকে সাতদিন ধরে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলবো। এখন পর্যন্ত মারার হয়েছে কি? অল্প পরেই রীণা অচেতন হয়ে যায়। কিন্তু তারা ঐ দেহের ওপরই চাবুক চালাতে থাকে। জ্ঞান এলে রীণা দেখে যে, সে মেঝের ওপর পড়ে আছে। পানি চাইলে তাকে পানিও দেয়া হয়নি। ৮ ফেব্রুয়ারি '৭৪ প্রথমে আমাকে ও পরে রীণাকে দোতলায় নেয়া হয়। সেখানে দেখলাম ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি ফজলু মিয়া ও ভেদরগঞ্জের সেক্রেটারি হোসেন খাঁ চেয়ারে বসে আছে। আমাকে বললো, তোমার স্বামী ও ছেলেকে ধরিয়ে দাও। অস্ত্র কোথায় আছে বলে দাও। তারা ডাকাত, অস্ত্র দিয়ে ডাকাতি করে। আমি বলি, তারা ডাকাত নয়, তারা সৎ দেশপ্রেমিক, আমার স্বামী রাজনীতি করেন, একথা কে না জানে। তিনি এদেশের সাধারণ লোকের অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয়। রীণাকেও তারা একই প্রশ্ন করে। রীণা জানে না বলায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ডামুড্যা ক্যাম্পের কমান্ডার কদম আলী এবং ভেদরগঞ্জ ক্যাম্প কমান্ডার বজলু রহমান এরা সবাই আমাদের অশ্লীল গালাগাল দিতে থাকে এবং আমাকে ও রীণাকে এক সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে রীণার বস্ত্র খুলে নেয়। তারপর দুজনকে দুদিক থেকে চাবুক মারতে থাকে। জ্ঞান হলে দেখি, আমরা উভয়েই মেঝেতে পড়ে আছি। রীণার সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমার গায়ে কাপড় থাকায় অপেক্ষাকৃত কম আহত হয়েছি। তবুও এই রুগ্ন বৃদ্ধদেহে এই আঘাতই মর্মান্তিক। সর্বাঙ্গ ব্যথায় জর্জরিত। তৃষ্ণায় মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। নড়বার ক্ষমতা নেই। ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে নারকীয় হাসি হাসছে। এদের হুকুমে দুইজন সিপাই আমাকে টেনে তুললো। অতিকষ্টে দাঁড়াতে পারলাম। রীণা পারলো না। দুজন রক্ষী তার দুই বগলের নিচে হাত দিয়ে তাকে টেনে তুলে তার গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিলো ও টানতে টানতে নিচে নামিয়ে নিয়ে এলো। কমান্ডার পেছন থেকে নির্দেশ দেয়। ওকে ভালো করে হাঁটা নয়ত মরে যাবে। সকালে কমান্ডার কয়েকজন রক্ষীসিপাইসহ রীণাকে নিয়ে গ্রামের দিকে রওয়ানা হলো। বাঁচবি তো না, চল তোর মাকে দেখিয়ে আনি। রীণার সর্বাঙ্গ ফুলে কালো হয়ে গিয়েছে। একটি পা ফেলবার ক্ষমতা নেই। সে অবস্থায় তাকে দু'হাতের দু'বাহুতে ধরে দুজন

www.pathagar.com

রক্ষী প্রায় টানতে টানতে দুমাইল দূরে গ্রামের দিকে নিয়ে চললো। ঠাট্টা করে বলছিলো, হাঁটলে পা ব্যথা কমে যাবে। বাড়িতে নিলে রীণার মা তাকে দেখেই ফিট হয়ে যান। কমান্ডার রীণাকে তার মার মাথায় পানি দিতে বলে। রীণার মার জ্ঞান এলে রীণার চেহারা এমন কেন জিজ্ঞেস করায় কমান্ডার বলে, পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। রীণাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য রীণার মা কমান্ডারের কাছে অনুনয় করলে কমান্ডার বলে, খাসী খাওয়ালে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো। রীণাকে তারা দু'মাইল রাস্তা পুনরায় টানতে টানতে নিয়ে এলো। ঐদিন ছিলো ৯ ফেব্রুয়ারি '৭৪। হনুফাকেও তারা ধরে নিয়ে এলো ঐ দিন। করিম নামে আর একটি কৃষক যুবককেও তারা রামভদ্রপুর থেকে এনেছে দেখলাম। কিন্তু তাকে অতো মেরেছে যে তার অবস্থা সঙ্গীন। নড়িয়া থানার পণ্ডিত স্যার থেকেও একজন স্কুল শিক্ষকও দুজন যুবককে এনেছে দেখলাম। বিপ্লব নামের একটি ছেলে নাকি মারের চোটে পথেই মারা যায়। রক্ষীবাহিনীর সিপাহিরা বলাবলি করছিলো। একজন জল্লাদ গর্ব করে বলছিলো দেখ এখনও হাতে রক্ত লেগে আছে। শুনেছি মতি নামের আর একটি যুবককে তারা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। আর আমাদের ধরে আনার দুদিন আগে কৃষি ব্যাংকের পিয়ন আলতাফকে পিটাবার পর হাত-পা বেঁধে দোতলার ছাদ থেকে ফেলে মেরে ফেলেছে।

সন্ধ্যার অল্প আগে আমাদের পানি থেকে তুলে ভিজা কাপড়েই থাকতে বাধ্য করলো। দারুণ শীতে আমরা কাঁপছি। প্রচণ্ড জর এসে গেছে সকলের। এমনি করেই রাতভর ছালার চটের ওপর পড়ে থাকলাম। পরদিন রাতে রীণাকে আবার নিয়ে গেলো দোতলায়। সেখানে আবার তাকে ঝুলিয়ে বেত মারলো। ১১ তারিখে আবার রীণার ওপর চললো এই অত্যাচার, রীণা জ্ঞান হারালো। রক্ষীসিপাইদের বলাবলি করতে শুনলাম, রীণা মরে গিয়েছে। রীণার কাছে শুনলাম, তার যখন জ্ঞান হলো, তখন সে দেখে তার পাশে ডাক্তার বসা। রীণা জিজ্ঞেস করে, আপনি কে, আমি কোথায়? ডাক্তার জবাব দেয়, আমি ডাক্তার, তুমি কথা বলো না। কিছুক্ষণ পরই ডাক্তার চলে গেলে রীণাকে তারা ধরাধরি করে নিচে আমাদের কাছে নিয়ে এলো।

একজন সিপাই রীণা ও হনুফাকে বলে তোরা তো মরেই যাবি, তার আগে আমরা প্রতিরাতে পাঁচজন করে তোদের ভোগ করবো। তারা অবশ্য ভোগ শব্দটি বলে নাই। বলেছিলো অতি অশ্লীল কথা। একদিন রাতে দুটি রক্ষীসিপাই ঘরে ঢুকে আলো নিবিয়ে দেয়। রীণা ও হনুফার মুখ চেপে ধরে। ধস্তাধস্তি করে তারা ছুটে গিয়ে চিৎকার করে। চিৎকার শুনে ক্যাম্পের অন্য রক্ষীরা ছুটে আসে। কমান্ডারও আসে। ওরা তাকে সব বললে সে বলে, খবরদার একথা প্রকাশ করো না। তাহলে মেরে ফেলবো। রক্ষীসিপাহিদের কারো কারো মধ্যে মাঝে মাঝে মানবতা বোধের লক্ষণ পাচ্ছিলাম। তারই একটি সিপাইকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছো? প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলো। বললো, বাংলাদেশে লেখাপড়া দিয়ে কি করবো? আমরা জল্লাদ, জল্লাদদের আবার লেখাপড়ার দরকার কি—এই বলে সে দে ছুট। মনে হলো যেনো চাবুক খেয়ে একটি ছাগল ছুটে পালাচ্ছে।

রক্ষীসিপাইদের কানাঘুষায় শুনছিলাম, আমাকে আর হনুফাকে অন্যত্র কোথাও পাঠিয়ে দেবে আর রীণা ও অন্য পুরুষ বন্দিকে মেরে ফেলা হবে। ১২ ফেব্রুয়ারি আমাকে ও হনুফাকে নিয়ে রক্ষীরা রওয়ানা দিলো। আমরা রীণাকে ফেলে যেতে আপত্তি জানালাম। রীণাও আমাদের সাথে যেতে খুব কান্নাকাটি করছিলো, কমান্ডারের কাছে অনুনয়-বিনয় করছিলো। কমান্ডার তার সহকর্মীদের সাথে কি যেন আলাপ করে সেদিন আমাদের পাঠানো স্থগিত

www.pathagar.com

রাখলো। ১২ তারিখেও ওরা রাত্রিতে আবার রীণাকে ঝুলিয়ে হান্টার দিয়ে পেটায়। ১৩ তারিখে তারা রীণাকে মারে না, কিন্তু নির্যাতনের নতুন কোশল নেয়। দম বন্ধ করে রাখে; জোর করে চেপে ধরে নাক-মুখ চেপে রাখে। এমনি করে জ্ঞান হারালে ওরা ছেড়ে দেয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে ওরা আমাদের তিনজনকে নিয়ে রওয়ানা দিলো প্রায় চার মাইল দূরে ডামুড্যা রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে। কলিমদ্দি, মোস্তফা গোবিন্দ ও হরিপদ থেকে গেলো। রক্ষীরা বলাবলি করছিলো, তাদের মেরে ফেলা হবে। আমরা কিছু দূরে এলে ক্যাম্পের দিক থেকে চারবার গুলির আওয়াজ শুনলাম। ভাবলাম ওদের বুঝি মেরে ফেললো। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেলো। তারপর আমাদের শরীরের অবস্থা এমন ছিলো যে হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছিলো। তবুও আমরা বাধ্য হচ্ছিলাম হাঁটতে। বোধ হয় আমাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছে, বোধ হয় বেঁচে যাবো। এই চিন্তাই আমাদের হাঁটতে শক্তি যোগাচ্ছিলো। অনেক রাতে ডামুড্যা রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে পৌছলাম। সেখানে কিছুক্ষণ রেখে স্পিড বোটে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। সমস্তক্ষণ আমাদের কম্বল চাপা দিয়ে মুর্দার মতো ঢেকে রাখা হলো। বেদনা জর্জরিত ক্ষতবিক্ষত শরীর। তার ওপর কম্বল চাপা থেকে শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম। যেনো জ্যান্ত কবর। আমাদেরকে মাদারীপুর ক্যাম্পে আনা হলো। সেখানে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলো। সমস্ত দিন আমাদের ওখানেই রাখলো। খেতে দিলো না। শেষ রাতে জিপে করে আবার কম্বল চাপা দিয়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা হলো। আবার সেই সুদীর্ঘ পথ জ্যান্ত কবরের যন্ত্রণা। ঢাকায় আমাদের প্রথমে রক্ষীবাহিনীর ডাইরেক্টরের কাছে নিয়ে গেলো। সে আমাদের খুব ধমক লাগালো। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে গেলো তেজগাঁ থানায়, তারপর লালবাগ থানায়। রাতে সেখানে থাকলাম। পরদিন পাঠালো সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে পাঁচদিন রাখার পর আমাদের নিয়ে এলো তেজগাঁ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে। সেখানে পাঁচদিন রেখে জিজ্ঞাসাবাদের পর আবার সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়।

জেলে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ কয়েদিদের মতো রাখা হতো। দিনরাত সেলে বন্দি। সেখানে রাজনৈতিক অভিযোগে আরও বন্দিনী আছে। তার মধ্যে ১৭ মার্চ '৭৪ গ্রেফতার জাসদ নেত্রী মমতাজ বেগম আছেন। সবাইকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদি করে রাখা হয়েছে এবং সাধারণ কয়েদিদের মতো খাটানো হচ্ছে। এর ওপর জমাদারনীরা (মেয়ে সিপাই জমাদার) তাদের নিজেদের জামাকাপড় সেলাই, কাঁথা সেলাই, কাপড়চোপড় ধোয়ানো সব কিছুই মেয়ে কয়েদিদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। রাজনৈতিক বন্দিনীদেরও রেহাই দিচ্ছে না।

যে কথা বিবৃতিতে বলা হয়নি সে সম্পর্কে অরুণা সেন বললেন :

যে জেলেদের প্রচণ্ডভাবে মারধর করে ছেড়ে দিয়েছিলো, সে মায়ের প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তীকালে রামভদ্রপুরের অবলা নামের একজন জেলে মারা গেছে। ভারতে চলে গেছে অনেকে। ওরা আমার ঘাড়ে পা দিয়ে কিভাবে যে ঝাঁকুনি দিয়েছে জানি না, পরে বহুদিন আমি ঘাড় সোজা করতে পারিনি। একদিন পানিতে চুবিয়ে চুলে ধরে আমাকে টেনে নিয়ে গেলো গুঁড়ো পাথরের কাছে। গুঁড়া পাথরের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে চুল ধরে এদিকে ওদিকে জোরে নাড়লো। কতক্ষণ পর্যন্ত খুব ব্যথা লাগতো। তারপর ব্যথাবোধও রহিত হয়ে গিয়েছিলো। এরপর ছুড়ে দিলো পানিতে। জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম কাদার মধ্যে পড়ে আছি। আস্তে আস্তে উঠে এলাম উপরে। সন্ধ্যায় ভীষণ জ্বর এলো। ভেজা কাপড়ে ছিলাম তখনো। সহ্য করতে না পেরে অনেক দুঃখে তখন রক্ষীবাহিনীর লোকদের বলেছিলাম,

www.pathagar.com

আমার অভিশাপে তোরা শেষ হয়ে যাবি।

আমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়তাম তখনো নাকি বলতে থাকতাম, জানি না, জানি না। রক্ষীদের সাবই যে খারাপ ছিলো সেটা আমি বলবো না। অনেকেই আমাকে সাহায্য করেছে গোপনে, চোখের পানি মুছতো কেউ কেউ। একজন বললো, সে মুক্তিবাহিনীতে ছিলো। এখন চাকরি ছেড়ে দেশের বাড়িতে চলে গেলেও বাঁচবে না। কিন্তু এসব যে সহ্যও করতে পারছে না।

আমার শরীরের কোনো অংশই সাদা ছিলো না। নীল হয়ে গিয়েছিলো ব্যথায়। আমাকে ধরার পর বাইরে যে হৈ চৈ শুরু হয়েছিলো তা জানতাম না। রিটের কথাও জানতাম না। ৫/৬ দিন পর দেখলাম আমার প্রতি ব্যবহার একটু সদয় হয়েছে। এক অফিসার বললো চিকিৎসা করে বুড়িকে সারিয়ে তোলো। মরে গেলে মুস্কিল হবে। তখনো ১২ দিন পার হয়ে গেছে।

কলিমুদ্দি, মোস্তফা, হরিপদ ও গোবিন্দকে মারার আগেই তাদের কবর খোঁড়া হচ্ছে দেখলাম। ক্যাম্প থেকে আমরা সামান্য দূরে আসার পরই তাদের হত্যা করা হয় গুলি করে। নড়িয়া থেকে ডামুড্যা এবং সেখান থেকে মাদারীপুর নিয়ে এলো আমাদের। মাদারীপুরে ক্যাম্পে এসে দেখলাম শেখ মনি বসে আছে। রিট হবার পর শেখ মুজিব নিজেও নজর রাখছিলো ঘটনার ওপর। তিনিই শেখ মনিকে মাদারীপুর পাঠিয়েছিলেন আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। মনি আমাকে বৌদি বলে সম্বোধন করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বললো। তাকে বললাম কিছু খেতে দিতে। সামান্য কিছু খাবার ব্যবস্থা করলো। রীণার ওপর কি ধরনের অত্যাচার হয়েছে জানতে চাইলে আমি বললাম, রীণাও বললো। সে তখন বিচারের আশ্বাস দিয়ে চলে গেলো।

পরদিন আমাদের ঢাকা আনা হলো। প্রথমে শেরেবাংলা নগর রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টারে এবং পরে আইবি-র তত্ত্বাবধানে কয়েকদিন থাকার পর জেলে পাঠিয়ে দিলো। দেড় মাস পর বিনাশর্তে মুক্তি পেলাম। মুক্তি পেয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলাম। না গেলে মরতে হতো। কারণ, ধরার পরপরই আমাদের হত্যা করা হয়নি বলে আওয়ামী লীগের উচ্চ মহলের লোকেরা নাকি রক্ষীবাহিনীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলো। মুক্তির কয়েকদিন পর আবার হত্যা করতে গিয়েছিলো, কিন্তু পায়নি। আমাদের না পেয়ে রীণার বাবা শশধরকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মম অত্যাচার করে। তার বয়স তখন ষাটের উপরে। এই বৃদ্ধ বুটের লাথিও খেতে খেতে পায়খানা করে দিয়েছিলো। রীণাকেও আর পায়নি। আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিলো।

ভেদরগঞ্জ ক্যাম্পে থাকার সময় আমার চোখের সামনে হত্যা করেছে করিম উদ্দিন নামক একজনকে। সে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। ক্ষেতে কাজ করার সময় ধরে এনেছিলো তাকে। প্রচণ্ড মারের চোটে তার যখন অন্তিম দশা তখন তাকে পানিতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলো। তার বাড়ি ছিলো রামভদ্রপুর চরে।

ডিঙ্গামানিক গ্রামের প্রাণকুমার কর্মকারকে খুব সঙ্গীন অবস্থায় দেখেছিলাম ভেদরগঞ্জ ক্যাম্পে। পরে ডামুড্যা নিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। লাশ পাওয়া যায়নি। কিশোরী ডাক্তারের ভাগ্নে পানুও গুলি খেয়েছিলো। সে অবশ্য বেঁচে গেছে। পণ্ডিতস্যার স্কুলের একজন বিএসসি শিক্ষককে সারারাত প্রহার করেছে ভেদরগঞ্জ ক্যাম্পে। তার চিৎকারে কেউই ঘুমুতে পারেনি। মইশালের কাদেরকে মারতে মারতে হত্যা করেছে। ভেদরগঞ্জের আইয়ুব আলী চেয়ারম্যানের জামাইকে নকশালদের শেল্টার দেয় বলে অভিযোগ এনে হত্যা করে। রক্ষীরা

www.pathagar.com

তাকে মারতে চায়নি, আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন খাঁ রক্ষীবাহিনী লিডারের কাছ থেকে রিভলবার নিয়ে তাকে হত্যা করেছে। হোসেন খাঁকেও পরে অবশ্য জীবন দিতে হয়েছে। আমার এক পালিতা মেয়ের বাবার নাম ছিলো যজ্ঞেশ্বর দেওয়ানজী। নকশালদের শেল্টার দেয়, এই অভিযোগে তাকে ধরে নিয়ে যায়। বৃদ্ধও অসুস্থ ছিলো। আধমরা করে তাকে নদীতে ফেলে দেয়। তার লাশ আর পাওয়া যায়নি। মরার আগে সে এক কাপ পানি চাওয়ার জন্য খুব অনুনয় বিনয় করায় প্রস্রাব খেতে দেয়া হয়েছিলো তাকে। তার স্কুল ছাত্র ছেলেকেও ধরেছিলো। স্কুলের শিক্ষকরা তাকে ছাড়িয়ে আনে। শেষের দিকে তারা মেরে আর কবর দিতো না, নদীতে ফেলে দিতো। গোবিন্দকে কবর থেকে তুলে নদীতে ফেলে দিয়েছিলো।

শান্তি সেন

'রক্ষীবাহিনী রীণাকে ধরার পর তার বোন সোনালীকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। সোনালী টের পেয়ে পালানোর জন্য রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করে। বেশ কিছু দূর চলে যাবার পর রক্ষীবাহিনী তাকে দেখতে পেয়ে পিছে পিছে দৌড়াতে থাকে। সোনালী রামভদ্রপুর থেকে মাইল তিনেক দূরে ডিঙ্গামানিক গ্রামের কানাইলালের বাড়িতে গিয়ে ওঠে এবং তাড়াতাড়ি সালোয়ার-কামিজ পাল্টে শাড়ি পরে থালা-বাসন নিয়ে পুকুর ঘাটে মাজতে শুরু করে। কানাইলালের স্ত্রী এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে। কিছুক্ষণ পর রক্ষীবাহিনীর কয়েকজন এসে সোনালীকে দেখতে না পেয়ে কানাইলালের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে। সে তখন দেখেনি বলে জানায়। এ সময় ঘাটে বাসন মাজা অবস্থায় বসা মেয়েটিকে দেখিয়ে রক্ষীরা পরিচয় জিজ্ঞেস করলে মহিলা তার খালাতো বোন বলে পরিচয় দেয়। সোনালী ঘোমটা দিয়ে বসেছিলো বলে চিনতে পারেনি। এরপর রক্ষীবাহিনী চলে যায়। সম্ভবত গ্রামের অন্য কেউ রাতে প্রকৃত ঘটনাটি রক্ষীবাহিনীদের জানিয়ে দেয়। পরদিন কানাইলালের বাড়িতে তারা আবার আসে এবং মেয়েটির খোঁজ করে। কানাইলালের স্ত্রী তখনো বলে যে, সে তাদের নিজের বাড়িতে চলে গেছে। রক্ষীবাহিনী তখন কানাইলাল ও তার স্ত্রীকে বাড়ির ওঠানে নিয়ে অকথ্য ও নির্মমভাবে মারধর করে। সোনালী তো আগের রাতেই পালিয়ে কেদারপুর চলে যায়। ডিঙ্গামানিক থেকে চার মাইল উত্তরে।

পরদিন কেদারপুরে ঘটে আরো মর্মন্তুদ ঘটনা। সোনালী যে গ্রামের বিপ্লব নামক এক ছেলের সহায়তায় অনেক পথ হেঁটে ঢাকাগামী লঞ্চে চড়ে পালিয়ে গেলো, রক্ষীবাহিনী এসে সেই বিপ্লবকে প্রথম খুব মারধর করলো। বিপ্লবের নাম তারা কিভাবে জানল তা অবশ্য জানি না। যাহোক, খুব মেরে বিপ্লবের মা ও বাবাকে ডাকিয়ে আনলো। তারপর বিপ্লবকে বললো 'কলেমা পড়।' বাধ্য হয়ে বিপ্লব হিন্দু হয়েও কলেমা পড়লো। এরপর বললো, 'সেজদা দাও পশ্চিমমুখী হয়ে।' ভয়ে বিপ্লব তাই করলো। যখন সেজদা দিলো, পেছন থেকে তারা বেয়োনেট চার্জ করে বাবা-মা ও অনেক লোকের সামনে হত্যা করলো তাকে। বেয়োনেট চার্জ করার সময় রক্ষীদের একজন বললো 'মুসলমান হয়েছো, এবার বেহেস্তে চলে যাও।'

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হবার পর আমাদের অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেন আওয়ামী লীগের স্টুয়ার্ড মুজিব ও সিরাজ সরদার। তাদের সঙ্গে আমাদের একটা সমঝোতা হয়েছিলো। অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য ছিলো। আমি তাদের খোলাখুলিই বলেছি যে, ভারতের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া যেতে পারে, কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের সমস্ত ভার ভারতের ওপর ছেড়ে দিলে সেই স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ হবে না এবং জনগণতান্ত্রিক পূর্ব

www.pathagar.com

বাংলাও কায়েম হবে না, এর জন্য আবার লড়াই করতে হবে। স্টুয়ার্ড মুজিব ও সিরাজ সরদার আমার কথায় প্রভাবিত হলেও দলীয় সিদ্ধান্তের কারণে আওয়ামী লীগের নীতিই অনুসরণ করতে থাকেন। তারা অবশ্য আমাকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে। তাদের ক্যাম্পে যেতাম আমি এবং রাজনৈতিক আলোচনা করতাম। এক সময় স্টুয়ার্ড মুজিব ভারতে চলে গেলেন। সিরাজ সরদার ভারতে যেতে অস্বীকার করলেন। যাহোক, বহু বামপন্থী ছেলে তাদের অধীনে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে এলে তাদের সঙ্গে আমাদের গ্রুপের ছেলেদের একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠলো। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে ৮০ জন ছেলে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে যাবার সময় ফরিদপুর ও চাঁদপুরের মিলনস্থলের কাছে এক জায়গায় মুসলিম লীগারদের হাতে আটকা পড়েছিলো। আমরা খবর পেয়ে আমাদের বাহিনী দিয়ে তাদের উদ্ধার করে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে দিয়েছিলাম। কারণ আমরা মনে করতাম পথ ভিন্ন হলেও মুক্তিযোদ্ধারা দেশপ্রেমিক। এলাকায় আমাদের প্রাধান্যের খবর শুনে কলকাতায়ও আওয়ামী লীগের একাংশ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। এর আগে আমাকে নির্মূল করার জন্য কলকাতা থেকে একটি চিঠি এসেছিলো। তাজউদ্দিন স্বাক্ষরিত ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে প্রেরিত সেই চিঠিতে লেখা ছিলো, 'এরেস্ট শান্তি, এন্ড কিল হিম।' স্বাধীনতার পর তাজউদ্দিন অবশ্য বলেছিলেন, সে চিঠি তিনি পাঠাননি। এটি ভুয়া ছিলো।

যাহোক, আমাদের অঞ্চলে আমাদের দল এবং মুক্তিবাহিনীর ভেতরে বামপন্থীদের প্রাধান্য নির্মূল করার জন্য তখন পদক্ষেপ নেয় সরকার। কর্নেল (অব.) শওকত আলীর প্রভাবিত দল এ কাজের ভার নেয়। অঞ্চলের ২১ জন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তখনো আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো।

বর্ষাকালে ২১ জন মুক্তিযোদ্ধা ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এলে শওকত আলীর বাহিনী তাদের নদীতে হত্যা করে। হিরু ও কাঞ্চনসহ ২১ জনের সেই ব্যাচটি ছিলো বামপন্থী চিন্তার অনুসারী। এ সময় আঘাত এলো সিরাজ সরদারের ওপর। তিনি পালিয়ে গিয়ে সিরাজ সিকদারের বাহিনীতে আশ্রয় নিলেন। আমার সঙ্গে একদিন দেখা করলেন সিরাজ সরদার। তাকে বললাম, আপনি পপুলার লোক, নিজের এলাকায় চলে যান। জনগণই আপনাকে রক্ষা করবে। এভাবে বাঁচতে পারবেন না। তিনি ভরসা পেলেন না। সিরাজ সিকদার তাকে চারজন গার্ড দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। একদিন শওকত আলীর বাহিনী বিনোদপুর গ্রামে শরিয়তপুরের এক বৈঠকের নাম করে তাকে নিয়ে এলো। এরপর ঘেরাও করে প্রথমে তারা সিরাজ সিকদারের দেয়া চারজন গার্ডকে হত্যা করলো এবং সিরাজ সরদারের হাতের কবজি কাটলো, তারপর পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গ কেটে এবং শরীরের মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ফেলে দিলো। এই নৃশংসতার নেতৃত্ব দিয়েছে ইদ্রিস নামক আওয়ামী লীগের গুণ্ডা, যার সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধ ছিলো সিরাজ সরদারের পরে ইদ্রিস একইভাবে নিহত হয়েছে।

অবস্থা বুঝতে পেরে আমি একদিন সিরাজ সিকদারের সঙ্গে দেখা করে বললাম, বামপন্থীদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, আসুন ফ্রন্ট করি। কিন্তু সিরাজ সিকদার তাতে রাজি হয়নি, বরং আমাদের এলাকা থেকে তার বাহিনী প্রত্যাহার করে বরিশাল নিয়ে গেছেন।

ফাঁদে ফেলে আমাকেও একবার গ্রেফতার করেছিলো হত্যা করার জন্য। তখন অক্টোবর মাস। আগে থেকে তারা আমাকে খুঁজছিলো। আমার নিজস্ব এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা

www.pathagar.com

কমান্ডার মান্নান ছিলো আমার ছেলে চঞ্চল সেনের বন্ধু। একদিন আমি তাকে চিঠি লিখে জানালাম যে, আমরা এই মুহূর্তে কেউ কারো শত্রু নই বরং পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের উভয়ের শত্রু। আমাকে শত্রু মনে করা ঠিক হচ্ছে না। এ বিষয়ে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি তারিখ ও স্থানের কথা জানিয়ে দিলাম। তারা আমার দেয়া তারিখের একদিন পর আলোচনায় বসতে রাজি হয়ে চিঠি দিলো। আসলে তারা আমার অবস্থান জেনে নিয়েছিলো কৌশলে। নির্ধারিত দিন বহুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কয়েকজন কর্মীসহ আমাকে ঘেরাও করলো। আমার কর্মীরা যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে আমি বাধা দিলাম। এ ধরনের রক্ত ক্ষয়ের পক্ষপাতী ছিলাম না আমি। সবাইকে নিয়ে সারেন্ডার করলাম। আমাদের নিয়ে কি করা হবে এ নিয়ে মতভেদ দেখা গেলো। বাংলাদেশ সরকারের পরিষ্কার নির্দেশ আমাকে হত্যা করার। অঞ্চলের প্রায় সব মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মিলে পরামর্শ করলেন। বেশির ভাগ মতামত দিলেন ছেড়ে দিতে। এদিকে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। আমাকে হত্যার নির্দেশ তারা পালন করবে না বলেও কেউ কেউ প্রকাশ্যে জানিয়ে ছিলেন। কমান্ডাররা বিশেষ করে তাদের বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবার ভয়েই আমাদের ছেড়ে দিলেন। সাথে সাথে ক্ষমাও চাইলেন। বস্তুত জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আমার জনপ্রিয়তাই সেদিন আমাকে রক্ষা করলো।

আমার ছেলে চঞ্চল সেন মুজিববাদীদের বিরাগের কারণ হয়েছিলো অন্য আরো একটি কারণে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে খুলনায় যখন বিহারি নিধন চলছিলো তখন দুই লঞ্চ ভর্তি অবাঙালী নারী ও শিশু পালিয়ে ঢাকা আসছিলা টেকেরহাটের কাছে। মুক্তিবাহিনীর হাতে একটি লঞ্চ আক্রান্ত হলে অন্যটি পালিয়ে ফরিদপুরের এক চরে চলে আসে। সারেং বিহারিদের চরে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। এরা নদীর পাড় ধরে আমাদের এলাকা অতিক্রমের সময় লুটপাট বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। চঞ্চল তখন সেখান থেকে ৩০ জন নারী-শিশুকে উদ্ধার করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। শওকত বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা তখন আমাদের বাড়িতে এসে দাবি করলো যে আশ্রয়দাতাদেরই এই অবাঙালিদের হত্যা করতে হবে। চঞ্চল তখন তা করতে অস্বীকার করলে মুক্তিযোদ্ধারা স্টেনগান নিয়ে ঘরে ঢুকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু অসহায় নারী-শিশুর করুণ অবস্থা দেখে তাদের মায়া হয় এবং হত্যা না করেই চলে যায়। কিন্তু চঞ্চলকে অভিযুক্ত করা হয় অবাঙালি আশ্রয় দানের জন্য। এই ঘটনা কলকাতা পর্যন্ত গড়িয়েছে।

১৯৭২ সালের শেষের দিকে রক্ষীবাহিনী আমাদের এলাকায় আশা শুরু করলো। প্রথমে তারা কার্যক্রমের ক্যাম্প করলো গোসাইরহাট, ভেদরগঞ্জ, ঘড়িসার, নড়িয়া, পালং প্রভৃতি জায়গায়। প্রথম আক্রমণের শিকার হলো নড়িয়া থানার মতিয়ুর রহমান। তার বাড়ি থানার কাছেই ছিলো। মতিয়ুর রহমানকে ধরা হয়েছিলো ঢাকায়, পালিয়ে ছিলো। বাড়িতে তাকে না পেয়ে রক্ষীবাহিনী তার বাবা-মা ও ভাবীকে অনেক মারধর করেছে এবং তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। মতিয়ুরের ভাবীর ওপর পাশবিক অত্যাচার হয়েছিলো বলেও আমরা শুনেছি। এরপর শুরু হলো সারা এলাকায় আক্রমণ। আমাদের গ্রামের নাম রামভদুপুর।

আমাকে ধরেছিলো যুবলীগের লোকেরা। ১৯৭৩ সালের ২৩ মার্চ, খুব সকালে আমি সাংবাদিক ও অন্যান্য কর্মী সৈয়দ জাফরের মোহাম্মদপুরের বাসা থেকে ধানমণ্ডি যাচ্ছিলাম। গ্রাফিক আর্টস কলেজের কাছে আসার পর যুবলীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট লুৎফর রহমান আমার রিকশা আটকালো। সে আমার এলাকার ছেলে, চিনতো আমাকে। তার বড় ভাই ও

www.pathagar.com

আমি এক সঙ্গে পড়তাম। তার সঙ্গে চন্দন নামের আরো একজন ছিলো। আমাকে দেখে তারা যখন রিকশা থামালো তখনই বুঝলাম ধরতে আসছে। ওরা প্রথমেই আমার এ্যাটাচি কেসটা ছিনিয়ে নিলো। আমি চেঁচামেচি শুরু করলাম যাতে লোক জড়ো হয়, কারণ ধরে নিয়ে গেলে আমার পরিণাম কি হবে তা জানতাম। আমার চিৎকারে লোকজন আসতে লাগলো। লুৎফর তখন লোকজনকে বললো, এ লোক নকশাল, একে আমাদের অফিসে নিয়ে যাচ্ছি। আমিও বেগতিক দেখে আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, আমি যদি অপরাধীই হই তাহলে যুবলীগের অফিসে কেন যাব, থানায় যেতে দিন। কিন্তু লুৎফর বলতে থাকলো যে অফিসেই যেতে হবে। সে যখন অফিসে নেবার জন্য জোর খাটাতে গেলো তখন চারদিকের লোকজনও বাধা দিয়ে বললো, অফিসে নিতে পারবেন না, থানায় নিয়ে যেতে দিন। তখন আমার মায়ের ঘটনা বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো বলে অনেকেই যুবলীগারদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলো। তাই তারা প্রাণপণে বাধা দিতে লাগলো। আমি তখন উপস্থিত জনতাকে আবার বললাম, আমাকে অফিসে নিয়ে যেতে পারলে ওরা হত্যা করবে। আপনারা অনুগ্রহ করে থানায় নিয়ে চলেন। আমি কোনো অপরাধী হলে কোর্ট বিচার করবে। এভাবে বাদানুবাদ করতে করতে বেলা ৯টা বেজে গেলো। এর মধ্যে ৫০/৬০ জন যুব লীগার এসে জমা হয়েছে। তারা সম্মিলিতভাবে আবার যখন আমাকে নেবার জন্য জোর খাটাতে গেলো তখন লোকজনও তাদের ওপর মারমুখী হয়ে উঠলো। প্রায় হাজারখানেক লোক জমা হয়ে গেছে তখন। তাদের সামনেই যখন আমাকে যুবলীগাররা পেটাতে শুরু করলো তখন মারামারি বেধে গেলো। আমার হয়ে তাদের সঙ্গে কিছু লোক মারামারি করতে লাগলো, তাদের মধ্যে অনেকেই কলেজের ছাত্র। এ সময় গ্রাফিকস কলেজের প্রিন্সিপাল এলেন। আমি তাকে বললাম, স্যার আপনি আমাকে পুলিশে দিয়ে দেন, এদের হাতে দেবেন না। তিনি বেশ কিছু ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে কলেজের ভেতরে নিয়ে একটি কক্ষে রাখলেন। তিনি থানায় যাওয়ার প্রস্তুতি নেবার সময়ই ৫০/৬০ জন যুবলীগার কক্ষের তালা ভেঙে আবার আমাকে গেটের দিকে নিয়ে এলো। তারা কলেজের মাইক্রোবাসে উঠালো আমাকে। কিন্তু ড্রাইভার চাবি নিয়ে পালিয়ে গেলো। জড়ো হওয়া লোকজন ও ছাত্রদের সঙ্গে আবার মারামারি বেধে গেলো। এ সময় রক্ষীবাহিনীর ৬টি ট্রাক ও ২টি জিপ এলো। দুপুর ১২টা তখন। চারদিকে ঘেরাও করে আমাকে ধরে নিয়ে গেলো তারা শেরেবাংলা নগরে। একজন অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন অনেক কিছু। আমি কিছুই জানি না বলে জানালাম, তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি কেন? উত্তর দিলাম যে, ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। নড়িয়ার শাহজাহানকে তখন হত্যা করা হয়েছে। যাকে পাচ্ছে ধরছে, অত্যাচার করছে। এসব কথা কৌশলে বললাম। এই অফিসারটি আমার সঙ্গে মোটামুটি ভালো ব্যবহারই করলেন। সেখান থেকে আমাকে পাঠানো হলো পিলখানার রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে। শুরু হলো আমার ওপর পাশবিক নির্যাতন। সেখানকার লিডার যিনি বরিশালের এক স্কুল মাস্টারের ছেলে তিনি আমাকে অবর্ণনীয় নির্যাতন শুরু করলেন। বিকেল হয়ে গেছে তখন। সারাদিন কিছু খাইনি। প্রথমে হাত-পা বাঁধল। তারপর শুরু করল মার। কি নির্মম নিষ্ঠুর সে মার। বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলো— বাবা কোথায়, অস্ত্র কোথায়? আমি শুধু এক কথাই বললাম, জানি না। এক দফা মেরে চোখ বেঁধে নিয়ে চলল আমাকে। ধাক্কা দিয়ে একটা দেয়ালের উপর তুলল। ভাবলাম, গুলি করে মারার জন্য হয়তো তুলেছে। চোখের বাঁধন খুলে ফেললাম। শেষবারের মতো দেখতে চাইলাম পৃথিবীটাকে। কিন্তু গুলি করলো

www.pathagar.com

না। লাথি দিয়ে ফেলে দিল দেয়ালের অপর পাড়ে, যেখানে অনবরত প্রহার করা হয় বন্দিদের। আবার শুরু হলো মার। শুধু জাঙ্গিয়া রেখে কাপড়-চোপড় সব খুলে অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মারধর করলো। রাত ৯টা পর্যন্ত এভাবে পড়ে রইলাম। ৯টার পর পালাক্রমে কয়েকজন মারতে শুরু করল, লাথি, কিল, ঘুষি, লাঠির আঘাত, সবই চলল সমানে। রাত একটা পর্যন্ত সহ্য করতে পারলাম। আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। সকাল ৯টা পর্যন্ত পড়ে রইলাম বাথরুমে। প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলেছিলাম, কিন্তু দেয়নি তারা। ৯টার পর আবার রক্ষী লিডার এসে সেপাইদের জিজ্ঞেস করল আমাকে আচ্ছামতো পেটানো হয়েছে কি না। আমার ফোলা শরীর ও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হলো সে। এক কাপ চা ও একটা পুরি দিতে নির্দেশ দিল। গরম চা গলায় ঢালার পর বুঝলাম এতে কিছু একটা মেশানো হয়েছে। সমস্ত মুখ, গলা ও বুক যেন পুড়ে যাচ্ছিল। ঘা হয়ে গেল মুখে। দ্বিতীয় দিনে পাজামাটা পরতে দিল। শরীর তখন ফুলতে লাগলো। সেদিন এরপরও কয়েক দফা প্রহার করলো একই কায়দায়। তৃতীয় দিন সকাল বেলা দেখলাম আঙ্গুলগুলো এমন ফুলেছে যে, ফাঁক করলেও লেগে থাকে। রশি ঢুকে যাচ্ছে মাংসের ভেতর। রক্ষীবাহিনীর একজন সদস্য আমার মা অরুণা সেনের বিবৃতি পড়ে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ল। তাকে বললাম, ভাই বাঁধনটা যদি একটু ঢিলে না করেন তাহলে হয়তো চিরকালের জন্য হাত দুটো নষ্ট হয়ে যাবে। সে সামান্য ঢিলে করে দিয়ে বলল, লিডার আসার আগে আবার টাইট করে দেব। আপনি নিশ্চিত থাকেন, লিডার ছাড়া আপনাকে আর কেউ মারবে না। এরপর লিডার ছাড়া অন্য কেউ আর মারেনি। চতুর্থ দিন সকালে লিডার এলো। দেখলাম একটু মোলায়েম ব্যবহার করছে। পঞ্চম দিনে বাঁধন খুলে ও পাঞ্জাবি পরিয়ে আমাকে অফিসে নিয়ে গেলো। আফটার শেভ লোশন দিয়ে রক্তাক্ত জায়গাগুলো মুছে দিলো। লিডার বললো, কেন এতো কষ্ট করছেন, যা জানতে চাই বলে দিন। যা চাইবেন তাই দেবো। উত্তরে বললাম, এসব ফালতু কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না। আমি কিছুই জানি না।

'সকাল এগারোটায় আমাকে পাঠিয়ে দিলো স্পেশাল ব্রাঞ্চে। ডিএসবি নুর মোহাম্মদ আমার অবস্থা দেখে রক্ষীবাহিনীর লিডারকে তিরস্কার করে বললেন, 'আপনারা এভাবে মারলে কিভাবে চলবে? লোকটা যদি মরে যেতো?' আমি তখন পাশের রুমে তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। লিডার ডিএসবি-কে বার বার অনুরোধ করছিলো, 'স্যার ও-র কাছে আমার নামটা বলবেন না। ডিএসবি অবশ্য কায়দা করে তার সামনেই আমাকে তার নাম বলে দিলেন। আমি অবশ্য আগেই জানতাম। এসবিতে গল্প-গুজবের স্টাইলে কিছু প্রশ্ন করে আমাকে পাঠিয়ে দিল মোহাম্মদপুর থানায়। সেখান থেকে কোর্টে পাঠালো। ব্যাকডেটে ওকালতনামায় স্বাক্ষর নিল। প্রথমে ব্যাকডেটে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছিলাম। পরে এডভোকেটদের কেউ কেউ বললেন, অস্বীকার করে লাভ নেই, যা তারা চায় তা করবেনই। স্বাক্ষর না করলেও কিছু হবে না। সেদিন ছিলো ২৮ মার্চ। ওকালতনামায় লেখা ছিলো সেদিনই আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং কোর্টে হাজির করেছে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলাম সই করতে। তারপর পাঠালো জেলে। মুক্তি পেলাম ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসের শেষের দিকে।

'আমার সঙ্গে যে ৪০ জনের মতো জেলে রাজনীতি করতো তারা সবাই ছিলো ব্রিলিয়ান্ট, ফার্স্ট ক্লাস পাবার মতো ছেলে। শুধু বেঁচে আছি আমি ও আরেকজন। বাকি

www.pathagar.com

সবাই রক্ষীবাহিনী, মুজিববাহিনী ও মুজিবের অন্যান্য বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে গৌতম দত্তকে গ্রেফতার করা হয় ঢাকায় এবং হত্যা করা হয় টিকাটুলিতে, তার নিজের বাড়িতে নিয়ে। সময় হবে পঁচাত্তরের জুন-জুলাই। আমি তখন জেলে। রশিদকে হত্যা করে রায়ভদ্রপুরে নিয়ে গিয়ে। সেও ঢাকায় ধরা পড়েছিলো। ডামুড্যার আতিক হাওলাদার, ধনুই গ্রামের মোতালেব এদেরকেও তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সামনে হত্যা করেছে। পঁচাত্তরের প্রথম দিকে মোহর আলীকে ধরেছিলো পুলিশ। শিবচর থেকে মুজিব বাহিনীর লোকেরা পুলিশের কাছ থেকে তাকে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ডামুড্যার তৎকালীন মুজিব বাহিনী প্রধানের নেতৃত্বে তাকে তার শরীরের চামড়া খুলে লবণ মাখিয়ে হত্যা করা হয় এবং তার লাশ ডামুড্যা বাজারে টানিয়ে রাখা হয় কয়েকদিন। অনেক পরে অবশ্য সেই মুজিব বাহিনী প্রধানও নিহত হয়েছিলো কোনো এক গোপন পার্টির হাতে। এরপর মাদারীপুর শহর থেকে রোকনকে ধরে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।'

দেখা গেছে যারা ঢাকায় ধরা পড়েছে তাদেরও হত্যা করা হয়েছে নিজ গ্রামে এনে, বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের সামনে। এর উদ্দেশ্য ছিলো আতঙ্ক সৃষ্টি করা, যাতে মুজিব সরকারের বিরোধিতার সাহস কেউ না পায়।

সৈয়দ জাফর

চঞ্চল সেন গ্রেপ্তার হওয়ার আগে সৈয়দ জাফরের মোহাম্মদপুর বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। শুধু তিনিই নন তাঁর মত আরও অনেক ভারত বিরোধী বামপন্থী নেতা রাজধানীর ঢাকার বিভিন্ন বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই আশ্রয়ের কারণ খুঁজতে গিয়ে আমি (লেখক) ১৫ জানুয়ারি ২০০২ ইং সৈয়দ জাফরের সাথে আলাপ করি।

সেই সময়ের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যেভাবে দেখতাম স্বাধীনতার পরবর্তী সরকারের শাসন জনগণের সেই স্বাধীনতার প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। পাকিস্তান আমলে ইপিসিপি (এমএল) এর একজন কর্মী হিসাবে পার্টির অন্য সকলের মত আমিও আওয়ামী লীগের চরিত্র সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতাম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আমার কাছে তা সঠিক বলে প্রতিভাত হয়েছে। আমরা আওয়ামী লীগকে সব সময় প্রগতি বিরোধী সম্প্রসারণবাদ তথা ভারতের শাসকশ্রেণীর হুকুম বরদার হিসেবে মনে করতাম। স্বাধীনতার পূর্বে আমরা মনে করতাম প্রগতিশীলদের সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর শক্তি হচ্ছে আওয়ামী লীগ।

স্বাধীনতা পরবর্তী কালে দেশবাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। ৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে জামায়াত অথবা মুসলিম লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের রক্ষা করেছিল অথবা আশ্রয় দিয়েছিল। এর বিপরীতে বামপন্থী প্রগতিশীলদের নিশ্চিহ্ন করার কর্মসূচী দেশব্যাপী পরিচালনা করেছে। এই কর্মসূচীর অংশ হিসেবে খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, ফরিদপুর, বরিশালসহ সারাদেশের শহরবন্দর গ্রামের বামপন্থীদের খুঁজে খুঁজে বের করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। শুধু তাই নয় স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে ভারত থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সদস্য বাংলাদেশে প্রবেশ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে হত্যায় লিপ্ত হয়। তার একটি অন্যতম বড় প্রমাণ ডুমুরীয়ার আমার বন্ধু শহীদ এ্যাডভোকেট আবদুর রউফ।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ইপিসিপি এর একজন কর্মী থাকার কারণে বিভিন্ন এলাকার

www.pathagar.com

আওয়ামীলীগের এই নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষার জন্য অনেককে ঢাকা শহরে নিয়ে আসি এবং আমার বাসাসহ অনেক বাসায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করি। তাদের মধ্যে যশোর, খুলনা, ফরিদপুরের কেউ কেউ আমার বাসায় অবস্থান করেন। তখন ঢাকা শহরের বিভিন্ন বাসা (ডুমুরীয়ার আবদুর মজিদ পরবর্তীতে বাজারে নিহত হন।) যশোরের মিজান, চঞ্চলা সেন, রীনা, রেহানা, অরুনাসেন আমার বাসায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা মোস্তফা মজিদের বাসাসহ জনতা ব্যাংক, এজি অফিস, হাইকোর্টের কর্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটের একজন কর্মকর্তার বাসায় অনেকে অবস্থান করেন। সেসময় বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বামপন্থী নেতা এবং কর্মীদের আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে জনাব বদরুদ্দিন ওমর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মরহুম আমানুল্লাহও ভূমিকা রাখেন।

স্বভাবতইঃ প্রশ্ন দেখা দিবে এইসব বামপন্থী নেতা কর্মীরা কেন গ্রাম ছেড়ে বাইরে আশ্রয় বা অবস্থান নিতে এসেছিলেন। আসলে সে সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে বলতে হয়, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আওয়ামী লীগকে শুধুমাত্র ক্ষমতায় বসিয়ে ক্ষ্যান্ত হয়নি; ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন তাদের ক্রীড়ানক সরকার প্রতিটি গ্রামে এবং শহরে তাদের বাহিনী দ্বারা হত্যার নামে বামপন্থীদের নির্বিচারে নিধন শুরু করে। যশোর, খুলনা, পাবনা, কুষ্টিয়া ফরিদপুর, বরিশাল প্রতিটি জেলার বিভিন্ন এলাকায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়া হয়েছিল বামপন্থীদের নিধন করার মাধ্যমে। শুধুমাত্র তখনকার যুবলীগ ছাত্রলীগ এবং আওয়ামীলীগের অন্যান্য বাহিনী এই হত্যাযজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় কুখ্যাত রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় উপদেষ্টাবৃন্দ এতে এ ভূমিকা রাখেন। এহেন পরিস্থিতিতে একটি দেশের সমগ্র রাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী দেশের বিশাল সহযোগীতা বামপন্থীদের তখন নিজ নিজ এলাকায় থাকা অসম্ভব করে তুলে। এ কারণেই ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদের অনেক বন্ধুদের সরে যেতে বাধ্য করা হয়।"

আওয়ামী লীগ আমলের রাজনৈতিক সন্ত্রাস সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ ও মারাত্মক ছিলো যশোরের কালিগঞ্জে। আওয়ামী লীগের পতনের পর এখানে একটি গণকবর আবিষ্কৃত হয় যেখানে প্রচুর কঙ্কাল ও মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিলো। এখানে ব্যাপক সন্ত্রাস হয়েছে বিশেষ করে ই. পি. সি. পি. এম. এল. নামক গোপন সংগঠনের নেতা, কর্মী, সমর্থক ও সহানুভূতিশীল ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের ওপর। ব্যক্তিগত শত্রুতার জের হিসেবেও অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে মুজিববাদীদের হাতে।

কালিগঞ্জের নিহত প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ওয়াজেদ আলীর ছোট ভাই মনিরুল হক বলেন, কালিগঞ্জে রক্ষীবাহিনী এসেছে ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে। বামপন্থী নিধনে রক্ষীবাহিনীর সহযোগী হয়ে কাজ করেছে স্থানীয় মুজিববাদীরা। এদের প্রধান কয়েকজনের নাম হচ্ছে রওশন, সামসুল, এমরান ও হামিদ। এক সময় এরা ছাত্র ইউনিয়ন করতো। ছাত্রজীবনে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকায় আমাদের অনেক খবরই তারা জানতো। পাকিস্তান আমলে এদের কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে নদী সিকস্তির জমি দখল আন্দোলনেও জড়িত ছিলো। পরে তারা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য মুজিববাদী হয়ে পড়ে। তারা একটি নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনীও গড়ে তোলে। নলডাঙ্গার গোপাল ছিলো রক্ষীবাহিনীর ইনফরমার। গোপাল রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেয় কানাই, কাসিম ও হাকিমকে। রক্ষীবাহিনী এদের ওপর নারকীয় অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করে। যশোর রোডের সাতমাইল

www.pathagar.com

নামক স্থানে তাদের লাশ পাওয়া যায়। হাকিমকে এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছিলো, জীবন বাঁচাবার জন্য সে বলেছিলো যে তার কাছে অস্ত্র আছে। আসলে তার কাছে কোনো অস্ত্র ছিলো না। যখন সে অস্ত্র দিতে পারলো না, তার মা-বাবার সামনে তাকে গুলি করে হত্যা করলো। তার বাবার নাম ইয়াকুব মণ্ডল, বাড়ি কাজিরপুর। তাকে হত্যা করা হয় ১৯৭৩ সালের শেষ ভাগে।

১৯৭৩ সালের ১১ অক্টোবর রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন ওয়াজেদ আলী ও কামরুজ্জামান। হেমন্ত সরকারও তাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি পালাতে পেরেছিলেন। ধরা পড়ার পর তাদের খোঁজ বা লাশ কিছুই পাওয়া যায়নি। সম্ভবত ঢাকায় নিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছে।

কালিগঞ্জ থেকে সাত মাইল দূরে কালাবাজারের কাছে রক্ষীবাহিনীর যে ক্যাম্প ছিলো সেখানে শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছে। বহু ছেলেকে ধরে এনে এখানে হত্যা করা হয়েছে। বামপন্থীদের হত্যা করার জন্য রক্ষীবাহিনী এখানে চাতুরীর আশ্রয় নিতো। তারা লোক মারফত বামপন্থী ছেলেদের বল খেলার জন্য আহ্বান জানাতো। খেলা শেষে চায়ের নিমন্ত্রণ করতো। এরপর চোখ বেঁধে নিয়ে যেতো বধ্যভূমিতে। হত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে রাখতো। আব্দুর রহমান ও ওয়াজেদকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর আহ্বানে যারা সারেন্ডার করেছে তাদেরও রেহাই দিলো না। কামাবাইলের গহর মালেক আত্মসমর্পণ করার পরও তাকে রক্ষীবাহিনী হত্যা করেছে। একইভাবে হত্যা করে ঝিনাইদার রেইনেবুর ওয়ালিউর রহমানকে। কোটচাঁদপুরের রুদ্রপুর এলাকার বঙ্কিয়া গ্রামের মহিউদ্দিন, তার বোন রাশিদা ও দীপুকে পিটাতে পিটাতে হত্যা করেছে। রাশিদা ছিলেন পাঁচ মাসের গর্ভবতী। তার স্বামী আমজাদকেও পরে হত্যা করেছে। চুয়াত্তরের প্রথমদিকে আমজাদকে হত্যা করে রক্ষীবাহিনী ও যুবলীগ কর্মীরা। এছাড়া এ মুহূর্তে নিহত আর যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হচ্ছে গহর আলী, রফিকুল ইসলাম, হাসান আলী, নূর মোহাম্মদ প্রমুখ।

অত্যাচারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে মনিরুল হক বলেন, বাড়ি ঘেরাও করে লোকজনকে ধরে বেদম পেটানো হতো। হাতে কাঁটা ফোটানো, পায়ে পেরেক ঢোকানো ছিলো অত্যাচারের একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি। প্রফেসর আফসার উদ্দিন, শহীদুল ইসলাম—এদের অকথ্য অত্যাচার করে রাস্তার পাশে উপরের দিকে পা বেঁধে নাকে গরম পানি ঢেলেছে। কমিউনিস্ট পার্টির লোকজনকে যারা আশ্রয় দিয়েছে বলে সন্দেহ করা হতো তাদের ওপরে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাতো।

১৯৭২ থেকে ৭৫-এর রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষ ব্যক্তিত্ব শেখ মুজিবুর রহমান প্রকাশ্য জনসভায় বিরোধী দলের উদ্দেশে লালঘোড়া দাবড়িয়ে দেবার হুমকি দিয়েছিলেন। এই লালঘোড়া বলতে তিনি আসলে একদলীয় বাকশালী ব্যবস্থার প্রসঙ্গই উল্লেখ করেছিলেন। ভারত-সোভিয়েত আঁতাতের মধ্য দিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে যে জঞ্জালের জন্ম হয়েছিলো তার অন্যতম লীলাক্ষেত্র হিসাবে বাংলাদেশকে নির্ধারণ করা হয়েছিলো। ভারতে এই লালঘোড়ার পরীক্ষাটা সঠিকভাবে করা যায়নি বিধায় বাংলাদেশে শিখণ্ডি সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে পরীক্ষা চালানো হচ্ছিলো তাতে সৈন্যসামন্ত হিসাবে কাজ করছিলো আমাদের আলোচ্য সোনার ছেলেরা। সরকার বিরোধীদের রাজাকার অথবা সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিলো ঐ দিনগুলোতে।

www.pathagar.com

তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি কর্মী এবং বর্তমানে ওয়ার্কার্স পার্টি নেতা আবদুস সালাম বলেন রক্ষীবাহিনী ছিলো তখন মূর্তিমান সন্ত্রাস। কালিগঞ্জ, বাগারপাড়া, হরিণাকুণ্ড, ঝিনেদা প্রভৃতি এলাকায় তারা হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগ কোনো কিছুই বাদ রাখেনি। আমার বলরামপুরের বাড়ি বার বার পুড়িয়ে দেয়ায় নতুন করে আর কোনো ঘরই তুলিনি। পঁচাত্তরের পর নতুন করে বাড়ি করেছি। রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাদীরা তখন দারুণ বিভীষিকাময় অস্তিত্ব। আমাদের অনেক কর্মী ঘুমের মধ্যেও আতঙ্কে লাফিয়ে উঠতো রক্ষীবাহিনীর নামে। আওয়ামী লীগের পতনের সংবাদ শোনার পর এই এলাকার ভিক্ষুকরা পর্যন্ত যারা রাজনীতির কিছুই বোঝে না তার ছেঁড়া কাপড় হাতে তুলে আল্লাহর কাছে শোকরগুজারি করেছে। তেলকুপির এক দিনমজুর শেখ মুজিবের পতনের সংবাদ শোনার সাথে সাথে শয্যা থেকে উল্লাসে উঠে এমনভাবে লাফাতে শুরু করেছিলো যে, তার পরনের কাপড় খুলে পড়ার পরও হুঁশ হয়নি। উলঙ্গ হয়ে উল্লাস প্রকাশ করছিলো সে।

রক্ষীবাহিনী আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ মুখার্জিসহ আমার অন্য দুই ভাই ও আমাকে ধরে নিয়ে গেলো কালিগঞ্জ ক্যাম্পে। আমরা নাকি নক্সালদের খেতে-পরতে দেই, এই তাদের অভিযোগ। ক্যাম্পে দেখলাম আরো ২৫ জনের মতো লোক। তাদের দিকে চাওয়া যায় না। মার খেয়ে ঢুলছে তারা। আমাদের প্রথমে নিয়েই হাত-পা বেঁধে বেদম পেটাতে শুরু করলো। অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত চললো পেটানো। দিনটি ছিলো শনিবার। ধরার ২৪ ঘণ্টা পর একটা করে রুটি দিলো। পানি চাইলে বললো, মুত (প্রস্রাব) খা। আর সেকি গালি। বাপের জনমেও এমন বিশ্রী গালি শুনিনি। কথায় কথায় কুত্তার বাচ্চা, খানকির পুত—এসব। পায়খানা করতে হতো সেখানেই। যখন খুশি এসে বেদম পেটায়। রোববার দিন সকালে বললো 'এই কুত্তার বাচ্চারা ঠিকঠিক মতো বসে থাকবি। আজকে তোদের বাপ আসবে দেখতে।' কতক্ষণ পর দেখলাম একজন ডেপুটি লিডার আসছে। সে ধনু বারিকে অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত পেটালো তারপর সবাইকে একটা করে পিটুনি দিয়ে চলে গেলো।

পরদিন বললো, 'সবাই শুয়ে পড়ে। আজ তোদের বড় বাপ আসবে।' সন্ধ্যার দিকে সেই বড় বাপ এলো। ঢাকা থেকে এসেছেন তিনি। কোনো ডিরেক্টর-ফিরেক্টর হবে। সে অবশ্য ভালো ব্যবহারই করলো, এমনকি আপনি করে সম্বোধন করলো। এ কয়দিন শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয় গেছিলাম। বড় বাপ জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের ছেড়ে দিলে নক্সাল ধরার কাজে সহযোগিতা করবে?' জানের ভয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, করবো।' কিসের নক্সাল কিসের কি? কোনো মতে রাজি হয়ে জান নিয়ে বের হয়ে এলাম। এখনো সে মারের প্রতিক্রিয়া টের পাই শরীরে। আসলে যে রক্ষীবাহিনীর মার না খেয়েছে সে মায়ের পেটেই আছে।

রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত ওয়াজেদ আলীর পিতা আলহাজ দলিল উদ্দিন বললেন, অন্যদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে সে তুলনায় আমার ওপর কিছুই হয়নি। গালাগালি করেছে, বিদ্রূপ করেছে, আমার পবিত্র দাড়ি নিয়েও ব্যঙ্গ করেছে। আমাদের এই পাইকপাড়ার ওপর দিয়ে অনেক ঝড় গেছে। আমার ছেলেদের বারবার ধরে নিয়ে গেছে, তারা খেতে দেয়নি, আমরা খাবার নিয়ে গেলে বলতো, দরকার নেই, তারাই দেবে। কিন্তু খেতে দেয়নি। বলেন, এই দুঃখ কি সহ্য করা যায়? জয়নগরের মাঠ থেকে ধরে নিয়ে গেলো আমার ছেলেকে। আর ফিরে এলো না।

কালিগঞ্জের পাইকপাড়ার শাখাওয়াত হোসেন বললেন, গ্রামে কার্ফু দিয়ে লোকজনদের

www.pathagar.com

ধরে পেটাতো রক্ষীবাহিনী। আবদুল আজিজের স্ত্রীকে এতো বেশি মারতে শুরু করে যে সহ্য করতে না পেরে সে পরনের কাপড় ফেলে উলঙ্গ হয়ে দৌড়াতে শুরু করে। আমার চাচাতো ভাই মান্নান মুসল্লী মানুষ। হাতে কোরান শরীফ নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। রক্ষীরা তাকে এমন জোরে দাবড়ায় যে, কোরান শরীফ ফেলে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে কয়েক মাইল দৌড়ে এক গ্রামে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। রক্ষীরা গ্রামে এসে ঘরের চালে আগুন ধরিয়ে দিয়ে নারকীয় উল্লাস প্রকাশ করতো, যাত্রার ভিলেনদের মতো উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে ঘরের কাচের জিনিস ভাঙ্গতো। যাবার সময় গরু-বাছুরও নিয়ে যেতো। 'বাহাত্তর সালে আমি স্কুলে পড়ি। স্কুলের পাশেই ছিলো রক্ষী ক্যাম্প। দেখতাম সেখানে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থাকতো অনেক লোক। কালীগঞ্জ কলেজে মুজিববাদীরা নির্বাচনে জিততে না পেরে প্রতিপক্ষকে রক্ষীবাহিনী দিয়ে পিটিয়েছে। '৭৩ সালে ছাত্রনেতা ইদ্রিসকে গাছে ঝুলিয়ে পিটিয়েছে। মুজিববাদীরা ছাত্রদের ডেকে নিয়ে বলতো, মুজিববাদের বিরুদ্ধে রাজনীতি করলে তোমাদেরও ইদ্রিস-শাহজাহানের মতো অবস্থা হবে। গড়াই নদীর ব্রিজের তলায় (এখানে হত্যার পর ফেলে রাখা হতো) যেতে হবে। তাদের ৫৪টি অস্ত্র ছিলো যা প্রকাশ্যে বয়ে বেড়াতো। কালিগঞ্জে যে আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাস হয়েছে তিনি এখন জাতীয় পার্টির নেতা। মুজিববাদী সন্ত্রাসীদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে গোপন রাজনৈতিক দলের হাতে মারা পড়েছে। ভেড়ামারার কামালপুরের ফজিলাতুন্নেসাকে হত্যা করেছিলো মুজিববাদীরা। তার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তার ভাই ফিরোজ আহমেদ বলেন একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার বোন আওয়ামী লীগের যেসব ছেলেদের শেল্টার দিয়েছেন, খাইয়েছেন ১৯৭৩ সালের ১১ জুন আমার বোনকে তারাই হত্যা করলো। তিনি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিলেন এবং কিছু বামপন্থী নেতা আমাদের আত্মীয়, এই অপরাধেই তাকে হত্যা করা হয়।

১৯৭১ সালের মে মাসে আমার বোনের কামালপুরের বাড়িতে একটি ঐতিহাসিক গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সে সভায় ভারত থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন দেবেন শিকদার। বাংলাদেশ থেকে যোগ দিয়েছিলেন টিটু বিশ্বাস, আবদুল মতিন, আমজাদ হোসেন, আলাউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। সে স্বাধীনতা যুদ্ধে পিকিংপন্থীদের করণীয় সম্পর্কে তারা আলোচনার জন্য মিলিত হয়েছিলেন।

১৯৭৩ সালের ১১ জুন রাতের বেলায় এসে প্রথমে বাড়ির সব ঘরের দরোজায় বাইরে থেকে শিকল আটকে দেয়। এরপর ফজিলাতুন্নেছাকে বের করে উঠানে ফেলে প্রচণ্ড মারধর করে। প্রথমে মারধোর করে তারা চলে যায়। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় উঠানে পড়ে ছিলেন। একটু পর যুবলীগাররা আবার ফিরে এসে তার মাথায় গুলি করে। এতে তার খুলি উড়ে যায়। তার লাশ ভয়ে কেউ দাফন করেনি।

আওয়ামী সন্ত্রাসীরা দেশের নাম সোনার বাংলা রাখলেও আসলে তারা ছিলো শ্বেতসন্ত্রাসী। এই কারণে দেশের সাধারণ নাগকির যারা আসলে শান্তি ও গণতন্ত্রপ্রিয় তাদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সন্ত্রাসের মাধ্যমে পদানত করাই ছিলো তাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে নির্বাচনের নামাবলী গায়ে দিয়ে যে সরকারটি ৭৩-৭৪ সালে তারা গঠন করেছিলো তা ছিলো মূলত সন্ত্রাসী বাহিনীর সরকারি-বেসরকারি লেবাস। এই সন্ত্রাসীদের দেশজুড়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অংশবিশেষ আমরা প্রকাশ করছি। এবারে বৃহত্তর বগুড়ার আক্কেলপুর উপজেলা এবং পটুয়াখালীর দশমিনা অঞ্চলের মুজিববাদী ও রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের আংশিক বিবরণ।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পর আক্কেলপুর অঞ্চলে মুজিববাদীরা চুরি-ডাকাতি করেছে, অত্যাচার করেছে অনেক। আবদুর রউফ ছিলেন একজন শিক্ষক, তার বাড়িতে ডাকাতি করার পর তাকে হত্যা করা হয়েছে।

মুজিব আমলে মুজিববাদীদের হাতে আক্কেলপুর ও সংলগ্ন এলাকায় শতাধিক জাসদকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। আক্কেলপুরের ফজলুর রহমান তখন জাসদ করতেন। তিনি বলেন, 'মুজিববাদীদের সহায়তায় রক্ষীবাহিনী আমাকে গ্রেফতার করে চুয়াত্তর সালের প্রথম দিকে। এর আগে আমাকে ধরতে না পেরে আমার দু'ভাইকে ধরে নিয়ে অকথ্য অত্যাচার করেছে, আমার শ্যালককে মারধর করেছে। পরে ঘুষ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে আনা হয়। নাকে গরম পানি ঢালা ও বুট দিয়ে লাথি মারা থেকে শুরু করে কোনো অত্যাচারই তারা বাদ রাখেনি। অনেকে বাড়িঘরই পুড়িয়ে দিয়েছে। শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর ছাড়া পেয়েছি। আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যাদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করেছি, যাদের শেল্টার দিয়েছি তারাই পরে আমাদের নির্মূল করার চেষ্টা করেছে। একাত্তরের ১০ জুন আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ ও আমাদের সংগঠনের সবাই মিলে সংগ্রাম কমিটি গঠন করি। আমি তখন প্রকাশ্যে ভাসানী ন্যাপের কৃষক ফ্রন্টে কাজ করি। পটুয়াখালী অঞ্চলকে চারটি জোনে ভাগ করে আমরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমি নেতৃত্ব দিয়েছি উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের। যুদ্ধের সময়ই আমার ভুল হয়েছিলো একটা। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সঠিক মুক্তি আসবে না এটা আমি প্রকাশ্যেই বলতাম। আমাদের অঞ্চল থেকে তেমন কেউ ভারতে যায়নি, কিন্তু যারা ঢাকা বা অন্য স্থানে ছিলো তারা ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকায় প্রবেশ করেছে। আওয়ামী লীগাররা অবশ্য মোজাফফর ন্যাপ ও আমাদের এক চোখেই দেখতো। যুদ্ধের এক পর্যায়ে দেখলাম তারা আমাদের সন্দেহ করছে এবং অস্ত্রগুলোও হস্তগতের চেষ্টা করছে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হলো। গ্রামে গ্রামে আমাদের লোকজন ছিলো। প্রথমাবস্থায় আওয়ামী লীগারদের যে সব শেল্টারে রেখেছি, পরে তারা বেছে বেছে সে সব বাড়িগুলোতেই হানা দিয়েছে আমাদের নির্মূল করার জন্য।

আমাকে তারা গ্রেফতার করে ১৯৭২ সালের অক্টোবরে। ধরা হয় গলাচিপা থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারির ইঙ্গিতে। ধরার পর থানায় নিয়ে গেলো। চেয়ারে বসা ছিলাম, এমন সময় পেছন দিক থেকে একজন আমার চোখ চেপে ধরলো। আরেকজন জোর করে বিষাক্ত ইনজেকশন দিলো। আমি বেহুঁশ হয়ে পড়লাম। বেহুঁশ অবস্থায়ই জেলে পাঠালো আমাকে। জ্ঞান হবার পর দেখলাম আমি কথা বলতে পারছি না, ডানপাশ সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেছে। পত্রিকায় লেখালেখি হলো এ নিয়ে। পটুয়াখালীর জেল ডাক্তার খুব পরিশ্রম করে চিকিৎসা করায় প্রাণটা বেঁচে গেলো। আসলে আমাকে হত্যা করার জন্যই ইনজেকশন দিয়েছিলো।

অবশ অবস্থায়ও প্রাণে বেঁচে গেছি পত্রিকায় লেখালেখি হওয়ার কারণে। জেলে ১৫ দিনের মতো থাকার পর আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রথমে ভর্তি করা হয় মিটফোর্ডে। অবস্থা তখনো অপরিবর্তিত। দৈনিক সংবাদের সাংবাদিকরা সেই অবস্থায়ই একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সেটি প্রচার করেন। তারা যা জিজ্ঞেস করেছেন আমি বাঁ হাত দিয়ে কোনো রকমে তার জবাব লিখে দিয়েছি। মিটফোর্ডের চিকিৎসায় আরোগ্য হচ্ছিলো না বলে আমাকে পি. জি-তে পাঠানো হলো। পিজিতে আমার মেরুদণ্ড থেকে পানি বের করা

www.pathagar.com

হলো। ৪/৫ মাস চিকিৎসার পর আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করলাম। সম্পূর্ণ সুস্থ হলাম ১৪ মাস পর। তখনকার মতো ছাড়া পেলাম। চুয়াত্তর সালে আমাকে আবার গ্রেফতার করা হয়, ছাড়া পাই মোশতাকের আমলে। মুজিববাদীরা আমার ঘরের অর্ধেকটা কেটে নিয়ে গেছে। আমাদের অসংখ্য কর্মীকে অত্যাচার করেছে। পরে জেনেছি থানার ওসি বলেছেন যে, তিনি তখন থানায় ছিলেন না বলেই মুজিববাদীরা আমাকে থানায় এনে বিষাক্ত ইনজেকশন দিতে পেরেছে। তিনি থাকলে তা হতে দিতেন না।

১৯৭৪ সালে মুজিববাদীরা রাজাপুরের মস্কোপন্থী ন্যাপকর্মী আবুল হোসেনকে হত্যা করেছে। আবুল হোসেন ছিলেন সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী।

স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের আমল ছিলো একটি দুঃসময়। ওই সময় মুজিববাদীরা কালিগঞ্জে শ্রমিক নেত্রী আনোয়ারা বেগমের ভাইসহ ১৪ জন জাসদ কর্মীকে হত্যা করে। আনোয়ারা বেগমের ভাই সামসু ছিলেন জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা, এ কারণেই আওয়ামী লীগারদের হাতে তার প্রাণ যায়। জাসদের বাদলকে হত্যা করা হয় '৭৪ সালে। মুজিববাদীদের ইঙ্গিতে রক্ষীবাহিনী হত্যা করে মান্দারখোলার আনোয়ারাকে। যারা প্রতিবাদ করেছে তাদের ওপরই নেমে এসেছে চরম নির্যাতন ও হয়রানি।

একটি রাষ্ট্রই যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো আমাদের ওপর: দেলোয়ার হোসেন প্রধান

গাইবান্ধায় রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাদীদের চরম নির্যাতন নেমে আসে শেখ মুজিবের একদলীয় শাসন প্রবর্তনের পূর্ব মুহূর্তে। এর আগে অবশ্য '৭৩-এর প্রথম দিকে গাইবান্ধার জাসদ সভাপতি সুজাকে (বীরবিক্রম) মুজিববাদীরা হত্যা করেছিলো। তার অপরাধ ছিলো জাসদ করা। কালীবাড়ি নামক স্থানে দিনের বেলায় তাকে গুলি করে হত্যা করে। সুজা সাহেবের সঙ্গী ফিরোজ ঘটনাচক্রে বেঁচে গেছেন। তার খুনিরা পরে পালিয়ে ভারতে চলে যায় এবং জিয়ার আমলে ফিরে আসে।

সুজা সাহেবকে হত্যার পর জাসদ ও জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগ এই এলাকায় আরো জোরদার হয়। ১৯৭৩ সালের কলেজ নির্বাচনে আমাদের প্যানেল পুরোটাই পাস করে। আমি পাঠাগার সম্পাদক নির্বাচিত হই। মুজিব-বাহিনীর অধিকাংশ ছেলে আমাদের পক্ষে ছিলো। মূলত বিরোধ বাধলো মুজিববাহিনী ও মুজিববাদীদের মধ্যে। আমাদের এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন রওশনআরা বকুল। তিনি প্রকাশ্যে বলতেন, আমার এলাকায় জাসদ বলে কোনো শব্দ থাকবে না। আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজনীতি করার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। চুয়াত্তরের ডিসেম্বর মাসে যারা মুজিববাদের বিরোধিতা করেছে তাদেরই তারা হত্যা করেছে। পটুয়াখালীতে ৫০ জনের মতো প্রগতিশীল কর্মীকে ডাকাত বা নক্সাল আখ্যা দিয়ে তারা হত্যা করেছে।

অসহায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সবসময়ই পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে থাকে। এই পক্ষপাতিত্বের সুবাদে জন্ম নেয় এমন সব বাহিনী যাদের রাজনৈতিক ভিত্তি থাক বা না থাক ব্যক্তিগত বাহিনী হিসাবে খ্যাতি থাকে। এদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো জ্ঞান না থাকলেও জাতিকে নিরাপত্তাহীন করার ব্যাপারে এদের ভূমিকা সবসময়ই সক্রিয় থাকে। বাংলাদেশের রাজনীতির জন্মলগ্ন থেকে এই ধারা অব্যাহত ছিলো। ক্ষমতাবান নানা কর্ণধারেরা ব্যক্তিগত বাহিনী গঠন করে জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে ছিলো। আর এসবেরই জন্ম হয়েছিলো

www.pathagar.com

৭৩-এর নির্বাচনের সূত্র ধরে। সেই সব ঘোষিত-অঘোষিত বাহিনীর সৃষ্ট অপকর্মের তালিকা থেকে এবার চুয়াডাঙ্গা এবং কালিগঞ্জের কিছু অমানবিক নির্যাতনের চিত্র।

চুয়াডাঙ্গার মতিয়ুর রহমান বাবু ছিলেন একজন জনপ্রিয় ও ত্যাগী বামপন্থী কর্মী। তাকে হত্যার পর রক্ষীবাহিনী তার পনেরো বছরের আরেক ছোট ভাইকেও হত্যা করেছিলো। সে অঞ্চলের ঘটনা সম্পর্কে তার ভাই খলিলুর রহমান বলেন, আমার ছোট ভাই মতিউর রহমান বাবুকে রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে যায় ১৯৭৩ সালের ১৬ অক্টোবর। পরে আর তার খোঁজ পাইনি, লাশও পাইনি। মতিউর রহমান বাবু ছিলেন উত্তরবাংলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি। 'ষাটের দশকের মধ্যভাগে টঙ্গীতে থাকার সময় কাজী জাফরের সংস্পর্শে এসে বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দেন। ভাসানীরও প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। একাত্তরে ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর এলাকায় আওয়ামী লীগারদের অত্যাচার, চোরাচালান ও লুটপাটের প্রতিবাদে মতিউর রহমান বাবু '৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে চুয়াডাঙ্গা কোর্টের সামনে অনশন ধর্মট করেন। সেই থেকে দোতালাবাহিনী (মুজিববাদীদের তাই বলা হতো) তার ওপর আরও ক্ষেপে গেলো। অনেক চোরাচালানিরও অসুবিধা হচ্ছিলো তার জন্য। এলাকায় তার জনপ্রিয়তাও অনেক বেড়ে গিয়েছিলো।

১৯৭৩ সালের ১৬ অক্টোবর বাবু চুয়াডাঙ্গার দৌলতদিয়া বাস স্ট্যান্ডে বসেছিলেন। এমন সময় একদল রক্ষীবাহিনী তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। গাড়িতে তোলার সময় তার মাথায় প্রচণ্ড জোরে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে এবং গাড়ির মেঝেয় ফেলে দিয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়। তাকে ধরার পর সাতদিন চুয়াডাঙ্গায় কার্ফু দিয়ে রাখে। এই সময় রক্ষীবাহিনী সে এলাকা থেকে ৭৪ জনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো যার মধ্যে জনাসাতেক ফিরে আসে। বাকিদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। জগতীর কাছে একটি ক্যানেলে রক্ষীবাহিনী লোকজনকে মেরে ফেলে রাখতো। আমার আরেক ছোট ভাই মতিউরের লাশ মনে করে একটি বিকৃত লাশ কবর দিয়েছে।

রক্ষীবাহিনী সমস্ত বিরুদ্ধমতের ছেলেদের ধরেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও মুজিববাদীদের পরামর্শ অনুযায়ী। মুজিববাদীরা আলমডাঙ্গা থেকে চারজন মুজিববাদবিরোধী ছেলেকে ধরে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা রোডের তিনদত্তের ব্রিজের নিচে (আমজুনের কাছে) জবাই করে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে একজনের গলা পুরোটা কাটেনি। মুজিববাদীরা চলে যাবার পর সে গলা ধরে ধরে হেঁটে কালাতির বাজারে আসে এবং একজন ডাক্তারের কাছে যায়। চুয়াডাঙ্গায় বসে খবর শুনতে পেয়ে সেই মুজিববাদীরা মোটরসাইকেলে করে সেখানে যায় এবং বেঁচে যাওয়া লোকটিকে মোটরসাইকেলের পেছনে বেঁধে হেঁচড়িয়ে আবার সেই ব্রিজের কাছে নিয়ে যায়। রাস্তায়ই অবশ্য সে লোক মৃত্যুবরণ করে।

কালীগঞ্জে বেশি নির্যাতন হয়েছে জাসদ কর্মীদের ওপর। সে অঞ্চলের সন্ত্রাস সম্পর্কে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী বলেন, স্বাধীনতার পর কালিগঞ্জের নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগাররা দুর্নীতি ও অত্যাচার শুরু করার পর মুক্তিযোদ্ধা ও তরুণরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ সময় জাসদের জন্ম হলে তরুণদের ৭৫ শতাংশই জাসদে ও রব সমর্থিত ছাত্রলীগ যোগ দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই নেমে আসে মুজিববাদীদের নির্যাতন। জাসদের আক্রাম ও জয়নালকে মুজিববাদীরা টঙ্গীতে এনে হত্যা করার পর অবস্থা চরম আকার ধারণ করে। এমনকি এ ঘটনার পর ময়েজউদ্দিন সাহেব মুজিব আমলে আর কালিগঞ্জ টাউনে যেতে পারেননি।

www.pathagar.com

বাহাত্তরের শেষের দিকে হত্যা করা হয় জাসদের প্রফেসর মান্নান ও সাংবাদিক গোবিন্দলাল দাসকে। গ্রেফতারের পর আমরা সব পালিয়ে যাই। রক্ষীবাহিনী মনোহরপুরের হামিদকে ধরে হত্যা করলো, এরপর হত্যা করলো জব্বার ও দুলালকে। সময়টা হবে '৭৫-এর জানুয়ারি। বাধ্য হয়ে আমরাও প্রতিরোধ গড়ে তুললাম গণ-বাহিনীতে যোগ দিয়ে। সুন্দরগঞ্জের জাহাঙ্গীরও রক্ষীবাহিনীর হাতে প্রাণ দেয়।

আমি জাসদ করি বলে আমার আব্বা রইসুদ্দিন প্রধান ও বড় ভাই আহসানউদ্দিনকে এমন নির্মমভাবে অত্যাচার করে যে, সে অত্যাচারের জের হিসেবেই তারা মৃত্যুবরণ করেন। বড় ভাই অত্যাচারের তিন মাস ও আব্বা তার পরে মারা যান। তাদের গাছে লটকিয়ে পিটিয়েছে। আমাদের মনোহরপুরে বাড়ি পুড়িয়েছে তিনবার। আগুন দেবার আগে দমকল বাহিনী আনা হতো এবং আমাদের ঘরের আগুন যাতে অন্য বাড়িতে সম্প্রসারিত না হতে পারে দমকল বাহিনী দাঁড়িয়ে থেকে সেটা নিশ্চিত করতো। একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষোভ ছিলো এমনি তীব্র। পুরো রাষ্ট্রমন্ত্রই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো যেন। আমাদের এ্যাকশনে ৩/৪ জন মুজিববাদী মারা পড়েছে যারা চোর বা ডাকাত ছিলো।

কোনো কোনো মহল থেকে বলা হয়ে থাকে, ৭৩-৭৪-এ আওয়ামী সন্ত্রাসের প্রধান শিকার ছিলো বামপন্থীরা। কারো কারো ভাষায় মাও পন্থী বিপ্লবীরাই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকারে পরিণত হয়েছে। এই তত্ত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে অনেকে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর উল্লেখ করে বলে থাকেন বাংলাদেশে ঐ সময়কার শাসকরা যা করেছে, তার প্রধান ভিত্তি ছিলো ঐ চুক্তি। সত্যি কথা বলতে গেলে আওয়ামী সন্ত্রাসের কোনো দলমত ছিলো না। ময়মনসিংহ এলাকার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার বিবরণী থেকে বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায় মুজিববাদী ও রক্ষীবাহিনীর হত্যা ও নির্যাতন সম্পর্কে একটি জরিপ রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন কাজী শামিম। ১৯৮০ সালের শেষ ভাগে সে এলাকায় প্রায় এক মাস থেকে তিনি এই রিপোর্টটি তৈরি করেন।

নির্যাতনের একটা সাধারণ চিত্র তুলে ধরার জন্য ময়মনসিংহের একটি থানায় নমুনা জরিপ চালানো হয়েছিলো। সমগ্র বাংলাদেশের মতো ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ থানার নির্যাতনের কাহিনীও এক। তবে এই থানার নিহতদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। থানায় এমন কেউ নেই, যিনি তারা বাবা, ভাই বা আত্মীয়কে হারায়নি। একটি সাধারণ হিসেবে এখানে মোট ৯৫০ জন রাজনৈতিক কারণে প্রাণ হারিয়েছেন।

ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনসিংহ জেলার মধ্যখানে অবস্থিত। বাস এবং ট্রেন উভয় রুটেই যাতায়াত চলে। থানার আয়তন ১০৯, ১৬ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা সোয়া দুই লক্ষ।

আওয়ামী লীগ আমলে থানা সদরে একটি মাত্র কলেজ ছিলো। উল্লেখ্য এই কলেজের শতকরা ৩৩ জন শিক্ষার্থী আওয়ামী লীগ আমলে নিহত হয়। এই আমলে এই থানায় বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া ১টি উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অভাবে প্রায় অচল হয়ে পড়েছিলো। অনেকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছে এ ধরনের নির্বিচারে গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানান। তাদের অভিযোগ, এ সময় ছেলেরা স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলো। অভিভাবকরা জানান, ভয়ে তাদের ছেলেদের বইপত্র মাটির নিচে গর্ত করে লুকিয়ে রেখে ছাত্র পরিচয় গোপন করা হতো। অপ্রাসঙ্গিক হলেও ঈশ্বরগঞ্জের নামকরণের কিংবদন্তি উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ, এই কিংবদন্তিটি এখানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। শোনা যায়, ঈশ্বরগঞ্জের

www.pathagar.com

প্রাক্তন নাম দত্তপাড়া। এই দত্তপাড়ায় ব্রিটিশ নীলকরদের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে ঈশ্বর পাটনী নামে এক সাহসী ব্যক্তি দু'জন নীলকর সাহেবকে গুলি করে হত্যা করে। পরবর্তীতে এই ঈশ্বর পাটনীর নাম অনুসারে দত্তপাড়ার নাম ঈশ্বরগঞ্জে পরিণত হয়।

আওয়ামী লীগ আমলে ঈশ্বরগঞ্জে কোনো শক্তিশালী বিরোধী দলের অবস্থান ছিলো না। পিডিপি'র নেতা মরহুম নুরুল আমিনের বাড়ির পার্শ্ববর্তী থানা হিসেবে ও তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই থানার কিছু অংশ আওয়ামী লীগ বিরোধী ছিলো। ৭২-এর পর আওয়ামী লীগের সদস্যরা রিলিফের মাল নিয়ে কারচুপি ও ঢালাও নির্যাতন আরম্ভ করলে সেখানে কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। '৭৪-এর দিকে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি উক্ত এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সন্ত্রাসধর্মী কার্যকলাপ চালায়। আওয়ামী লীগের দুজন কর্মীসহ ডাকাত বলে কথিত কয়েকজন লোককে এরা হত্যা করে। এরা এই থানার উচাকিলা পুলিশ ফাঁড়ি লুট করে এবং আঠারোবাড়িস্থ অগ্রণী ব্যাংকের শাখা প্রকাশ্যে লুট করে। এর ফলে আওয়ামী লীগ তার নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে অজুহাত খুঁজে পেয়ে গিয়েছিলো এবং তাতে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের পথও সুগম হয়ে যায়। মূলত তাই ঈশ্বরগঞ্জের হত্যাকাণ্ডের বেশির ভাগ হয়েছিলো রাজনীতি বিবর্জিত ব্যক্তিগত ঝগড়া-ফ্যাসাদের কারণে।

সর্বহারা পার্টি ছাড়া ঈশ্বরগঞ্জ থানায় মোজাফফর ন্যাপ এবং জাসদের থানা কমিটি ছিলো। তবে এইসব কমিটি ছিলো নিষ্ক্রিয়। তথাপি এইসব রাজনৈতিক দলের কর্মীরা এখানে নির্যাতিত হয়েছেন।

তৎকালীন সরকারের স্বৈরাচার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠলে আওয়ামী লীগ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তারা নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিবাদকে স্তব্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। '৭৩-এর প্রথম দিকে এই থানার থানা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে ঢাকায় ডেকে পাঠানো হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্যের উপস্থিতিতে তৎকালীন একজন মন্ত্রীর বাসায় এদের নিয়ে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে ঈশ্বরগঞ্জের সার্বিক অবস্থা ও বিরোধী দলের অবস্থান নির্ণয় করে কিছু মারাত্মক অস্ত্র কর্মীদের কাছে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ময়মনসিংহের এক ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার অফিসে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে তৎকালীন ঈশ্বরগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক উক্ত হাশেমুদ্দীনকে ঈশ্বরগঞ্জস্থ রক্ষীবাহিনীর হাইকমান্ড নির্বাচন করে। একজন দুর্নীতিবাজ সিভিলিয়ানের হাতে শক্তিশালী আধা-সামরিক বাহিনীর একটা ইউনিটের সার্বিক দায়িত্ব বর্তাবার পর ঈশ্বরগঞ্জে প্রকৃত দুর্যোগ শুরু হয়।

এই সময় ঈশ্বরগঞ্জের মানুষ ভুলেও রাজনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাতো না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, একজন অসহিষ্ণু স্কুল শিক্ষক তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রধানের সমালোচনা করলে তাকে জুতার মালা পরিয়ে সারা ঈশ্বরগঞ্জে ঘুরানো হয়। এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বোকাইনগরের চেয়ারম্যান বৃদ্ধ রংগুমিয়ার কপালেও। ভারি জুতোর মালা পরিয়ে তাকে দিয়ে ঈশ্বরগঞ্জ বাজার প্রদক্ষিণ করানো হয়। আওয়ামী লীগ তার নির্যাতনের ভিত্তিভূমি শক্তিশালী করার জন্যে এই থানার প্রতিটি ইউনিয়নে গুণ্ডা-বদমাশদের সংগঠিত করে ডিফেন্স কমিটি নামে একটি খুনি বাহিনী গঠন করে। এরা ছিলো এই এলাকার জন্য সত্যিকারের সন্ত্রাস। এই ডিফেন্স পার্টি ছিলো খুনের ব্যাপারে উন্মাদ। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু কেউ এদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এই ডিফেন্স পার্টির ওপর ঢালাও খুনের নির্দেশ ছিলো।

তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কোনো ধরনের রাখঢাক পছন্দ করত না।

www.pathagar.com

বিরুদ্ধবাদীদের প্রকাশ্যে জবাই করার জন্যে তারা ডিফেন্স কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছিল। লক্ষীগঞ্জ বাজারে অনুষ্ঠিত এক সভায় থানা আওয়ামী লীগ সম্পাদক প্রকাশ্যে খুনের আদেশ দিলে ধর্মভীরু কয়েকজন লোক পাপের অজুহাত তোলেন। কিন্তু উক্ত সম্পাদক হাজার হাজার লোকের সামনে দাম্ভিকভাবে উত্তরে বলেছিলো, আওয়ামী লীগ বিরোধীদের খুনের যাবতীয় পাপ আমি একাই বহন করবো।

ডিফেন্স কমিটির সদস্যরা এই ধরনের ঢালাও নির্দেশ পেয়ে বাপ-দাদা-পরিবারের ঝগড়ার সূত্র ধরে খুনের পর খুন চালিয়ে গাঁ উজাড় করে দেয়।

বৃদ্ধ বাপ খুব ভোরে উঠে চোখ কচলে তার উঠানে দেখলেন কয়েক দিন আগে রক্ষীবাহিনী কর্তৃক ধৃত ছেলের বিকৃত লাশ অথবা একটা গায়ের মানুষ হতবাক হয়ে দেখলো, তাদের চৌরাস্তার মোড়ে পাঁচটা বীভৎস অপরিচিত লাশ পড়ে আছে অথবা তারা দেখলো স্কুলের সামনে জাম গাছে পা বাঁধা অবস্থায় উল্টোভাবে ঝুলছে এক তরুণের লাশ। তৎকালে এটা ঈশ্বরগঞ্জ থানার জনবহুল এলাকাগুলোর একটা প্রাত্যহিক দৃশ্য। জনমনে নিছক সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ ধরনের কার্যকলাপ করা হতো।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সুটিয়া বাজারের কাহিনী। এই বাজারের পাঁচজন তরুণের লাশ তিনদিন পর্যন্ত খোলা অবস্থায় পড়েছিলো। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা লাশগুলো আত্মীয়-স্বজনদের নিতে দেয়নি। পরে লাশ পচে গেলে তারা স্থানান্তর করতে দিতে বাধ্য হয়।

সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উল্টোভাবে পা বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে হত্যা করার অনেক দৃষ্টান্ত এই থানায় রয়েছে। মুগাটোলা ইউনিয়নের তাকাটিয়া গ্রামের হাশেমকে আটরা হাই স্কুলের পাশের জাম গাছে ঝুলিয়ে হত্যা করে তার লাশ কয়েক দিন সেখানেই লটকে রাখা হয়েছিলো। চলতি ট্রাকের পেছনে বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে হত্যা করার মতো মারাত্মক ঘটনাও ঘটেছে। অনেক জায়গায় রক্ষীবাহিনী লাশ ফেলে সাদা কাগজে স্বাক্ষরবিহীন আদেশনামা লাশের পাশে রেখে আসতো। ইসলামপুর মাদ্রাসার কাছে এক জায়গায় তিনটা লাশের পাশে এ রকম স্বাক্ষরবিহীন আদেশনামা পাওয়া যায়। এই আদেশনামায় স্থানীয় জনগণের উদ্দেশ্যে লাশগুলো পুঁতে ফেলার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিলো। এতে লেখা ছিলো অবশ্যই যেন লাশগুলো তিনদিন পরে মাটি চাপা দেয়া হয়।

নিছক সন্ত্রাসের জন্য রক্ষীবাহিনী এই থানায় অনেক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়েছে। রাজীবপুরের হাশেমকে মারার দিন মধুপুর বাজারের আশপাশের গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে তাকে ঘুরিয়েছে। প্রতিটি বাড়ির সামনে হাশেমকে দিয়ে বলিয়েছে, 'আমাকে মধুপুর স্কুলের মাঠে আজ বিকেল পাঁচটায় গুলি করে মারা হবে—আপনারা সবাই আসবেন।' নিজের মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে হতভাগ্য হাশেম। তবুও সে রক্ষীবাহিনীর বেয়নেটের খোঁচা সহ্য করতে না পেরে তাদের শেখানো বুলি তোতাপাখির মতো আওড়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী এইদিন পাঁচটায় হাশেমকে মধুপুর স্কুলের মাঠে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিলো। রক্ষীবাহিনী ছাড়াও সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের সদস্যরা প্রকাশ্যে হত্যা করেছে। আরশু নামের জনৈক ব্যক্তিকে ঈশ্বরগঞ্জ বাজারের দিন কলেজের মাঠে টিউবওয়েলের হাতল দিয়ে পিটিয়ে আওয়ামী লীগ কর্মীরা হত্যা করে। রাতের বেলা কে বা কারা তার লাশের মস্তক খণ্ডন করে গায়েব করে ফেলে। সন্ত্রাস অবশ্য তারা সৃষ্টি করতে পেরেছিলোও। তাদের ভয়ে মানুষ কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলো। সন্ধ্যার সাথে সাথে জনপদ হয়ে যেতো মৃত্যুপুরীর মতো নীরব। সবাই আতঙ্কে থাকতো কে কখন লাশ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

'৭২-থেকে '৭৫ পর্যন্ত ঈশ্বরগঞ্জের জনবহুল এলাকাগুলোতে লাশের ছড়াছড়ি ছিলো। প্রতিদিন ভোরেই কোথাও পাওয়া যেতো বিকৃত অথবা গলাকাটা বেওয়ারিশ লাশ।

আওয়ামী লীগ সদস্য নিয়ে গঠিত ডিফেন্স কমিটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জবাই করে হত্যা করতে পছন্দ করতো। জবাই করা লাশের কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার নিয়ে জানা গেছে, ওরা খুনের কাজে যথেষ্ট নিরূপণ ছিলো। হাত-পা পিছমোড়া করে বেঁধে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে শিকারকে আগে কাহিল করে নিতো পরে চিৎ করে শুইয়ে কণ্ঠনালীর ঊর্ধ্বাংশে নরম জায়গায় ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে জবাই করা হতো। সাধারণত ঈশ্বরগঞ্জে এইসব জবাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট কিছু লোক ছিলো। এ ধরনের একজন খুনির সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে যে, সে প্রতিটি খুনের জন্য ঊর্ধ্বে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত পেতো। ব্যক্তিগত জীবনে এই লোক ছিলো ভ্রষ্ট ভূমিহীন কৃষক।

গণহত্যায় ক্লান্ত হয়ে ঈশ্বরগঞ্জে রক্ষীবাহিনী '৭৫-এ ধৃত ব্যক্তিকে খুনের জন্য ডিফেন্স কমিটির হাতে হস্তান্তর করতো। তথাকথিত নির্দোষ হিসেবে রক্ষীবাহিনীর হাত থেকে রেহাই পেয়েও অনেকে ডিফেন্স কমিটির হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। এই ধরনের অনেক কারণহীন খুন অনেক সময় রক্ষীবাহিনী বাধা প্রদান করতো। তবে আওয়ামী নেতাদের হস্তক্ষেপের ফলে বাধা কার্যকরী হতো না। হরিপুর গ্রামের এক পরিবারের ৯ জন নারী-পুরুষ-বৃদ্ধকে হত্যা করার সময় রক্ষীবাহিনী বাধা দিয়েছিলো। কিন্তু প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপের ফলে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। একই সময়ে নয় জন নারী-পুরুষকে অর্ধমৃত অবস্থায় তাদেরই বাড়ির আঙ্গিনায় জীবন্ত কবর দেয়। এ ধরনের উন্মুক্ত খুনগুলোকে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় তৎকালে আওয়ামী লীগ কর্মীরা খুনের জন্যই খুন করতো এবং খুন এদের কাছে একটা নেশায় পরিণত হয়েছিলো।

নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে তখন সুপরিচিত ছিলো ঈশ্বরগঞ্জ থানা সদরের জেলা বোর্ডস্থ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প এবং মধুপুর বাজারের স্কুলের ক্যাম্প ছিলো সুপ্রসিদ্ধ। ধৃত ব্যক্তিদের ওপর এই দুই কেন্দ্রে নির্যাতনের বিভিন্ন ধরনের কায়দা প্রয়োগ করা হতো। পুলিশের মতো রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের কায়দা তত সূক্ষ্ম ছিলো না। ছিলো নির্মম এবং জঘন্য। মূলত রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের কায়দা ছিলো লেব্রেটারিতে ছাত্রদের ব্যঙের ডিসেফশানের মতো। সহজ-সরল ছাত্ররা যেমন ব্যঙের চার পা পিন দিয়ে গেঁথে নির্বিকারভাবে সার্জিকেল নাইফ ব্যবহার করে রক্ষীবাহিনীও তেমনি করতো। বেশিরভাগ ধৃত ব্যক্তির উরু-বাহু-হাতের তালু ও কানের লতি বেয়োনেট চালিয়ে ফুটা করা হতো। পা উপর দিকে বেঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় বন্দীর নাকে-মুখে গরম পানি ঢালা হতো। এটা ছিলো রক্ষীবাহিনীর সবচেয়ে প্রিয় নির্যাতনের কায়দা। অবশ্য রক্ষীবাহিনী কর্তৃক ধৃত লোকের মাঝে খুব নগণ্যসংখ্যক লোক ভাগ্যক্রমে বাঁচতে পেরেছিলো। ধৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনরা এখানে জামিনের তদবির করতে আসতো না। আসতো লাশ চাইতে।

অন্য এক জরিপে জানা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পলাতক ব্যক্তিদের না পেলে তার আত্মীয়স্বজনকে ধরে এনে নির্যাতন করতো। এ ছাড়া গরুসহ ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র লুট-পাট করে নিতে আসা হতো এবং মোটা অংকের ঘুষ আদায় করা হতো। তাই প্রিয়জনহারা ঈশ্বরগঞ্জের বেশির ভাগ পরিবার নিঃস্ব।

ঈশ্বরগঞ্জের রক্ষীবাহিনী ছিলো সম্পূর্ণরূপে আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণাধীন। আওয়ামী লীগই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো কাকে 'মালিশ' করতে হবে বা কাকে 'খরচ' করতে হবে।

www.pathagar.com

তৎকালে আওয়ামী লীগাররা গর্বের সাথে 'খরচ' এবং 'মালিশ' শব্দ দুটি খুন ও নির্যাতনের প্রতিকী শব্দ হিসাবে ব্যবহার করতো। তাই এখানে ৯৮ ভাগ খুন ব্যক্তিগত ঝগড়ার ফ্যাসাদের কারণে ঘটে। এখানে নমুনা হিসেবে দু'একটা ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ধূতপুর গ্রামের হাফিজউদ্দিন খানের দুই ছেলেকে মারা হয়েছে মূলত আওয়ামী লীগ আত্মীয়ের সাথে জমি সংক্রান্ত বিবাদের কারণে। অন্য ঘটনাটি ঘটে উচাকিলার রহিম নামক ব্যক্তির ভাগ্যে। উক্ত লোক জনৈক আওয়ামী লীগ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত একটা মামলা আদালতে দায়ের করলে প্রভাবশালীরা এই মামলা তুলে নেয়ার জন্য তার ওপর চাপ প্রয়োগ করে। রহিম এতে সম্মত না হলে রক্ষীবাহিনী দিয়ে তাকে খুন করা হয়। সর্বশেষ ঘটনাটি হচ্ছে আওয়ামী লীগের জনৈক প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতার কন্যার সাথে প্রণয়ঘটিত কিছু ব্যাপার ছিলো। গরিব কর্মীর দুঃসাহসে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে রক্ষীবাহিনী দিয়ে গ্রেফতার করায় এবং হত্যার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। পরে অন্যান্য তরুণ আওয়ামী লীগ কর্মীদের চাপে এবং উর্ধ্বতন রক্ষীবাহিনীর রিডারের কাছে প্রেমিকার সাথে যৌথ ছবি প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে পেরে উক্ত কর্মী প্রাণে বেঁচে যায়। তবে তার উরু এবং বাহু বেয়োনেট দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করা হয়েছিলো।

আবদুল আজিজ ছিলেন মুগটুলার হাফিজ উদ্দিন খানের বড় সন্তান। সে ছিলো লাজুক ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। '৭৫ সালে সে গৌরিপুর কলেজের ছাত্র ছিলো। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তার এক আওয়ামী লীগ আত্মীয় রক্ষীবাহিনীর কাছে তার ও তার ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করে। তার পরপরই রক্ষীবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া দেয় এবং বাড়িতে হানা দিয়ে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। আজিজ ও তার ছোট ভাই নুরুল ইসলামকে না পেয়ে তাদের ছোট ভাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশত ছোট ভাইয়ের গ্রেফতারের কয়েকদিন পরে মেজ ভাই নুরুল ইসলাম ঘাগরা নদীর পাড়ে ধৃত হয় এবং ওখানেই তাকে খুন করা হয়। নুরুল ইসলামের পরিণতি ছোট ভাইয়ের ভাগ্যে ঘটবে এই ধরনের আশঙ্কায় আজিজ সরাসরি ইশ্বরগঞ্জে রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে আত্মসমর্পণ করে। আওয়ামী লীগ নেতারা আজিজকে পেয়ে উল্লসিত হয় এবং ঘোষণা দেওয়া হয় কাটালি বাজারে (আজিজের বাড়ির পার্শ্বস্থ বাজার) তাকে প্রকাশ্যে গুলি করে মারা হবে। কিন্তু আওয়ামী নেতাদের দুর্ভাগ্য তাদের খায়েশ মেটেনি। কারণ ট্রাকে করে কাটালি বাজারে আনার পথে অত্যধিক নির্যাতনে আজিজ মারা যায়। তৎকালে রক্ষীবাহিনীর হাতে গ্রেফতারকৃত ছোট ভাই জানিয়েছে, আজিজকে কাটালি বাজারে হত্যা করার জন্য আনার সময় পানি খেতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাকে পানি দেওয়া হয়।

কাসেম ছিলো দুবলির এয়াকুব আলীর সরকারের ছোট ছেলে। মৃত্যুর পূর্বে সে ঈশ্বরগঞ্জ কলেজ থেকে আইএ পাস করেছিলো। রক্ষীবাহিনী ঈশ্বরগঞ্জের ক্যাম্প করার পর থেকেই তাকে খোঁজা হচ্ছিলো। তাকে ধরতে না পেরে তার বাপ বৃদ্ধ এয়াকুব আলী সরকারকে হাজতে প্রেরণ করা হয়েছিলো। ধরা পড়ার পাঁচদিন পর কাসেমকে কলতাপাড়া বাস স্ট্যান্ডের পাশে খোলা জায়গায় রাত তিনটার সময় গুলি করে মারে।

কাসেমের সাথে গ্রেফতারকৃত জনৈক ব্যক্তি জানিয়েছেন, হত্যা করতে নিয়ে আসার সময় কাসেমদের সবাইকে রাত দুটায় জাগানো হয়েছিলো। কিছু মিষ্টিও বিতরণ করেছিলো। কিন্তু কাসেম সে মিষ্টি স্পর্শ করেনি। কারণ নাকে গরম পানি ঢালার ফলে মুখে

www.pathagar.com

দগদগে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিলো। উল্লেখ্য, সে ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা।

আহমদ আলী ছিলেন কাজিপুর ইউনিয়নের একমাত্র বিএ পাস। ঘটনার সময় সে ময়মনসিংহ ল'কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। ময়মনসিংহ থেকে গ্রামের বাড়িতে পরীক্ষার ফিস জোগাড় করতে এসে রক্ষীবাহিনীর খপ্পরে পড়েন। আহমদ আলী গরিব এবং মেধাবী ছাত্র ছিলো। বিনয়ী বলে সে এলাকায় যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলো। রক্ষীবাহিনী তাকে কেন গ্রেফতার বা হত্যা করে এর কারণ জানা যায়নি। প্রথম দিকে সে জাসদ সমর্থক ছিলো। কয়েক জায়গায় আওয়ামী লীগ বিরোধী মিটিংয়ে সে বক্তৃতা দিয়েছিলো। তার মৃত্যুর জন্য অনেকে বক্তৃতাকে দায়ী মনে করেন।

তার মৃত্যুর পর তার বৃদ্ধ নানা ঈশ্বরগঞ্জে রক্ষীবাহিনী লিডারের কাছে মাফ চাইতে গিয়েছিল। লাশের জন্য জনৈক আওয়ামী লীগ নেতাকে ৫শ টাকা ঘুষ দিয়েছিলো কিন্তু লাশ শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান আঠারোবাড়িতে তার আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলো। এখানে সে একটি মেয়ে পছন্দ করে। এখান থেকে সে তার বাপের কাছে চিঠিতে পছন্দের কথা জানায় এবং মেয়ের বাপের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেওয়ার অনুরোধ করে।

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে বাপের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো নেমে আসে। '৭৫-এর এই ফেব্রুয়ারীর তিন তারিখ তাকে রক্ষীবাহিনী গ্রেফতার করে ময়মনসিংহ নিয়ে যায়। তার বাপ অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। শেষ পর্যন্ত ছেলের লাশও পায়নি এবং কোনো খবর পায়নি।

নাউরি গ্রামের তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে ছিলো আবদুল কুদ্দুস। আবদুল কুদ্দুস ছিলো ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজের ছাত্র। ছুটিতে বেড়াতে এসেই সে মৃত্যুর খপ্পরে পড়ে। '৭৫ সালের জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখ সে মা ও বোনদের সাথে ঘরের বারান্দায় রোদ পোহাচ্ছিলো। সিভিল কাপড়ে এসে রক্ষীবাহিনী তাকে গ্রেফতার করে। বিকেলের দিকে তাকে এনে বাড়ির সবাইকে বেধড়ক পিটায় এবং ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ধরা পড়ার পরের দিনই বাড়ির সামনে পেটে-মুখে অসংখ্য বেয়োনেট চার্জের দাগসহ তার লাশ পাওয়া যায়।

ঈশ্বরগঞ্জে এভাবেই মরেছে শত শত তরুণ। মরেছে তারাই যাদের প্রতি মা-বাবা, পড়শীদের ছিলো অনেক আশা, অনেক ভরসা। আজ তারা নেই। তবে কালো দিনগুলোর দুঃস্বপ্ন নিয়ে বয়ে গেছে তাদের পরিবার-পরিজনের হৃদয়ে মর্মান্তিক স্মৃতি এখনো তাদের কষ্ট দেয়।

১৯৭২ থেকে ৭৫-এর ১৪ আগস্ট পর্যন্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের আষ্টেপৃষ্টে যার ছায়া-প্রচ্ছায়া সকলকে তাড়িত করে বেড়িয়েছে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। গণতন্ত্রের ভাষণে, স্বৈরতন্ত্রের লেবাসে এই অবয়ব বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকাঠামোতে এতোটাই দাপট ও ক্ষমতা বিস্তার করে ছিলেন যে, তিনি আসলে কোন পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন সেটা বড় কথা নয় বরং বড় কথা ছিলো তার অস্তিত্ব এবং আমিত্ব। ১৭ মার্চ তার জন্মদিবস। আর ১৯৭৩ সালে সেই দিনটিকেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ বেছে নিয়েছিলো ফ্যাসিবাদ বিরোধী দিবস হিসাবে। সেই দিনের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেন প্রত্যক্ষদর্শী আলোকচিত্রী নাসির আলী

www.pathagar.com

মামুন। নিচে তার বিবরণ দেওয়া হলো :

আলোকচিত্রী মামুনের অভিজ্ঞতা

আমি তখন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও ছবি তুলতাম। জাসদের ১৭ মার্চের সভায় গিয়েছিলাম ছবি তোলার জন্য। সভাশেষে মিছিলের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির কাছে এলাম। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ৪ থেকে ৫শ পুলিশ মোতায়েন ছিলো বাড়িতে। মিছিলকে বাধা দিলো তারা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন বাড়িতে নেই। মিছিল থেকে কেউ কেউ ইটপাটকেল ছুড়লো বাড়িতে। পুলিশের বাধা অগ্রাহ্য করে বাড়ি ঘেরাও করতে অগ্রসর হলো মিছিল। এমন সময় চারদিক থেকে অসংখ্য রক্ষীবাহিনী একে একে ঘিরে ফেললো মিছিলের লোকদের। প্রথমে তারা ফাঁকা আওয়াজ করলো এবং সবাইকে চলে যেতে বললো! রক্ষীবাহিনী দেখে লোকজন পালাতে শুরু করলো। এ অবস্থায় রক্ষীবাহিনী নতুন কোনো উস্কানী ছাড়াই মারপিট ও গুলি শুরু করলো। মেজর জলিল, আ. স. ম. আবদুর রব ও মমতাজ বেগম বাড়ির গেইটেই ডানদিকের একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আরো কয়েকজন নেতাও তাদের সঙ্গে তারা শুয়ে পড়লেন গাছের নিচে। তখন এলোপাতাড়ি গুলি শুরু করছে রক্ষীবাহিনী। শোওয়া অবস্থায় অনেকের বুকের কাছে এসএলআর রেখে গুলি করতে থাকে। আমিও শুয়ে পড়লাম। চারদিকে মরণ চিৎকার। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা। আমার শরীর আশপাশের কয়েকজনের রক্তে ভিজে যেতে লাগলো। আমার মনে হচ্ছিল আমরা যেনো শত্রু দেশের কোনো সৈন্য। পাশবিকভাবে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চললো চোখের সামনে। জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে থাকলাম। শুয়ে শুয়ে দেখলাম দেয়াল টপকে পলায়নমান অনেককে গুলি করছে, যেন পাখি শিকার। মেজর জলিল কয়েকবারই মাথা উঁচু করে উঠে বসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অন্যান্য নেতা তাকে জোর করে ধরে রাখলেন। জলিল শুয়ে শুয়েই চিৎকার করছিলেন, 'স্টপ ফায়ার রক্ষী, স্টপ ফায়ার'। তিনি খুব বিমর্ষ ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। আমার কাছে মনে হচ্ছিলো এটি একটি যুদ্ধক্ষেত্র। পুলিশ তখন প্রশংসনীয় কাজ করেছে। মনে হচ্ছিলো তারা মিছিলকারীদের পক্ষে। গাছের নিচে শুয়ে থাকা নেতাদের ওপর তারা গুলি চালাতে দেয়নি। একটানা পনের মিনিটের মতো গুলি চললো। আমি পাকিস্তানি আর্মিদের হাতেও ধরা পড়েছিলাম, জেলও খেটেছি তখন, কিন্তু এমন নির্মম ও নারকীয় কাণ্ড জীবনে আর দেখেনি। কোনো বিরোধী দলের মিছিলে এতো দীর্ঘ সময় ধরে একটানা কোথাও গুলি চালানো হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

গুলিবৃষ্টি যখন থামলো, দেখলাম রক্তে লাল হয়ে গেছে চারদিক। চারদিকে মরণ যন্ত্রণা ও কাৎরানির শব্দ। কে কাকে সাহায্য করে? আমি ক্যামেরাটা গলার কাছে ধরে আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। উদ্দেশ্য, ক্যামেরা দেখে যদি গুলি না করে। পরে টের পেলাম পালানোর চেষ্টা করলেও অনেকে পালাতে পারেনি, রক্ষীবাহিনী পালাতে দেয়নি, তাদের হুশিয়ারী ছিলো লোক দেখা মাত্র গুলি, সাথে লাথি ও বন্দুকের আঘাত যে কত করেছে তার হিসেব নেই। শুয়ে থাকা কেউই অক্ষত ছিলো না। গুলিতে আহত ও রক্তাক্ত লোকগুলোকে টেনে-হিঁচড়িয়ে কোথাও বা মারতে মারতে গাড়িতে তুললো তারা। পুলিশ অবশ্য আহতদের সাহায্য করেছে। আমার ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে লাথি মারতে মারতে ট্রাকে তুললো তারা, কোনো দোহাই শুনলো না। তবে অন্যের তুলনায় কমই মেরেছে আমাকে। আমি রক্ষীবাহিনীর গাড়িতে উঠার সময় দেখলাম রব ও জলিলকে পুলিশের গাড়িতে তোলা হচ্ছে

www.pathagar.com

ঘেরাও দিয়ে যাতে রক্ষীবাহিনী তাদের মারতে না পারে। পরে আমাদের নিয়ে গেলো শাহবাগের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে আমাদের পাঠিয়ে দিলো রমনা থানায়, সাথে একজন পুলিশ দিয়ে। তখন আমার গোঁফও ভাল করে ওঠেনি। সম্ভবত পুলিশটির দয়া হয়েছিলো আমাকে দেখে। অনেক গল্প করলেন তিনি, বললেন, দেখেন ভাই কি অত্যাচার শুরু হয়েছে দেশে। রক্ষীরা আমাদের কোনো কথাই শোনে না। রমনা থানার সেলে নিয়ে গেলো এরপর। এই একই সেলে একাত্তর সালে আমাকে ও আমার আব্বাকে আটক রাখা হয়েছিলো। শরীরে তখন প্রচণ্ড ব্যথা। ক্যামেরা আগেই ছিনিয়ে নিয়েছিলো। অবশ্য রমনা থানার তৎকালীন ওসি-র বদন্যতায় ক্যামেরাটা ফেরৎ পেয়েছিলাম। রিলগুলো পাইনি। একটা রিল লুকিয়ে রেখেছিলাম। রাত দুটোর দিকে আমি তখন হাঁটুর উপর মাথা রেখে ঘুমাতে চেষ্টা করছিলাম, হঠাৎ শুনলাম একজন ভদ্রলোক সেলের চোর-ছ্যাচড়াদের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করছেন। মাথা তুলে দেখি কবি আল মাহমুদ। আমাকে চিনতেন তিনি। তাকে রাতে ঘেরাও করে বাসা থেকে ধরে এনেছে। তিনি তখন গণকণ্ঠের সম্পাদক। পরদিন আমাদের দুজনকে পুলিশ ভ্যানে পাঠিয়ে দিলো সেন্ট্রাল জেলে। জাসদের অফিস অতিক্রম করার সময় দেখলাম আগুন জ্বলছে সেখানে। পরদিন শুনলাম শেখ কামাল ও পাহাড়ির নেতৃত্বে জাসদ অফিস পোড়ানো হয়েছে। জেলে ঘুরে দেখি আশপাশে সব জাসদের লোক। সাতদিন জেলে থাকার পর মুক্তি পেলাম। আমার বড় ভাই তখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সঙ্গে জড়িত থাকায় বের হয়ে আসতে পেরেছি। সেদিন আরো বহু সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার মার খেয়েছিলেন।

১৭ই মার্চ ছিলো শেখ মুজিবের জন্ম দিন। পরদিন ইত্তেফাকে পাশাপাশি ছবি ছাপা হলো, অসুস্থ শেখ মুজিব ফলের রস পান করছেন এবং মেজর জলিল ও রবকে টেনে-হিঁচড়ে জেলে নেওয়া হচ্ছে।

৭২-৭৫ পর্বের আওয়ামী সন্ত্রাস সম্পর্কে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা আবদুল মতিনের একটি সাক্ষাৎকার পরবর্তীকালে নিয়েছিলেন সাংবাদিক আহমেদ মুসা।

আবদুল মতিন তার সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ আমলের সন্ত্রাস সম্পর্কে বলেন, আমাদের একজন কর্মী মুজিববাদীদের গুলিতে নিহত হবার সময় তার শেষ কথা ছিলো, আমার রক্ত এর প্রতিশোধ নেবে।

আওয়ামী লীগ গোড়া থেকেই প্রগতিশীল শক্তিকে প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করে টার্গেট করেছে। একাত্তরের মার্চে তারা ভারতে চলে গেলো, আমরা দেশে রয়ে গেলাম । পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করলাম স্বাধীনভাবে। একাত্তরের জুলাই-আগস্ট মাসে পাকবাহিনী আমার পিতা ও এক ভাইকে হত্যা করেছে। আমাদের বহু কর্মী-সমর্থক প্রাণ দিয়েছে তাদের হাতে, ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে অনেকের।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের স্পষ্ট মতপার্থক্য ছিলো এটা ঠিক, কিন্তু তারা আমাদের এভাবে টার্গেট করবে ভাবতে পারিনি। একাত্তরের জুলাই-আগস্ট থেকেই মুজিববাহিনী আকারে তারা এলাকায় প্রবেশ করতে থাকে। সেপ্টেম্বরে তারা ঈশ্বরদীর শাহপুরে ঢুকে পরপর আমাদের ৬/৭ জন কর্মীকে হত্যা করলো। আমরা তখন পাকবাহিনী ও মুজিববাহিনীর দ্বিমুখী আক্রমণের শিকার হলাম। ভারতেও আমাদের অনেক কর্মী তাদের টার্গেট হয়েছে। দেলোয়ার নামে আমাদের এক কর্মী যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য ভারতে

www.pathagar.com

গিয়েছিলো, কিন্তু পরে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

স্বাধীনতার পর যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহীসহ উত্তর বাংলার বিভিন্ন স্থানে আমাদের কর্মীদের তারা নির্বিচারে হত্যা শুরু করলো। বাধ্য হয়ে আত্রাইয়ে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম। পরে ব্যাপক সংঘর্ষ এড়াবার জন্য আমরা পিছিয়ে আসি। এরপর শুরু হয় আমাদের পার্টির কর্মী সমর্থক ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের ওপর ব্যাপক অত্যাচার। '৭৩-এর পরই আমরা পিছিয়ে এসেছিলাম। মুজিবের পতনের পূর্ব পর্যন্ত একটানা হত্যা ও সন্ত্রাস হয়েছে দেশ জুড়ে। তাদের নির্দয়তারও তুলনা ছিলো না। আমার চাচার সামনে তার ছেলেকে হত্যা করেছে। আমার আপন ভাই গাফফারকে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করতে করতে হত্যা করেছে। পাবনার জেলখানা থেকেও আমাদের কর্মীদের ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করেছে। আমাদের কর্মী মাসুদের মায়ের সামনে তার ১৭ বছরের ছোট ভাইকে হত্যা করেছে নারকীয়ভাবে। মায়ের সামনে প্রথমে তার হাত ও পা কেটেছে। যাকে ধরেছে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।, ফ্যাসিস্ট আমলের হিটলারকেও ছাড়িয়ে গেছে তাদের নির্মমতা। নৃশংসতায় পাক বাহিনীর চেয়েও বেশি ছিলো তারা। জেলে তারা যে আচরণ করেছে তা ব্রিটিশরাও করেনি।

তবে এটাও ঠিক যে, তখনকার সেনাবাহিনী ছিলো এ ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। বরং তারা আমাদের কাছে অপারেশনের আগে খবর পাঠিয়ে দিতো, সরে যাওয়ার জন্য। রক্ষীবাহিনী-মুজিববাহিনীর সঙ্গে সেনাবাহিনীর যে দ্বন্দ্ব ছিলো সেটা তখন আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারিনি। আমরাও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলেছি।

সিরাজ সিকদার ও জাসদের তৎপরতা সম্ভব হয়েছিলো পুলিশ ও সেনাবাহিনী তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো বলে। জাসদের সুবিধে ছিলো যে, সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের সংযোগ ছিলো।

আওয়ামী লীগ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয় জনগণ থেকে। এই বিচ্ছিন্নতা যতো বেড়েছে, তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতাও বেড়েছে সমহারে। সন্ত্রাস দিয়ে তারা সব দমন করতে চেয়েছে।

আমরা স্বীকার করি, রাজনীতিতে চারুমজুমদারের লাইন গ্রহণ আমাদের জন্য সঠিক ছিলো না। মার্ক্সবাদ ও সন্ত্রাসবাদ পাশাপাশি চলতে পারে না। কিন্তু আওয়ামী লীগ আমলে আমাদের হাতিয়ার ধরতে হয়েছিলো বাধ্য হয়ে। তারাই আমাদের ঠেলে দিয়েছে সে পথে। তাদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় আমরাও তাদের ওপর হামলা করেছি। অথচ এটা কাম্য ছিলো না। দেশ স্বাধীন হবার পর উচিত ছিলো সবাইকে নিয়ে দেশটা গড়ে তোলা। আমরা আমাদের ভুল স্বীকার করি কিন্তু তারা তা করবেন না।

মুজিব নিহত হবার পর জেলে মনসুর আলী ও তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিলো। তখন উত্থাপন করেছিলাম এ সব প্রশ্ন, কেন তারা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, কেন আমাদেরও ঠেলে দিয়েছিলেন বিপর্যয়ের দিকে? মনসুর আলী সাহেব অস্বীকার করে বলেছেন, এতোসব তারা জানতেন না। তাজউদ্দিন আহমদ বলেছিলেন, 'যা হবার হয়ে গেছে চলুন বের হবার পর সবাই মিলে মুক্তির পথ নিয়ে ভাবি, দেশটাকে গড়ে তুলি।' কিন্তু তারা বের হবার সুযোগ আর পেলেন না।

আহমেদ বুলবুল তখন জামালপুরে থাকতেন। তিনি তুলে ধরেছেন আরেকটি লোমহর্ষক ঘটনার কথা। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি রক্ষীবাহিনী পেট্রল নামক একজন জাসদ কর্মীকে জামালপুর স্কুলের মাঠে প্রকাশ্যে প্রহার করতে করতে হত্যা করে। তাকে হত্যার

www.pathagar.com

পূর্বে রক্ষীবাহিনী স্কুলের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মাঠে আসতে নির্দেশ দেয় এই হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার জন্য।

সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আওয়ামী দুঃশাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির চেয়ারম্যান সিরাজ সিকদার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পূর্ববাংলা ভারতের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। তাকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিলো ফ্যাসিস্টের নির্মম গুলিতে। আর সিরাজ সিকদার নিহত হবার পর জাতীয় সংসদে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব চিৎকার করে বলেছিলেন : কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?

নিজের দলের ওপর আক্রমণ ও তার স্বরূপ সম্পর্কে সিরাজ সিকদার নিজে লিখেছেন: পঁচিশ মার্চের পূর্বে ক্ষমতার দম্ভে ভুলে এই প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্টরা কমিউনিস্টদের জ্যান্ত কবরস্থ করা, নকশাল ধ্বংস করার জন্য গ্রামে গ্রামে সভা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথমেই বামপন্থীদের খতম করা। কিন্তু তারও ধৈর্য তাদের ছিলো না, অনেক স্থানেই দেশপ্রেমিকদের তারা খতম করতে শুরু করে। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে তাদের দখলকৃত এলাকার জেলখানায় আমাদের কর্মীদের মুক্তি দিতে তারা অস্বীকৃতি জানায়।

তারা উগ্রজাতীয়তাবাদী হয়ে হিটলারের ইহুদি নির্মূলের পথ অনুসরণ করে। অপরাধী নিরপরাধী নির্বিশেষে অবাঙালি উর্দু ভাষাভাষী শিশু-নারী, যুবক, বৃদ্ধ অর্থাৎ সবাইকে হত্যা করার ফ্যাসিস্ট তৎপরতা চালায়। শত শত নিরপরাধ নারীদের তারা ধর্ষণ করে, উলঙ্গ করে হাঁটায়, নির্মম অমানুষিক অত্যাচার চালায়, শিশুদের মায়ের সামনে হত্যা করে মা'কে শিশুর রক্ত পানে বাধ্য করে, বৃদ্ধ-যুবকদের সারি বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। এ জঘন্য কাজে তারা মেশিনগান, কামান পর্যন্ত ব্যবহার করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা আগুন দিয়ে হত্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের তারা নদীর মাঝে নির্জন দ্বীপে ফেলে আসে অভুক্ত অবস্থায় তাদের মারার জন্য। নিরীহ নারী-শিশুরা গ্রামের পর গ্রাম হেঁটে বেড়ায়। এই ফ্যাসিস্টদের ভয় উপেক্ষা করে কেউ কেউ তাদের আশ্রয় ও খাদ্য দেয়। এ সকল আশ্রয়হীন নারী-শিশুদের তারা পথিমধ্যে হত্যা করে, নারীদের ধর্ষণ করে ও অপহরণ করে। এভাবে বহু দেশপ্রেমিক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, কর্মচারী প্রাণ হারায়। এদের অপরাধ এরা উর্দু ভাষায় কথা বলে। এভাবে এরা পূর্ববাংলার, উর্দু ভাষাভাষী জনগণের সাথে বাঙালিদের সম্পর্ক তিক্ত করে তোলে। তাদের এ সকল কার্যকলাপের সাথে পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের কার্যকলাপের কোনো পার্থক্য নেই।

পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের ২৫ মার্চের পরবর্তীকালীন আক্রমণের ফলে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। তখন আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনীর বহু নেতা ও কর্মীকে সর্বহারা পার্টির কর্মী ও গেরিলারা আশ্রয় দেয়। তাদের ও তাদের পরিবারকে অর্থ, বাসস্থান, খাদ্য, নিরাপত্তা ও কাজের সুযোগ প্রদান করে।

পরবর্তীকালে ভারত থেকে সশস্ত্র হয়ে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনী পূর্ববাংলায় ফিরে এলে সর্বহারা পার্টির কর্মীরা ঐক্যের প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আওয়ামী লীগ ও তার মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ করার পরিবর্তে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাদের রক্তে হাত কলঙ্কিত করেছে এবং আমাদেরকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

তারা এ জঘন্য অন্তর্ঘাতী কাজ করার জন্য সাধারণ দেশপ্রেমিক সৈনিক ও কর্মীদের বাধ্য করেছে। কিন্তু তবুও প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে অনেক কর্মী এদের নীতির স্বরূপ উপলব্ধি

www.pathagar.com

করে আমাদের সাথে ঐকবদ্ধ হয়ে কাজ করে। এরূপ ঐক্যের ফলে ঢাকায় সর্বপ্রথম জাতীয় শত্রু ব্যারিস্টার মান্নানকে খতম করা হয়।

অতীতে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বের যতটুকু স্বাধীন ভূমিকা ছিলো তাও তারা ভারত ও তার মাধ্যমে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রদত্ত আশ্রয়, অস্ত্র, অর্থ ও সমর্থনের বিনিময়ে বিসর্জন দেয়, নিজেদেরকে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ, পূর্ববাংলায় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ এই ছয় পাহাড়ের দালালে পরিণত করে। পূর্ববাংলাকে তারা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের নিকট বন্ধক দেয়, তারা ভারতের ও সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। পূর্ব বাংলায় ছয় পাহাড়ের দালাল হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের ধ্বংসের কাজকে প্রাধান্য দেয়, পক্ষান্তরে পূর্ববাংলার জাতীয় স্বার্থ বিক্রয়কারী জাতীয় শত্রুদের পয়সার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। জনগণের ওপর অত্যাচার করে।

ছয় পাহাড়ের দালাল, ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার মুক্তিবাহিনী বরিশালের স্বরূপকাঠিতে আমাদের চারজন কর্মী ও গেরিলাকে হত্যা করে, অন্যান্যদের খুঁজে বেড়ায়। মাদারীপুরে তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কার্যরত আমাদের সমর্থকদের খতমের ষড়যন্ত্র করলে তারা বেরিয়ে আসে। এই তাঁবেদার বাহিনী আমাদের কর্মীর বাড়িতে হানা দেয় এবং নারীদের নির্যাতন করে, বাড়ি লুট করে।

সম্প্রতি টাঙ্গাইলে তারা আলোচনার কথা বলে আমাদের দুজন কর্মীর সাথে বৈঠকে মিলিত হয় এবং সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে গ্রেফতার করে। তারা গ্রেফতারকৃত কর্মীদের বন্দুকের ডগায় সমস্ত গেরিলাদের নিকট থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার জন্য পাঠায়। আমাদের গেরিলারা এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়। একজন নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়, কিন্তু অপরজনকে তারা বন্দি করে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এ এলাকার এক জাতীয় শত্রুর নির্দেশে তারা আমাদের দুজন গেরিলাকে কেটে লবণ দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

তারা বরিশাল জেলার ঝালকাঠি, কাউখালি, স্বরূপকাঠি অঞ্চলে আমাদের তিনটি গেরিলা ইউনিটকে ঘেরাও ও নিরস্ত্র করে এবং গেরিলাদের বন্দি করে, আমাদের গেরিলাদের কেউ কেউ পালিয়ে আসতে সক্ষম হয় বাকিদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে তাদেরকে মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্ট খুনিরা হত্যা করেছে। এ এলাকায় তারা আমাদের হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে এবং আমাদের দ্বারা মুক্ত বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয়। তারা আমাদের নারী গেরিলা শিখাকে বন্দি করে, তার পরিবারের সকলকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে; শিখার ওপর নির্মম পাশবিক অত্যাচার চালায়, তাকে ধর্ষণ করে। তার খোঁজ আজও পাওয়া যায়নি।

তারা আরো কয়েকজন নারীগেরিলা ও কর্মীকে খতমের জন্য খোঁজ করে। তাদের এই ঘৃন্য বর্বর, ফ্যাসিবাদী তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে ভারতীয় শিখ, গুর্খা সৈন্য ও অফিসাররা।

তারা ফরিদপুরের কালকিনী অঞ্চলে আলোচনার কথা বলে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের দুজন গেরিলাকে বন্দি ও নিরস্ত্র করে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়। তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হলে জনসাধারণ বুক পেতে দেয়, আমাদের আগে হত্যা করো, তারপর এদেরকে হত্যা করো। জনগণের হস্তক্ষেপে তারা আমাদের কর্মীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

কুখ্যাত ডাকাত-নারী নির্যাতনকারী কুদ্দস মোল্লার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মুক্তিবহিনীর

www.pathagar.com

ফ্যাসিস্ট দস্যুরা মেহেন্দিগঞ্জেও আমাদের একাধিক গেরিলা ইউনিটকে নিরস্ত্র করে, মূল্যবান দ্রব্যাদি লুট করে এবং গেরিলাদের গ্রেফতার করে। তাদের ওপর অশেষ নির্যাতন চালায়। গৌরনদী অঞ্চলে তারা আমাদের দ্বারা মুক্ত বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয় এবং কর্মীদের খতম করার প্রচেষ্টা চালায়।

মঠবাড়িয়া অঞ্চলে এই ফ্যাসিস্ট দস্যুরা আমাদের মুক্তাঞ্চল আক্রমণ করে ও দখল করে নেয়। গেরিলাদের সামনাসামনি ধ্বংস করতে না পেরে বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্তর্ঘাতকতার পথ গ্রহণ করে। এক সাথে কাজ করার ভাওতা দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হয় এবং যৌথ আক্রমণের সময় পেছন থেকে গুলি করে প্রতিভাবান কর্মী হাসানকে হত্যা করে এর সাথে শহীদ হয় হিমু নামক অপর এক কর্মী।

বরিশালের পাদ্রিশিবপুর অঞ্চলে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ভান করে আওয়ামী বাহিনী সুযোগ সন্ধান করে নেতৃস্থানীয় কর্মীদের খতম করার জন্য। শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে ডেকে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে মাসুম ও অপর এক গেরিলাকে তারা হত্যা করে। ঢাকার নরসিংদী অঞ্চলে আমাদের গেরিলাদের তারা অস্ত্র জমা দিতে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বলে, অন্যথায় খতম করবে বলে হুমকি দেয়? আমাদের গ্রেফতারকৃত কর্মীদের নিকট বেত দেখিয়ে এ ফ্যাসিস্টরা বলে তোমাদের নেতা সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করে বেত দিয়ে মারতে মারতে ভারতে নিয়ে যাবো।

পূর্ববাংলার সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর এই ফ্যাসিস্টরা সভা করে সিদ্ধান্ত নেয়, ভারতের গোলাম হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ দেশপ্রেমিকদের খতম করার জন্য। পাক-সামরিক দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে আমাদেরসহ অন্য দেশপ্রেমিকদের খোঁজ করা—খতম করার ওপর তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনী ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলরা যথাযথ খবরের ভিত্তিতে কোনো কোনো ইউনিটকে ঘেরাও করে, নিরস্ত্র করে কিছুসংখ্যক কর্মীকে হত্যা করে। টাঙ্গাইলে জাতীয় শত্রু চেয়ারম্যানের খবরের ভিত্তিতে তারা আমাদের দুজন গেরিলাকে কেটে কেটে লবণ দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বহু স্থানে তারা আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে।

আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত ছিলো এরূপ কিছু বুদ্ধিজীবী, ভ্রষ্ট সর্বহারাদের, যাদের সরল বিশ্বাসে আমাদের গেরিলা বাহিনীতে নিয়েছিলাম, পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম কিন্তু ভারত-প্রত্যাগত মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে যোগাযোগ হলে তারা প্ররোচিত হয়ে দলত্যাগ করে এবং বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করে আমাদের কর্মীদের ও ইউনিটের অবস্থান জানিয়ে দেয়, তাদের সাথে যোগদান করে। অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত ছিলো কিন্তু আমাদের আশ্রয়ে বেঁচেছিলো এরূপ কিছুসংখ্যক সামন্তবাদী, বুর্জোয়াজীবী সহানুভূতিশীলরা ভারত-প্রত্যাগত মুক্তিবাহনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের খবর সরবরাহকারী হয়।

কয়েক ক্ষেত্রে ঐক্যের আলোচনার কথা বলে তারা ঐক্যবৈঠকে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের কর্মীদের গ্রেফতার ও নিরস্ত্র করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। এক্ষেত্রে জনসাধারণ হস্তক্ষেপ করে; তারা বুক পেতে বলে আমাদের আগে হত্যা করো, তারপর একে হত্যা করো। জনসাধারণের হস্তক্ষেপে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আমাদের কর্মীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

কয়েক ক্ষেত্রে গ্রেফতারকৃত আমাদের কর্মীরা পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

(সিরাজ সিকদারের রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৬১ ও ৬২।)

নূর হোসেন (বিএনসি, বিকম) বাংলাদেশ বিমানে চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী ও ভালো সংগঠক। পাকিস্তান আমলে তিনিই প্রথম (৬৯ সালে) পিআইএতে সর্বপ্রথম সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ঘেরাও অভিযান পরিচালনা করেন এবং সেখানে প্রগতিশীল রাজনীতির বিকাশ ঘটান। স্বাধীনতার পর ১৯৭০ সালের ২১ মে মুজিববাদীরা প্রকাশ্য মিছিলে তাকে গুলি করে হত্যা করে। এ সম্পর্কে শহীদ নূর হোসেন-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীশীর্ষক রচনার একাংশে উল্লেখ করা হয় :

১৯৭৩ সালের ২১ মে মওলানা ভাসানীর অনশন ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে আহূত হরতালের দিনে ঢাকায় রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনাকালে নূর হোসেন ডিপিআই অফিসের সামনে মুজিববাদী গুণ্ডাদের গুলিতে আহত হন। আহত অবস্থায় তৎকালীন গুণ্ডাবাহিনী তাকে একটি রেডক্রসের জিপে তুলে নিয়ে যায়। তার পরিবার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মালেক উকিলের সাথে আলাপ আলোচনা করেও শেষ পর্যন্ত শহীদ নূর হোসেনের লাশ ফেরত পাননি।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে রাজশাহী জেলে অনেক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে বন্দি ছিলেন মনিসিংহ ও দেবেন সিকদার। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে জেলের কয়েদিরা বিদ্রোহ করে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এই কাজে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছিলেন সাবান মল্লিক। সাবান মল্লিক রাজনৈতিক কর্মী ছাড়াও ছিলেন সৌখিন ডাকাত।

ধনীদের বাড়িতে ডাকাতি করে সেই অর্থ বিলিয়ে দিতেন গরিবদের মধ্যে। পরে মুজিববাদীরা তাকে হত্যা করে যদিও তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এ সম্পর্কে দেবেন সিকদার লিখেছেন :

সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো, যার দক্ষতা ও কাজের ফলে রাজশাহী জেলবিদ্রোহ সফল হয়েছিলো, সেই দক্ষ সংগঠক কমরেড সাবান মল্লিককে রুশভারতের আওয়ামী পাণ্ডারা বন্ধুবেশে ডেকে এনে যুদ্ধের শেষদিকে হত্যা করেছিলো। যে সাবান মল্লিক জেল থেকে বের হয়ে বাড়ি না গিয়ে সোজা পাবনায় গিয়ে টিপু বিশ্বাসের সাথে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিলো, পরে টিপু বিশ্বাসরা যখন পাকিস্তানবিরোধী যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন সাবান মল্লিক পাঞ্জাবিদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া একটি চায়নিজ রাইফেল নিয়ে নিজ গ্রামে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারপরও তিনি নিহত হলেন যেহেতু তিনি দেবেন সিকদারের শিষ্য ও কমিউনিস্ট এবং একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক। আজও চাটমোহর থানার সমস্ত জনগণ তার জীবন্ত সাক্ষী। তার স্ত্রী ও দুই সন্তান অভিসম্পাত দিচ্ছে স্বাধীনতার জিম্মাদারদের।

(বাইশ বছরের গোপন জীবন, গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর পৃষ্ঠা : ২০২)

কুষ্টিয়া জেলার আলোকদিয়ার মতিউর রহমান বাবুকে হত্যার পর রক্ষীবাহিনী তার আরেক ছোট ভাই আনিসুর রহমানকেও হত্যা করে। বামপন্থী নেতা দেবেন সিকদার শহীদদের জীবনী সংগ্রহ প্রশ্নমালায় তার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানতে চেয়ে যে প্রশ্নমালা বিলি করেছিলেন (১৯৭৯ সালে) সেখানে মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয় : কমরেড মতিয়ুর

www.pathagar.com

রহমান বাবুকে হত্যা করার পরে তার ছোট ভাই ওয়ালিউর রহমান মতিয়ুর রহমান বাবুকে হত্যা করার পরে তার ছোট ভাই ওয়ালিউর রহমান যখন প্রথমে মতিভাইয়ের লাশ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে তখন রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে ধরা পড়ে এবং নিকটাত্মীয় এক রক্ষীবাহিনীর লিডারের সহযোগিতায় ছাড়া পাবার পরও সেই ওয়ালিউর রহমানকে খুঁজতে গিয়ে তাকে না পেয়ে তাদের ছোট ভাই ৫ম শ্রেণীর ছাত্র আনিসুর রহমানকে ধরে নিয়ে গিয়ে রক্ষীবাহিনী হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধের বীর সেক্টর কমান্ডার মেজর (অব.) এম. এ জলিল সম্পর্কে আওয়ামী সিদ্ধান্ত কতোটা বর্বর ছিলো সে বিবরণ আমরা আগেও দিয়েছি। শুধুমাত্র সরকারের বিরোধিতার কারণে মেজর জলিল রাষ্ট্রীয় খেতাব পাননি। শুধু তাই নয়, সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্রের বিরোধিতা করার কারণেই তিনি নির্মমভাবে নির্যাতিত এবং কারারুদ্ধ হয়েছেন। রক্তাক্ত হয়েছে তার দেহ। জাসদের সভাপতি হিসেবে ১৯৭৪-এর ১৭ মার্চ তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে যে কর্মসূচি তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তা পালন করতে গিয়ে কিভাবে রক্ষীবাহিনীর হিংস্র হামলার শিকার হয়েছেন, তা তিনি নিজেও লিখেছেন। সেই ঘটনা সম্পর্কে মেজর জলিল এবং ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি করছি।

আজ ১৭ মার্চ, ১৯৭৪ সাল।... বেলা দশটা বাজতেই দেখা গেলো গোটা বিশেক বড় বড় ট্রাক ভর্তি রক্ষীবাহিনী ও পুলিশ-এর আড্ডা জমেছে বায়তুল মোকাররমের সামনে, আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে এবং পল্টনের আশপাশে। বেলা দুটো বাজতে আরো গোটা তিরিশেক ট্রাক ভর্তি সরকারি বাহিনী এলো। এছাড়া প্রধান প্রধান মোড়ে পুলিশ ভ্যানগুলোকে দাঁড়ানো দেখা গেলো। মনে হচ্ছে, ওরা যেন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে নামবে। প্রত্যেকের হাতে ছিলো অত্যাধুনিক অস্ত্র, এসএলআর, স্টেনগান, এলএমজি, গ্রেনেড। সরকারি বাহিনীকে এরকম যুদ্ধাবস্থায় সজ্জিত দেখে জনসাধারণ কৌতূহল বোধ করলো—এমন যুদ্ধ পরিস্থিতি কাদের ঠেকানোর জন্যে।

বিকেল তিনটা বাজতে না বাজতেই বিভিন্ন দিক থেকে জনতার ঢল নেমে এলো পল্টনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পল্টন উপচে লোকজন পার্শ্ববর্তী স্টেডিয়ামের নিচে, উপরে এবং গুলিস্তান বিল্ডিং পর্যন্ত জমাট বেঁধে গেলো।... অবশেষে মিছিলটি এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির গেটের সামনে ঘিরে দাঁড়ালো। উত্তেজিত জনতার স্লোগান চলছে তখন পুরোদমে। দীর্ঘক্ষণ এমনি ঘিরে রাখার পর হঠাৎ অসংখ্য অস্ত্রধারী রক্ষীবাহিনী '...' মতো ছুটে এলো গেটের দিকে। রাইফেলের বাঁট ও বেয়োনেট দিয়ে জখম করলো অসংখ্য ছাত্রজনতাকে। লোকজন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছোটাছুটি শুরু করলো। মেজর জলিল, আ.স.ম রব সামনে এসে রক্ষীবাহিনীকে খালি হাতেই বাঁধা দিতে লাগলেন।... অকস্মাৎ শুরু হলো বন্যার মতো গুলিবর্ষণ। এসএলআর, স্টেনগান সবগুলো টকটক, ঠুসঠাস, দুরুমদারোম শুরু হলো আপন আপন গতিতে। যেনো শত শত দানব ছুটে আসছে, যে যেখানে পারলো শুয়ে পড়লো। নিরীহ, নিরস্ত্র জনতার আর্তনাদ শোনা গেল চারদিকে। এ যেন যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ, শুরু হলো। মুহূর্তে গোটা মিন্টুরোডটি এক পরীক্ষায় যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নিলো। সন্ধ্যা তখন সবেমাত্র ঘনিয়ে এসেছে। অন্ধকারের গাঢ় ছায়া তখনো পড়েনি। মাটিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলো একটি মেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে।... রাস্তার পাশে দুজনের রক্তমাখা দেহ। অদূরে আরো কয়েকটি যুবক-যুবতীর রক্তমাখা স্তব্ধ শরীর পড়ে রয়েছে। রক্ষীবাহিনীর গুলি তখনো থামেনি। গাঢ় অন্ধকারে বীভৎসতা ভৌতিক হয়ে উঠছে।

www.pathagar.com

আহতদের মরণ আর্তনাদ, রক্ষীবাহিনীর শিকারি চিৎকার, গুলির শব্দ খান খান করে দেয় রাতের নিস্তব্ধতাকে। গোলাগুলি চলার সময়েই পুলিশের একটা ট্রাক এসে তাড়াতাড়ি আহত নিহত অবস্থায় যারা গেটের সামনে পড়েছিলো তাদের ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

জাসদের ঘেরাও এবং অন্যান্য প্রকাশ্য দলের ওপর সরকারি বাহিনীর নির্মমতা ও নির্যাতন সম্পর্কে মওদুদ আহমদ লিখেছেন, এই সময়ে মওলানার নেতৃত্বাধীন ন্যাপ এবং জাসদ উভয় দল তীব্র আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু সংস্কারপন্থী অসংখ্য যুবকের সমর্থনপুষ্ট জাসদই সরকারের জন্য প্রধান হুমকি হিসেবে অবস্থান করতে থাকে। জনগণের কাছে জাসদই ছিলো তখন বৃহত্তম বিরোধী রাজনৈতিক দল। ১৭ই মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে জাসদ এক বিরাট জনসমাবেশ অনুষ্ঠান শেষে সরকারের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। জনসভায় জাসদ সরকারের নৈরাজ্য ও নির্যাতনের অবসানকল্পে শোষক শ্রেণীর এজেন্টদের ঘেরাও-এর কর্মসূচি সম্বলিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঢাকা থেকে এই ঘেরাও অভিযান শুরু হয় এবং একই দিনে রেডক্রসের চেয়ারম্যান, মহল্লা ত্রাণ কমিটির চেয়ারম্যান, বেআইনী গাড়িবাড়িজমি সম্পত্তির দখলদার, রাষ্ট্রীয়-বাণিজ্য সংস্থ্যা, ভুয়া লাইসেন্সধারী, সরকারের আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের অফিস, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কেন্দ্রীয় কারাগার, সচিবালয়, পরিকল্পনা কমিশন, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের অফিস ও বাসগৃহ, রেডিও-টিভি ও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র, রক্ষীবাহিনীর কার্যালয় এবং সরকারি ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান ঘেরাওয়ের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

একই দিনে জাসদ মিন্টু রোডে অবস্থিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের মাধ্যমে ঘেরাও অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। জাসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে জনসভা শেষে একটি বিশালাকার বিক্ষোভ মিছিল, একটি স্মারকলিপি হস্তান্তরের জন্য পল্টন ময়দান থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন অভিমুখে রওয়ানা হয়। মিছিলটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করলে সেখানে উত্তেজিত জনতার সাথে কর্তব্যরত পুলিশ বাহিনীর এক খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রক্ষীবাহিনী তলব করা হয়। সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে। যদিও দুই পক্ষই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছিলো বলে অভিযোগ পাওয়া যায়, তথাপি এই গুলিবর্ষণের ফলে মূল্য দিতে হয়েছে বিক্ষোভকারীদেরই। গুলিবর্ষণে সরকারিভাবে ছয়জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সংঘর্ষে নিহত হন ১২ জনেরও বেশি, শতাধিক ব্যক্তি আহত হন এবং জাসদের সভাপতি এম. এ. জলিল ও সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম আব্দুর রবসহ ২০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

পরদিন আওয়ামী লীগ জাসদের ওপর একটি পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে আরো প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। সরকার যেখানে জাসদকে ধ্বংসযজ্ঞে নিয়োজিত রাষ্ট্রবিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলো, সেখানে আওয়ামী লীগ একে চীন-মার্কিন দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে বলে যে, এরা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে সরকারের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি ব্যাহত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সেদিন আওয়ামী লীগ জাসদকে স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র এবং উন্নয়নের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ঢাকা শহরে নানা ধরনের অস্ত্রসজ্জিত লোক সমন্বয়ে বিরাট এক মিছিল বের করে। তারা জাসদের নেতা-কর্মীদের শাস্তি দাবি করে ও বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে অবস্থিত জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় পুড়িয়ে

www.pathagar.com

দেয়। রক্ষীবাহিনী একই রাতে জাসদের মুখপত্র দৈনিক গণকণ্ঠ অফিসের দখল গ্রহণ করে এবং গণকণ্ঠের সম্পাদক আল মাহমুদকে আটক করে জেলখানায় পাঠায়।

ঘেরাও মিছিলে জাসদ কর্মী হত্যা এবং দলের অফিস আক্রমণের প্রেক্ষিতে দেশের প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সরকারি ভূমিকার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে। পরদিন সরকার দেশব্যাপী প্রায় প্রত্যেকটি জেলা ও মহকুমায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। শত শত জাসদ কর্মীকে আটক করে জেলে পাঠানো হয়। এতে করে প্রচুরসংখ্যক জাসদ নেতা ও কর্মী জেলে থাকায় এবং আওয়ামী লীগ জাসদকে শায়েস্তা করার নামে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করায় দলের অন্যান্য কর্মীরা হতোদ্যম হয়ে পড়েন। বিক্ষোভ প্রশমিত হলে সরকার ক্ষমাহীনভাবে জাসদকে শায়েস্তা করার জন্য মাঠে নামেন। এ সময় সরকারের প্রশাসনযন্ত্রের একটি সুসংগঠিত অংশকে জাসদের ওপর দমননীতি চালানোর জন্য লেলিয়ে দেয়া হয়। এতে করে দেশের অন্যান্য মার্কসবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তাদের তৎপরতা জোরদার করতে শুরু করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টি মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক, টিপু বিশ্বাস, ওয়াহিদুর রহমান ও অন্যান্যের নেতৃত্বাধীন কমুনিস্ট গ্রুপগুলোর বিভিন্ন অংশও ক্রমশ সক্রিয় হতে থাকে। জাসদের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ শুরু হওয়ায় দলের অসংখ্য কর্মী আন্ডারগ্রাউন্ডে আশ্রয় নেন। পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন গুপ্ত সংগঠনের মাধ্যমে সশস্ত্র গ্রুপ তৈরি করে দেশের রাজনৈতিক প্রবাহে নতুন ধারা সংযোজনের প্রত্যয় নিয়ে আবির্ভূত হন।

মুজিব আমলে সামগ্রিকভাবে হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাস সম্পর্কে হায়দার আকবর খান রনো লিখেছেন: '৭৩ সালের দিকে কালীগঞ্জে পুলিশি আক্রমণ শুরু হয়। '৭৪-এর দিকে রক্ষীবাহিনী নামে। '৭৩ সালে পার্টির গেরিলারা ৫ জন পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নেন। এরপর ব্যাপক পুলিশি অত্যাচার চলে গোটা এলাকায়। আড়মুখ গ্রামে ৬৩টি বাড়ি পোড়ানো হয়, বহু ধর্ষণ ছিলো রক্ষীবাহিনীর নিয়মিত ঘটনা। কালীগঞ্জের কালার বাজারে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের কাছে একটি গণকবর করা হয়েছিলো। সেই সময়কার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জনৈক প্রাক্তন পার্টি গেরিলা নেতা আমাকে বলেছেন, পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর আক্রমণ তীব্র হলে আশ্রয় পাওয়া যেতো না। কিন্তু সরকারি বাহিনী কাছাকাছি না থাকলে আশ্রয় পাওয়া যেতো। পার্টি তখনও পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে কোনো যুদ্ধ করেনি, বরং যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। ১৯৭৪-এর ১১ অক্টোবর পার্টির এক গোপন সভা হচ্ছে। এমন সময় রক্ষীবাহিনী দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়ে। এই প্রথম কালীগঞ্জের পার্টি রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। দুজন পার্টি নেতা ওয়াজেদ আলী ও কামরুজ্জামান মোল্লা আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। তাদেরকে বন্দি ও আহত অবস্থায় ৫/৭ মাইল দূরে গরুর গাড়িতে করে রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য গেরিলারা কোনো প্রকার চেষ্টা করেনি। এই ঘটনা অনেক পার্টি কর্মীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর কিছুদিন পর আরও বেশ কিছু পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মী ধরা পড়েন। তার মধ্যে রশিদা নামে একজন নারীকর্মীও ছিলেন। তাদের সবাইকেই রক্ষীবাহিনী হত্যা করে। একই সঙ্গে এলাকায় রক্ষীবাহিনী ও যুবলীগের গণপিটুনী আরম্ভ হয়। পার্টির সামান্যতম সমর্থকদেরও কালিগঞ্জে থাকা সম্ভব ছিলো না।

এই রকম অবস্থায় নতুন করে মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯৭৫-এর জানুয়ারি মাসে পার্টি সিদ্ধান্ত নেয়, চিহ্নিত শত্রুকে খুন করতে হবে এবং বড় রকমের ঘটনা ঘটিয়ে জনগণকে

www.pathagar.com

উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এর আগে বহুদিন পর্যন্ত পার্টি খতমের লাইন বাদ দিয়েছিলো। এই সিদ্ধান্তের পর কয়েক রাতে কালীগঞ্জে পরপর কয়েকটি খতম করা হয়। যাদের খুন করা হয়, তারা সকলেই যুবলীগের সদস্য এবং পার্টি ক্যাডারদের হত্যা করার জন্য দায়ী ছিলো। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আরও বড় ধরনের ঘটনা ঘটাতে হবে। এই জন্য এই বৎসর জানুয়ারি মাসে রাতের বেলায় সাধুহাটি ফার্মের ধান লুট করা হয়। প্রায় তিরিশটা গ্রামের কৃষক এতে অংশগ্রহণ করেন। সারারাত পার্টির গেরিলারা সশস্ত্রভাবে রাস্তার দুই দিক পাহারা দেয় এবং রক্ষীবাহিনী আসলে তাকে প্রতিহত করার জন্যও প্রস্তুত থাকে।

১৯৭৩ থেকে ৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস পরিচালিত হয় এই সন্ত্রাসের কেন্দ্র বিন্দু ছিলো '৭৩-এর নির্বাচন। বক্ষমান আলোচনায় গোড়াতেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে সন্ত্রাসের উদ্ভব হয়েছে ক্ষমতা ও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। '৭৩-এ সম্পন্ন নির্বাচনের সন্ত্রাস ও কারচুপি সম্পর্কে মদুদ আহমেদ লিখেছেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ষড়যন্ত্র ও ভীতি প্রদর্শনের পন্থা গ্রহণ করে। দলীয় নেতাকে খুশি করতে গিয়ে একজন আওয়ামী লীগ নেতা ভোট সংগ্রহের যুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। অসহিষ্ণু আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করতে থাকেন যে, দেশ শাসন করার অধিকার তাদের ছাড়া অন্য কারো নেই। কাজেই নিজ নিজ এলাকায় নির্বাচনযুদ্ধে তারা গণতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণের কথা বিস্মৃত হয়ে বেপরোয়াভাবে ভোট কারচুপি করে দেখাতে চান যে, তার এলাকায় বাস্তবে বিরোধী রাজনীতির কোনো অস্তিত্বই নেই। এ সময় সম্পূর্ণ সরকারি প্রশাসনযন্ত্র ছিলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে। দৈনিক সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের মতো সংবাদ মাধ্যমসমূহ, সরকারি যানবাহন আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণার কাজে নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে সকল রকমের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নির্বাচনে বিজয় সুনিশ্চিত জেনেও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ছিলেন দুর্বিনীত, রোষায়ত, অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ এবং নির্বাচনে যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে তারা প্রচেষ্টার কোনো ঘাটতি দেখাননি।

ক্ষমতাসীন দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার অব্যাহত রাখলেও বিরোধী দলগুলোর বিশেষ করে ভাসানী ন্যাপ ও জাসদের জনসভাগুলোতে প্রচুর লোক সমাগম হচ্ছিলো— যা বাংলাদেশে নির্বাচনে জনপ্রিয়তার একটি মূল মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। শেখ মুজিব এবং তার মন্ত্রীরা ত্রাণকার্যের জন্য ব্যবহার্য হেলিকপ্টার নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করলেও বিরোধী দলগুলো ক্রমশ জোরসমর্থন পেতে থাকে। ফলে নির্বাচন যতোই ঘনিয়ে আসতে থাকে, আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও সমর্থকরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তার সমর্থকদের প্রতি ততোই অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে থাকে। নির্বাচনে পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র পেশ করার সময় ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ বিরোধের সূচনা ঘটে। এ উপমহাদেশে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনে বিজয়ী হওয়াটাকে একটি বিশেষ সম্মানের বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেউ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে আসতে পারলে সরকারি দলে উচ্চাসন তার জন্য প্রায় নিশ্চিতভাবেই সংরক্ষিত রাখা হয়।

কাজেই ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখে যখন প্রার্থীদের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হলো, তখন দেখা গেলো ছয়জন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর আসনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তারা হলেন :

১। এম সোহরাব হোসেন, ২। তোফায়েল আহমদ, ৩। মোঃ মোতাহার উদ্দিন, ৪।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমান, ৫। কে. এম. ওবায়দুর রহমান, ৬। শেখ মুজিবুর রহমান, (অন্য একটি আসনে)।

সম্ভবত কেবলমাত্র শেখ মুজিব ছাড়া অন্যান্য আসনগুলোতে অভিযোগ তোলা হয় যে, আওয়ামী লীগের প্রার্থী কিংবা তাদের সমর্থকরা অন্য কাউকে সেই এলাকা থেকে মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেননি। জীবনের হুমকি, ভীতি প্রদর্শন কিংবা অপহরণসহ অন্যান্য নানা ধরনের উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র পেশ করা থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। পরবর্তীকালে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে দেখা যায় যে, আরো ৫ জন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তারা হলেন :

১। এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান, ২। রফিক উদ্দীন ভূঁইয়া, ৩। মনোরঞ্জন ধর, ৪। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ৫। জিল্লুর রহমান।

উপরোক্ত প্রার্থীদের মধ্যে কারো কারো এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হয়। এর আগে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন, এমন সহকর্মীদের সঙ্গে জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায় নেমে তারা নিজেদের বিপুল জনপ্রিয়তা প্রমাণের জন্য সেই একই ধরনের পন্থা অবলম্বন করেন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই বলপ্রয়োগ করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করানো হয়।

বিরোধী দলগুলো এ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায় ও ক্ষমতাসীন দলের এহেন আচরণকে ফ্যাসিস্ট মনোভাবের পরিচায়ক বলে অভিযোগ উত্থাপিত করে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল মনোনয়নপত্র পেশ করার জন্য নতুন তারিখ স্থির করার দাবি জানায়। অন্যান্য দলগুলোর পক্ষ থেকেও একই দাবি উত্থাপন করা হয়। নির্বাচনের দিন কি ঘটতে পারে, এ নিয়ে তারা আগাম আশংকা প্রকাশ করতে থাকেন। বায়তুল মোকাররম চত্বরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জাসদের আ. স. ম. আবদুর রব ঘোষণা করেন যে, বিদ্যমান পরিস্থিতি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূলে নয়, কারণ সরকার ভীতি প্রদর্শনের পন্থা বেছে নিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, জাসদের অনেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেয়া হয়নি এবং সরকার সেক্ষেত্রে সামান্য সৌজন্যবোধও প্রদর্শন করেননি। তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপন করে তার পদত্যাগ দাবি করেন। একথা সত্য যে, বিদ্যমান অবস্থায় তাদের যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও দেয়া হতো, তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু এর পরেও তারা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, তাতে জনমনে ত্রাসের সঞ্চার ঘটে এবং ক্ষমতাসীন দলকে এর জন্য অনেক অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

বলাবাহুল্য আওয়ামী লীগের এই মনোভাব নির্বাচনী প্রচারণার গোটা সময় জুড়ে অব্যাহত ছিলো এবং নির্বাচনের দিনে তা চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয়। এ ধরনের প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও প্রায় দুই ডজন আসনে বিরোধী দলীয় প্রার্থীরা নিশ্চিত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যান। ভোট গণনা শুরু হবার পর কোনো কোনো আসনে স্থানীয় অফিসারেরা বিরোধীদলীয় প্রার্থীকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত বলে ঘোষণাও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের বিজয়ী হতে দেয়া হয়নি। বিরোধীদলীয় নেতাদের মধ্যে টাঙ্গাইল ন্যাপ-ভাসানীর ড. আলীম আল রাজী ক্ষমতাসীন মন্ত্রী আবদুল মান্নানের বিরুদ্ধে, জাসদের শাজাহান সিরাজ আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে, ভাসানী ন্যাপের আবদুর রহমান মীর্জা তোফায়েল হোসেনের বিরুদ্ধে, বাকেরগঞ্জ জাসদের মেজর (অব.) জলিল আবদুল মান্নান ও হরনাথ বাইন-এর বিরুদ্ধে (দুটি আসনে), ভাসানী ন্যাপের রাশেদ খান মেনন ফজলুল হক ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুরের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

(দুটি আসনে), সিলেট ন্যাপের সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের বিরুদ্ধে, কুমিল্লার ন্যাপ (মো)-এর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ক্যাপ্টেন সুজাত আলীর বিরুদ্ধে এবং ন্যাপের মোশতাক আহমেদ চৌধুরী এম. আর সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে বিপুল ভোটে অগ্রগামী ছিলেন। এদের মধ্যে এম. এ. জলিল, শাজাহান সিরাজ এবং মোশতাক আহমেদ চৌধুরীর নাম টেলিভিশনে বিজয়ী বলে ঘোষণাও করা হয়। এছাড়াও আরো কয়েকজন বিরোধীদলীয় প্রার্থী নুরুদ্দিন জাহিদ (জাসদ) কুমিল্লা-৭ আসনে, মোখতার আহমদ (জাসদ) চট্টগ্রাম-১৫ আসনে, এ.কে.এম. হাম্মাদ চৌধুরী (স্বতন্ত্র) নোয়াখালী-১৩ আসনে, নুরুল ইসলাম মাস্টার (জাসদ) নোয়াখালী-৭ আসনে, ফজলুল হক খোন্দকার (স্বতন্ত্র) ঢাকা-২৪ আসনে, হারুনুর রশিদ ময়মনসিংহ-৪ আসন, এস. এম. এ. সবুর (ন্যাপ-ভা) খুলনা-৩ আসনে এবং আহসান আহমেদ (ন্যাপ-ভা) রংপুর-২ আসনে ভোট গণনায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের খুবই কাছাকাছি ছিলেন। তারা এবং আরো প্রায় এক ডজন বিরোধী প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, নির্বাচনে কারচুপি না হলে এবং আওয়ামী লীগ অসৎ পন্থা অবলম্বন না করলে নিজেদের নির্বাচনী এলাকা থেকে তারা বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করতেন।

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতারা পুরো ঘটনাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। বিশেষ করে বিশিষ্ট নেতাদের নির্বাচনে পাস করিয়ে আনা ছিলো তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দলের নেতারা যুক্তি দেখান যে, আতাউর রহমান খান, মশিউর রহমান, এম. এ. জলিল, শাজাহান, সিরাজ, রাশেদ খান মেনন, ড. আলিম আল রাজী, মোজাফফর আহমদ, সুরঞ্জিত সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যদি নির্বাচনে জয়লাভ করেন, তা শুধুমাত্র দলের ওপর প্রতক্ষ হুমকিই সৃষ্টি করবে না, জাতির পিতার জন্যও তা হবে অবমাননাকর। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকাকালে এবং তিনি দল ও সরকারের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে এ ধরনের পরিস্থিতি তাদের কাছে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। নির্বাচনে যদি উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ জয়ী হন তাহলে তা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতাই প্রমাণ করতো এবং পক্ষান্তরে তা বিরোধী দলের চূড়ান্ত বিজয় বলেই প্রতিভাত হতো। তাছাড়া বিরোধী দলের এরা জিতে এলে সংসদে তাদের মুখোমুখি হওয়াও আওয়ামী লীগের পক্ষে কঠিন হতো। আওয়ামী লীগ আরো মনে করে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করে বিরোধী দলগুলোর কয়েকজন নেতা দুর্নাম কুড়িয়েছেন। সাধারণ নির্বাচনে তারাও জয়লাভ করলে তা তো স্বাধীনতারই ধারাবিরোধী। তারা মনে করেন, নির্বাচনে গুরুত্ববিহীন কিছুসংখ্যক বিরোধী নেতা জয়লাভ করলে তাতে তেমন কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু বিশিষ্ট বিরোধী নেতারা জিতে যাবেন— তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিশেষ করে আবদুল মান্নান ও আবদুস সামাদ আজাদের মতো মন্ত্রী পরাজিত হলে তা হতো আওয়ামী লীগের জন্য এক ধরনের বিপর্যয়।

বেতার ও টেলিভিশনে নির্বাচনের ফলাফল প্রচার শুরু হতেই আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তৎপর হয়ে ওঠেন। যখন তারা দেখতে পান যে, আওয়ামী লীগের কয়েকজন প্রথম সারির নেতা বিরোধী কয়েকজন নেতার কাছে পরাজিত হতে চলেছেন, তখন তাদের মাথায় বজ্রাঘাত ঘটে। নির্বাচন নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্বাহ্নে গঠিত কেন্দ্রীয় প্রচার কমিটিকে স্তব্ধ করে দিয়ে গণভবনের একটি কন্ট্রোল রুমে আবেদন জানাতে থাকেন তখন গোটা প্রশাসনযন্ত্র ও রক্ষীবাহিনী বিপন্ন নেতাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। ভোট গণনা ও ফলাফলের প্রবণতা যখন কয়েকজন বিরোধী নেতার সুনিশ্চিত জয়ের ইঙ্গিত

www.pathagar.com

দিচ্ছিলো, তখন অন্ততপক্ষে ছয়টি নির্বাচনী এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে হেলিকপ্টার পাঠানো হয়। তারা সমস্ত ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নেয় এবং পূর্বেই ব্যালট পেপার ভর্তি বাক্সগুলোর পরিবর্তে অন্য বাক্স নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে রেখে আসে।

নির্বাচনে ব্যাপকভাবে জয়লাভ আওয়ামী লীগের শুধুমাত্র রাজনৈতিক শক্তিই বৃদ্ধি করেনি, নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সরকার পরিচালনায়ও তারা লাভ করে একচ্ছত্র অধিকার। দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আচারণেও এক ধরনের উদ্ধত মানসিকতার স্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হতে থাকে। নির্বাচনে যা হয়েছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ না করে পক্ষান্তরে তারা চলতে থাকেন উল্টো পথে। নির্বাচনের পর মাত্র এক মাস সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন দেশের শিল্পাঞ্চলগুলো থেকে অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের বহিষ্কারের অভিযান চালায়। তাদের যুক্তি ছিলো, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে এবং সরকার শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এমতাবস্থায় দেশের অন্য কোনো ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

১৯৭৩ সালের ৫ এপ্রিল তারিখে তারা টঙ্গী শিল্প এলাকায় একটি বামপন্থী দলের বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন নামের শ্রমিক সংগঠনের ওপর প্রথমবারের মতো সরাসরি আক্রমণ চালায়। এতে কয়েকজন শ্রমিক হিনত হন ও অসংখ্য শ্রমিককে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। ইতিমধ্যে উক্ত শ্রমিক সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় পৌঁছে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করলে শেখ মুজিব তাদের প্রতি সুবিচারের নিশ্চয়তা দেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক লীগের এক বৈঠকে পথভ্রষ্ট শ্রমিক নেতাদের খতম করে দেশের সমস্ত শিল্প এলাকা থেকে তাদের বহিষ্কার করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। এর আগেই আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠনের নেতা আবদুল মান্নান লালবাহিনী গঠন করেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর শোষনমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকারকে সাহায্য করাই ছিলো এই বাহিনী গঠনের ঘোষিত উদ্দেশ্য। শিল্প এলাকা থেকে খারাপ লোকদের বহিষ্কার এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের অপসারণ ছিলো এর প্রধান কাজ। অবশ্য প্রায়ই তারা ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত করে শিল্পখাত অতিক্রম করে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ব্যক্তিজীবনেও হস্তক্ষেপ করতে থাকে। ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতায় এদের শক্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতগুলোর জন্য যে শৃঙ্খলা ছিলো অতি প্রয়োজনীয়, ক্রমশ সেই শৃঙ্খলার ভিত ধসে যেতে থাকে। দেশের বহু স্থানে নিরীহ শ্রমিকরা এদের হাতে নির্যাতিত হতে থাকে। নিজেদের কর্তৃত্ব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে তারা শ্রমিকদের স্থানীয় ও অস্থানীয় এই দুই শিবিরের মধ্যে বিভক্ত করে ফেলে। শ্রমিকদের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদের বিষবাষ্প সঞ্চারিত হয়। এর আগেই প্রথমে টঙ্গী ও পরে কালুরঘাট ও সর্বশেষে চট্টগ্রামের বাড়বকুণ্ডে অবস্থিত আর আর পাট ও বস্ত্রকলে কয়েকজন শ্রমিককে হত্যা করা হয়। তাদের বেশিরভাগই চট্টগ্রামের বাইরের জেলাগুলো থেকে আসা এবং সেখানে তারা বছরের পর বছর ধরে কাজ করছিলেন। এভাবে বাহিনী সদস্যদের মাধ্যমে দাঙ্গা বেঁধে উঠতে থাকে এবং বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব শ্রমিক লীগ বা এর পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্তদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

এমতাবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি, শিল্পখাত উৎপাদন বিপর্যয়ের

www.pathagar.com

সম্মুখীন হয়। নির্বাচনের পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে— জনগণের এই প্রত্যাশা এ সময়ে ক্ষমতাসীন সরকারের দুরাচারে কুয়াশার আবরণে তলিয়ে যায়। লালবাহিনী, মুজিববাহিনী, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও রক্ষীবাহিনীর বাড়াবাড়ি জনমনে ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। লালবাহিনীসহ সরকারের আরো কয়েকটি সংগঠন কালোবাজারী, মজুদদারী, চোরাচালানকারী ও ভুয়া ডিলার ও শিল্পপতিদের ওপর এক সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করে। রাজনৈতিকভাবে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় বলে আওয়ামী লীগের সব কয়টি অঙ্গসংগঠনই এই অভিযানে জড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গসংগঠন হলেও এই সংগঠনগুলো তাদের তৎপরতার পেছনে যুক্তি প্রদর্শনের জন্য ৩ মে হরতালের ডাক দেয়। কিন্তু তাদের এই অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কারণ, (১) দুষ্কৃতকারীরা ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলো; (২) আচরণের বাড়াবাড়ি সাধারণ নির্বিরোধ লোকদের ওপর অত্যাচারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো; (৩) শৃঙ্খলা বিধানকারীদের যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি বলে সংশোধনকারীরা স্বয়ং এর ফায়দা লুটতে থাকে; (৪) পুলিশ বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসন তাদের অসহযোগিতা করেন, কারণ, তাদের এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিলো। অন্যদিকে বিচারবিভাগ ছিলো অসহায়, কেননা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগে সৃষ্টি করা হচ্ছিলো প্রতিবন্ধকতা; (৫) আচরণবিধি না থাকায় রক্ষীবাহিনী ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করছিলো এবং (৬) তাদের এই প্রচারণার বলি হচ্ছিলেন বিরোধী রাজনীতিবিদ ও কর্মীরা।

এ অবস্থায় জনগণের মধ্যে নিদারুণ উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়। তাদের প্রচারণা শুধু কোনো ইতিবাচক ফল প্রদর্শন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই ব্যর্থ হয়নি, পাশাপাশি বিরাজ করতে থাকে আইনহিনতা। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন প্রক্রিয়া দারুণভাবে ব্যাহত হতে থাকে। গোটা অভিযানই ধ্বংসের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। সরকার যখন ১৩ এপ্রিল ১৯৮৩ তারিখে ঘোষণা করেন যে, সিমেন্ট, সুতা ও অন্যান্য লাভজনক আইটেমের ৬৭ জন ভুয়া ডিলারকে আটক করা হয়েছে এবং ছোট বড় ১,২৭৭টি ভুয়া প্রতিষ্ঠান সনাক্ত করা হয়েছে, তখন জনমনে এমন একটা ক্ষীণ আশার রশ্মি প্রতিফলিত হয় যে, এবার বোধ হয় সরকার তার প্রতিশ্রুতি রাখতে যাচ্ছেন। কিন্তু যতোই দিন যেতে থাকলো ততই দেখা গেলো যে, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে পারছেন না; কারণ, দুষ্কৃতকারীরা ছিলো ক্ষমতাসীন দলের সদস্য কিংবা কোনো না কোনভাবে দলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আসছিলো।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে মওদুদ আহমদ লেখেন, ইতিপূর্বে ক্রমাবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে ১১ মার্চ তারিখে রাষ্ট্রপতির ৫০ নং আদেশ সংশোধন করে আরো কয়েকটি অপরাধ উক্ত আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং অপরাধীদের সংক্ষিপ্ত বিচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ ধরনের অন্যান্য অপরাধের মধ্যে ছিলো ডাকাতি, দস্যুতা, হাইজ্যাকিং, অপহরণ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ওষুধ, ড্রাগ ও খাদ্যশস্যে ভেজাল মিশ্রিতকরণ, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ, কালোবাজারি, চোরাচালানি ও মজুদদারি। এ সমস্ত অপরাধে শাস্তির মেয়াদ ছিলো ৩ থেকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। এতে কেবলমাত্র সমকালীন সময়ে দেশে সংঘটিত অপরাধগুলো শাস্তিযোগ্য বলে বিধান রাখা হয়। এভাবে একটি কার্যকর কৌশল বলে বিবেচিত হবে— এই ধারণা নিয়ে আওয়ামী লীগ একই সাথে দুই কূল রক্ষা করে চলতে থাকে। প্রথমত, কঠোর আইন জারি করে তা বাস্তবায়নের জন্য রক্ষীবাহিনীকে কাজে

www.pathagar.com

লাগানো হয় এবং দ্বিতীয়ত, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ব্যবহার করার পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু এরপরেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। ফলে সরকারকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হয় যা শেখ মুজিব নিজেও কখনো সমর্থন করেননি। যেহেতু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছিলো এবং সরকারের জনপ্রিয়তা যাচ্ছিলো কমে, সেহেতু এই উপমহাদেশের অন্যান্য সরকারের ন্যায় আওয়ামী লীগও এবার আরো কঠোর রাজনৈতিক নিপীড়নের পথ বেছে নেয়।

নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত করার লক্ষ্যে সরকার শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালের সংবিধানে উল্লেখিত আদর্শবাদ বিসর্জন দেন। সরকার সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ ও জরুরি অবস্থা জারি করার বিধান সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। এভাবে সরকার পেছন দিকে তার গন্তব্য স্থির করেন এবং তদনুসারে ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংবিধানে দ্বিতীয় সংশোধনী বিল উপস্থাপন করেন। এতে ৩৩ নং অনুচ্ছেদের স্থলে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সম্পর্কীয় নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজিত করা হয়। ৯ (ক) নামে একটি নতুন ভাগ সংযোজন করে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান নগণ্য থাকায় খুব অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য বিতর্ক ছাড়াই সংশোধনী বিল পাস হয়ে যায়। আতাউর রহমান খানসহ অন্যান্য বিরোধী নেতা জনমত যাচাইয়ের জন্য এই বিল জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার দাবি জানালে সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

নতুন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর অবশ্য যুক্তি দেখান যে, যে কোনো জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানেই এই বিষয় দুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, সংবিধান প্রণয়নের সময় এই বিধানগুলো সংযোজন করা হয়নি বিধায় এখন সংশোধনী এনে সেই ভুল শোধরানো হচ্ছে। তার কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হয়তো সাংবিধানিক পরিষদ এই বিধান দুটি সংযোজন করতে ভুলে গিয়েছিলো, কিংবা ড. কামাল হোসেন ভুলক্রমে তা করেননি।

রক্ষীবাহিনীর হত্যা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বা আইনগত প্রতিকারের সুযোগ যে কত সীমাবদ্ধ ছিলো সে সম্পর্কে মওদুদ আহমদ লিখেছেন : 'রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের প্রেক্ষিতে দেশের আদালতগুলোতে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলার প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করলে রক্ষীবাহিনীর বেপরোয়া আচরণের লোমহর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। এ ধরনের একটি মামলার বিবরণ এতদপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ফরিদপুর জেলার নড়িয়া থানার জনৈক শাজাহানের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত এই মামলায় রক্ষীবাহিনীর পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবদেরও অভিযুক্ত করা হয়েছিলো। মামলার বিবরণে জানা গেছে, শাজাহান নামের ১৮ বছরের এই বালককে ১৯৭৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে। তারপর তাকে রমনা থানায় সোপর্দ করে তার বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডায়েরি লিপিবদ্ধ করা হয়। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫৪ ধারায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। সেদিনই রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারের আদেশে তাকে রক্ষীবাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

শাজাহানের ভাই মামলার অভিযোগে উল্লেখ করে যে রক্ষীবাহিনী শাজাহানের ওপর অযথা শারীরিক নির্যাতন চালায়। ১৯৭৪ সালের ২ জানুয়ারি শাহাজানের সাথে তার সর্বশেষ সাক্ষাৎ ঘটে রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে। এরপর থেকে শাজাহানের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

তখন শাজাহানের ভাই একটি হেবিয়াস কপাস মামলায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বেআইনি আটকাদেশের অভিযোগ আনে। মামলায় রক্ষীবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, শাজাহান ছিলো নড়িয়া থানায় দায়েরকৃত একটি মামলায় অভিযুক্ত এবং তার কাছে বেআইনি অস্ত্র থাকার অভিযোগ ছিলো। এই অস্ত্র উদ্ধারের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে রক্ষীবাহিনী তাকে থানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। এতে আরো বলা হয়, শাজাহানের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য রক্ষীবাহিনী তাকে ঢাকার রায়ের বাজারের এক জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে একটি গলির সামনে নেমে শাজাহান হঠাৎ করে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে রক্ষীবাহিনী ৩১ ডিসেম্বর মোহাম্মদপুর থানায় একটি প্রাথমিক তথ্য রিপোর্টও দাখিল করে। কাজেই শাজাহানকে আদালতে উপস্থিত করা রক্ষীবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এ সময়ে শাজাহানের ভাই সংশ্লিষ্ট নিম্ন আদালতের নথির মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, নড়িয়া থানায় কোনো মামলায় শাজাহান কখনো অভিযুক্ত ছিলো না। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর শাজাহান পলাতকের ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ ২ জানুয়ারি (১৯৭৪) তারিখে রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে শাজাহানের সাথে তার দেখা হয়েছে। তিনি আশঙ্কা করেন যে রক্ষীবাহিনী তার ভাইকে হত্যা করেছে।

এই মামলার ফলে আদালত রক্ষীবাহিনীর ভূমিকা আইনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উন্মোচিত করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অফিসারকে আদালত তলব করে। কাগজপত্র পরীক্ষা করে আদালত দেখতে পায় যে, সেই পলায়নের ঘটনার তিনদিন পরে থানায় প্রাথমিক তথ্য রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছিলো। সবকিছু পরীক্ষা করে আদালত নড়িয়া থানার অভিযোগে অস্ত্র উদ্ধারের কাহিনী এবং শাজাহানের পলায়নের বিষয়টিকে আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণের অযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করে। মামলার রায়ে বলা হয় রক্ষীবাহিনী যা করেছে, তা দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি চরম অশ্রদ্ধারই প্রমাণ দিয়েছে।

'রক্ষীবাহিনীর ন্যক্কারজনক তৎপরতার এটি একটি প্রকৃষ্ট নমুনা। অত্যাধুনিক অস্ত্রবাহী, সরকারের সম্পূর্ণ সমর্থনপ্রাপ্ত এবং হিসাবযোগ্যতাবিহীন এই বাহিনীর জঘন্য তৎপরতা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা ছিলো না। সনাতন পদ্ধতিতে সজ্জিত পুলিশ এই বাহিনীর সামনে ছিলো অসহায় নীরব দর্শক। এ সময় থেকে প্রতিদিনই গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের অভিযোগ আসছিলো। নোয়াখালীর মাইজদী কোর্টে রক্ষীবাহিনীর সাথে স্থানীয় রিকশাচালকদের এক ঘটনার জের হিসেবে সেখানে এক দিনের পূর্ণ ধর্মঘটও পালিত হয়েছিলো। রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র উদ্ধারের অভিযানে গিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কিংবা তার কোনো অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের ওপর চড়াও হতো না। তাদের এই দলীয় ভূমিকায় জনমনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিলো। নিজেদের কর্তৃত্ব জাহিরের জন্য তারা মফস্বল এলাকায় গিয়ে নিজেদের শিবির স্থাপন করতো, জেলা প্রশাসন কিংবা অন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আগমনী রিপোর্ট দাখিল করা প্রয়োজন বলে মনে করতো না। রক্ষীবাহিনী তার কাজ করতে গিয়ে সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো না

www.pathagar.com

বলে অধিকতর উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সেনাবাহিনীর সদস্যরাও ছিলেন এদের ওপর বিক্ষুব্ধ। জনগণের এক বিরাট অংশসহ দেশের সংবাদপত্রগুলো প্রতিদিনই রক্ষীবাহিনী নারকীয় তৎপরতার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছিলো। রক্ষী বাহিনীর আইনগত ক্ষমতাকে বিভিন্ন মহল থেকে প্রকাশ্যভাবে চ্যালেঞ্জও হচ্ছিলো।

আদালতের কাছে প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা স্বীকার করেছেন যে, তাদের কোনো কার্যবিধি কিংবা আচারণবিধি ছিলো না। নিজেদের কাজকর্মের কোনো বিবরণী কিংবা কাগজপত্র বা দলিল তারা সংরক্ষণ করতো না। কোনো গ্রেফতার কিংবা তল্লাশির রেকর্ডও তারা রাখতো না। তাহলে তারা কিভাবে কাজ করেছে, আদালতের এমন প্রশ্নের জবাবে রক্ষীবাহিনীর একজন সিনিয়র ডেপুটি লিডার হাফিজ উদ্দিন উদ্ধতভাবে জবাব দিয়ে ছিলেন, 'আমরা যেভাবে করা ভালো মনে করি সেভাবেই করি।' প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে হাফিজ উদ্দিন আরো জানান যে, কোনো অভিযানের ব্যাপারে তারা ডায়েরি রাখতো না, অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদেরও হিসেবের জন্য কোনো রেজিস্টারও তাদের ছিলো না।

ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিলো যে, অসংখ্য হতভাগ্যের ন্যায় শাহজাহান ছিলো বিরোধী দল জাসদের ছাত্র সংগঠনের একজন সদস্য। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আনীত কোনো অভিযোগই আদালতে প্রমাণ করা যায়নি। যাহোক, শেষঅবধি আদালত ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবনের পর শাজাহানের সন্ধান জানার লক্ষ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন।

মামলার রায় এবং তদন্ত কমিটি গঠনের পরামর্শ সংক্রান্ত কাগজপত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে পাঠানো হলেও এই তদন্ত আর কোনোদিনই অনুষ্ঠিত হয়নি।

দেশের কোনো কোনো স্থানে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনার কোনো ভাষা ছিলো না। নিজেদের এরা অপরাজেয় শক্তি হিসেবে মনে করতো। বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান পরিচালনাকালে তারা যেখানে খুশি শিবির স্থাপন করতো, সন্দেহভাজন লোকদের ধরে শিবিরে নিয়ে আসতো, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যে কোনো রকম নির্যাতনের পন্থা অবলম্বন করতো। কোনো রসিদ না দিয়ে তল্লাশিকালে তারা জনগণের সম্পত্তি হরণ করতো। ঘরে ঘরে ঢুকে লুট করতো ঘড়ি, ট্রানজিস্টার ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী। প্রাণের ভয়ে কেউ তাদের আচরণের প্রতিবাদ করার সাহস পেতো না। এমনও খবর পাওয়া যায় যে, বাজারে গিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে তার টাকা সংগ্রহ করতো।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি মামলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে রক্ষীবাহিনী বদরগঞ্জ মহকুমার রামভদ্রপুর গ্রামে প্রবেশ করে ও শান্তি সেনের স্ত্রী অরুণা সেন (৬০), পুত্রবধূ রীনা সিনহা এবং পাশের বাড়ির একজন অতিথি হনুফা বেগমকে (১৬) ধরে নিয়ে যায়। তারা এই তিনজন মহিলাকে নিজেদের শিবিরে আটক করে রাখলে জনমনে প্রবল রোষ সঞ্চারিত হয়। রাজধানীর পত্রিকাগুলোতে এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলে সরকারের টনক নড়ে। প্রথম অবস্থায় এ ব্যাপারে সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলেও উক্ত তিনজনকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। প্রেসনোটে অভিযোগ করা হয় যে, রক্ষীবাহিনী গঠনের পর থেকেই এক শ্রেণীর সংবাদপত্র ও বিরোধী রাজনৈতিক দল রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে নানা রকমের কুৎসা রটনা করে আসছে। এতে বলা হয় অরুণা সেন বা অন্য কাউকে হত্যা বা নির্যাতন করা হয়নি। তাদের কাছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিরোধী কাগজপত্র পাওয়া গেছে বলে ঘটনার তদন্তের জন্য

www.pathagar.com

তাদের পুলিশের কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রেসনোটে তাদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত বেআইনি অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকাও দেয়া হয়। তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা ছিলো কি না প্রেসনোটে তার উল্লেখ ছিলো না।

প্রায় একই সময় উক্ত তিনজনের অবৈধ আটকাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের জন্য একটি রিট আবেদন করা হয়। এতে বলা হয়, রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে উক্ত তিনজনের ওপর নিদারুণ নির্যাতন চালানো হয়। অরুণা সেনকে হাত বেঁধে নিকটস্থ নদীর ঠাণ্ডা পানিতে নিক্ষেপ করে আবার টেনে তোলা হতো। যুবতী দুজনকেও নানাভাবে নির্যাতন করা হয়। শারীরিকভাবে তাদের মর্যাদাও হানি করা হয়। উক্ত তিনজনকে আদালতের সামনে উপস্থিত করার জন্য আবেদনের অনুরোধ জানানো হয়।

আবেদন পেশ করার পর আদালত উক্ত তিনজনকে সাত দিনের মধ্যে আদালতের সামনে উপস্থিত করার জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দেন। কিন্তু কোনো মামলা দায়ের ছাড়া প্রায় দুই মাস অবৈধভাবে আটক রাখার যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা সরকারের ছিলো না। দেশের সর্বোচ্চ শাসকও এতে বিচলিত হয়ে বার বার এ্যাটর্নি জেনারেলকে ডেকে পাঠাতে থাকেন। এ্যাটর্নি জেনারেল উক্ত তিনজনকে আদালতে উপস্থিত করার আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আদালতের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনবার আবেদন জানান। তিনি বলেন, অস্ত্রধারী নিরাপত্তা প্রহরী পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাদের আদালতে আনতে হবে যা আদালতের জন্য মর্যাদাকর হবে না। অবশেষে মাননীয় বিচারক তার আদেশ সামান্য পরিবর্তন করে বলেন যে, আদালত কক্ষের পরিবর্তে তার চেম্বারে উক্ত তিন মহিলাকে উপস্থিত করতে হবে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের একটি ভ্যানে করে তাদের আদালতে নিয়ে আসা হয়। আদালত ঘটনার বিবরণ শুনে দুদিন পর শুনানির তারিখ দেন।

সেদিন ঘটনার ফলাফল দেখার জন্য আদালত ছিলো লোকে লোকারণ্য। শেষ পর্যন্ত সরকার ঘটনার ভয়াবহতা অনুধাবন করে আর অগ্রসর না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শুনানির শুরু হওয়ার আগের রাতে জেল সুপারিনটেনডেন্ট এই লেখককে টেলিফোনে জানান যে সরকার বিনাশর্তে তিন মহিলাকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমি, মামলার আবেদনকারী বদরুদ্দীন উমর এবং হলিডে সম্পাদক এনায়েতউল্লাহ খান তারপর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে যাই ও অরুণা সেন ও অপর দুজনকে নিয়ে আসি। সরকারের প্রেসনোটটি ছিলো মিথ্যা এবং পরদিন আদালতকে এই মুক্তিদানের নির্দেশ জানানো হয়।

রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে দুঃশাসনের ১৩৩৮ রজনী গ্রন্থে লেখা হয় এককথায় বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর এ সময়টা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিলো কালোমেঘে ঢাকা। বাকশাল গঠনের পূর্বে ময়দানে বিরোধী রাজনৈতিক দল থাকলেও শেখ মুজিবের স্বৈরশাসনের কাছে তাদের তৎপরতা ছিলো খুব সীমিত। আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের অত্যাচার, অবিচার, লুণ্ঠন সমাজকে বিষিয়ে তুলে। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে হত্যা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি, লুট, অপহরণ এ ছিলো এদের নিত্যদিনের কার্যক্রম। এ জঘন্য তৎপরতায় শেখ মুজিবের মসনদ রক্ষাকারী বাহিনী 'রক্ষীবাহিনী' অনেক সময়ই প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান করতো। এ ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অসহায় থাকলেও মাঝে মধ্যে দু'একটি ক্ষেত্রে দু'একজন ধরা পড়লেও স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিফোনে কিংবা কোনো মহারথী আওয়ামী নেতার টেলিফোনে ছাড়া পেয়ে যেতো।

www.pathagar.com

১৯৭৪ সালে আত্মগোপনরত অবস্থায় সাম্যবাদী দলের নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা (মরহুম) আওয়ামী লীগের হত্যা ও নির্বাচনসহ বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। আমরা বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি :

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বে

প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান '৭২-এর ১৮ এপ্রিলের মধ্যে সকল বে-আইনি অস্ত্রধারীদের ওপর অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণের নির্দেশ জারি করেছেন। কারণ হিসেবে তিনি তার বিগত ২৬ মার্চের বক্তৃতার উল্লেখ করেছেন, যে বিগত তিন বছরে তার দলীয় জাতীয় পরিষদের ৫ জন সদস্যসহ ৩ হাজারেরও অধিক ব্যক্তি বে-আইনি অস্ত্রধারীদের হাতে নিহত হয়েছেন। কাজেই তিনি দুষ্কৃতকারীদের নিরস্ত্র করে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চান।

এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই : বিগত ৩ বছরে 'দুষ্কৃতকারীদের' হাতে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা সরকার প্রদত্ত হিসেব অনুযায়ী ২১ হাজারেরও বেশি; অথচ শেখ মুজিব মাত্র তাঁর দলীয় ৫ জন পরিষদ সদস্য এবং ৩ হাজার কর্মীর কথা উল্লেখ করলেন কেন? তাঁর দলের বাইরের যারা নিহত হয়েছেন তাদের ব্যাপারে শেখ মুজিব ও তার সরকারের কি কোনো দায়-দায়িত্ব নাই? এবং এই যে হত্যাকাণ্ড আজও প্রতিদিন চলছে তার পরিণতি কি? এই সমস্ত প্রশ্নের ওপর আমরা দেশবাসী রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা তথা সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন অংশের দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশ্যে আমাদের কটি কথা পেশ করতে চাই।

এই হত্যাযজ্ঞের হোতা কারা এবং এর উৎস কোথায়?

সর্বপ্রথমে যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই আলোচনার দাবি রাখে তা হচ্ছে : এই হত্যাকাণ্ডের হোতা কারা এবং তার উৎস কোথায়? প্রশ্নটি আমরা ঘটনাভিত্তিক আলোচনার পক্ষপাতী।

যে রাজনৈতিক কারণে ১৯৭১-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো সে সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে মতভেদের অবকাশ থাকলেও ২৫ মার্চ (১৯৭১) পাকসামরিক বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রশ্নে কোনো মতপার্থক্যের অবকাশ ছিলো না। বস্তুত : বোলতার চাকে ঢিল ছুড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা পালিয়ে গিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। বিভিন্ন জেলায় আমাদের পার্টির নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক সাধারণ ও অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই প্রতিরোধ সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আমরা দারুণ বিস্ময় এবং উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করেছিলাম যে, ঐ জাতীয় দুর্যোগের মুহূর্তে তৎকালীন আওয়ামী লীগের (বর্তমান 'বাকশাল') পক্ষ থেকে এক গোপন নির্দেশনামায় বলা হয়েছিলো : বামপন্থীদেরকেও শত্রু বলে গণ্য করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; তাদের হাতে যাতে কোনো অস্ত্র না যায় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বলাবাহুল্য যে, এই নির্দেশ সাথে সাথে কার্যকর হয়েছিলো। অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে উদাহরণস্বরূপ আমরা দুই চারটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার উল্লেখ করবো :

নোয়াখালী জেলা

এক. সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে সামরিক দিক থেকে পাক-বাহিনীর আক্রমণের প্রতিরোধ করার কোনো ক্ষমতাই তখনকার আওয়ামী লীগের ছিলো না। বস্তুত আওয়ামী লীগ ছিলো ঢিলেঢালা নির্বাচনী হৈ চৈ করার মতো গণসংগঠন।

www.pathagar.com

কাজেই স্থানীয় জনমতের চাপে আওয়ামী লীগের জেলা নেতারা একটি অঞ্চলে আমাদের পার্টির হাতে যৎসামান্য অস্ত্র (৪টি রাইফেল) দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু দেয়ার সময় বন্দুকগুলোর ট্রিগার খুলে রাখা হয়। এই অকেজো বন্দুকই ভাসানী ন্যাপের বিশিষ্ট নেতা ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের সভ্য জনাব সিদ্দিকউল্লাহর মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছিলো পাকবাহিনীর হাতে। পাকবাহিনী খবর পেয়ে তার বাড়ি ঘেরাও করে তাকে গুলি করে হত্যা করে।

দুই. উক্ত জেলায় কার্যরত আমাদের পার্টির অন্যতম কর্মী ও তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য নুরুল হাসানকে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ৪ এপ্রিল ১৯৭১ গ্রেফতার করে। তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়ার পরই আওয়ামী লীগের তৎকালীন ও বর্তমান পরিষদ সদস্য মি. হানিফের নেতৃত্বে গঠিত 'সামরিক আদালত' তাকে মৃত্যুদণ্ড দান করে। সৌভাগ্যবশত সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার ঘটনাটি উর্ধ্বতন জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার ফলে নুরুল হাসানের প্রাণ রক্ষা পায় বটে, কিন্তু জেলা কর্তৃপক্ষ তাকে মুক্তি দিতে সাহস পাননি। তারা তাকে হাজতে প্রেরণ করেন। পরবর্তী সময় আমাদের পার্টির হস্তক্ষেপের ফলে নুরুল হাসান মুক্তি লাভ করেন।

তিন. যে ক্ষেত্রে সময়মতো আমাদের পার্টির হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়নি সেইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগের হাতে আমাদের এবং অন্যান্য বামপন্থী রাজনীতির সমর্থকরা প্রাণ হারিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ : নোয়াখালী জেলার পাকবাহিনীর সাথে লড়াই চলাকালীন আমাদের বাহিনীর তিনজন গেরিলা যোদ্ধা পশ্চাদপসারণকালীন রায়পুর থানার এলাকায় আওয়ামী সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে বন্দি হন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন (ফয়েজ আহমদ) চৌমুহনী কলেজের ছাত্র এবং আওয়ামী লীগের তৎকালীন এবং বর্তমান পরিষদ সদস্য মি. সিরাজুল হকের (রামগতি) শ্যালকের ছেলে। আমাদের গেরিলা যোদ্ধাগণ রাজনৈতিকভাবেই তাদেরকে পরিস্থিতি উপলব্ধি করার এবং কোনো কোনো প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই পরিস্থিতিতে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় পাকবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে হত্যা না করে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়ার সুযোগ দানের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয়নি। উক্ত সিরাজুল হকের নির্দেশে তিনদিন পর তাদেরকে হত্যা করার জন্য নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হলে একজন নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দীর্ঘ ১৮ মাইল পথ সাঁতরিয়ে প্রাণ বাঁচান; অপর দুইজন তাদের হাতে নিহত হন। বেঁচে আসা গেরিলা কমরেডের নিকট থেকেই আমরা এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাই।

উক্ত জেলায় যুদ্ধ চলাকালীন আওয়ামী লীগ দলীয় বাবর নামে একজন ছাত্রলীগ কর্মীর নেতৃত্বে কয়েকজন ছাত্রকর্মী তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছিলেন যে উক্ত জেলায় যুদ্ধের একমাত্র সংগঠক আমাদের পার্টিই। উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ নেতারা সপরিবারে ও সদলবলে ইতিপূর্বেই ভারতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তাই তারা দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে অস্ত্রসহ আমাদের বাহিনীতে যোগ দেন। এই অপরাধে বাবরসহ তিনজন কর্মীকে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

চার. যুদ্ধের এক পর্যায়ে (জুন অথবা জুলাই মাসের দিকে) সীমানা অতিক্রম করে আওয়ামী লীগের এই বাহিনী আমাদের পার্টির নিয়ন্ত্রিত এলাকায় উপস্থিত হয়। আমাদের প্রভাবিত জনগণ সরল বিশ্বাসে তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে আমাদের বাহিনী পাকবাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হয় ঠিক তখনই এই বিশ্বাসঘাতকরা পেছন দিয়ে আমাদের বাহিনীকে আক্রমণ করে। এই পরিস্থিতিতে দুইদিকে আক্রমণ প্রতিহত করে আমাদের বাহিনী বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে আমাদের বাহিনীর কয়েজন আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের হাতে বন্দি ও নিহত হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন পাকবাহিনী (কোর) পরিত্যাগকারী যোদ্ধা এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ। আমাদের পার্টির সাথে সংযোগের কারণেই তাকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় সবচেয়ে তিনি আওয়ামী লীগের লোকদেরকে এতোদূর বিশ্বাস করেছিলেন যে, নিজে উদ্যোগ নিয়েই তিনি আওয়ামী মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার জন্য তাদেরকে বোঝাতে যান। অথচ বেঈমানরা তাকে দুইদিন আটক রাখার পর ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে।

ফরিদপুর জেলা

ফরিদপুর জেলায় আমাদের পার্টির অন্যতম নেতা শান্তি সেনের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সর্বদলীয় ভিত্তিতে হানাদার বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত হয়েছিলো ঠিক সেই সময়ই কলিকাতাস্থ তৎকালীন 'স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের' প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিনের স্বাক্ষরিত এক সার্কুলার মারফৎ নির্দেশ আসে : বামপন্থীদের নিরস্ত্র করো এবং হত্যা করো। একই সময় আরেকটি নির্দেশ আসে শান্তি সেন, সর্দার সিরাজউদ্দীন (ভাসানী ন্যাপ) ও সিরাজ সিকদারকে হত্যা করার জন্য। এই নির্দেশের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি ও স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার স্টুয়ার্ড মুজিব কলিকাতায় বন্দি হয় এবং তার স্থলে নতুন কমান্ডার নিযুক্ত হয় অন্য একজন। ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনীর হাতে শান্তি সেনসহ আমাদের পার্টির ৫ জন কর্মী বন্দি হন। কিন্তু জনমতের চাপে মুক্তিবাহিনী তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

যা হোক, আমাদের পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার এবং বাংলাদেশের ওপর সম্ভাব্য ভারতীয় কবজার বিরোধিতা করার 'অপরাধে' পরবর্তী সময় স্টুয়ার্ড মুজিব ও তার সহকারী কমান্ডার কাঞ্চনসহ আরো কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা গ্রেফতার হয়; তাদের মধ্যে কাঞ্চনসহ কয়েকজনকে হত্যা করা হয়। স্টুয়ার্ড মুজিবের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা আদৌ আমরা জানতে পারিনি।

আওয়ামী লীগের এই আচরণে আমাদের পার্টি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আত্মগোপনে চলে যায়। কিন্তু সরদার সিরাজউদ্দিনসহ অন্যান্য দলের লোকেরা প্রকাশ্য থেকে যান এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরপরই মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হন। সর্দার সিরাজউদ্দিনকে হত্যাকাণ্ডে আওয়ামী মুক্তিবাহিনী যে পৈশাচিক বর্বরতা দেখিয়েছে তা কল্পনা করতেও শরীর শিউরে ওঠে। সর্দার সিরাজউদ্দিনকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। নিমন্ত্রিত অতিথির এক একটি করে হাত-পা কাটার পর তাকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। তিলে তিলে এইরূপ চরম মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা সংঘটিত করার পেছনে কোনো বর্বর

www.pathagar.com

পৈশাচিক ও বিকৃত মানসিকতা কাজ করেছিলো তা থেকেই বোঝা যায় তাদের পদলেহী শ্রেণী চরিত্র। সম্প্রতি সিরাজ সিকদারকেও গ্রেফতার করে বন্দি অবস্থায় হত্যা করে তার পালিয়ে যাওয়ার এক মিথ্যা কাহিনী প্রচার করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলা

চট্টগ্রাম জেলায় দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের পার্টির ডাক্তার তুহীনের নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, স্কুল শিক্ষক প্রাণকুমার ভট্টাচার্যের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি গেরিলাবাহিনী গড়ে তোলে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগও একটি বাহিনী গঠন করে এবং সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকায় আমাদের পার্টিরই একটি বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কয়েকদিন পর আমাদের বাহিনী এসে তাদের সাথে মিলিত হয়। দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের বাহিনীর লোকেরা যখন নিজের ঘরে নিদ্রায় মগ্ন তখন আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকরা হঠাৎ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে তাদের ৩০ জনের সকলকেই হত্যা করে।

অন্যদিকে তারা প্রাণকুমার বাবুকেও ডেকে পাঠায়। তিনি এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। সেখানে উপস্থিত হলে তাকে হত্যা করা হয়। পরদিন আশ্রয়দাতা ও সেই বাড়ির মালিককেও তারা হত্যা করার সিদ্ধান্ত করে এবং ঘটা করেই তা করা হয়। কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে এসে তিনি নাকি 'নাপাক' হয়ে গেছেন। তাই তাকে গোসল করিয়ে নেওয়া হয় এবং অতঃপর ঠাণ্ডা মাথায় তার হত্যার কাজ সমাধা করা হয়। এর পেছনে যে বিকৃত মানসিকতা ছিলো তা আর যাই হোক সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক নয়।

চট্টগ্রাম জেলার সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা এবং এককালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় কমিটির সভ্য অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন আহম্মদকে হত্যা করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতারা একটি সশস্ত্র স্কোয়াড নিযুক্ত করেছিলো।

কিন্তু উক্ত স্কোয়াডেরই একজন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই ভ্রান্ত কর্মনীতির ভুল উপলব্ধি করে অধ্যাপক সাহেবকে এই ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জানিয়ে দেন এবং পরবর্তী সময়ে সমস্ত ষড়যন্ত্রটি আমাদের নিকট প্রকাশ করে অকপটে স্বীকার করেন যে, অধ্যাপক আসহবা উদ্দীনের ন্যায় একজন কেন্দ্রীয় নেতাকে হত্যা করা হলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হতো। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও আসহাব উদ্দীনকে জানানো হয়েছে যে, তিনি এখনও বিপদমুক্ত নন। তাই তিনি বাধ্য হয়ে বিগত তিন বছরাধিকাল আত্মগোপনে জীবনযাপন করছেন।

ঢাকা জেলা

১৯৭১-এর ২৮ মার্চ তারিখ আমাদের পার্টির অন্যতম নেতা জনাব তোয়াহা এবং গণশক্তির সম্পাদক অধ্যাপক বদর উদ্দিন ওমর ঢাকা শহর থেকে গ্রামের নিরাপদ এলাকায় যাওয়ার পথে বুড়িগঙ্গার অপর তীরবর্তী ব্রাহ্মণ কিতায় আওয়ামী মুক্তিবাহিনীর হাতে আটক হন। তাদের সাথে ছিলো তাদের পরিচিত বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুইজন পদস্থ অফিসারের দুই ছেলে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত অফিসারদ্বয় ইতিমধ্যে রেজিমেন্ট ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

যা হোক, জনাব তোয়াহা ও ওমরের গ্রেফতারের খবর পেয়ে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার তদন্ত করতে আসেন এবং যাওয়ার সময় তাদের দুইখানা রেডিও ট্রানজিস্টার ও অন্যান্য মালামাল নিয়ে চলে যান। রাত্রি আনুমানিক ১১টার দিকে সাবেক ইপিআর-এর একজন জওয়ান গোপনে

www.pathagar.com

জনাব তোয়াহার সাথে দেখা করে তাকে তাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্রটি প্রকাশ করে জানান যে তাদের শখের ছেলে দুইটিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং তাদের দুইজনের তোয়াহা ও বদর উদ্দীন ওমরের বিষয় তখনো আলোচনা চলছিলো। উক্ত ইপিআর জওয়ান তাদেরকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় জনৈক কলেজ অধ্যাপক বিষয়টি উক্ত ব্রাহ্মণকর্তা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও তার ছোট ভাই হাফেজ সাহেবের গোচরীভূত করেন। উক্ত হাফেজ সাহেব কিছুটা অনুসন্ধিৎসু এবং ঔৎসুক্যের বশবর্তী হয়েই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আমাদের দেখতে আসেন। যখন তিনি জনাব তোয়া ও তার সাথীদের পরিচয় পান তখন তিনি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে উক্ত অধ্যাপকের সহায়তায় তাদেরকে নৌকায় করে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেন। এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে উক্ত মুক্তিবাহিনীর লোকেরা নৌকা নিয়ে জনাব তোয়াহাদের নৌকার পেছনে ধাওয়া করেছিলো বলে পরদিন জানা গেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত চেয়ারম্যান এবং তার ভাই হাফেজ সাহেবই ছিলেন ঐ সমস্ত অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোয়াহা ও তার সাথীদেরকে মুক্তি দেয়ার 'অপরাধে' (?) অপরাধী। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর উক্ত চেয়ারম্যান ও তার ভাইকে হত্যা করা হয়।

ঢাকা জেলার নওয়াবগঞ্জ থানায় আমাদের দলীয় বিশিষ্ট নেতা আব্বাস কতিপয় ব্যক্তিকে ও মুক্তিবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেতারা হত্যা করার। এদেরই একজন পঙ্কুকে গ্রেফতার করলে স্থানীয় জনসাধারণ আওয়ামী ঘাতকদের ঘেরাও করে তাকে মুক্ত করে।

পাবনা জেলা :

পাবনা জেলার মোহনপুরে আমাদের পার্টির অন্যতম নেতা এবং বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা হামিদ ও তার সহকর্মী ১১ জনকে আওয়ামী বাহিনীর লোকেরা হত্যা করে। এই জেলার আওয়ামী লীগের ঘাতকদের ব্যাপক আক্রমণের শিকার হয়েছিলো পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম. এল)-র কর্মী ও সমর্থকরা।

ময়মনসিংহ জেলা :

ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও এলাকায় আমাদের পার্টির দুইজন বিশিষ্ট কর্মী নুরু ও বাতেনকে আওয়ামী লীগের লোকেরা ঐ সময় হত্যা করে।

যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া :

যশোর, খুলনা ও কুষ্টিয়া জেলায় বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক বিশেষ করে আমাদের পার্টির কর্মীদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ভারতীয় আগ্রাসী ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনাটির প্রকৃত রূপটি উদঘাটিত করতে সাহায্য করে। বলা প্রয়োজন যে, যুদ্ধের শুরুতে আমাদের পার্টি এবং কোনো কোনো এলাকায় অন্যান্য বামপন্থীদেরই ব্যাপক গণভিত্তিক সংগঠন ছিলো। নির্বাচনী হৈচৈকারী ব্যবস্থা ছাড়া আওয়ামী লীগের প্রকৃত সংগ্রামী সংগঠন বলতে কিছুই ছিলো না। ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পথে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলো আমাদের পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থীরা। পরবর্তী পর্যায়ে ভারত থেকে যখন অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে তারা আগমন করে তখনো তাদের অস্ত্রশস্ত্রের সংরক্ষণ এবং আশ্রয় প্রদান করে প্রধানত আমাদের পার্টিই। পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই সংঘটিত করে আমাদের পার্টি যশোর ও খুলনার

www.pathagar.com

ব্যাপক অঞ্চল মুক্ত করে। তারপর নভেম্বর মাসের দিকে হঠাৎ মুক্তিবাহিনীর মতিগতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সর্বত্র মুক্তিবাহিনী আমাদের পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনী ও পার্টি সমর্থকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একত্র লড়াইকালীন তারা আমাদের পার্টির কর্মীদেরকে হত্যা করে। খুলনা জেলায় আমাদের পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মী রউফ এবং অন্যান্য বহু কর্মীকে হত্যা করে। যশোরের পুলম ও মোহাম্মদপুর এলাকায় এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ হত্যাকাণ্ড ব্যাপক আকার ধারণ করতেই আমাদের পার্টির স্থানীয় নেতাদের টনক নড়ে। প্রথমে কিছুটা হতভম্বতা ও বিভ্রান্তি তাদের মধ্যে দেখা দিলেও অচিরেই সমগ্র ষড়যন্ত্রটি তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয়। স্মরণ করা যেতে পারে, ঐ সময় নোয়াখালী, যশোর, খুলনা প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় আমাদের পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিরোধ যুদ্ধের সফলতার খবর বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, রেডিও জাপান প্রভৃতি বেতার থেকে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতের 'নকশালপন্থীরা' আমাদের পার্টির সাথে যোগাযোগ করছেন বলে মিথ্যা প্রচার চালিয়েছিলো। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ লেঃ) যে পূর্ব বাংলায় ভারতীয় আগ্রাসনের বিরোধিতা করছিলেন তা সর্বজনবিদিত। কাজেই পূর্ব বাংলায় ভারতের আক্রমণ ও দখলকে নিরঙ্কুশ করার উদ্দেশ্যে ভারতের সম্প্রসারণবাদী শাসনচক্রের নির্দেশে তাদের দালাল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে পরিচালিত মুজিববাহিনী যে আমাদের পার্টি ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে তা ছিলো অবধারিত।

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বরের পর এই আক্রমণ আরো ব্যাপকতা লাভ করে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রবেশের সাথে তা অভাবিতপূর্ব ব্যাপক হত্যা ও লুটতরাজের বীভৎস রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির সাথে সাথে এই বীভৎসতা ক্রমশ সারা দেশের সব কয়টি জেলায় পরিব্যপ্ত হয়।

উপরে আমরা জেলাওয়ারী নমুনা সার্ভে হিসেবে কতকগুলো ঘটনার উল্লেখ করেছি মাত্র। বলাবাহুল্য যে, বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তি ও দেশপ্রেমিকদের এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ছিলো ভারতীয় আগ্রাসন ও দখলকে নিরঙ্কুশ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত মুজিববাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বে ও পরে তা কোনো সময়ই প্রশমিত হয়নি।

পাঁচজন পরিষদ সদস্য খুন হলো কেন?

এবার শেখ মুজিবুর রহমানের আরেকটি বক্তব্যের বিচার করা যাক। তিনি বলেছিলেন, বিগত তিন বছরে তার দলীয় ৫ জন পরিষদ সদস্য খুন হয়েছেন। তারপর শ্লেষাত্মক ভাষায় তিনি বলেছেন, 'রাত্রির অন্ধকারে এরা মানুষ খুন করে। এটা নাকি বিপ্লব। এরা বিপ্লবী।' শেখ মুজিব কি একজন 'বিপ্লবী' বলে দাবি করেন। একের পর এক 'বিপ্লব' করে চলেছেন তিনি। এই মুহূর্তে চলেছে তার তথাকথিত 'দ্বিতীয় বিপ্লব।' তার 'বিপ্লবের' বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মানুষ খুন করা। উপরে আমরা অসংখ্য ঘটনার মধ্যেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। তার দলীয় 'বিপ্লবীদের' প্রতি যদি তিনি কটাক্ষ করে উপরের কথাগুলো বলতেন তাতে আপত্তি এবং নিন্দা করার থাকলেও আমরা আপাতত নীরব থাকাটাই সমীচীন মনে করতে পারতাম। কেননা, 'বিপ্লবের' ধারায় যদি দলীয় খুনিরা কিছু পরিমাণ শায়েস্তা হয়। তার নিজের 'বিপ্লবীদের' চোখ খুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক হতে পারে। কিন্তু তিনি কটাক্ষ করেছেন দেশের খাটি বিপ্লবীদের প্রতি এবং তাদেরকেই তিনি তার বিভিন্ন সরকারি

www.pathagar.com

বেসরকারি সশস্ত্রবাহিনী দ্বারা হত্যা করে চলেছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে তার দলীয় ৫ জন পরিষদ সদস্য কি খাঁটি বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়েছেন; প্রথম যে ঘটনাটি আমরা উল্লেখ করতে চাই তা হচ্ছে তার জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার ঘটনা : (১) পরিষদ সদস্য জনাব নুরুল হক আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। মুজিব সরকার ধরে নিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই এটা পূর্ববাংলার সাম্যবাদী দলের কাজ না হয়ে পারে না। কারণ ঐ অঞ্চলে বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে আমাদের পার্টিই তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী। কাজেই মন্ত্রী ফনী মজুমদার এবং বাকশাল নেতা রাজ্জাক কয়েকশত রক্ষীবাহিনী নিয়ে এলাকায় হাজির হন এবং জনসভায় আমাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করে বক্তৃতা করেন। বাকশাল নেতা রাজ্জাক তার ঝাঁঝালো বক্তৃতায় ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রোশ প্রকাশ করে ঘোষণা করেছেন 'আওয়ামী লীগ দলীয় পরিষদ সদস্য খুন হওয়ার পরিণতি কি হয় তা এই এলাকার জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই আমি এসেছি।' জনগণকে নাকি তিনি উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন ইত্যাদি ইত্যাদি। বাস্তবেও তারা করলেন তাই। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সমগ্র এলাকার জনগণের ওপর পাইকারি হারে গ্রেফতার মারপিট লুটতরাজের এক বীভৎস তাণ্ডবলীলা চালিয়ে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলেন তারা। অথচ কয়েক দিন পর জানা গেলো যে, জনাব নুরুল হকের হত্যাকারী একজন আওয়ামী লীগ কর্মী এবং প্রাক্তন মুক্তি বাহিনীর সদস্য। তিনি ইতিমধ্যে গা ঢাকা দিয়েছেন। তারপর আর কিছুই শোনা যায়নি। সরকারও এমন চুপ হয়ে গেলেন, যেন কিছুই ঘটেনি। রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয় চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করেননি মুজিব ও তার সরকার।

(২) দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বরিশাল জেলার ভোলায়। পরিষদ সদস্য রতনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও শাসক দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বেরই পরিণতি। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে, অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিলো দুইটি :

(ক) শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ পাশবিক কোনো এক নেতা দলীয় কর্মীদের মধ্যে রতনের প্রভাব বৃদ্ধিকে তার নিজের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে গণ্য করেন।

(খ) রতন ছিলেন ধুরন্ধর, সুচতুর ব্যক্তি। দলের জনপ্রিয়তা নষ্ট হতে দেখে তিনি জনগণের ওপর স্বীয় প্রভাব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তার দলীয় সরকারের ভারত ঘেঁষানীতির সমালোচনায় মুখর উঠেছিলেন ক্রমশ এর সাথে যুক্ত হলো অন্যান্য স্থানীয় কোন্দল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রক্ষীবাহিনীর পোশাকের অনুরূপ পোশাকধারী কয়েক ব্যক্তি গুলি করে তাকে হত্যা করেছিলো। এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িতদের অন্যতম সন্দেহে স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের জনৈক চেয়ারম্যান গ্রেফতার হয়ে হাজতে গেলেন। সম্প্রতি তিনি জামিনে খালাস হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে স্থানীয় বাজারে এক চায়ের দোকানে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারালেন। নিঃসন্দেহে প্রতিশোধমূলক এই হত্যাকাণ্ডটি এই বিয়োগান্তক নাটিকার শেষ অঙ্ক নয়।

(৩) বিগত ঈদের দিনে ঈদের জামাতে প্রকাশ্য দিবালোকেই কুষ্টিয়ার জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব কিবরিয়া আততায়ীর ব্রাশ ফায়ারে নিহত হন। ঘটনাটি শাসক চক্রগুলোর অভ্যন্তরীন ক্ষমতার দ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতি, কোনো বিপ্লবী দলের কাজ নয়, এ সত্যের স্বীকৃতি পাওয়া গেলো। অবশেষে অরিন্দম কহিলা বিষাদে : এ ঘটনা আত্মগোপনকারী কোনো বামপন্থী দলের কাজ নয়। কারা এ ঘটনার সাথে জড়িত সরকার তা ভালোভাবেই জানেন। তৎকালীন মন্ত্রী এবং বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় পরিষদের বক্তৃতায় অবশেষে সত্যটি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাক্তন মন্ত্রী তাজুদ্দিন প্রকাশ্য জনসভাতেই অনেক আগেই বলেছেন : গুপ্তহত্যা বন্ধ করা কঠিন কাজ নয়, আমরা বন্ধ করতে চাইলে তা বন্ধ হয়ে যায়। অতি খাঁটি কথা। গুপ্তহত্যা চালিয়েছে আওয়ামী লীগ। তারা নিজেরা হত্যাকাণ্ড বন্ধ করলেই গুপ্ত হত্যা বন্ধ হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

(৪) কুষ্টিয়া জেলায় কিছুদিন পূর্বে মাছ শিকারে যাওয়ার পথে তাদের গাড়ির উপরে ব্রাশ ফায়ার করে ৪ জন আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে কারা হত্যা করেছিলো তা কি সরকার এবং স্থানীয় জনসাধারণের অজানা? ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফলে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে যাওয়া তথাকথিত স্বাধীনতা যুদ্ধে কারো চাইতে অবদান কম ছিলো না বলে দাবি করার অধিকার যারা দাবি করতে পারেন বলে মনে করেন, অথচ শাসন ক্ষমতার অংশ থেকে বঞ্চিত, শাসক শ্রেণীর অভ্যন্তরে এই ধরনের উপদল যে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে এটাই কি স্বাভাবিক নয়? কেবল তাই নয়। এমনকি ক্ষমতাসীনদের গুপ্তঘাতকদের হাতে প্রাণ হারাতে থাকেন তখন স্বাভাবিকভাবেই এই বিরোধ উন্মুক্ত গুপ্ত হত্যার পথেই অগ্রসর হতে বাধ্য।

(৫) কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গার ট্রেজারি লুট, রায়পুর থানা আক্রমণ, আওয়ামী লীগের বড় বড় চাঁইদের ক্ষেতের ও গোলার ধান লুট প্রভৃতি ঘটনা যে শেখ মুজিব ও তার দলের এককালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বেরই ফল তা স্বয়ং শেখ মুজিব ও তার সরকারের ভালোভাবেই জানা আছে, কিন্তু কোনো এক জায়গায় এই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্বার্থের এমন একটি গভীর সংযোগ রয়েছে যে, তাদের পক্ষে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো কিছু বলা বা করা সম্ভব নয় কিছুতেই, তা স্বয়ং শেখ মুজিব সব কিছুই জানেন এবং বোঝেন। রুশ, ভারত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভয়ে ভীত ব্যক্তির পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

বে-আইনি অস্ত্র কাদের নিকট কি পরিমাণ আছে এবং কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য ঐসব দেয়া হয়েছে এই সবই শেখ মুজিবের সবচেয়ে ভালো জানা আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মুজিব প্রতিটি ইউনিয়নে গড়ে তোলা তার দলীয় সশস্ত্র প্রাইভেট বাহিনীর হাতে বে-আইনি অস্ত্র রাখতে দেবেন এবং তাদের দ্বারা হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকবেন (উদাহরণস্বরূপ ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুর, রায়পুর, সিকান্দি প্রভৃতি থানার চারিটি বাহিনীর নামধামসহ আমরা আগে উল্লেখ করেছি) আর প্রতিপক্ষকে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণের নির্দেশ বা উপদেশ দেবেন এবং তা করলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলে যতো আশ্বাসবাণীই প্রচার করুন না কেন তাতে কোনো ফল হবে কি? কারণ, অস্ত্র সমর্পণকারীদের বিরুদ্ধে বে-আইনি অস্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা যখন শেখ মুজিব নিজের হাতে রেখেছেন, তখন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না' বলে তার প্রদত্ত আশ্বাস বা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রতিপক্ষকে সুকৌশলে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে অবলম্বিত নিছক ধোঁকাবাজি তা বুঝতে খুব একটা বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে সরকারিভাবে সংবাদপত্রের ওপর কঠোর খড়্গহস্ত থাকা সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনী, মুজিববাদী ও সমজাতীয় বাহিনীগুলোর হত্যা, সন্ত্রাস ও নির্যাতন সম্পর্কে দেশী-বিদেশী পত্রিকায় বেশ কিছু রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। এসব রিপোর্ট ছাপার অপরাধে দেশের বহু পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কিংবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বিদেশী অনেক সাংবাদিককেও অপদস্থ হতে হয়েছে। তৎকালীন অন্যতম বিরোধী সংবাদপত্র হক কথার উদ্ধৃতি :

www.pathagar.com

'বামপন্থী নিধন মহাপরিকল্পনা' শীর্ষক নিবন্ধে সাপ্তাহিক হক কথায় লেখা হয় : 'বাংলাদেশ আজ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি এই নব স্বাধীনতালব্ধ দেশের দেশপ্রেমিক বামপন্থীদের হত্যা করার একটি মহা-পরিকল্পনা অনুযায়ী কতিপয় বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। বামপন্থীদের সমূলে উৎখাতের এই প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়। তথাকথিত পাকিস্তানি আমলেও এ ধরনের পরিকল্পনা বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করা হয়েছিলো। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর এবং বাংলাদেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীরও বামপন্থীদের সম্পর্কে একটি বিশেষ শত্রুতামূলক ও সন্দেহপ্রবণ মনোভাব রয়েছে। আর এই মনোভাবের পেছনে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে কতিপয় বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা। সঠিকভাবে এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মূলে রয়েছে বাংলাদেশের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক অবস্থান। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কুখ্যাত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই.-এর একটি ষড়যন্ত্রের গোপন দলিল সম্পর্কে ইঙ্গিত দেন। আর স্বাধীনতার পর সোভিয়েতের গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান কে. জি. বি. এবং ভারতের কংগ্রেসি হায়েনাদের নরহত্যা উৎসবের প্রধান জল্লাদবাহিনী রুথলেস র‍্যাডের নতুন পরিকল্পনা সি.আই.-এর নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হচ্ছে। এই ত্রয়ী-মৈত্রীর লক্ষ্যও হচ্ছে এ দেশের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের শিকার হতে অনিচ্ছুক, ভারতীয় শাসক ও বণিক গোষ্ঠীর শোষণ বিরোধী, নিজ মাতৃভূমিতে লুটপাট সমিতি এবং ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টায় রত প্রগতিশীল বামপন্থী কর্মী ও নেতৃবৃন্দ।

বিশ্ব রাজনীতিতে নয়া চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে। সংগ্রাম চলছে দেশীয় শোষক, সাম্রাজ্যবাদ আর সংশোধনবাদী চক্রের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায়। সংগ্রাম চলছে অবাধ চোরাচালান আর দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বিরুদ্ধে, পারমিট লাইসেন্স শিকারিদের হাত থেকে শোষিত, লাঞ্ছিত মজলুম মানুষের মুক্তির সপক্ষে জনতার এই সংগ্রামী কাফেলাকে বিভ্রান্ত করে, ভয় দেখিয়ে, গুপ্ত হত্যা চালিয়ে এই দেশে দেশী-বিদেশী শোষক চক্রের আসনকে পাকাপোক্ত করার পরিকল্পনারই একটা ধাপ হচ্ছে আজকের এই হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার অভিযান। এই একটি জায়গায় উল্লেখিত শক্তিগুলোর মহা-পরিকল্পনার আশ্চর্য মিল, অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের প্রতিটি মানুষ, প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক দলই নির্ভয়ে তাদের বক্তব্য বলতে পারবে, গণতান্ত্রিক অধিকারের বলেই বিরোধী দলগুলো তাদের কার্যক্রম চালাতে পারবে, এটা আশা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। স্বাধীনতা পূর্বকালে পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠী যেমন সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করতো, বিরোধীদলীয় কর্মী ও নেতাদের ভারতীয় চর, কমুনিস্ট বলে চিত্রিত করতো এবং ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকেও অভিযুক্ত করেছিলো। আজ ৩০ লক্ষ মানুষের রক্তে অর্জিত স্বাধীনতার পর বর্তমান সরকারের কাঁধেও যেন পাকিস্তানী ভূত ভর করে আছে। তাই তো অবাধ চোরাচালান, সরকারি দলের পাণ্ডাদের লুটপাট, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা বললে দেশপ্রেমের একক দাবিদার মহলটি এর মধ্যে রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পান। তাই তো স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ জননেতা আজীবন স্বাধীনতাকামী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে রাজাকার আর বদরবাহিনীর দোসর হিসেবে প্রচার করার ঘৃণ্য চক্রান্তের খেলা চলে। স্বাধীনতা উত্তরকালে এই নির্ভীক স্পষ্টভাষী বর্ষীয়ান নেতার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে ক্ষিপ্তপ্রায় এককালের জনদরদি

www.pathagar.com

এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ এবং বর্তমানে অজস্র টাকা, বাড়ি, গাড়ি, আর লাইসেন্স-পারমিটের মালিক নেতৃবর্গ আর তাদের জি-হুজুরের দল একের পর এক মিথ্যা, ভিত্তিহীন কুৎসার জাল রচনা করে চলেছে এবং অবশেষে ব্যাপক গণহত্যার কর্মসূচি গ্রহণ করে উস্কানীমূলক কাজের মাধ্যমে নরসিংদী, টঙ্গী, খুলনা, পাবনাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিরীহ কৃষক-শ্রমিকের ওপর আগ্নেয়াস্ত্রসহ আক্রমণ, সভা-সমিতি পণ্ড এবং নেতৃবৃন্দের ওপর প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ, সর্বোপরি দিল্লি, মস্কো, ওয়াশিংটনের বন্ধুদের সহযোগিতায় প্রগতিশীল কর্মীদের সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে বাংলাদেশে নতুন ইন্দোনেশিয়ার সৃষ্টি করাই হচ্ছে তাদের আশু লক্ষ্য।

সমাজতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে যখন দেশের বুভুক্ষু, ক্ষুধিত মানুষের প্রশ্ন এড়ানো সম্ভব হয় না, নিজেদের কৃতকার্যের ফল ভোগ করার আতঙ্ক বিকারগ্রস্ত হয়ে এই খুনি আর লুটেরাদের চোখে তখন জ্বলে উঠেছে চক্রান্তের আগুন, রক্তের তৃষ্ণা আর হত্যার নীল স্বপ্ন।

কালোবাজারি আর দেশের সম্পদ বাইরে পাচার বন্ধ করা আর দুঃখী মানুষের সপক্ষে কথা বললে যদি কোনো বিশেষবাদ বা বাহিনীর টারগেটভুক্ত হতে হয় তাহলে আমাদের বলার কিছু নেই। সোয়া লক্ষ বামপন্থী হত্যার পরিকল্পনা এক্ষেত্রে অপ্রতুল। কেননা দেশের সাত কোটি মানুষের অন্তরের দাবিও আজ তাই। সুতরাং এদের সবার সম্পর্কেই তাহলে পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। আমরা জানি, ইতিহাস তার পথ নিজেই সৃষ্টি করে। একটি রক্তবিন্দু থেকে জন্ম নেয় সহস্র রক্তকণা। সুতরাং ইতিহাসের চাকা উল্টো ঘুরানোর চেষ্টা যে ব্যর্থ হতে বাধ্য পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশে মরণপণ মুক্তিযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তা যেমন বুঝে নিতে বাধ্য হয়েছে, কেউ যদি সেই পথে অগ্রসর হয় তাদের অভিজ্ঞতাও যে অনুরূপ হতে বাধ্য, সে সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, কিউবা আর লাতিন আমেরিকার ঘটনাপ্রবাহ থেকে প্রত্যেকেরই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সমাধান না করে রাজনৈতিক হত্যার আশ্রয় নিয়ে কোনোদিন নিজেদের বাঁচানো যায় না। যুগের দাবি আর লাঞ্ছিত মানুষের অভ্যুদয় ভোরের সূর্যোদয়ের মতোই অনিবার্য। (হক কথা: ২ জুন, ১৯৭২)।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে সরকারিভাবে সংবাদপত্রের ওপর কঠোর খড়্গহস্ত থাকা সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনী, মুজিববাদী ও সমজাতীয় বাহিনীগুলোর হত্যা, সন্ত্রাস ও নির্যাতন সম্পর্কে দেশী-বিদেশী পত্রিকায় বেশ কিছু রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। এসব রিপোর্ট ছাপার অপরাধে দেশের বহু পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কিংবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বিদেশী অনেক সাংবাদিককেও অপদস্থ হতে হয়েছে। তৎকালীন অন্যতম বিরোধী সংবাদপত্র হক কথার উদ্ধৃতি :

ঢাকা জেলার মনোহরদী থানার পাটুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের জনৈক কর্মকর্তা দলীয় কর্মীদের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত শত্রুতা সাধনের উদ্দেশ্যে জনৈক মুক্তিযোদ্ধাকে জীবন্ত কবর দিয়েছেন। এই অপরাধে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নারায়ণগঞ্জে চালান দিলে জনৈক এম-সি-এ হস্তক্ষেপ করে এই নরঘাতকটিকে মুক্ত করিয়েছেন।

(হক কথা : ২ জুন, ১৯৭২)।

'খুলনা জেলার তালা থানায় সরকার যুবশক্তি নিধনের পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিরক্ষা ও শৃঙ্খলা বিধায়ক বাহিনীর সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনীকেও লেলিয়ে দিয়েছেন। যারাই এমসিএদের দুর্নীতির সমালোচনা করছেন, তাদেরকেই গোপনে ভারতীয় সেনাদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পাইকারিভাবে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা চলছে। ফলে

www.pathagar.com

ভীত-সন্ত্রস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই পালিয়ে জীবন বাঁচাচ্ছেন বলে এক পত্রে জানিয়েছেন। মাওবাদী যুক্তফ্রন্টের মুক্তিযোদ্ধারা এখনো প্রচুর অস্ত্র জমা না দিয়ে নিজেদের কাছেই রেখে দিয়েছেন। অথচ, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে সরকার একপেশে নীতি গ্রহণ করে নিরীহ যুবকদেরকে হত্যা ও অত্যাচার চালিয়ে শৃঙ্খলার নামে মারাত্মক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছেন। ফলে যুবকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।'

(হক কথা : ৩০ জুন, ১৯৭২)।

'কুষ্টিয়া শহরে মুজিববাদ কায়েম হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্র থেকে কাগজপত্রে মুজিববাহিনী নিষিদ্ধ হলেও কুষ্টিয়ার বিপ্লবী মুজিব বাহিনী সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নিয়েছে। ভারতে কয়েক ট্রাক পাট পাচারের কেলেঙ্কারির প্রধান নায়ক এমসিএ-টি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হয়েছেন। তার সব পাপ মাপ হয়েছে। তার কেলেঙ্কারি যে ছাত্র নেতা ধরে ফেলেছিলো বিপ্লবী মুজিব বাহিনী তাকে একদিন বেদম মারপিট করেছে। তাকে প্রহারের খবর ছাত্র নেতার নিজ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ঘটনার দু'একদিন পর শহর থেকে ১৪ মাইল দূরের আমলা সদরপুর থেকে হাজার হাজার লোকের একটি বিক্ষুব্ধ মিছিল এমসিএ-কে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে শহরের দিকে আসতে থাকলে কলঙ্কিত এমসিএটি টেলিফোনে ঢাকায় মহাপ্রভুর সাথে যোগাযোগ করেন। তৎক্ষণাৎ একটি হেলিকপ্টার এসে তাকে তুলে ঢাকায় নিয়ে যায়। মিছিল এগিয়ে এলে মুজিব বাহিনীর গুণ্ডারা শহর ছেড়ে নদীর অপর পাড়ে পালিয়ে যায়।...মুজিববাদী গুণ্ডাদের কীর্তিকলাপ স্থানীয় 'শান্তির ডাক' সাপ্তাহিকীতে প্রকাশিত হওয়ার ২৭ মে পত্রিকা অফিসে হামলা চলে এবং সম্পাদকের বুকে রিভলবার ধরা হয়। থানায় জানানো হলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। অবশ্য মুজিববাদীদের চাপে সাথে সাথে গুণ্ডাদেরকে ছেড়েও দিতে হয়েছে। গত ২৩ মে (১৯৭২) মুজিববাহিনীর লোকেরা ১২টার সময় ল্যান্ডরোভার ধরনের একটি গাড়ি জোরপূর্বক নিয়ে যায়। সন্ধ্যার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিলো, রহস্যজনকভাবে বিদ্যুৎও ছিলো না শহরে, ডাকাতি করার জন্য হাসপাতালের গাড়ি নিয়ে ঐ দুর্বৃত্তরা বেরিয়ে গেলে থানার সম্মুখে টহলদার পুলিশের ট্রাকের সামনাসামনি পড়ে যায়। মুজিব বাহিনীর ডাকাতরা হঠাৎ করে পজিশন নিয়ে পুলিশের ওপর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করলে পুলিশ ট্রাকসহ পেছনে সরে থানায় যায় এবং শক্তি বৃদ্ধি করে ফিরে আসে। পরে হাসপাতালের গাড়িখানি একটা গাছের সাথে ধাক্কা লাগা অবস্থায় পাওয়া যায়। সবকিছু জানা সত্ত্বেও কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর কুষ্টিয়া শহরে নতুন ডিলার নিয়োগ করা হয়েছে ৫০ জন। সবাই মুজিব বাহিনীর লোক। এরা দখলকৃত বাড়িতে বসে আরামে ব্যবসা চালাচ্ছে।

এগ্রোনমি অফিস থেকে জিপ অপহরণ করে ভিন্ন জেলার প্লেট লাগিয়ে মুজিববাহিনীর নেতা ডাটে গাড়িটি চালাচ্ছে। এজাহার দিয়েও লাভ নেই। মুজিববাদে বিশ্বাসীদের ওপর হাত তোলা সম্ভব নয়। অনেক গাড়ির সম্মুখে 'বঙ্গবন্ধুর অনুমতিক্রমে' প্লেট লাগিয়ে চালানো হচ্ছে। মুজিববাদ কায়েম হবার পর কুষ্টিয়াবাসীরা হাবিয়া দোজখতুল্য শান্তিতে বাস করছেন।'

(হক কথা : ৭ জুলাই, ১৯৭২)।

'দেশব্যাপী তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে রং-বেরং-এর বাহিনীগুলো দুষ্কৃতকারী বিরোধী অভিযান চালিয়েছে, দ্রব্যমূল্য সাবেক পর্যায়ে কমিয়ে আনার ওয়াদা দিয়ে ঘোষিত মহৎ 'উদ্দেশ্যে' সাধনে জনগণও সহযোগিতা করেছেন অকপটে। কিন্তু জনগণের আকাঙ্ক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে অবধি। তবে দেশটাকে আরেক দফা দখলদার আমলের আতঙ্ক ও শিহরণ দিয়ে বেসরকারি পকেটবাহিনীগুলো নিজেদের স্ট্যাটাস বাড়িয়ে নিয়েছে। এর

www.pathagar.com

অনিবার্য পরিণাম আসবে ভবিষ্যতে। সরকারি বাহিনীগুলো বাদ দিয়েই লাল-সবুজেরা জনপদে নামবে। যখন যেমন ইচ্ছা, তেমনি করবে। তখন কেউ টুঁ শব্দটি করতে সাহস পাবে না। কেননা, জুন মাসেই সেনাপুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সমমর্যাদার ক্ষমতা এরা ব্যবহার করে নজির সৃষ্টি করে রেখেছে যে, এরা কোনো বিশেষ দলের বাহিনী হলেও ক্ষমতার বদৌলতে এরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। পরিপূর্ণ ফ্যাসিবাদ কায়েমের পূর্বশর্ত হিসেবে পকেট বাহিনীগুলোকে অথরিটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং তার স্টেজ রিহার্সেল সম্পন্ন। এখন সহস্র রজনীর অভিনয়পালা শুরু। (হক কথা : ৭ জুলাই, ১৯৭২)।

'যশোরের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার খবরে প্রকাশ, দৌলতপুর, ডুমরিয়া, বাগেরহাট ও সুন্দরবন অঞ্চলে সর্বত্র নয়া অত্যাচারে আবার মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ১২ বছরের কিশোরদের পিটিয়ে সারাজীবনের মতো পঙ্গু করে দেয়া হচ্ছে। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক কর্মীদের গাছের ডালে পা উপরের দিকে বেঁধে বেপরোয়া পিটানো হচ্ছে।

নৃশংসতম অত্যাচারে রক্তাক্ত হচ্ছে অসংখ্য প্রগতিশীল ও বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী। পাক-বাহিনীর হাতে ধর্ষিতা তরুণী বাঙালি বাহিনীর দ্বারা পুনরায় ধর্ষিতা হচ্ছে। রাজাকার ধরার জন্য বলে প্রচারিত সপিং আপ অপারেশনে অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন উক্ত অঞ্চলসমূহে ঘরে ঘরে মা-বোনদের কান্নার রোল পড়ে যায়। বাগেরহাটে শেষ পর্যন্ত দুইশত মা-বোন পথে বেরিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করেছেন।

(হককথা : ১৪ জুলাই, ১৯৭২)।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে সরকারিভাবে সংবাদপত্রের ওপর কঠোর খড়গহস্ত থাকা সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনী, মুজিববাদী ও সমজাতীয় বাহিনীগুলোর হত্যা, সন্ত্রাস ও নির্যাতন সম্পর্কে দেশী-বিদেশী পত্রিকায় বেশ কিছু রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। এসব রিপোর্ট ছাপার অপরাধে দেশের বহু পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কিংবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বিদেশী অনেক সাংবাদিককেও অপদস্থ হতে হয়েছে। তৎকালীন অন্যতম বিরোধী সংবাদপত্র হক কথার উদ্ধৃতি :

অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভাসানীর প্রতিবাদ

রাজশাহী জেলার পোরশা থানার অন্তর্গত খোর্দ্দহরিপুর প্রকাশে চুলিয়াপাড়া ও তদপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের নিরীহ জনসাধারণ বিশেষ করে বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক কর্মকর্তাগণের ওপর পুলিশি জুলুম ও অত্যাচারের মাত্রা পাক আমলকেও হার মানিয়েছে।

ঘটনায় জানা যায় যে, ২/৩ দিন অনাহারের জ্বালায় ছেলেমেয়েরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে উক্ত চুলিয়াপাড়া সাকিনের সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত গাইমাল নামক এক ব্যক্তি উক্ত গ্রামের হাজি চানতুল্লা মণ্ডলের গাছ হতে একটি কাঁঠাল আহারক্লিষ্ট ছেলেমেয়েদিগকে খাওয়ালে পর হাজি সাহেবের হুকুমমতো তাহার 'মুক্তিফৌজি' নামদারী এক নাতি গদাইমালকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটাইতে পিটাইতে মারিয়া ফেলে। তদসম্পর্কে থানায় খবর দেয়া সত্ত্বেও থানা কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় উত্তেজিত জনতার হাতে হাজি সাহেবের মৃত্যু হয়। আমি জানতে পারলাম যে, উল্লেখিত ঘটনার পর স্থানীয় এম. সি.এ. পুলিশ বাহিনীসহ তথায় যান এবং ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐ এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করতে ব্রতী হন। উক্ত এম.সি.এর সহযোগিতায় পুলিশ বাহিনী ঐ এলাকায় বহু নিরীহ লোককে বিশেষ করে বিরোধী রাজনৈতিক দলীয় কর্মীদিগকে অকারণে মারপিট ও গ্রেফতার করিতেছে। ভয়

www.pathagar.com

প্রদর্শন করে এবং অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের খবরও পাওয়া যাইতেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বহু লোক প্রাণহানি ও অত্যাচারের ভয়ে চাষাবাদের কার্য ফেলে গৃহত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছে।

আমি সরকার ও সরকারি বাহিনীর অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি এবং অবিলম্বে অত্যাচার বন্ধ করার জন্য সরকারকে আহ্বান করিতেছি।

(হককথা : ১১ আগস্ট, ১৯৭২)।

প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম দেহরক্ষী জালাল উদ্দিন এবার গৌরনদী কেন্দ্র থেকে বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছেন। সান্ধ্য-আইন জারি করে যখন অস্ত্র উদ্ধার চলছে, তখন দেহরক্ষী পরীক্ষার্থীটি বগলে রিভলভার ঝুলিয়ে পরীক্ষা হলে এসেছেন। পরীক্ষার খরচ বাবদ তিনি সরকারের কাছ থেকে নজরানাস্বরূপ ১০০ রাউন্ড পিস্তলের গুলি পেয়েছেন বলে তাকে প্রচার করতে শোনা গেছে। তিনজন সহযোগী জুটিয়ে তিনি কিভাবে পরীক্ষা দিয়েছেন তা না বললেও চলে।

(হক কথা : ১২ আগস্ট, ১৯৭২)।

বদরগঞ্জে নক্সাল দমন? শীর্ষক এক পাঠকের চিঠি

জনাব,

২৮ জুলাই ভোরবেলা রক্ষীবাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর আনুমানিক সাড়ে সাত শ'-র একটি দল রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার লোহানীপাড়া ইউনিয়নসহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে কার্ফ্যু দিয়ে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করে তহমুল লোহানী নামে বদরগঞ্জ থানা ন্যাপের সদস্যসহ অপর এক গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে। অভিযোগে প্রকাশ, 'নক্সাল কোথায়? ধরিয়ে দাও' বলে গ্রামের বহু নিরীহ জনসাধারণকে প্রহার করা হয় এমনকি তাদের গুলি করে হত্যার হুমকিও দেয়া হয়। কিন্তু নক্সাল কি? কে নক্সাল? আর কোথায়ইবা তাদের অবস্থান বলতে না পারায় তাদেরকে প্রহার করা হয় বলে তারা মনে করছে!

এছাড়া বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর আরও দু'বার উক্ত এলাকাগুলোতে বাংলাদেশ বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলিতভাবে 'নক্সাল' দমন অভিযানে গিয়ে নিরীহ জনসাধারণকে হয়রানি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী মনে করছেন যে রংপুর জেলার জনৈক নেতার অদৃশ্য প্রভাবের ফলেই গ্রামবাসীর ভাগ্যে নেমে এসেছে নির্মম নির্যাতন। কার উক্ত ন্যাপ (মোজাঃ) নেতার চাচা মোঃ সোলায়মান শাহ লোহানী পাড়া ইউনিয়ন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান এবং পাক-বাহিনীর সহযোগিতায় উক্ত গ্রামগুলো কয়েকবার 'অপারেশন' করে ব্যাপক হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনে সক্রিয় সহযোগী ছিলো বলে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক তার বাড়ি দু'বার আক্রান্ত হয় এবং সে পালিয়ে জীবন রক্ষা করে।

স্বাধীনতার পর দালাল মোঃ সোলায়মান শাহ রংপুর শহরে উক্ত মোজাফফর ন্যাপ নেতার বাসায় আশ্রয় নিয়ে আছে। এ ব্যাপারে অত্যাচারিত গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে রংপুর জেলা 'দুর্নীতি দমন বিভাগে' আবেদনও করা হয়েছিলো। কিন্তু আবেদনের পর আজ প্রায় পাঁচ মাস পর্যন্ত দালাল ব্যক্তিটি উক্ত ন্যাপ নেতার বাসভবনে আশ্রয় নিয়ে রংপুর 'ক্যান্টনমেন্টে' জ্বালানি খড়ি সরবরাহ করে বেশ দু'পয়সা রোজগারের একটা পথও করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি 'খোলা চিঠি'ও তারা দিয়েছিলো।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দালাল চাচা কি করে অদ্যাবধি ন্যাপ নেতা ভাতিজার মক্কেল হয়ে আছেন?

www.pathagar.com

'দুর্নীতি দমন বিভাগ' এবং কোতোয়ালি থানা কর্তৃপক্ষ কি ক্যান্টনমেন্টে জ্বালানী খড়ি সরবরাহের মুনাফার মোহে পড়ে ঘুমাচ্ছেন? 'খোলা চিঠি পাওয়ার পর সরকারই বা নীরব কেন?' আরো প্রকাশ, উক্ত ন্যাপ নেতা গ্রামগুলোর বহু নিরীহ লোকজনের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার মিথ্যে ডাকাতি ও চুরির মামলা দায়ের করাচ্ছে। নক্সাল দমন অভিযান বোধ হয় এরই অন্যতম দিক।

ইতি

ওবায়েদ লোহানী, রংপুর

(হক কথা : ২৫ আগস্ট, ১৯৭২)।

জনসাধারণের ওপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার পরিচালনায় ফেনী মহকুমার সোনাগাজী থানা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক প্রধান হোসেনের জুড়ি নেই। সম্প্রতি চরখোয়াজ গ্রামের দু'জন অধিবাসীকে ধরে এনে উক্ত ছাদেক অন্যায়ভাবে মারপিট শুরু করলে এলাকার ক'জন বিবেকসম্পন্ন লোকের চেষ্টায় তারা আহত অবস্থায় উদ্ধার পায়।

পরে জনসাধারণের বিচারে ছাদেক হোসেনের ১০০ টাকা জরিমানা হয় এবং প্রকাশ্যে জনসমক্ষে সে কৃত অপরাধের জন্য করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে।

এরপরেও কিন্তু তার দৌরাত্ম্য শেষ হয়নি। লোকটি এখন সিগারেট এজেন্সি নিয়ে টুপাইস কামাচ্ছে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে।

(হক কথা : ২৫ আগস্ট, ১৯৭২)।

কয়েকদিন আগে এমসিএ হাবিবুর রহমান আফিল জুটমিলে গিয়েছিলেন শ্রমিকদের ছবক দিতে। অবশ্য মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো দালাল মিল প্রশাসক আছলাহ উদ্দিনকে শক্তি যোগানো, কেননা আজকাল তিনি আছলাহ উদ্দিনের আমব্রেল হিসেবে কাছ করছেন, আর তাতে মালপানিও মন্দ জুটছে না।

শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে এমসিএ সাহেব বলেন, জানেন আপনারা (অর্থাৎ শ্রমিকরা) বাংলাদেশে আরো ত্রিশ লাখ লোক মারা হবে মানে হত্যা করা হবে, বুঝলেন! আমি এ খবর আনঅফিসিয়ালি বলছিনে—অফিসিয়ালি বলছি। আর ভাসানী ন্যাপ ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নে যারা আছে তারা সব নকশাল। তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ স্বাধীনতার পরই হয়েছিলো কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এই সমস্ত নকশালদের অবিলম্বেই খতম করা হবে।

'সুতরাং সাবধান। আই এ্যাম এমসিএ স্পিকিং'। জনাব হাবিবুর রহমান এখন খুলনার বহু আলোচিত আওয়ামী লীগ নেতা। পাক-সরকারের আমলের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এই নেতা বর্বর সেনাবাহিনীর আমলেও একমাত্র আওয়ামী লীগের গণপরিষদ সদস্য যিনি খুলনা বেতার কেন্দ্র থেকে পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন। ইনিই একমাত্র সদস্য যিনি স্বাধীন হওয়ার পর বহু অপকর্মের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইনিই খুলনার গণ-পরিষদ সদস্যদের মধ্যে প্রথম, যিনি সবসময়ই প্রশাসন কর্তৃপক্ষের স্বাভাবিক কাজের বিঘ্ন ঘটিয়ে নিজের ক্ষমতা জারি করে থাকেন। এমনকি কোনো আসামি ধরা পড়লে এই এমসিএ সাহেব থানায় যান পুলিশের ওপর মেজাজ দেখিয়ে আসামি ছাড়াতে। পাক-আমলের দালালদের পুলিশ গ্রেফতার করলে এমসিএ সাহেব তৎক্ষণাৎ থানায় যান তদবির করতে। সেখানে গিয়ে তার প্রথম বুলি হলো, 'ডু ইউ নো আই এ্যাম এমসিএ?'

(হক কথা : ১ সেপ্টেম্বর : ১৯৭২)।

সন্দ্বীপের সারিকাইত, মাইটভাঙ্গা প্রভৃতি এলাকার ৫ জন প্রবীণ আওয়ামী লীগার

www.pathagar.com

সন্দ্বীপের বুকে বর্তমানে সংঘটিত ঘটনাবলীর জের টেনে এক পত্রে লিখেছেন, দু'একদিন নয়, ১০/১২ বছর ধরে আওয়ামী লীগ করে আসছি আমরা, কিন্তু আওয়ামী লীগ শাসনের চেহারা দেখে আমরা বীতশ্রদ্ধ। দরকার বশত লোক হত্যা করে পথের কাঁটা সরানো এটাই কি স্বাধীনতা? তাদের অভিজ্ঞতা : কথায় কথায় স্টেনগান নিয়ে তেড়ে আসা, এটা কি সরকারি আদেশ?

দীর্ঘ চিঠির উপসংহারে তারা লিখেছেন, সরকারের কাছে বহুবার জানানো হয়েছে, কিন্তু আজ আর কালি নেই, কলম মুষড়ে আসছে।

তাদের আকুল ফরিয়াদ : শেষে নিরুপায় হয়ে হককথার শরণাপন্ন হলাম, আমাদের এই দ্বীপবাসীর জনগণের মর্মন্তুদ কাহিনী সারা দেশের মানুষকে জানিয়ে দিন।

সারিকাইতের সামছুল হক রিলিফের চাল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। আওয়ামী লীগের অসৎ নেতৃত্বের চাপে তার বিচার হয়নি। প্রতিটি ইউনিয়নেই চলছে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সাতঘড়িয়ার সতেন, গণেশ কর্মকার ও কামাল উদ্দিন মুক্তিবাহিনীর নাম ভাঙ্গিয়ে জনসাধারণের ওপর চালাচ্ছে নির্মম অত্যাচার।

মুজিববাহিনীর নামে দুলাল চন্দ্র, অমর কর্মকার, নারায়ণ চন্দ্র, মৃণাল বাবুরা সারা দ্বীপে সৃষ্টি করেছে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। বলার ইচ্ছে ছিলো না, সাম্প্রদায়িক চেতনাকে আমরাও ঘৃণা করি, তবু কি অসহায় অবস্থায় পড়ে বলছি ভেবে দেখুন, এ কথা লিখে তারা জানাচ্ছেন মুসলমানদের মধ্যে যারা বুদ্ধিজীবী, সামাজিক, সৎচরিত্র তাদেরকে এরা অহরহ দালাল বলছে। এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্র তো রয়েছেই উপরন্তু জনগণের মধ্য থেকে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে চক্রটি গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

অতিষ্ঠ হয়ে অনেক সমাজকর্মী আওয়ামী লীগার দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছেন, অন্যত্র বাস করছেন।

বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, এসে তদন্ত করে আপনারা দেখুন, এই স্বাধীন বাংলায়—এই দ্বীপে পাঞ্জাবিদের কায়দায় কারা আমাদের মা-বোনদের ওপর হিংস্র হায়েনার মতো নির্যাতন করছে। আবারও বলছি সাম্প্রদায়িকতাকে তাড়াবার জন্য আমরা আওয়ামী লীগরা, ন্যাপ কর্মীরা এক শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশব্যাপী সংগ্রাম করেছি। আজ আমাদের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। কিন্তু তদন্ত করে দেখুন, জেনে রাখুন। কারা আজ এই সম্প্রীতির পবিত্রতার ওপর আঘাত হানছে। শুনছি, মুসলমান বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত লোকদের একটা তালিকা হয়ে গেছে। এদের সরিয়ে ফেলতে পারলে, নব্য ফ্যাসিস্টরা দ্বীপের নেতৃত্ব পাবে বলে আশা করছে। ইতিমধ্যে যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের মধ্যে আব্দুল খালেক সওদাগর অন্যতম। রাতের অন্ধকারে তাকে মেরে দু'লাখ টাকার অলংকার ও অর্থ অপহরণ করেছে মুজিববাহিনী। হাই স্কুল পলিটিক্সে বিকম, বিএড মোহাম্মদ কামালকে হত্যা করা হয়েছে। ছাত্রদের সন্তানের মতো জেনে তিনি পড়াতেন। তার অনুপস্থিতিতে হাই স্কুলটি আজ গোশালা। তৃতীয় শিকার সফিউল্লা সওদাগর। সফিউল্লা সওদাগরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হলে তার শ্যালক ভগ্নিপতিকে বাঁচাতে গিয়ে গুলি বুকে নিয়ে মরেন। সফিউল্লা বেঁচে যান।

সংগ্রামকালে আওয়ামী ভিত্তিক কমিটিকে সংগ্রাম পরিষদে রূপান্তর করা হলে গণ-আদালত বসলো। স্থানীয়ভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজিববাহিনী শুরু করলো এক নারকীয় উৎসব। স্টেনগান বুকে ঠেকিয়ে বেপরোয়া পাইকারি হারে লোকজনকে হাজির করলো গণ-আদালতে। আদায় করলো হাজার হাজার টাকা। টাকা না থাকলে দিতে হয়েছে জান। যার

www.pathagar.com

হাতে অস্ত্র নেই, তারাই হলো এদের শিকার।

রমজান মাসে দঃ সন্দ্বীপ হাই স্কুল প্রাঙ্গণে সমবেত মুজিববাহিনী এক উৎসুক ১৩ বছরের কিশোরকে গুলি করে হত্যা করলো। ঈদের দিনে ঘেরাও অভিযানের সাথে চললো সান্ধ্য-আইন। ছালামত নামে জনৈক আওয়ামী লীগারকে হত্যা করলো তারা। অথচ সালামতের দু'ছেলে তখন মুক্তিবাহিনীতে।

মুজিববাহিনীর উদ্যত স্টেনগানের ভয়ে এবং জানকবজের তালিকায় নাম থাকায় অনেক আওয়ামী লীগার ও দেশপ্রেমিক সমাজকর্মী বউ ছেলে মেয়ে ফেলে কোথাও পালিয়ে আছেন।

(হককথা: ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২)।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে সরকারিভাবে সংবাদপত্রের ওপর কঠোর খড়্গহস্ত থাকা সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনী, মুজিববাদী ও সমজাতীয় বাহিনীগুলোর হত্যা, সন্ত্রাস ও নির্যাতন সম্পর্কে দেশী-বিদেশী পত্রিকায় বেশ কিছু রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। এসব রিপোর্ট ছাপার অপরাধে দেশের বহু পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কিংবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বিদেশী অনেক সাংবাদিককেও অপদস্থ হতে হয়েছে। তৎকালীন অন্যতম বিরোধী সংবাদপত্র হককথা ও মুখপত্র-র উদ্ধৃতি : মদের আড্ডা জমেছে এখন যত্রতত্র। প্রগতিশীল কর্মীকে ও ছাত্রদের নকশাল বলে হত্যা করা হচ্ছে। গোপনে নমিনেশন এনে চোর বদমায়েশ ও লুটেরাগুলো বানিয়েছে পঞ্চায়েত কমিটি।

হাজি মতিউর, মৌলবী ইউনুছকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে দেড় লক্ষ টাকার অলঙ্কার ও নগদ অর্থ লুট করা হয়েছে।

ডাকাতি চলছে চমকপ্রদভাবে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের জুলাই পর্যন্ত ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড হয়েছে অনেক। সব কয়টিই ধনী ও মধ্যবত্তি, এমনকি নিম্নবিত্ত মুসলমানের বাড়িতে। হিন্দু জোতদার, মহাজন, ব্যবসায়ীদের একজনও যদি ডাকাতির খপ্পরে পড়তো, তবু না হয় কথা ছিলো। ডাকাত কেবল মুসলমান চিনছে কেন?

সন্দ্বীপ থানা প্রধানের কাছে যে পুলিশ আছে তা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের পাহাড়াই চলে না। বিচারপতির কাছে মামলা গেলে তিনি পাঠান আওয়ামী লীগের দুর্দান্ত সম্পাদক চৌধুরীর কাছে। তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আর আওয়ামী লীগ খোল নৈচা বদল করে এখন হয়েছে তাতার বাহিনী।

পত্রলেখকগণ প্রশ্ন করেছেন, বলুন শেখ সাহেব ভারতপ্রেমই কি এ দেশের জন্য দেশপ্রেম? তারা প্রশ্ন করেন, শেখ সরকার দেশ চালায়, না হিন্দু প্রধান মুজিববাহিনী চালায় দেশ। তিন লাখ অধিবাসী অধ্যুষিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে বারবার বিপর্যস্ত সন্দ্বীপের বুকে স্বস্তি ফিরিয়ে দেবে কে?

(হককথা : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২)।

ভাসানীর বিবৃত্তি

আমি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, একদিকে যখন সরকারের চরমব্যর্থতা ও দুর্নীতির ফলে খাদ্যাভাবে মানুষ দিন দিন ধুঁকে ধুঁকে মরছে, অন্যদিকে সরকার ও জনগণের এ অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ না করে চরম ফ্যাসিবাদী কায়দায় গণবিক্ষোভকে দমন করতে চাচ্ছে। এই সুযোগে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জনগণের বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। বন্ধুবেশে এই সব সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তিসমূহ বাংলার মানুষকে চিরদিনের

www.pathagar.com

মতো গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। আর আমাদের সরকার এসব বিদেশী শক্তির দাবার ঘুঁটি হিসেবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মিশিয়ে দিয়ে বিদেশী প্রভুর নির্দেশে একের পর এক জনগণের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। সম্পূর্ণ ফ্যাসিবাদী পন্থায় তারা সন্ত্রাস, গুপ্তহত্যা, বাড়িঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে বিরোধীদলীয় কর্মীদের নিশ্চিহ্ন করার অশুভ চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ভুখা মানুষের খাদ্যের দাবিতে কথা বলার অধিকার নাই। অসহায় মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা জানিয়ে দেশে যে দু'একখানা বিরোধীদলীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো চরম স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একে একে তারও কণ্ঠরোধ করে দেয়া হচ্ছে। সাপ্তাহিক 'গণশক্তি' তালাবদ্ধ করা হয়েছে। হককথা-র সম্পাদক জনাব ইরফানুল বারীকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে সাপ্তাহিক মুখপত্রের সম্পাদককেও গ্রেফতার করা হয়েছে এবং গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে অফিস জবরদখল করা হয়েছে। সর্বশেষ বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত 'হককথা'সহ পাঁচটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ করে দেবার নোটিশ জারি করা হয়েছে। এককথায় সরকারবিরোধী সকল সংবাদপত্রের টুঁটি টিপে হত্যা করতে এই সরকার বদ্ধপরিকর। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ আজ রুদ্ধ। জনগণের অর্থনৈতিক জীবন ও গণতান্ত্রিক অধিকার উভয়ই আজ চরম সংকটের সম্মুখীন।

দেশের এই পরিস্থিতিতে আমরা কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পারি না। দলমত নির্বিশেষে সকল গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে তাই আমার আকুল আবেদন, আসুন ১ অক্টোবর সারাদেশব্যাপী সভা ও শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার মাধ্যমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালন করি।

(হককথা : ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২)।

এসব গুপ্তঘাতকরা যে সব সময় লুকিয়ে হত্যা করছে এমন নয়। অনেক সময় প্রকাশ্যে হাটেবাজারে মানুষ খুন করে ঘাতক আবার বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘাতকদের অনেকেরই মুখ মহল্লার লোকদের চেনা। তারাও প্রকাশ্যে ডাকাতি করে। অনেক ডাকাত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য বলে পরিচয় দেয়। অনেকে আবার গ্রেফতার হয়ে বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের সুপারিশে ছাড়া পেয়ে যায়।

(মুখপত্র: ১০ ভাদ্র : ১৩৭৯ বাংলা)

বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব সিরাজুল হোসেন খান পত্রিকা হকারের ওপর তথাকথিত লালবাহিনীর লোকদের গুণ্ডামির নিন্দা করে এক বিবৃতি দেন।

তিনি বলেন, হকার সিরাজুর রহমানকে টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশনের পূর্বদিক তথাকথিত লালবাহিনীর লোকেরা ডাকিয়া নিয়া যায় এবং তাহাকে মারধর করিয়া লাল পতাকা 'হককথা', 'মুখপত্র' এবং 'নবযুগ' ও অন্যান্য পত্রিকা ও টাকাপয়সা লুট করে তাকে অচেতন অবস্থায় ফেলে চলে যায়।

কোন অবস্থাতেই এসব গুণ্ডামি সহ্য করা হবে না বলে হুশিয়ার করে দিয়ে তিনি বলেন, যদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হন, তা হলে সচেতন শ্রমিকশ্রেণী এ সমস্ত গুণ্ডাদের দমন করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে এক শ্রেণীর গুণ্ডা সুপরিকল্পিতভাবে হকারদের মারধোর ও হয়রানি করছে। এর পেছনে বিশেষ মহলের হাত রয়েছে বলে সকলের

www.pathagar.com

ধারণা। এ ধরনের গুণ্ডাদের জনগণের স্বার্থের খাতিরেই চরম শাস্তি দেয়া প্রয়োজন।

(মুখপত্র : ১০ ভাদ্র : ১৩৭৯ বাংলা)

সম্প্রতি নবীগঞ্জ থানার আদিত্যপুর গ্রামে একটি প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাসেবক নামধারী কতিপয় সশস্ত্র দুর্বৃত্ত কার্ফ্যু দিয়ে লুটতরাজ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এই সশস্ত্র দলটি আদিত্যপুর গ্রামের চারটি বাড়িতে চড়াও হয়ে নগদ টাকা, অলঙ্কার, রেডিও, ঘড়ি ও অন্যান্য সামগ্রী লুট করে নিয়ে গেছে। জনসাধারণের কাছ থেকে জানতে পারা গেছে যে, দুর্বৃত্তরা পূর্বেই জনসাধারণকে নিজ গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে কার্ফ্যু জারি করেছিলো। (মুখপত্র : ১০ ভাদ্র : ১৩৭৯ বাংলা)।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে সরকারিভাবে সংবাদপত্রের ওপর কঠোর খড়্গহস্ত থাকা সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনী, মুজিববাদী ও সমজাতীয় বাহিনীগুলোর হত্যা, সন্ত্রাস ও নির্যাতন সম্পর্কে দেশী-বিদেশী পত্রিকায় বেশ কিছু রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। এসব রিপোর্ট ছাপার অপরাধে দেশের বহু পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কিংবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বিদেশী অনেক সাংবাদিককেও অপদস্থ হতে হয়েছে। তৎকালীন অন্যতম বিরোধী সংবাদপত্র মুখপত্র ও গণকণ্ঠ-র উদ্ধৃতি :

লুট, রাহাজানি আর ডাকাতি নাটোরে জনজীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে।

খবরে জানা যায় যে, গ্রামে রাতে আর শহরে দিন-দুপুরে ডাকাতি এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। গ্রামে ডাকাত আর শহরে (কথিত) স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আমলের ন্যায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করছে। খবরে আরো জানা যায় যে, গ্রাম থেকে কোনো লোক শহরে পদার্পণ করলে অযথা তাকে রাজাকার কিংবা আলবদর বলে আখ্যায়িত করা হয়। ফলে এসব সরলমনা মানুষকে সেলামি দিয়ে রক্ষা পেতে হয়। এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন বলে অভিযোগে জানা গেছে।

স্থানীয় জনগণ তাই তাদের নিরাপত্তার জন্য অবিলম্বে এবং দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

(মুখপত্র : ১০ ভাদ : ১৩৭৯ বাংলা)।

জাতীয় শ্রমিক লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান লাল বাহিনীর ১৪টি দায়িত্ব অর্পণের আহ্বান জানান শেখ মুজিবের কাছে। এর দ্বিতীয়টি ছিলো : সকল দুর্বৃত্ত দমনে লালবাহিনীকে অস্ত্রের মোকাবিলা করার জন্য এবং সশস্ত্র আক্রমণ থেকে নিরীহ শ্রমিক জনসাধারণকে রক্ষার জন্য লালবাহিনীর নিকট অস্ত্র ও প্রয়োজনবোধে অস্ত্র ব্যবহারের হুকুম প্রদান করা হোক। লালবাহিনীকে শুদ্ধি অভিযানের ক্ষমতাদানের আহ্বানও তিনি জানান।

(গণকণ্ঠ : ৫ জুন : ১৯৭২)।

জনৈক অধ্যাপকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে শাহজাদপুরের ঘটনাবলী :

গত ৯-৬-৭২ তারিখে জাতীয় কৃষক লীগের থানা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিলো। সেখানে লতিফ, আমির ও অন্যদের উপস্থিত থাকার কথা ছিলো। সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তির যে মন্ত্র ও পথ আমরা মানুষের মধ্যে প্রচার করেছিলাম, তাতে অবহেলিত কৃষককুল সাড়া দিয়েছিলো অভূতপূর্বভাবে। তাতে আঁৎকে উঠছিলো গুটিকয়েক ক্ষমতাসীন ব্যক্তি। তাই সম্মেলন নষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমরা তখন শান্তিপূর্ণভাবে কাউন্সিল

www.pathagar.com

অধিবেশন চালিয়ে যাচ্ছিলাম কলেজের ১৮ নং কক্ষে, তখন 'মুজিববাদের' প্রচারক এম. সি. এ. আবদুর রহমান তার গুণ্ডাবাহিনীকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত করে অতর্কিতে হামলা চালায় আমাদের উপর। আরম্ভ করে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ। আমার ৬ জন কর্মীকে বাড়ি থেকে খুঁজে বের করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। কি অপরাধ করেছিলো তারা—মানুষের মুক্তির কথা বলে? আমার সবচেয়ে দুঃখ 'গণকণ্ঠে' ছাপানো খবর। আপনারা কি চান আমাদের কাছে? অতীতে রহমান সাহেবদের মতো জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের সম্বন্ধে অনেকবার বলা হয়েছে আপনাদের। তারপরও আপনারা আমাদের শুধু কাজ করে যেতে বলেছেন। আমরা মেনে নিয়েছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম জাতীয় কৃষক লীগের কার্যকরী পরিষদে সদস্য হিসেবে আব্দুর রহমান স্থান পেয়েছে। এলাকায় প্রায় ৪/৫ মাস অবধি কার করলাম আমরা, আর আপনারা ঢাকায় থেকে বহাল তবিয়তে নাম পাঠালেন এমন একজন লোকের যার সঙ্গে নীতির ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে আমাদের। যার ফলস্বরূপ আমাদের দিতে হলো ৬টি মূল্যবান জীবন, যাদের মধ্যে রয়েছে আপনার স্নেহের শহীদুজ্জামান হেলালও।

(গণকণ্ঠ : ১৭ জুন : ১৯৭২)।

প্রকাশ্য দিবালোকে এমসিএ সাহেবের আত্মীয়-স্বজন সহযোগে ভাড়াটে গুণ্ডারা স্টেনগান, এসএলআর ও রিভলবারসহ কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। গুণ্ডাদল হায়েনার মতো বিপ্লবী কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কলেজ প্রাঙ্গণেই সিরাজগঞ্জ দোকান কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কোরবান আলীকে গুলি করে হত্যা করে। গুণ্ডারা একজন কলেজ ছাত্রকে না পেয়ে তার পিতা দোকানদার সফিজুদ্দিনকেও গুলি করে হত্যা করে। গ্রামের একপ্রান্তে পুকুরপাড়স্থ মহল্লার এক বাড়িতে শাহজাদপুর থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও শাহজাদপুর কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও গণকণ্ঠের নিজস্ব সংবাদদাতা শহীদুজ্জামান হেলাল আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুণ্ডাদল উক্ত বাড়িতে ঢুকে শহীদুজ্জামান হেলাল ও ফরহাদ হোসেনকে ধরে ফেলে এবং পৈশাচিক উল্লাসে উক্ত বাড়ির দোতলা থেকে নিচে ফেলে দেয়। তারপর আঘাতের পর আঘাত হেনে তাদেরকে হত্যা করে। দুর্বৃত্তরা তাদের লাশ পার্শ্ববর্তী করতোয়া নদীতে ফেলে দেয়।

চারটি হত্যাকাণ্ড সমাধা করে গুণ্ডারা এমসিএ সাহেবের কাছে যায়। পরে দুর্বৃত্তরা আবার হত্যার নেশায় মেতে ওঠে। বাড়ি বাড়ি তল্লাশি শুরু করে। তারা কালাম ও দিলিপকে ধরে এমসিএর সাহেবের বাড়িতে নিয়ে যায়। অত্যাচার চালানোর পর বাজারের ওপর নিয়ে এসে গুলি করে হত্যা করা হয়।

দুর্বৃত্তরা ওয়াহিদ খানের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারা শহীদুজ্জামান, হাবিব, নুরু, গোলাম ও অধ্যাপক আউয়ালের বাড়িতে লুটতরাজ চালায়। শাহজাদপুর মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস ও পার্শ্ববর্তী এলাকার দোকানপাটও তছনছ করে। উল্লেখ্য যে, গুণ্ডা দলের কয়েক ঘণ্টাব্যাপী এই তাণ্ডবলীলা বিনা বাধায় চলতে থাকে। ঐ সময় পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহত সফিজুদ্দিনের ছেলে মান্নান তার পিতাকে হত্যা করার সময় থানার পুলিশের সাহায্যের জন্য কাকুতি-মিনতি করেও কোনো সহায়তা পায়নি বলে অভিযোগে প্রকাশ।

(গণকণ্ঠ : ২১ জুন : ১৯৭২)।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবার ক্ষমতা কুক্ষীগত করার জন্য এবং ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ শক্তিকে দাবিয়ে রাখার জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের প্রশাসনযন্ত্র পুলিশি নির্যাতনের

www.pathagar.com

পথকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। সত্যিই আমাদের অবাক লাগে যে, রাজনীতিবিদরা মাত্র সাত মাস আগে যে কোনো ধরনের নির্যাতন, পুলিশ বা মিলিটারির গুলি চালনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হতো, সেই রাজনীতিবিদরা প্রশাসনযন্ত্রকে প্রভাবিত করে ছাত্রকর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করছে ও গ্রেফতার করছে।

(গণকণ্ঠ : ১৩ জুলাই : ১৯৭২)।

২১ জুলাই থেকে ছাত্রলীগের তিনদিনব্যাপী যে কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তারই প্রস্তুতিস্বরূপ আজ সন্ধ্যায় একটি মশাল মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি এসডিও-র বাসার সামনে এলে মুজিববাদের সমর্থক কিছুসংখ্যক গুণ্ডা উক্ত মিছিলে হামলা চালায় এবং মহকুমা শাখার সভাপতি বাবর শেখ, সাধারণ সম্পাদক সিরাজ খান ঠাকুর ও খুলনা বাস্তুহারা সমিতির সভাপতি মোশাররফ হোসেনকে স্থানীয় এমসি আবদুর রশীদ সাহেবের বাসায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদেরকে বেদম মারধর করা হয়। এ পর্যন্ত তাদের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

(গণকণ্ঠ : ১৯ জুলাই, ১৯৭২)।

আরেকটা নক্ষত্রের পতন হলো...এমন একটা বাহিনীর দ্বারা যারা নিজেদেরকে গণতন্ত্রের প্রচারক ও জনগণের প্রতিনিধি বলে দাবি করে। গত ২৩ জুলাই আওয়ামী গুণ্ডাবাহিনী ও সরকারসমর্থক এনএসএফ মার্কা ছাত্রদলের ফ্যাসিবাদী হামলায় আহত আব্দুল মালেক গতকাল সকাল সাড়ে ছ'টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

(গণকণ্ঠ : ২৬ জুলাই, ১৯৭২)।

ফ্যাসিবাদী গুণ্ডাদের আক্রমণে গত পরশু (বৃহস্পতিবার) কালিগঞ্জ ইউনিয়নের আব্দুর রহিম (২৩) নামে আর একজন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হয়েছেন। সেদিন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কালিগঞ্জ ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে একদল সশস্ত্র মুজিববাদী নামধারী গুণ্ডা সভায় উপস্থিত ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর আক্রমণ করে ফলে ১০ জন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। আহতদের ফেনি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সন্ধ্যার সময় আব্দুর রহিম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

(গণকণ্ঠ : ৫ আগস্ট, ১৯৭২)।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, মুজিব বাহিনীর সার্টিফিকেট নিয়ে রাজাকাররা এখন রক্ষীবাহিনীতে ঢুকছে। গফরগাঁওয়ের লঙ্গাইর গ্রামের কুখ্যাত রাজাকার মুহম্মদ আনোয়ার খান ওরফে নশী এখন সাভারে রক্ষীবাহিনীতে ট্রেনিং নিচ্ছে। উক্ত কুখ্যাত রাজাকার গফরগাঁও অঞ্চলে একদা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো এবং সে বহু হত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজের সঙ্গে জড়িত ছিলো। সে তার প্রভাবশালী মাতুল ময়মনসিংহের রক্ষীবাহিনী প্রধান সামসুদ্দিন আহমদের বদৌলতেই রক্ষীবাহিনীতে ঢুকতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে।

(গণকণ্ঠ : ৫ আগস্ট, ১৯৭২)।

আজ বিকেল ৪টায় যশোহর থেকে লড়াইল যাবার পথে চাঁচড়ায় বাংলার যুব সমাজের কণ্ঠস্বর আ স ম আবদুর রব মুজিববাদী সশস্ত্র ফ্যাসিস্ট দুর্বৃত্তদের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিপ্লবী নেতা আবদুর রব তার সঙ্গীদের সাথে নড়াইলের জনসভায় যোগ দেয়ার জন্য যখন নড়াইল যাচ্ছিলেন তখন যশোহর থেকে ৬ মাইল দূরে চাঁচড়ায় দুর্বৃত্তরা তার গাড়িকে ঘিরে ফেলে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, জনাব রব চাঁচড়ার পৌছানোর অনেক আগে থেকেই দুষ্কৃতকারীরা প্রত্যেকটি গাড়ি তল্লাসী চালিয়ে

www.pathagar.com

আসম রবকে খুঁজছিলো। দুষ্কৃতকারীরা প্রথমে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। জনাব রব ও তার সঙ্গীরা গাড়ি থামালে দুর্বৃত্তরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গাড়ীর কাঁচ ভেঙে জনাব রবকে বের করে আনা হয় এবং তার হাতে পিঠে এবং কপালে ছুরিকাঘাত করা হয়। তার সঙ্গী কামরুজ্জামান টুকু, জুলফিকার এবং গোরাও দুর্বত্তদের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। ইতোমধ্যে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মুজিববাদী গুণ্ডাদেরকে তাড়া করলে তারা পালিয়ে যায়।

(গণকণ্ঠ : ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২)।

যশোর জেলা ও শহর ছাত্রলীগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক বিরাট ছাত্র গণমিছিলের উপর মুজিববাদী ফ্যাসিস্ট গুণ্ডারা হামলা চালালে যশোহরের গণকণ্ঠ সংবাদদাতা একরামুল হক সহ কমপক্ষে ৪ জন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়েছেন।

(গণকণ্ঠ : ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২)।

বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার দশজন প্রগতিশীল ছাত্র-যুবক-শ্রমিক নেতাকে সুপরিকল্পিত উপায়ে হত্যা করার জন্য 'গেস্টাপো' বাহিনী গঠন করেছেন। গতকাল পল্টনের জনসভায় বিপ্লবী যুব নেতা আ স ম আবদুর রব এ তথ্য উদঘাটন করেছেন।

তিনি বলেন, তিনজন পরিচিত নেতার (?) নেতৃত্বে মীরপুর ও মোহাম্মদপুর থেকে ঘাতক সংগ্রহ করে কতগুলো দল তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি দলে রয়েছে ৫ জন করে ঘাতক। এভাবে বাংলাদেশের মাটি থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দেয়ার এক জঘন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

(গণকণ্ঠ : ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২)।

শাসক আওয়ামী লীগ দল ও সরকার গণতন্ত্রকে চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শের একটি বলে ঘোষণা করলেও গণতন্ত্রের প্রতি তাদের নিষ্ঠা একান্তই মৌলিক। প্রকৃতপক্ষে দেশে বিভেদ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি অস্থিতিশীল অবস্থাকে অব্যাহত রাখা হয়েছে। এই অস্থিতিশীল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে শাসক দল বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং দলের নেতা ও কর্মীদের হয়রানী করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এসব দলের নেতা ও কর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে বলে বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীদের উপর আক্রমণ ফ্যাসিস্ট আকার ধারণ করেছে। কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। ডাকসুর প্রাক্তন সহসভাপতি বিপ্লবী জননেতা জনাব আ স ম আবদুর রবের উপর এ পর্যন্ত দু'দুবার আক্রমণ ও হত্যার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এছাড়া মমতাজ বেগমের উপরও আক্রমণ করা হয়। ছাত্রলীগের বর্তমান সম্পাদক আ. ফ. ম. মাহবুবুল হকের উপরও এ ধরনের জঘন্য আক্রমণ চালানো হয়েছে। এছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে ছাত্রলীগ কর্মীদের ধরপাকড়, নির্যাতন ও হয়রানী অবাধে চলছে। এ পর্যন্ত অসংখ্যক ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

(গণকণ্ঠ : ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২)।

কুমিল্লায় মুজিববাদী গুণ্ডাদের ফ্যাসিবাদী হামলায় আহতদের মধ্যে আবদুল হক (১৪) নামক একটি কিশোর শ্রমিক গতকাল (শুক্রবার) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। উল্লেখ্য গত বুধবার রাতে ডাকাতি করার সময় কুমিল্লার মুজিববাদী সংগঠনের পাণ্ডা পাখিকে দলবলসহ অস্ত্র ও জীপগাড়ী সমেত গ্রেফতার করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত

www.pathagar.com

ফ্যাসিস্ট সংগঠনের অপরাপর পাণ্ডারা ডাকাত পার্টির মুক্তির দাবিতে শহরে হরতাল আহ্বান করেছে। জনগণ তাদের আহ্বানে বিন্দুমাত্র সাড়া দেয়নি।

(গণকণ্ঠ : ৭ অক্টোবর, ১৯৭২)।

গতকাল স্থানীয় কলেজের বিএ শ্রেণীর ছাত্র বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও ছাত্রনেতা জনাব মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান মুজিববাদী গুণ্ডাদের গুলিতে নিহত হন। প্রকাশ, গফরগাঁও কলেজের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিছুদিন পূর্বে মুজিববাদী গুণ্ডারা ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উক্ত মাসুদুজ্জামানকে প্রকাশ্যভাবে মারধর করে এবং এ ব্যাপারে থানায় এজাহার দিলে তাকে প্রাণে মারা হবে বলে হুমকি প্রদর্শন করে। জনাব মাসুদুজ্জামান থানায় এজাহার না দিয়ে স্থানীয় এম. সি. এর কাছে বিচার প্রার্থনা করে। কিন্তু এমসিএ সাহেব এ ব্যাপারে মোটেও গা করেননি। এরপরই মুজিববাদী গুণ্ডারা জনাব মাসুদুজ্জামানকে তার নিজ বাড়ি ফান্দি পাড়া গ্রামে খুন করে। গভীর রাতে মুজিববাদীরা দরজা ভেঙে তার ঘরে ঢুকে তাকে গুলি করে হত্যা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মুজিববাদীদের ফ্যাসিস্ট কার্যকলাপ এই অঞ্চলে দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। গত আগস্ট মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগ সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য উত্তর বঙ্গ থেকে আগত ছাত্রলীগ কর্মীদের গফরগাঁয়ে নামিয়ে মারধর করে।

(গণকণ্ঠ : ১২ অক্টোবর, ১৯৭২)।

ঈশ্বরদী থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, গতকাল রবিবার রাতে (৫ নভেম্বর) ঈশ্বরদী ছাত্রলীগ কর্মী জনাব ইকবাল হোসেন গতকাল মুজিববাদী গুণ্ডাদের গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে আছেন। মুজিববাদী গুণ্ডারা জাতীয় শ্রমিক লীগের ঈশ্বরদী শাখার সদস্য জনাব তমিজ উদ্দিনের উপর এসএমজি-র ৫/৬ রাউন্ড গুলি নিক্ষেপ করে। সে সময় পাশের ইকবালের মাথায় লাগে।

(গণকণ্ঠ : ৬ নভেম্বর, ১৯৭২)।

'গত রবিবার ১২ অক্টোবর সন্ধ্যায় জাতীয় কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও নবাবগঞ্জ হাই স্কুলের অন্যতম শিক্ষক জনাব সিদ্দিকুর রহমান খান দুষ্কৃতকারীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার দিকে জনাব সিদ্দিকুর রহমান যখন স্কুল হোস্টেলের বারান্দায় বসে নামাজের জন্য ওজু করছিলেন ঠিক সেই সময় তার উপর স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ার হয়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তিনি একজন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও আদর্শবাদী সমাজকর্মী ছিলেন। তার জনপ্রিয়তার জন্যে অঞ্চলে সাধারণ্যে তিনি সিদ্দিক মাস্টার বলে পরিচিত ছিলেন। জনাব সিদ্দিক মাস্টার বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন প্রাক্তন সদস্য। ইদানীং তিনি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। গতকাল সোমবার জনাব সিদ্দিক মাস্টারের দেহ ঢাকায় আনা হয়। ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দের অপকর্মের বিরুদ্ধে তিনি অত্র এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে তিনি স্থানীয় এমসি র রোষানলে পড়েন। কিছুদিন পূর্বে এ নিয়ে নবাবগঞ্জে পুলিশ জনতার উপর গুলি চালালে ৪ জন আহত হয়। এরপর উক্ত এমসিএ-কে অপদস্ত করার অভিযোগ করে সিদ্দিক মাস্টারকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। পরবর্তীকালে তাকে বার বার হত্যার হুমকি দেয়া হয়।

(গণকণ্ঠ : ১৪ নভেম্বর, ১৯৭২)।

পরদিন জাসদ নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে বলেন, যেসব বিপ্লবী পাকিস্তানী সেনাদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তারা ফ্যাসিবাদের শিকার হচ্ছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর সুপরিকল্পিতভাবে এ পর্যন্ত তিন হাজারেরও বেশি প্রগতিশীল ছাত্র-শ্রমিক-রাজনৈতিক কর্মীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত তারা নরসিংদীর শ্রমিক মুক্তিযোদ্ধা কাদের, সিরাজ, ঈশ্বরদীর কচি, কুষ্টিয়ার হাবিব, টাঙ্গাইলের জিন্নাহ ও নবাবগঞ্জের শহীদ সিদ্দিকুর রহমানের নাম উল্লেখ করেন।

(গণকণ্ঠ : ১৬ নভেম্বর, ১৯৭২)।

ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসলীলা, গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধের প্রতিবাদে ছাত্রদের একটি মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে রাজপথ বেয়ে এগিয়ে আসছিলো। মিছিলটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের তথ্য কেন্দ্রের সামনে এলে পুলিশ কোনো সঙ্কেত বা শতর্কবাণী ছাড়াই বেলা ১২টা ১০ মিনিটে গুলি চালাতে শুরু করে। গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র মতিউর ইসলাম ও ঢাকা কলেজের ছাত্র মীর্জা কাদির ঘটনাস্থলেই নিহত হন। গুলিতে অসমর্থিত খবর অনুযায়ী কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে।

(গণকণ্ঠ : ২ জানুয়ারি, ১৯৭৩)।

একই দিনে গণকণ্ঠের 'লালঘোড়া, শীর্ষক সম্পাদকীয়ের একাংশে বলা হয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশপ্রেমিক ছাত্র যুবকের তাজা রক্তপাতের মধ্য দিয়ে তাদের নববর্ষের যাত্রা শুরু করেছে—তাহলে কি আওয়ামী লীগের অশ্বমেধের লালঘোড়া নিরীহ ছাত্র যুবকদের ওপর দিয়ে এভাবেই চলতে শুরু করলো? এতো তাড়াতাড়ি?

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আহূত ভিয়েতনাম দিবসের কর্মসূচিকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে গতকাল (বুধবার) তথাকথিত মুজিববাদী ছাত্রনামধারী গুণ্ডারা শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় আয়োজিত জনসভা ও মিছিলের উপর বেপরোয়া ও নির্লজ্জ হামলা চালায়। মুজিববাদীদের এই ফ্যাসিস্ট হামলায় বাংলাদেশ জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান ও জনৈক সাংবাদিক ফটোগ্রাফারসহ বহু ছাত্র ও শ্রমিক গুরুতররূপে আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

(গণকণ্ঠ : ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৩)।

ঈশ্বরদীতে এখন সন্ত্রাস। বাজারে মানুষ আসে না। যারা আসেন তারাও সন্ধ্যা হবার আগেই ঘরে ফেরেন। মুজিববাদের সমর্থকরা সরকারি সাহায্য পেয়ে সশস্ত্র অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগে জানা গেছে। তারা ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের কর্মীদের হত্যা করছে এবং হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।...গতকাল শনিবার ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে অতি সম্প্রতি ছাত্রলীগ কর্মী মতিউর রহমান কবিকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর গণমনে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, গত ১১ নভেম্বর দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে একজন মুজিববাদী গুণ্ডা পূর্বাশা বিতান নামক দোকানে মতিউর রহমান কবিকে পরপর ছয়টি গুলি করে হত্যা করে।

(গণকণ্ঠ : ১১ নভেম্বর, ১৯৭২)।

ঈশ্বরদীতে এখন সন্ত্রাস। বাজারে মানুষ আসে না। যারা আসেন তারাও সন্ধ্যা হবার আগেই ঘরে ফেরেন। মুজিববাদের সমর্থকরা সরকারি সাহায্য পেয়ে সশস্ত্র অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগে জানা গেছে। তারা ছাত্রলীগ ও শ্রমিকলীগের কর্মীদের হত্যা করছে এবং হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।...গতকাল শনিবার ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে অতি সম্প্রতি ছাত্রলীগ কর্মী মতিউর রহমান কবিকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর

www.pathagar.com

গণমনে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। ইতোপূর্বে প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, গত ১১ নভেম্বর দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে একজন মুজিববাদী গুণ্ডা পূর্বাশা বিতান নামক দোকানে মতিউর রহমান কবিকে পরপর ছয়টি গুলি করে হত্যা করে। তার মাথা ও বুকে এস এম জি থেকে ফায়ার করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানিয়েছেন যে, ঐদিন সন্ধ্যার সময় দলটি পাকশীতে যায়। সেখানে একটি মাঠে ১০ জন মেয়েসহ ১২৩ জন ছাত্রলীগ কর্মীকে লাইন করে দাঁড় করায়। তারা তাদেরকে মৃত্যুর হুমকি দেয় ও অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফাঁকা গুলি ছুড়ে। তাদের কাছ থেকে মুজিববাদ সমর্থন করায় বিবৃতি আদায় করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের বলা হয় যে, তাদের সন্তানেরা যদি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নাম উচ্চারণ করে তাহলে তাদের চাকরি যাবে।

(গণকণ্ঠ : ১১ নভেম্বর, ১৯৭২)।

'গত ১০ জানুয়ারী জয় পরাজয়ে জাসদের জনসভা শেষে পথিমধ্যে মুজিববাদী গুণ্ডা বাহিনী ব্রাস ফায়ার ও বেয়োনেট চার্জ করে বাদলকে হত্যা করে।'

(গণকণ্ঠ : ১২ জানুয়ারি, ১৯৭৩)।

মৌলভীবাজার জেলা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব মীরজা ফরিদ আহমদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জনাব মীরজা হারুন আহমেদ গত ১৮ই জানুয়ারী গভীর রাতে মৌলভীবাজার থানার অন্তর্গত মাথারপুর গ্রামে তাদের বাড়িতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন।

ফরিদপুর শহরের অদূরে কতিপয় দুর্বৃত্ত ছাত্রলীগ কর্মী এবং সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কামালুজ্জামান মোস্তাফাকে (১৬) নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ২৭ জানুয়ারী শনিবার উক্ত কামালুজ্জামান মোস্তফা তার নিজ গ্রাম কোমলপুর থেকে গোয়ালন্দ যাবার পথে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক অপহৃত হয়। পরদিন অম্বিকাপুরের অদূরে রেলওয়ে পুলের নিকটবর্তী নদীতে জেলেদের জালে তার লাশ উঠে আসে।

(গণকণ্ঠ : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩)।

চট্টগ্রামে নারকীয় ও চাঞ্চল্যকর শ্রমিক হত্যা সম্পর্কে গণকণ্ঠ লিখেছে : 'রোববার রাত সাড়ে ১২টায় সরকারি শ্রমিক সংগঠনের কয়েক শতের একটি দল স্টেনগান, এসএলআর, এলএমজি এবং অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বারবকুণ্ড শিল্পাঞ্চলের আর টেক্সটাইল মিলে হামলা চালায়। গুণ্ডাবাহিনী সমগ্র মিল এলাকা চারদিক থেকে ঘেরাও করে বেরুবার পথ বন্ধ করে দেয় এবং পার্শ্ববর্তী আশ্রয়স্থলে পাহাড়া মোতায়েন করে কাঁচা ঘরগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণে প্রকাশ, শ্রমিক ব্যারাক থেকে বেরুবার সব কটি পথে সশস্ত্র গুণ্ডারা 'এ্যামবুস' করে থাকে। ব্যারাকে ঢুকে একদল গুণ্ডা তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র থেকে অনবরত এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত শ্রমিকরা গুণ্ডাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করলেও বহুসংখ্যক শ্রমিককে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে শ্রমিকদের উপর গুণ্ডাবাহিনী গ্রেনেড চার্জ করেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শী জানান। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, পলায়নপর শ্রমিকদের অনেককে হাত পা বেঁধে কাঁচা ঘরের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। উক্ত মিলের সম্মুখস্থ মুদি দোকানদার মোহাম্মদ বশিরুল্লাহ হতভাগ্য শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করলে তাকে হাত পা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।

উক্ত টেক্সটাইল মিলে এ পর্যন্ত কোনো 'বার্গেনিং এজেন্ট' কিংবা সরকারি শ্রমিক

www.pathagar.com

সংগঠনের কোনো ইউনিট ছিল না। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বার্গেনিং এজেন্ট নিযুক্তির জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল। বহুবার চেষ্টা করে ইউনিট প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে সরকারি শ্রমিক সংগঠনের স্থানীয় কর্তা ব্যক্তিরা ভাড়াটিয়া দালালের সহযোগিতায় এই নৃশংস প্রতিশোধ নিয়েছে বলে শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে।

(গণকণ্ঠ : ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩)।

গত পরশু (৮ ফেব্রুয়ারী, ৭৩) ১/১ গজনবী রোডে অবস্থানরত বরিশালের প্রাক্তন এমসিএ হেমায়েত হোসেনের ভাই আবদুর রহমান আলি আহাদ নামক জনৈক পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে।

(গণকণ্ঠ : ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩)।

রক্ষীবাহিনী খুলনায় ফকিরহাট ও সদর থানার দুটি গ্রামে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। বিস্তারিত খবরে জানা গেছে ফকিরহাট থানার বাহিরদিয়া গ্রামে ও খুলনা সদর থানার স্বল্প বাহিরদিয়া গ্রামে রক্ষীবাহিনীর লোকেরা ব্যাপক নির্যাতন চালিয়েছে। গ্রামবাসীদের বাড়িঘরও নাকি তারা জ্বালিয়ে দেয়। গ্রাম দুটির বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর নির্মম প্রহারে আবদুল খালেক শেখ এবং আবদুল জব্বার শেখ নামের দুজন কৃষক মারা গেছে বলে জানা গেছে। (গণকণ্ঠ : ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩)।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে সরকারিভাবে সংবাদপত্রের ওপর কঠোর খড়্গহস্ত থাকা সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনী, মুজিববাদী ও সমজাতীয় বাহিনীগুলোর হত্যা, সন্ত্রাস ও নির্যাতন সম্পর্কে দেশী-বিদেশী পত্রিকায় বেশ কিছু রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। এসব রিপোর্ট ছাপার অপরাধে দেশের বহু পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিংবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বিদেশী অনেক সাংবাদিককেও অপদস্থ হতে হয়েছে। তৎকালীন অন্যতম বিরোধী সংবাদপত্র গণকণ্ঠের উদ্ধৃতি :

শনিবার (১০ মার্চ, ৭৩) সকালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, মোজাফফর ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের স্থানীয় কয়েকজন নেতা ও কর্মী কোটালীপাড়া থেকে গোপালগঞ্জ যাচ্ছিলেন। তারা যখন টুকুরিয়া গ্রামে পৌঁছেন তখন চারদিক থেকে বেশ বড় একটা দুর্বৃত্ত দল তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুর্বৃত্তদের আকস্মিক আক্রমণে তারা হতভম্ব হয়ে যান। ইতিমধ্যে দুর্বৃত্তরা তাদের হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে দেয়। তারপর চলতে থাকে নির্দয়ভাবে লাঠিপেটা। এই বর্বরোচিত আক্রমণে ঘটনাস্থলেই চারজন মারা গেছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ফরিদপুর-২ থেকে সদস্য সমাপ্ত নির্বাচনের মোজাফফর ন্যাপ প্রার্থী শ্রী কমলেশ চন্দ্র বৈদ্য, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় নেতা জনাব ওয়ালিউর রহমান লেবু, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা লুৎফর রহমান মানিক ও শ্যামল ব্যানার্জী। এ ছাড়াও অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন। (গণকণ্ঠ : ১১-৭৩)।

৭ মার্চের ভোট পর্বে শাসক দল আওয়ামী লীগ বিজয়ী হবার পরপরই বাংলাদেশে বিরোধী দলীয় কর্মীদের উপর এক চরম আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে বলে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খবর আসছে। তাদের সেই আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে যুবতী মেয়েরাও লাঞ্ছিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। ভালুকায় দোলনা নামক ১৬ বছরের একটি যুবতীকে মারাত্মক মারধর করায় সে অজ্ঞান হয়ে যায় বলে জানা গেছে।... নাটোরে মুজিববাদীরা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন কর্মীকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করেছে বলেও জানা গেছে।

(গণকণ্ঠ : ১২ মার্চ, ৭৩)।

www.pathagar.com

ঢাকা জেলার ধামরাইতে রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ জাতীয় লীগের বিশিষ্ট কর্মী আবদুল মান্নাফকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে দলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

(গণকণ্ঠ : ১১ মে, ৭৩)।

ঢাকার রাজপথ আবার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর খুনি হাতে মেহনতি মানুষের তাজা রক্তের দাগ পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদের লেজুড় আওয়ামী লীগের প্রাইভেট বাহিনীগুলো গতকাল সোমবার হরতালের দিনে কমপক্ষে ১০ জনকে হত্যা করেছে এবং অসংখ্য মানুষকে আহত করেছে। নিহত ১০ জনের মধ্যে কেবল বাংলাদেশ বিমানের পণ্যসরবরাহ কর্মচারী নূর হোসেনের পরিচয় পাওয়া গেছে। কোনো লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হত্যা করার পর প্রাইভেট বাহিনীর লোকেরা নিহত ব্যক্তিদের লাশ জীপে করে সরিয়ে ফেলেছে।

(গণকণ্ঠ : ২২ মে, ৭৩)।

মুজিববাদী গুণ্ডারা গতকাল (২৪ মে) রাতে ঈশ্বরদী থানার শাহপুর গ্রামের বিশিষ্ট ছাত্রলীগ কর্মী রিয়াজ উদ্দিনকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ... মুজিববাদী গুণ্ডারা নিহত রিয়াজ উদ্দিনকে তার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। আজ সকালে তার লাশ পাওয়া গেছে।

(গণকণ্ঠ : ২৬ মে, ৭৩)।

সরকারি গুণ্ডাবাহিনীর গুলিতে আবার নরসিংদী রক্তাক্ত : অধিকার হারা ১০টি প্রাণ আবার আত্মাহুতি দিলেন গতকাল শোষক গোষ্ঠীর গুলিতে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আহূত গতকালকের গণবিক্ষোভ দিবসের মিছিলে গুলি চালানো হয়। ফলে ৯ জন বঞ্চিত মানুষ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। আহত হয়েছেন বহুসংখ্যক।... ঘটনাস্থলে নিহত তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য সকলের লাশই গুণ্ডারা নীল রংয়ের একটি পিক-আপ ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। যে তিনজনের লাশ নিয়ে যেতে পারেনি তারা হচ্ছেন নরসিংদী থানা জাসদের কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, ছাত্রলীগ কর্মী আবদুল মোমেন। অন্যজনের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। থানার ওসি এবং ঢাকার ডিসি তিনজনের মৃত সংবাদ স্বীকার করেছেন।

(গণকণ্ঠ : ২৮ মে, ৭৩)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের সম্মানের ছাত্র হাসান ইমাম আজন্ম প্রিয় গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন গ্রীষ্মের ছুটিতে। কিন্তু ঢাকায় আর ফিরে আসতে পারেনি। তার এলাকার সংসদ সদস্য নুরুল হকের হত্যার পরদিনই হাসান ইমাম প্রাণ হারিয়েছিলেন। বিক্ষুব্ধ জনতার নাম নিয়ে রক্ষীবাহিনীর জনৈক কর্মকর্তার নেতৃত্বে একদল মুজিববাদী গুণ্ডা নির্মমভাবে বুটের তলায় পিষে তাকে হত্যা করেছে বলে স্থানীয় অনেকে অভিযোগ করেছেন। তার সঙ্গে প্রাণ হারিয়েছেন মোহাম্মদ হানিফ নামের একজন প্রথম বর্ষের কলা বিভাগের ছাত্র। নিহত হাসান ইমাম কোনো ছাত্র সংগঠন কিংবা রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন কি না জানা যায়নি।

(গণকণ্ঠ : ১ জুন, ৭৩)।

সংসদ সদস্য জনাব নুরুল হকের হত্যাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন দল মড়িয়া থানার বিভিন্ন অঞ্চলে অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। ঘরবাড়ি জ্বালানো, হত্যা, নির্যাতন, লুট, নারী ধর্ষণ চলছে অবাধে। শুধু বিরোধী দলই নয়, নিরীহ, সাধারণ মানুষও এ অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। নিহত সংসদ সদস্যের আত্মীয়-স্বজন আওয়ামী লীগ ও মুজিববাদী গুণ্ডাবাহিনী

www.pathagar.com

সংঘবদ্ধভাবে এ নির্যাতন চালাচ্ছে। রক্ষীবাহিনী তাদের সাহায্য করছে। ১২ বছরের ওপরের কোনো ছেলে এ অঞ্চলে থাকার সাহস পাচ্ছে না। সন্ধ্যার পর লোক চলাচল বন্ধ। বাতি জ্বলে না রাতে। হাটবাজার এক রকম বসে না বললেই চলে। চামটা, বরিসার, ডিঙ্গামানিক, ভুমগাড়া, চর আত্রা ও কেদারপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রতিদিন গড়ে এক থেকে দু'হাজার নারী পুরুষ শিশু বাড়িঘর ছেড়ে ঢাকা আসছেন। এ এলাকা থেকে সত্বর আগত জনৈক আতঙ্কগ্রস্ত বৃদ্ধকে এলাকার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সভায় জানতে চান আমি আওয়ামী লীগ করি কি না, রক্ষীবাহিনী কিনা। আশ্বাসে অবশেষে বিশ্বাস করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ৫০ বছরের বৃদ্ধা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে জানালেন, নড়িয়া থানার ৪০ মাইল এলাকাব্যাপী সন্ত্রাসের নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করা হয়েছে। রক্ষীবাহিনী ও ক্ষমতাসীনদের অত্যাচার পাকসেনাদের নির্যাতনকেও হার মানিয়েছে। প্রতিদিন দল বেঁধে গ্রাম পোড়াতে আসে। (গণকণ্ঠ : ১৪ জুন, ৭৩)।

পণ্ডিতেশ্বর গ্রামের ডাঃ আলাউদ্দিনের ৫টি পাকা ঘরের একটিও নেই। পাকা ঘর ঘরের ধান-পাট ভস্মীভূত করা হয়েছে। একইদিন পাশের বাড়ির স্বপন কুমারের পাকা দালান পোড়ানো হয়েছে। শালদহ গ্রামের মক্কর উদ্দিন ডিলারের বাড়ি এবং গোলার বাজারের রেশন দোকান গম ও চালসহ ভস্মীভূত করে। অন্যান্যের ঘর বাঁচানোর জন্যই নাকি উক্ত ডিলারের ঘর ভেঙে বাজারের বাইরে নিয়ে পোড়ানো হয়। মক্কর ডিলারের অপরাধ তিনি নির্বাচনে বিরোধী দলকে সমর্থন করেছেন। কাঠহুগলী গ্রামের নিহত ছাত্র জামাল ইমামের বাবা ফরহাদ কাজীও ভিটে ছাড়া। তারও বাড়ি পোড়ানো হয়েছে। দেওজুড়ি গ্রামের সেকান্দর হাওলা দারের বাড়ি ২/৩ শ' মণ ধান ও শ' দুয়েক মণ পাটসহ পোড়ানো হয়েছে। পোড়ানো হয়েছে তেলিপাড়ার চৌধুরী বাড়ি, দত্তপাড়ার শ্যামসুন্দর দত্তের বাড়ি। এ অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন নিহত সংসদ সদস্য নূরুল হকের শালা অজিত বিশ্বাসের পুত্র, আবদুল হাই মাস্টার, থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক কাজী সিরাজুল ইসলামসহ আওয়ামী ও মুজিববাদী গুণ্ডারা। এ কথা গতকাল সদরঘাটের লঞ্চঘাটে এলাকা থেকে সদ্য আগত জনৈক ব্যক্তি জানালেন। তিনি আরো জানান, বিগত নির্বাচনে মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ আওয়ামী লীগাররাই সংসদ সদস্য নুরুল হককে হত্যার জন্য দায়ী। কিন্তু এ হত্যার সুযোগ নিয়ে বিরোধীদলীয় ও বিরোধী দল সমর্থক নিরীহ মানুষের ওপর ঢালাও নির্যাতন চালানো হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শত্রুতা হাসিলের জন্য অত্যাচার চলছে। রক্ষীবাহিনীর অফিসার নিহত সংসদ সদস্যের ভাই চিনুকে বদলি করে আনা হয়েছে এবং নির্যাতনের সর্বময় ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছে বলেও বিভিন্ন সূত্রের অভিযোগ।

(গণকণ্ঠ : ১৪ জুন, ৭৩)।

গত ১৩ জুন বরিশালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কর্মী জনাব ফারুক আলম দুষ্কৃতকারীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন।

(গণকণ্ঠ : ১৬ জুন, ৭৩)।

রক্ষীবাহিনীর নির্মম শিকারে পরিণত হয়ে আজ (১৭ জুন) দুপুরে ১২টার সময় স্থানীয় (বগুড়া) কারাগারে জাসদের অন্যতম কর্মী শ্রী মানিকদাস গুপ্ত মৃত্যুবরণ করেছেন।... ৮ জুন রাত ১০টায় রক্ষীবাহিনী হঠাৎ করে গ্রেফতার করে। তাকে গ্রেফতার করার পরপরই তার উপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার। বেদমভাবে মারপিটের ফলে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কারাগারে থাকাকালে তার সাহার্য বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যায়ে তার আঙ্গুলগুলো কেটে ফেলা হয়। এহেন অত্যাচারের শিকার হয়ে শ্রী

www.pathagar.com

মানিক আজ দুপুর ১২টার সময় মারা যান। ইতোপূর্বে গত ৮ জুন বিকেল ৫টায় মুজিববাদী গুণ্ডারা প্রকাশ্য দিবালোকে বগুড়ার রাজপথে আতা এবং রঞ্জু নামে ছাত্রলীগের দুজন কর্মীকে গুলি করে হত্যা করে।

(গণকণ্ঠ : ১৮ জুন, ৭৩)।

সকাল আনুমানিক ৯টায় (২৯ জুন, ৭৩) একটি যাত্রীবাহী বাস পতেঙ্গা রেল ক্রসিং-এর কাছে রক্ষীবাহিনীর একটি ভ্যান ওভারটেক করে। রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে যাত্রীবাহী বাসটিকে ওভারটেক করে রাস্তা আটকে দাঁড়ায় এবং ওভারটেক করার অভিযোগে বাসের ড্রাইভার কন্ডাক্টরসহ কয়েকজন যাত্রীকে মারধর করতে শুরু করে। এতে পথচারী ও বাসের যাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং রক্ষীবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতিরোধে পরাস্ত রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে সাথে সাথে বাসটিকে অনুসরণ করে ইস্টার্ন রিফাইনারীর কাছে পুনরায় বাসটিকে অবরোধ করে। এক প্লাটুন রক্ষীবাহিনীর সদস্য ত্বরিত বাসটিকে ঘিরে ফেলে। ভীতসন্ত্রস্ত বাসযাত্রী, ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর ইস্টার্ন রিফাইনারীর ভেতরে আশ্রয় নেয়। প্রাণ ভয়ে পলায়মান জনতাকে পিছু ধাওয়া করে রক্ষীবাহিনী মিল অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে ঢুকে পড়ে এবং বেপরোয়া গুলি চালায়। ফলে ২৫ জন হতাহত হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। এদের মধ্যে চারজন ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। জেলা কর্তৃপক্ষ একজনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে। রক্ষীবাহিনী কালিগঞ্জ মসলিন কটন মিলের শ্রমিক মোহাম্মদ আলাউদ্দিনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

(গণকণ্ঠ : ১ জুলাই, ৭৩)।

লোহাগড়ার জনগণের ওপর রক্ষীবাহিনী, বিডিআর ও রিজার্ভ পুলিশ যৌথভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে। তাদের নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে ৬ বছরের বালিকা এবং অশীতিপর বৃদ্ধরাও রেহাই পাচ্ছে না। তাদের অত্যাচারের শিকার হয়ে ইতিমধ্যে দুজন মৃত্যুবরণ করেছে।

(গণকণ্ঠ : ১৫ জুলাই, ৭৩)।

গত ২৬ আগস্ট মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজ মিলনায়তনে জেলা ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন ছিলো। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না। জনাব মান্না অপরাপর সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য জেলা শাখার কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হবার আগেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন।

কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয় সন্ধ্যা সাতটায়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দেবেন্দ্র কলেজটি প্রায় ৫শ রক্ষীবাহিনী ঘিরে ফেলে। তবুও কলেজ মিলনায়তনে কাউন্সিল অধিবেশন চলছিলো। কিন্তু রাত সাড়ে নয়টার রক্ষীবাহিনী মিলনায়তনে প্রবেশ করে এবং ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকে। প্রায় এক হাজারেরও উপর কাউন্সিলের একটা বিরাট অংশকে রক্ষীবাহিনী গ্রেফতার করে। অন্যরা মিলনায়তনের পেছনের বিরাট জলাশয় সাঁতরিয়ে পালিয়ে যায়। গ্রেফতারকৃত কর্মীদের উপর রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার চরমে উঠে। এদের মধ্যে সাটুরিয়া থানা ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব দেলোয়ার হোসেন হারেজের শরীর কেটে কেটে তার উপর লবণ ছিটিয়ে দেয়া হয় বলে জানা গেছে। পরে আরো জানা গেছে যে, শুধুমাত্র হারেজ ছাড়া রক্ষীবাহিনী এর মধ্যে গ্রেফতারকৃত সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু হারেজকে কেন ছাড়া হয়নি বা তার নামে নির্দিষ্ট কোন মামলা আছে কিনা জানা যায়নি।

www.pathagar.com

(গণকণ্ঠ : ১ সেপ্টেম্বর, ৭৩)।

শাহজাদপুরের গ্রামাঞ্চল থেকে আগত ২ জন পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র নিতে এসে প্রাণ হারিয়েছেন মুজিববাদী গুণ্ডাদের হাতে। মুজিববাদীরা এদের গলা কেটে ফেলেছে।

(গণকণ্ঠ : ২ সেপ্টেম্বর, ৭৩)।

এখানে (হোমনা) একজন আওয়ামী লীগ কর্মীর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে রক্ষীবাহিনী ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের গুণ্ডাবাহিনী ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তারা নিরীহ জনগণের উপর পাইকারী নির্যাতন চালাচ্ছে। গুণ্ডাবাহিনী জনসাধারণের উপর ১০ টাকা করে চাঁদা ধরেছে। এই দুর্দিনে তারা চাঁদা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অথচ চাঁদার টাকাটা দিতে সামান্য বিলম্ব হলেই গ্রামবাসীদের চোখ বেঁধে পানিতে ফেলে দিয়ে তাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। রক্ষীবাহিনীর আস্কারা পেয়ে আওয়ামী গুণ্ডাবাহিনী হোমনার ছোট ছোট বাজারগুলোও লুট করে নিয়েছে। আড়াই হাজারের খবরে জানা গেছে খাবনাকান্দা ইউনিয়নে ডেঙ্গারকান্দি ও কমলাপুর গ্রামে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন চরমে উঠেছে। অত্যাচারে এলাকার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

গণকণ্ঠ : ৫ সেপ্টেম্বর, '৭৩)।

ডক শ্রমিকের রক্তে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের বন্দর এলাকা আবার রঞ্জিত হয়েছে। সশস্ত্র মুজিববাদী গুণ্ডাদের সম্মিলিত হামলায় নিহত হয়েছেন ডকের দুজন শ্রমিক। আহত হয়েছেন ১০ জন। নিখোঁজ রয়েছেন ৬ জন। নিহতরা হচ্ছেন আব্দুল মান্নান সরদার (৪০) ও দারোয়ান আব্দুল গণি।

গণকণ্ঠ : ২৫ সেপ্টেম্বর, '৭৩)।

ভূমিটি হচ্ছে ঢাকা জেলার নওয়াবগঞ্জ। এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত সর্বশেষ এই বিরাট মুজিববাদী অপারেশনে কতো জীবন যে বলি হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। তবে ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের হাসপাতালের মর্গে কতকাল পর্যন্ত ৭টি লাশ এসে পৌঁছেছে। এই সাত জনের মধ্যে রয়েছে খালিদ হোসেন সম্পদ (নবাবগঞ্জ থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক), এবাদত আলী ছাত্রলীগ আগলা হাইস্কুল শাখার সভাপতি, বাবলু (ছাত্রলীগের বিশিষ্ট কর্মী) এবং এবারকার এসএসসি পরীক্ষার্থী রবি (ছাত্রলীগ কর্মী), মোতালেব, কালু এবং এবাদত (২)।

গতকাল বিকেল পর্যন্ত নওয়াবগঞ্জের নদীতে দুটো মহিলার লাশ ভাসতে দেখা গেছে বলে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন। বাংলাদেশ স্টাইলে নওয়াবগঞ্জকে বধ্যভূমি বানাবার পৈশাচিক নায়ক হচ্ছে ঐ এলাকার আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট নেতা। তিনি গত ১৬ তারিখ ঢাকা থেকে রক্ষীবাহিনী নিয়ে রাতেই নওয়াবগঞ্জ যান এবং ঐ রাতেই নাকি ঐ অঞ্চলের মুজিববাদীদের সাথে এক গোপন বৈঠকে বসেন। ... ১৭ তারিখে সকালে মুজিববাদীরা রক্ষীবাহিনীর সাথে এলএমজি স্টেনগান এসএলআর চায়নিজগান, রিভলভার এবং অন্য আগ্নেয়াস্ত্রসহ রাস্তায় নামে। সকাল থেকেই তারা বাড়ি বাড়ি জাসদ, ছাত্রলীগ, কৃষক লীগ, কর্মীদের তল্লাশী শুরু করে। তারা সদম্ভে ঘোষণা করে মুজিববাদীদের বিরোধীদের এক আপোষহীন মৃত্যুর খেলা দেখানো হবে। অপরাহ্নের দিকে কিন্তু রক্ষীবাহিনী এবং মুজিববাদীরা বাবলুকে বাগমারী নিয়ে যায়। বামগারায় রবির সিগারেটের দোকানে খালেদ হোসেন সম্পদ উপস্থিত ছিলো। সম্পদ, রবি আর বাবুলকে মুজিববাদীরা অগণিত ওয়ার্ত জনতার সামনে গুলি করে হত্যা করে। তখন বিকেল প্রায় পৌনে পাঁচটা। সেই

www.pathagar.com

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়েই পাণ্ডারা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বিশিষ্ট কর্মী কাজী দারাজউদ্দিনের বাড়িতে হামলা চালায়। অবস্থা বেগতিক দেখে সে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে যায়। তখন তার উপর মেশিনগানের গুলি ছোড়া হয়। তবে দারাজউদ্দিন আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। তখন তার বাড়িতে আগত অতিথিকে মুজিববাদীরা টেনে বের করে তার উপরও গুলি চালায়। ঠিক এমন সময় পাশের ঢাকা থেকে নওয়াবগঞ্জে একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ যাচ্ছিলো। মুজিববাদী এবং রক্ষীবাহিনী মনে করে ঐ লঞ্চে হয়তো তাদের বিরোধী কেউ রয়েছে। তখন রক্ষীবাহিনী ঐ লঞ্চকে থামতে বলে। সারেং লঞ্চ থামাচ্ছিলেন, কিন্তু থামাবার সময়ও সারেং পাননি। তার আগেই উপর্যুপরি কয়েকবার ব্রাশ ফায়ার করা হয়। আর সেই লঞ্চে যে কতো জীবন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলো তার সঠিক হিসেব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।... ঢাকা পুলিশ সূত্রে গত রাতে জানানো হয়েছে ৭ জনের মৃত্যু ও ২ জনের আহত হবার কথা।

গণকণ্ঠ : ১৯ সেপ্টেম্বর, '৭৩)।

নওয়াবগঞ্জে সংঘটিত বর্বর হত্যাকাণ্ডের রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতেই মুজিববাদী গুণ্ডারা এবার বগুড়ায় এক পৈশাচিক রক্তাক্ত ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।... মুজিববাদী গুণ্ডারা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের তিনজন কর্মীকে প্রকাশ্য রাস্তায় স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করেছে। বাকী তিনজনকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এদেরকেও একই কায়দায় শহরের বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে রুনু এবং আবদুর রশিদ। নিহত অপরজনের নাম তোতা।

সকালের দিকে মুজিববাদী গুণ্ডারা বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সূত্রাপুর আঞ্চলিক শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্য চঞ্চলসহ ছাত্রলীগের আরো দুজন কর্মীকে গুম করে ফেলে।... সন্ধ্যার দিকে নিহত রুনু, রশিদ এবং তোতা রিকশায় করে এদের খুঁজতে বের হয়। রিকশা জলেশ্বরীতলায় জনাব মোজাম পাইকার ও হামিদ শাহের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় অন্য একটা রিকশা থেকে রুনু, রশিদ এবং তোতার উপর স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ার করা হয়। এতে দুজন ঘটনাস্থলে নিহত হয় এবং আহত তোতাকে হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

(গণকণ্ঠ : ২২ সেপ্টেম্বর, '৭৩)।

বগুড়া জেলা ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা জনাব আনিসুজ্জামানের ছোট ভাই জনাব গোলাম কিবরিয়াকে গতকাল (২ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ন ২টার সময় মুজিববাদীরা গুলি করে হত্যা করে।

(গণকণ্ঠ : ৪ সেপ্টেম্বর, '৭৩)।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বিপ্লবী সাথী, জাকসুর সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন রোকন পরিণত হয়েছে গুপ্ত হত্যার শিকারে।... ক্ষমতাসীন দলের পোষ্য গুণ্ডাবাহিনী রাতের অন্ধকারে বর্বর কাপুরুষের মতো হত্যা করেছে তাকে। গত শনিবার রাতে নারায়ণগঞ্জ জাসদ অফিস থেকে তার বোনের বাসায় যাবার পথে প্রকাশ্য রাস্তা থেকে মুজিববাদীরা বুকের উপর বন্দুকের নল ঠেকিয়ে রোকনকে ছিনতাই করে। তার সাথে রিকশার সহযাত্রী অন্য একজন ছাত্রলীগ কর্মীও ছিলো। গতকাল রবিবার (৭ অক্টোবর) লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলের সামনে রোকনের লাশ পাওয়া গেছে।

(গণকণ্ঠ : ৮ সেপ্টেম্বর, '৭৩)।

www.pathagar.com

সোনার ছেলেদের একাল

এই সময়

সাবেক পূর্বপাকিস্তানে স্বাধীকার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ দেশের জনগণ যখন ধীরে ধীরে সংগঠিত হচ্ছিলো, তখনই ভেতরে ভেতরে বেড়ে উঠছিলো আমাদের আলোচিত সোনার ছেলেরা। ঠিক যেভাবে বটগাছে বেড়ে উঠে পরগাছা। পরজীবী, পরচিন্তা মূলোচ্ছাদিত, কথিত এই রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের উত্থান ও বিকাশ ঘটেছে ৭২ সালের ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত। তারিখটা হয়তো ঠিক এভাবে বেঁধে দেওয়া ঠিক নয় তবু ওই তারিখটিকেই আমরা কেন্দ্রবিন্দু ধরে নিচ্ছি এই কারণে যে, ওই তারিখে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে সংসদীয় গণতন্ত্রের কবর দিয়ে সংসদে বসে একদলীয় বাকশাল কায়েম করেছিলো আওয়ামী বাকশালীরা। বাকশাল গঠনে প্রধান কারণ সম্ভব। এই ছিলো যে, দেশের গণতন্ত্র এবং স্বাধীন চেতনাকে ধূলিস্বাৎ করে এমন একশ্রেণী গড়ে তোলা যাদের মোড়ক থাকবে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আর ভেতরে থাকবে স্বাধীনতা বিনাশী এক দৈত্য আত্মা।

এদের এই ভরংটা শুরু থেকে অনেকের কাছেই পরিষ্কার ছিলো তবে পুরোচিত্র জানা ছিলো না। কেউ কেউ সময়ের অপেক্ষা করছিলো, কেউ ভেবেছিলো হয়তো এক সময় ঠিক হয়ে যাবে। আসলে যা হবার তাই হয়েছে। ক্রমাগত জনগণের ক্ষোভ ও রোষের মুখে যখন মুজিব সরকারের পতন হলো তখন এসব সোনার ছেলেরা সাময়িকভাবে মিশে যাবার চেষ্টা করেছিলো জাতির সাথে। কিন্তু তা কি সম্ভব। জনতার সমুদ্রে অদ্রাব্য এ সোনার ছেলেরা আলাদা হয়েই থাকলো। সে সাথে তারাও সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলো। ধীরে ধীরে নানা কথা এবং গাল ভরা বুলি নিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগুতে থাকলো। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা, এরশাদের সামরিক শাসনের মধ্যে দিয়ে নতুন করে জন্ম হলো এ শ্রেণীর। যাদের হাতে ক্ষমতা গেলো ৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের কাহিনী এখানে উল্লেখ না করলে এ কালের সোনার ছেলেদের ঠাউর করা ঠিক সম্ভব হবে না। এরশাদ বিরোধী গণআন্দোলনের সময় প্রকাশ্য যে তিনজোটের আন্দোলন গড়ে উঠে তা সমন্বয় করতো লিয়াজো কমিটি। এ কমিটির আন্দোলনগত সফলতা রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন পরিচালনায় বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। ৮২ সালের সামরিক শাসনের পরবর্তী এক বছরের মধ্যে ৮৩ সালের মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন ঠেকাতে এরশাদ সরকার দু'ধরনের অপতৎপরতা চালায়। এক. রাজনৈতিক কৌশল, দুই. দমন নীতি।

যেহেতু ৮২ সালের সামরিক শাসন সম্পর্কে আওয়ামীদের ধারণা ইতিবাচক ছিলো তাই রাজনৈতিক কৌশলের হাত সম্প্রসারিত করে তৎকালীন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জিয়া উদ্দিন বাবলুকেও এরশাদ সরকারের সাথে নিয়ে নেয়া হয়। দমন নীতি প্রয়োগ করে ছাত্রদেরকে দমানো হয়। সরকারের গুলিতে জয়নাল, জাফরসহ আরো অনেকেই নিহত হন। মূলত: রাজনীতিতে এরশাদ সরকার যে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো তার ফলশ্রুতিতে তিনি নয় বছর ক্ষমতাসীন ছিলেন।

প্রথম দিকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে কিছুটা অগ্রগতি থাকলেও ৮৬ সালের নির্বাচন, টোপে আন্দোলনকারী প্রধান ধারায় দ্বিধাবিভক্তি শুরু হয়। স্বৈরাচার পতন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ

www.pathagar.com

গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ সত্ত্বেও ৮৬ সালের এক মধ্যরাতে অজ্ঞাত কারণে আওয়ামী লীগ এরশাদ সাহেব প্রস্তাবিত জাতীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। বিএনপিসহ ৭ দল এবং জামায়াতে ইসলাম এ নির্বাচন বর্জন করে। এ পরিস্থিতিতে জাতীয় রাজনীতিতেও পরিবর্তন সাধিত হয়। নির্বাচনী কৌশলে বিএনপি এবং জামায়াতসহ দেশপ্রেমিক ধারার সিদ্ধান্ত সঠিক হলেও দীর্ঘদিনের ক্ষমতা বঞ্চিত, ক্ষমতা লিপ্সু আওয়ামী লীগ নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ করে নেয় এবং এভাবে আওয়ামী সোনার ছেলেদের বর্তমান দফা উত্থান সুচিত হয়। ৭৫ থেকে ৮৬ সাল এক দশক এক বছর পর আওয়ামী লীগ বিরোধী দল হিসেবে ক্ষমতায় যাওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নতুন করে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট গ্রহণে মনস্থাব করে। ৮৬ নির্বাচন বেশিদিন টিকেনি। আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে ৮৮ সালে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৮৮ থেকে ৯০ এ দু'বছর পুনরায় লিয়াজোঁ কমিটির মাধ্যমে এরশাদ সরকারবিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। ৮৬-এর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৫ দলীয় জোটের ভাঙন দেখা দিয়েছিলো। এর ফলে ৮৮-র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৭ দল, ৮ দল, জামায়াত বামদলীয় জোটের লিয়াঁজো চলতে থাকে। এরশাদবিরোধী আন্দোলনেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারনার জন্ম হয়। তবে বিশ্বের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এ নতুন ধারাকে কিভাবে বাস্তবায়িত করা যায় এ নিয়ে যখন সকল মহলে আলোচনা চলছিলো সে সময় জামায়াতে ইসলামী কেয়ারটেকার সরকারের ধারণার বাস্তবতা জনসম্মুখে নিয়ে আসে। যদিও বলা হয় এরশাদ সাহেবকে বাঁচিয়ে দেবার জন্যই কেয়ারটেকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিলো। সে যাই হোক একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদে ক্ষমতা হস্তান্তরের বাস্তবতার নিরিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীনকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাস্তবতা মেনে নেয়া হয় সে সরকার নিয়েই ৯৬ সালে বিএনপিকে বিপাকে পড়তে হয়েছিলো। কারণ ৯১-এর নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হলেও আওয়ামী লগি এ নির্বাচনকে মেনে নেয়নি। সূক্ষ্ম অভিযোগের ধূয়া তুলে সংসদ বর্জন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগ সংবিধানিক শুন্যতা সৃষ্টির যে চেষ্টা করেছিলো তার ফলশ্রুতিতে নির্দিষ্ট সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্ভব হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার প্রয়োজনে বিএনপি সরকার ৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নতুন নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর এখানেই আওয়ামী লীগ এবং আমাদের আলোচিত সোনার ছেলেদের মেওকা মিলে গেলো। যদিও এখানে এ প্রশ্ন থেকেই গেছে যে, কেন বিএনপি ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ৯৬ সালে শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে একটি নির্বাচন দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলো।

৯৬-এর নির্বাচনের আগে আওয়ামী ভেলকিবাজি রাজনীতিতে বেশ চমক ছিলো। দলটির প্রধান শেখ হাসিনা নির্বাচনের পূর্বে জনগণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। তবে পরবর্তীতে এ কথা পরিষ্কার হয়নি তিনি আসলে কিসের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিলেন। বরঞ্চ এ কথাই যৌক্তিক যে বিভ্রান্তির সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষমা ভিক্ষা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলেন। ৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত আওয়ামী শাসন আমলে বাংলাদেশে সোনার ছেলেদের দুর্দন্ড প্রতাপ চলেছে। বলা যায়, নির্বিবাদে এ শাসন চালিয়েছে। তারা গ্রেফতার করেছিলো খাঁটি দেশপ্রেমিকদের আর নির্যাতন চালিয়েছিলো তাদের ভাষার সন্দেহজনক সকল মহলে। কথিত মুজিব হত্যামামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে কর্নেল (অবঃ) ফারুক, মেজর (অবঃ) হুদাসহ অন্যদের। অন্যদিকে মামলা দিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়েছিলো বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াসহ অন্যদের। দুঃশাসনের এ দিনপঞ্জিতে আহত-নিহত-গ্রেফতার হয়েছে হাজার হাজার নারিপুরুষ। দেশের আলেম-ওলামা থেকে শুরু করে কেউ বাদ যায়নি আওয়ামী নির্যাতনের হাত থেকে। দুঃশাসনের সেই দিনপুঞ্জির কিছু বিবরণ নিয়েই সোনার ছেলেদের 'এই সময়' বিধৃত।

www.pathagar.com

এক

ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গ ইদানীং বেশ আলোচিত হচ্ছে। এই আলোচনা যতটা ছাত্রদের রাজনীতি প্রসঙ্গ তার চেয়ে বেশি সন্ত্রাস প্রসঙ্গ। ছাত্র রাজনীতির ধরন এবং প্রকৃতি নিয়ে নানাজনের নানা মত রয়েছে। ছাত্রদের সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা সঠিক কিনা এ ব্যাপারেও নানা মত রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড় হিসাবে ছাত্র সংগঠনগুলোর টিকে থাকা উচিত কিনা এই প্রশ্ন বর্তমান সময়ে মৌলিক বিষয় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কারণ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যে দল ছাত্রদের ব্যবহার করে তারা ক্ষমতায় গিয়ে ছাত্রদের কোনো কল্যাণ করে না বরং দলীয় ছাত্র কর্মীদের ক্যাডার হিসাবে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে।

এই অঞ্চলে ছাত্র রাজনীতির গোড়ায় ফিরে তাকাবার আগে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। ছাত্রদের সক্রিয় রাজনৈতিক ধারা শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে ছাত্ররা রাজনৈতিক নেতাদের কর্মসূচির সমর্থক এবং সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ৩০ জানুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে প্রতিবাদ সভা শেষে শহরে বিশাল মিছিলের মাধ্যমে জনগণকে তাদের মতামত জানিয়ে দেয়। সভা মিছিল শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি ৪ ফেব্রুয়ারি সমগ্র ঢাকা শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। এইভাবে ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনমত সংগঠিত করে ভাষা আন্দোলনকে পর্যায়ক্রমে স্বাধীকার আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে। সত্যি কথা বলতে গেলে, ভাষা আন্দোলন প্রকাশ্য রাজনীতি হলেও এই আন্দোলনের ছায়ায় বুড়িগঙ্গার বোটে যুবলীগের জন্ম হয়। যার প্রধান লক্ষ্য ছিল, পাকিস্তানে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। ভাষা আন্দোলনের কথা বাদ দিলেও স্বাধীকার আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালীন ডাকসু ৬৯-৭০ সালে রাজনৈতিক দলগুলো থেকে আরও একধাপ এগিয়ে গণতান্ত্রিক ধারাকে সমর্থন করেছে। এই রাজনৈতিক ধারার পাশাপাশি পাকিস্তান সরকারের সমর্থক ছাত্র রাজনীতির ধারাও অব্যাহত ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি মার্কিন তথ্য দপ্তরের সামনে সরকারি বাহিনী কর্তৃক ছাত্রদের গুলি খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র রাজনীতিতে সোভিয়েত অক্ষশক্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলেও তাদের রাজনৈতিক গুরুদের সমর্থন না পাওয়ায় ঐ রাজনীতি এগুতে পারেনি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস প্রবেশ করে। এই সন্ত্রাসী ধারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজও বিলুপ্ত হয়নি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতীয় উপমহাদেশে ছাত্র রাজনীতির সূচনা ব্রিটিশ আমল থেকেই শুরু হয়। অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে সন্ত্রাসী রাজনীতির শুরু হলেও ১৯৩৫ সালের পর থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে।

সরকারবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছাত্রদের জুড়ি মেলা ভার। শুধু এ অঞ্চলে নয় বরং দুনিয়াব্যাপী ছাত্ররা এই ধরনের আন্দোলন সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে। দুনিয়াজোড়া এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল হিসাবে বিবেচনা করা হয় ১৯৬০-৭০ এবং ৫৭ থেকে ৭৫ সালকে। ১৯৫৭ থেকে ৭৫ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিনীদের জড়িয়ে পড়ার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে লেখানকার ছাত্ররা আন্দোলন করে। ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী জনমত গঠনে ছাত্ররা রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পরে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি এবং কাজের সমালোচনা করে উল্লেখ করে যে, আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য আগ্রাসন এবং বৈষম্য দূরীকরণে ব্যর্থ হয়েছে মার্কিন সরকার যা সরকার গৃহীত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধারার বিপরীত। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্ররা, প্রধানত কালোরা সেখানে আফ্রো-আমেরিকার ইতিহাস ও কৃষ্টি পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতেও আন্দোলন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্র আন্দোলনেও মার্কসবাদীদের ভূমিকাই মুখ্য ছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী ছাত্র রাজনীতিতে যে সন্ত্রাস শুরু হয়, ৭৫-এর ১৫ আগস্ট পরবর্তীকালেও তা অব্যাহত ছিলো। সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমান সামরিক প্রশাসক হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সফরে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র তাকে সরাসরি অপদস্থ করে। তবে এই ঘটনা ছাত্র রাজনীতির পুরনো ধারার পরিবর্তনসূচিত করে। দেশপ্রেমিক রাজনীতির উত্তরসুরি হিসাবে প্রেসিডেন্ট জিয়া ক্ষমতাসীন হওয়ার কারণে ছাত্র রাজনীতিতে ৭৫ পরবর্তী ধারার সূত্রপাত ঘটে। এই ধারায় নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের জন্ম হয়। নানামহল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে নানাভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলেও আধিপত্যবাদ বিরোধী ছাত্র সংগঠন হিসাবেই ছাত্রদল ছাত্র রাজনীতিতে পরিচিতি লাভ করে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ছাত্রদলের ওই ভূমিকার কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। তিনি নিজে দেশের সেরা মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে ছাত্র সংগঠন গড়ার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ৩০ মে'র দুঃখজনক পরিণতির পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে পরিবর্তন শুরু হয় সেই বাতাস ছাত্রসংগঠনেও লাগে। প্রেসিডেন্ট হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদ রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে চাইলে ৮৩ সালে ছাত্র প্রতিরোধের মুখে পড়েন। তবে সেই সময়কার ডাকসুর সাধারণ সম্পাদককে দলে বাগিয়ে নেয়ার কারণে ছাত্রদের স্বৈরাচার প্রতিরোধে আন্দোলনে ভাটা পড়ে এবং ক্ষমতার টোপ দিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অনেক নেতাকে এরশাদ দলে টেনে নেন। এর পরবর্তীকালে বিএনপির দায়িত্বে বেগম খালেদা জিয়া ফিরে এলে ছাত্র রাজনীতিতে নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়। বলা যায় দু'একজন ছাত্রনেতা পালিয়ে গেলেও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এককভাবে সরকারবিরোধী আন্দোলনের বিজয় পর্বে সম্মিলিত ছাত্রদের মোর্চা গঠন করে। তৎকালীন ডাকসুর ভিপি আমানুল্লাহ আমানের নেতৃত্বে ছাত্র রাজনীতির নতুন অধ্যায়ের বিজয় সমাপ্ত হয়।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এই রাজনৈতিক ধারা টিকে থাকেনি, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরীর নির্দেশে ছাত্রদলের বেশ কিছু নেতাকর্মীকে সন্ত্রাসের দায়ে বিএনপির শাসনামলে গ্রেফতার করা হয়। বিএনপি ৯৬ সালের নির্বাচনে বিরোধী দল হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার পর সরকারি রোষানলে পতিত হয়ে ছাত্রদলের অসংখ্য নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়েও ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রদলের ভূমিকা ভিন্ন রকম হয়। সম্প্রতি বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করেছেন। বেগম জিয়ার এই ঘোষণাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ছাত্রদলের রাজনীতি স্থগিতকরণ এবারেই প্রথম নয়। ৯৩ সালেও নয় মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল। এবার ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হওয়ার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে

www.pathagar.com

সংঘর্ষ হয়। বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। বেগম জিয়া কেন এবং কি কারণে ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছেন তার কোনো ব্যাখ্যা তিনি দেননি। হতে পারে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ড অথবা এমন কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছিল যার দ্বারা ছাত্র এবং মূল সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত।

সে যাই হোক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেগম জিয়াকে ধন্যবাদ জানানোর আগে এবং পরে সরকারি ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ এত বেশি সন্ত্রাসের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে যে, প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই ছাত্রলীগের সোনার সন্তানদের অপকর্মের খবর পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল, আত্মীয়দের বাড়ি দখল, ছাত্রাবাস কক্ষে মেয়েদের ওড়না, লিপস্টিক পাওয়ার খবর পর্যন্ত প্রতিদিন ছাপা হচ্ছে। কিভাবে এ সন্ত্রাসের শুরু হয়েছিল সেকথা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বলা না গেলেও অনেকেরই মনে আছে, এই সরকারের শুরুর দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল এবং সেই যে কামড়াকামড়ি শুরু হয়েছে আজও তার শেষ হয়নি। পুলিশ ছেড়ে পাবলিক, এরপর দেশ ছেড়ে বিদেশেও এইসব বেলেল্লাপনা চলছে। এমনকি সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা পর্যন্ত গোপনে সাংবাদিকদের ডেকে এইসব কথাবার্তা আলাপ করছেন। তবুও সরকারি দলের নেতানেত্রীরা অথবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ত্রাসের উৎসমুখ বন্ধ করার ঘোষণা দিচ্ছেন না। যে কাজের জন্য তারা বেগম জিয়াকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন সেই কাজটি নিজেরা করে ধন্যবাদ না নেয়ার অর্থ হচ্ছে আসলে, নিন্দাবাদ গ্রহণ করছেন। জ্ঞানীরা বলেছেন : 'আপনি আচারি ধর্ম অপরে শেখাও।' নয়ত ব্যাপারটা অন্যরকম শোনায়।

দুই

শিষ্য বলল, গুরু আরো কিছুদিন এই রাজ্যে থেকে যাই। গুরু বললেন, কাজ নেই, কারণ এখানে তেল ও ঘিয়ের দাম সমান। কাজেই এই রাজ্যে বিচার নেই। এখান থেকে অন্যত্র চলে যাবো।

শিষ্য প্রতিবাদ করে বললো, আমরা যাযাবর। বিচার-অবিচারে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। কিছুদিন থেকে খেয়েদেয়ে মোটা হয়ে যাই। অতঃপর শিষ্যের কথায় প্রতিবাদ না করে গুরু-শিষ্য ঐ রাজ্যে বসবাস করতে লাগলো।

রাজার পেয়াদা এসে শিষ্যকে ধরে নিয়ে গেলো। অস্থির হয়ে গুরু রাজ দরবারে গিয়ে জানলেন, শিষ্যকে শূলে চড়ানো হবে। শিষ্য গুরুর পায়ে প্রণাম জানিয়ে বললো, এবারের জন্য বাঁচান। গুরু বললেন, দেখি কি করা যায়।

অনেক চেষ্টা করে শিষ্যের শূলে চড়ানো সংক্রান্ত যে বিবরণ তিনি পেলেন তা অনেক দীর্ঘ। সংক্ষেপে ব্যাপারটি এমন দাঁড়ায়, সে রাজ্যের এক চোর চুরি করতে গিয়ে গৃহস্থের হাতে ধরা পড়ে। হাত ফস্কে চোর পালিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির কার্নিশ ধরে লাফ দিতে গেলে কার্নিস ভেঙ্গে চোর মাটিতে পড়ে মরে যায়। এরপর চোরের স্ত্রী রাজ দরবারে বিচার দেয় যে, তার স্বামী চুরি করলেও চুরির সাজা মৃত্যুদণ্ড নয়। সুতরাং তাকে যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার হওয়া দরকার।

যথারীতি রাজা বাড়িওয়ালাকে তলব করলেন। বাড়িওয়ালার সাফ জবাব, বাড়ি

www.pathagar.com

বানিয়েছেন মিস্ত্রী। তার কাছে জিজ্ঞেস করুন।

মিস্ত্রী জবাব দিল, যোগালী কাঁচা মাল সংগ্রহ করেছে। তাকে জিজ্ঞেস করুন।

যোগালী জানিয়ে দিল, সেদিন বৃষ্টি ছিল আমার কিছু করার ছিল না।

অতঃপর রাজা সুবিচার করার স্বার্থে সিদ্ধান্ত দিলেন যে, এই রাজ্যের মোটা লোকটিকে শূলে চড়াতে হবে। আর তাই রাজাদেশ পালনে অন্যান্য শিষ্যকে নিয়ে আসা হলো।

গল্পটি অনেক লম্বা বিধায় এ প্রসঙ্গে আমরা আর আলোচনা করছি না।

মুখে মুখে এই গল্প নানা জনের কাছে নানা রকম থাকতে পারে। তবে মূল সুর এক। অনেকদিন পর এই গল্পটি আমার এক পুরনো বন্ধু চা-এর কাপে চুমুক দিতে দিতে উল্লেখ করলেন। গল্প বলার আগে কোনো ভূমিকা ছাড়াই তিনি বললেন, মনটা ভীষণ খারাপ। পত্রিকা খুললে দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি অথবা দেশের উন্নতি-অবনতির কোনো খবর নেই। ধর্ষণ, ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যার খবরে পুরা কাগজ ভরে থাকে। তবে ঘটনার খবর যতটা ছাপা হয় অপরাধীদের গ্রেফতার অথবা প্রকৃত অপরাধী কারা সে সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাওয়া যায় না। এই ধরুন চট্টগ্রামের মার্ডার, ঢাকার হত্যাকাণ্ড সবকিছুই গোলমেলে হয়ে যায়। এই তো সেদিন কলেজ ছাত্রী রুশদানিয়া ফুলের হত্যাকাণ্ড নিয়ে কাগজে বিশদ বিবরণ ছাপা হলো। কিন্তু যেই মাত্র স্থানীয় আওয়ামী লীগের কাদেরের নাম এলো অমনি সবার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। যেন কিছুই ঘটেনি। শুধু রুশদানিয়া নয়, নির্মম পুলিশী নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র রুবেল।

সেখানেও যে চিরকুটটি পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে, এই হত্যার নেপথ্যের ঘাতক ছিলেন স্থানীয় একজন আওয়ামী লীগ নেত্রী। বরিশালে বাস থেকে নামিয়ে যে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হলো সেই গুরুতর অপরাধের হোতাও একজন প্রভাবশালী স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতার ছেলে। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনার যারা নায়ক তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। অথচ যে কোনো ঘটনা ঘটলেই দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দল বিশেষভাবে বিএনপি, জামায়াত, জাপাকে জড়িয়ে রমরমা গল্পের অবতারণা করা হয়। এতসব মজার গল্প পত্রিকায় ছাপা হয় যা দেখলে প্রাচীন রূপকথার গল্প বুড়ির ফোকলা দাঁত দিয়ে বেরিয়ে আসা আজগুবি গল্প হার মানে।

বন্ধুটি এরপর রাজনৈতিক আলোচনা পর্যালোচনায় না গিয়ে সোজা বলতে শুরু করলেন, 'আমরা কি হাজার বছরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ কোনো সভ্যদেশের নাগরিক, নাকি কোনো আদিবাসী উপজাতি হিসেবে বেঁচে আছি।

উপজাতি সমাজে যেসব ঘটনা ঘটে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাদের সমাজের নতুন কেউ এলে প্রথমে তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রাজ দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর বাজনাবাদ্য বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে বধ করা হয়। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভ্যাগত যদি সুকৌশলে রানী বা রাজকন্যার মনে নিজেকে ধরাতে পারে তাহলে অন্য কথা। গল্পের মোড় ঘুরে যায়।

মনে পড়ে যায় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের কথা। বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী আছে কিনা এ নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। যাই হোক আধুনিক শিক্ষায়-শিক্ষিত একটি জাতির পক্ষে বাংলাদেশে আদিবাসী চিন্তায় সম্পৃক্ত হওয়া সংগত নয়। তবুও এই চিন্তা ক্রমশ আমাদেরকে আচ্ছন্ন করছে। তার কারণ যা কিছু ঘটে 'কেষ্টাবেটাই চোর' এই ধরনের একটি

www.pathagar.com

ধারণা প্রশাসন থেকে সর্বত্র প্রচার করা হচ্ছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথম যে সংবিধান রচিত হয় সেই সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এই বিশেষ অনুচ্ছেদ এড়িয়ে গিয়ে সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন করে ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় অনীহার অবসান ঘটানো হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি আবার সেই পূর্বাবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয়। এখন সবকিছুর জন্যই ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে বিশ্ববাসীদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেত্রীবৃন্দ ও বিসমিল্লাহ, রাষ্ট্রধর্ম বাদ দেয়ার দাবি তুলেছেন। সেই সাথে মুসলমানদের নামের পদবি থেকে মুহাম্মদ এবং আলহাজ বাদ দেয়ার আবদার তুলেছেন।

ব্যাপারটিকে যদি সরকারি পর্যায় থেকে সিরিয়াস ভাবে নেয়া হতো তাহলে নিশ্চয়ই এই ক'দিনে সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের কোনো না কোনো জরুরি ঘোষণা পাওয়া যেত। সুতরাং মনে করা যেতে পারে রাজনৈতিকভাবে যেমন ভাবে ধর্ম বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে সরকারি রোষ ধাবিত হচ্ছে তেমনি হয়তো অন্যরাও একই সুরে কথা বলছে। পৃথিবীর এক আধটি দেশ ছাড়া কোথাও ধর্মকে নিষিদ্ধ করার উদাহরণ পাওয়া যাবে না। সেই পরিস্থিতিতে ধর্মবিশ্বাসীদের নিয়ে যে রূপকথার গল্প বানানো হচ্ছে তা দেখে সেই প্রাচীন কিংবদন্তীর গল্পের কথাই পুনরায় মনে পড়ে বিধায় বন্ধুর সাথে কোনো তর্কে না গিয়ে নিজের চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললাম, তবে আসি।

তিন

রাজ দরবার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অন্ধকে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখলেন?

অন্ধ জবাবে বলল, ভয়ে না নির্ভয়ে জবাব দেব?

রাজা বললেন, নির্ভয়ে বলুন।

অন্ধ বললো, রাজা চিনি দানে।

রাজা বললেন, আমার সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

অন্ধ বললো, আপনার মাকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি কি রাজবংশের?

অনেক লম্বা গল্প। তবে সবটুকু বলা প্রয়োজনীয় এবং নিরাপদ মনে না করায় এই গল্পের এখানেই শেষ করতে চাই। গল্পের সূত্রপাত এই জন্যেই যে, রাজা চেনার উপায় কি? কথায় বলে, দেশের রাজা ভালো হলে প্রজাদের দুঃখ এমনি চলে যায়। রাজ্যের বালামুছিবত দূরে থাকে। খুনখারাবি হিংসা বিদ্বেষ থেকে জনগণ নিরাপদ থাকে। বলা যায়, সৃষ্টিকর্তা নিজেই রাজ্যের হেফাজত করেন। যদিও পবিত্র কোরআনে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্ষমতা এবং সম্মান দুটোই হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ। আর সে কারণেই কথা ওঠে, আল্লাহর এই বিশেষ নেয়ামত দুটি যারা পান তারা এর সঠিক ব্যবহার করতে পারেন কি না। যদি না পারেন তাহলে পরিস্থিতি কি দাঁড়ায়?

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করে ফেলবেন, বর্তমান পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যাদের আল্লাহ নিয়ে কোনো চিন্তা নেই বরং জীবনকে ভোগ করার জন্য যতটা উপকরণ সম্ভব তারা গ্রহণ করছেন। সভ্যতার নামে এক আদিম উন্মাদনায় তারা মেতে রয়েছেন। সে সব দেশে

www.pathagar.com

কি আল্লাহর ব্যবস্থা কার্যকর নয়?

আমরা দীর্ঘ বিতর্কে না গিয়ে শুধু ইতিহাসের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলবো, জাহেলিয়াতের যুগ এবং ইসলামের শাসন পরস্পরবিরোধী হলেও একটি বিশেষ বিষয়ে মিল ছিল। জাহেলিয়াতের যুগ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা না করেও সংক্ষেপে শুধু এই কথা বলা যায় যে, ঐ সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মিথ্যে বলা, নারী নির্যাতন করা, পাপ ও ব্যভিচার। কিন্তু এসবের উৎস ছিল বহুত্ববাদ। জাহেলিয়াতের লোকেরা আল্লাহে বিশ্বাসী ছিল। তাদের সমাজপতিরাও আল্লাহতে বিশ্বাস করতেন। এমনকি ধর্মীয় পবিত্র স্থানগুলোর ওপরও তাদের আস্থা এবং বিশ্বাস ছিল। বংশানুক্রমে এই সকল পবিত্র স্থানের আমনতদারী তারা রক্ষা করতো। শুধুমাত্র একত্ববাদে তারা বিশ্বাস করতো না। ইসলামের মহান প্রবর্তক আল্লাহর নবী জাহেলিয়াতের মানুষদেরকে একাত্ববাদের আহ্বান জানালেন। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ সমাজে যা যা বিরাজমান ছিলো তার কোনো কিছুর বিরুদ্ধেই তিনি শুরুতে কথা বলেননি, শুধুমাত্র একত্ববাদের আহ্বান ছাড়া। আর এখানেই বহুত্ববাদ ও একত্ববাদের মধ্যে চরম সংঘর্ষ লেগে যায়। বহুত্ববাদীরা মনে করলো একত্ববাদের আহ্বান মানতে হলে যাঁর নেতৃত্ব মানতে হবে তার ব্যক্তিগত চরিত্রে কোনো কালিমা না থাকায় আমাদেরকেই হয়ত বদভ্যাসগুলো ছেড়ে দিতে হবে। যা কিনা তারা তাদের ভাষায় বাপ-দাদাদের ধর্ম বলে মনে করতো। তবুও তারা অবিশ্বাসী বা নাস্তিক ছিল না। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর এমন অনেক দেশ রয়েছে যারা ভোগবাদে বহুত্ববাদীদের মতই পারঙ্গম হলেও প্রকাশ্য ধর্মবিরোধিতায় আসেন না। আধুনিক গণতন্ত্রের জন্ম লগ্ন থেকে খ্রিস্ট ধর্মের কতিপয় যাজকের সাথে মতপার্থক্যের কারণে ধর্মের সাথে গণতন্ত্রকে আলাদা করে দেখানো হচ্ছে। আর সেই সূত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামে একটি নতুন মতবাদ চালু করে অনেকে মানবধর্ম নামে এক নতুন ধর্মের কথা প্রচার করে থাকেন। যাকে সরলিকরণ করলে এরকম দাঁড়াবে : ঘর বা পরিবার ভেঙে বিশ্ব পরিবারকে নিজের মতো করে পেতে চাওয়া।

সে যাই হোক, বিশ্বে ধর্ম নিয়ে বিশেষ করে ইসলাম নিয়ে বিতর্কের শেষ হয়নি। বরং বর্তমান অবক্ষয়ী সভ্যতার জন্যে ইসলাম একটি নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দিন দিন এগুচ্ছে। বর্তমান সময়ে যারা ইসলামের চর্চা করছেন এরা সনাতনী এতিমখানার ছাত্র নয় বরং অনেক ইংরেজ সাহেবদের চেয়ে উন্নত ইংরেজি বলা নব্যশিক্ষত। কারণ সভ্যতার বর্তমান সংকটে ইসলাম যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে এটি পরীক্ষিত সত্য।

বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ হওয়া সত্ত্বেও ইদানিং ইসলামের বিরুদ্ধে শীর্ষ মহল থেকে নানা কথা বলা হচ্ছে। এসব কথাকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা যাক না কেন একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, প্রশাসনের সাথে প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসীদের পার্থক্য বেড়ে যাচ্ছে। শুরুটা হয়েছিল বিসমিল্লাহ নিয়ে। বিগত ২১ বছরের সরকার রাষ্ট্রীয় কাজ শুরু করতেন বিসমিল্লাহ দিয়ে, এই সরকার শুরু করলেন বিসমিল্লাহর বঙ্গানুবাদ দিয়ে। পবিত্র কোরআন এবং তার অর্থ এক জিনিস নয়। আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন আরবি ভাষায়। সুতরাং বঙ্গানুবাদ অর্থ কোরআন নয়। বিষয়টিকে ধোঁকা হিসাবে উল্লেখ না করলেও একথা বলা অসঙ্গত নয় যে, বর্তমান সরকারের শুরুটা কোরআনের অনুরূপ হয়নি। সেই যে শুরু এখনও তা শেষ হয়নি। দিন দিন ধর্মবিশ্বাসীদের ওপর সরকারের রোষ এতটাই বাড়ছে যে, বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার অপচেষ্টা চলছে। এর অজুহাত হিসাবে দাঁড় করানো হচ্ছে প্রাণনাশের নানা চেষ্টার কথা।

www.pathagar.com

ঘটনার সত্য মিথ্যা যাই থাকুক সত্যিকারভাবে কোনো অভিযুক্তকে খুঁজে পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার মতো অনেক আইন দেশে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খোলাফায়ে রাশেদিনের চার মহান শাসকের মধ্যে তিনজনই শাহাদত বরণ করেছেন নামাজরত অবস্থায়। কিন্তু তাই বলে অর্ধ পৃথিবীর শাসনকর্তারা কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেননি। অথবা নিজেদের শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করার জন্য কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করেননি অথবা উস্কানি দেননি। সত্যি কথা বলতে কি, জীবন ও মৃত্যুর মাঝে তাদের প্রাপ্ত সম্মানকে তারা দায়িত্ব হিসাবে মনে করতেন।

আর সে কারণেই তাদের সঙ্গে জনগণের পার্থক্য বলতে যেটুকু ছিল তা হলো, একদল মোমিন আর আরেক দল হচ্ছেন আমিরুল মোমেনিন।

আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মকে পরোক্ষ আঘাত হানার নানা কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে। যার প্রকৃত অর্থ হলো সমাজকে ইসলামধর্মহীন করে ফেলা এবং তা সম্ভব হলে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। ব্রিটিশ শাসনের আগে সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলামের প্রকৃত আলেমদের সাথে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরোধ উপস্থাপিত হয়েছিলো। সেই জমানার মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ) গ্রেফতার হয়েছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সেই মোগল পরিবারেই জন্ম নিয়েছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব বা জিন্দাপীর। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমান আলেমদের যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার পরিণতিতে ইংরেজদের এদেশ ছাড়তে হয়েছে। ইংরেজরাও এদেশের জননন্দিত আলেম ওলামাকে চোর-ডাকাত হিসাবে পর্যন্ত চিহ্নিত করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি একাত্ববাদের সাথে বহুত্ববাদের লড়াই রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্য ন্যায় বনাম অসত্য ও ব্যভিচার আকারে রূপ নেয়। আর এই লড়াইয়ে সত্যই বিজয়ী হয়। গল্পের শুরুতে অন্ধ যেভাবে রাজাকে বলেছিল, রাজা চিনি দানে। আসলে চেনার জন্য দুটি চোখই যথেষ্ট নয় বরং মনের চোখ গুরুত্বপূর্ণ। সেই চোখে সত্য মিথ্যার যাচাইয়ে কেউ যদি কাউকে অসত্যের প্রতীকবাহী মনে করে তাহলে শত চেষ্টা করেও নিজেকে ধার্মিক বানানো যাবে না বরং বকধার্মিক হিসাবেই চিহ্নিত হবে।

চার

টিভি চ্যানেল ANT বাংলার একটি জনপ্রিয় মেগা সিরিয়াল 'মামা ভাগ্নে'। এই সিরিয়ালটির একটি পার্শ্বচরিত্র হচ্ছে জনৈক মিথ্যা বিক্রেতা। পেশা হিসাবে সে মিথ্যা বিক্রি করে। অর্থাৎ পেশাদার মিথ্যা বিক্রেতা। সিরিয়ালে হঠাৎ করেই তার আগমন। মামা ভাগ্নের সামনে এসেই চঞ্চু নামের সেই লোকটি কথা নেই বলা নেই কান ধবে উঠবস শুরু করে দিল। বেশ কয়েকবার এই ভাবে উঠবসের পর সে তার আসল কথায় ফিরে এলো। সে জানাল, তার পেশা হলো মিথ্যা কথা বেচা। বাজারে এই পণ্যটির নাকি অনেক ক্রেতা।

সিরিয়ালের এক পর্যায় এসে সে জানাল সমাজে মন্ত্রী এবং বড়কর্তারা এত বেশি মিথ্যে বলছে যে, এখন আর তার মিথ্যের কোনো ক্রেতা নেই।

নাটক নাটকই। এ নিয়ে যত আলোচনা করা যাক না কেন নাটক জীবন নয়। তবে সচেতন লেখকের হাতে পড়লে কল্পনার রংয়ের সাথে জীবনের ছোঁয়া মিলে নাটক হয়ে উঠে

www.pathagar.com

জীবনঘেঁষা। নাট্য বিতর্কে যাওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা মিথ্যে বিক্রেতাকে আমাদের দিনমান জীবনের একটি অপরিহার্য চরিত্র মনে করে পাঠকের সামনে তুলে আনলাম।

মন্ত্রী মিনিস্টার বা সমাজপতিরা মিথ্যে বলে কি ফায়দা লুটছেন সেটা যারা বলেন তারাই হয়ত বলতে পারবেন। তবে সমাজে বর্তমানে যে মিথ্যাচার চলছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মতোই মিথ্যে এখন হাট বাজারে পাওয়া যায়। বাজারের ভেজাল পণ্য বা দুই নম্বরী পণ্যের কথা বাদ দিলেও রাজনীতিবিদদের মিথ্যা এখন জনজীবনে আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই তো সেদিন অর্থমন্ত্রী টাকার অবমূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেক বড় বড় কথা বললেও আসলে সাধারণ মানুষের জীবনে যে দুর্গতি নেমে এসেছে সে কথা বলেননি। মুদ্রাস্ফীতির দাপটে জনজীবনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে অর্থমন্ত্রী হয়ত এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। কারণ তার অর্থনীতির বিদ্যা যে তত্ত্ব শিখিয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের দুঃখের অবসান কল্পে কোনো খিউরি নেই। এমনকি যে দলটিতে তিনি আছেন সেই দলটিও আওয়ামী লীগ। জনগণের দুঃখ লাঘবের জন্য নয় বরং জনগণের দুঃখেরই কারণ। ৭২-৭৫ পর্যন্ত যখন এই দলটি ক্ষমতায় ছিল তখনও জনগণের দুঃখ লাঘবের পরিবর্তে দুঃখ দুর্দশায় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে সময়কার সরকার যেমন জনগণের এই দুঃখের কথা স্বীকার করেননি আজও করছে না। বরং চিৎকার করে শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় তুলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। অথচ এই সরকারের অন্য এক মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছেন, দেশের অর্থনীতির অবস্থা এতটাই খারাপ যে জনগণ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে। শুধু অর্থনীতি কেন রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজীও একেবারে কম চলছে না। এক সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন ২০০০ সালে জাতীয় নির্বাচন দিবেন। এরপর এই কথা প্রত্যাখ্যান করে এমন সব কথা বলেছেন যা থেকে নির্বাচন প্রসঙ্গটি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠেছে। যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় কালে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে এই সন্দেহের কারণ কি তা তিনি উল্লেখ করেননি। জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রবীন না হলেও নবীন নন। নেপথ্য রাজনীতির যে কাহিনী বাংলাদেশে চালু আছে তাকে সেই চালবাজদের একজন বলে মনে করা হয়। উত্তরাধিকার রাজনীতির যদি কোনো অধিকার থেকে থাকে তাহলে তিনি তার একজন দাবিদার। ৪৭ এর পাকিস্তান সৃষ্টিতে দৈনিক আজাদের যেমন বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল তেমনি বাংলাদেশ সৃষ্টিতে জনাব তফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে বলে থাকেন ইত্তেফাক না হলে হয়ত বাংলাদেশই হত না। সেই সূত্রে বাংলাদেশ সৃষ্টির রাজনীতির অন্যতম কর্ণধার মানিক মিঞার পুত্র হিসাবে তিনিও উত্তরাধিকার সূত্রে খানিকটা সুবিধা দাবি করতে পারেন। ইত্তেফাক সম্পাদক হিসেবে বিএনপির শাসন আমলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিরুদ্ধে জনাব আতাউর রহমান খান যে অনশন করেছিলেন জনাব মঞ্জু তা সমর্থন করেছিলেন। এরপর প্রেসিডেন্ট এরশাদ এবং আওয়ামী মন্ত্রিসভায় নিজের নাম লিখিয়ে রাজনীতির অঙ্গণেও খানিকটা জায়গা করে নিয়েছেন। তিনি যখন নির্বাচন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তখন সংশয়কে একেবারে উড়িয়ে দেয়া সহজ নয়। যদি তার বক্তব্যকে আওয়ামী মন্ত্রিসভায় একজন সদস্য হিসাবে বিবেচনা করা যায় তাহলে বলতে হবে মিথ্যার বিক্রেতা এই সরকারের ফেরিওয়ালা হিসাবে তিনি শুধুমাত্র মিথ্যাই বিক্রি করেছেন অর্থাৎ নির্বাচন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে বিরোধী দলের মধ্যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে

www.pathagar.com

সরকারী দলকে লাভভান করতে চান। এই ব্যাপারটি যে তার মাথায় একেবারেই নেই সে কথা হয়ত ঠিক নয়। কারণ তার সাবেক নেতা প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে অর দলগত বা জোটগত ঐক্যের সম্ভাবনা না থাকলে সরকারী দলই বর্তমান প্রক্রিয়ার একমাত্র ভরসা। সুতরাং তরী না ডুবানোর জন্য তিনি কৌশলগত ভাবে এই বক্তব্য বাজারে ছেড়ে থাকতে পারেন। কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে ধরে নেয়া যায় যে, সরকারের ফেরীওয়ালা না হয়ে তিনি রাজনীতির একজন হয়ে এ কথা বলেছেন, তাহলে বলতে হবে ভবিষ্যৎ সত্যি অনিশ্চিত। নির্বাচন না হলে অনেক কিছুই হতে পারে তবে সম্ভাব্য একটি আতংকের দিক হচ্ছে গোটা দেশে রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং সরকারী দলের অসহিষ্ণু কর্মকাণ্ড পরিস্থিতি বিষিয়ে তুলতে পারে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করে রাজনীতির পরিবেশকে নস্যাৎ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। জনাব মঞ্জুর আলোচনা সেই সাথে মিলালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই জটিল বলে মনে হয়।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংকট এই প্রথমবার নয়। ইতোপূর্বেও অনেকবার এই ধরনের সংকট এসেছে। শুধু বাংলাদেশ নয় এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ সহ বিশ্বের বহুদেশেই কখনো না কখনও রাজনীতির সংশয় দেখা দিয়েছে এবং তার সন্তোষজনক সমাধানও পাওয়া গিয়েছে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার এই সংকটের উত্তরণ ঘটলে তা সকলের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু তা না হলে পরিস্থিতি হবে দুঃখজনক। জনাব মঞ্জু অথবা প্রধানমন্ত্রীর সংশয় টিভি সিরিয়ালের মিথ্যা বিক্রেতার মতোই অসার প্রমাণিত হোক এটাই সকলের আকাঙ্ক্ষা। আর জনগণের স্বাভাবিক আকাংখা স্বাভাবিক ভাবে জীবিত থাকুক এটাই স্বাভাবিক। তবুও আমরা বলি রাজনীতি কখন কোন পথে মোড় নেয় এবং সেই বাঁকে কারা কোথায় অপেক্ষা করেন তা বাংলাদেশে যে কয়জন খোঁজ খবর রাখেন তার মধ্যে জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু একজন। আমরাও তার কথায় আগামী নির্বাচন সম্পর্কে সংশয়বাদী হয়ে উঠলাম।

পাঁচ

গণতন্ত্রহীন গণতান্ত্রিক দেশেই সহিংস সরকার অনেক সময় লোক দেখানো অহিংস বাণী উচ্চারণ করে থাকে। সম্ভবত আমাদের বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের অবস্থাও হয়েছে তেমন। তারা হয়তো ধরেই নিয়েছে যে, যেহেতু তাদের আরো অন্তত ৫ বছর ক্ষমতায় থাকতে হবে তাই কে কি বলে এ নিয়ে ব্যথা করার মতো মাথা রাখার দরকার নেই। লজ্জার মাথা খেয়ে এখন তারা প্রকাশ্যই নেমেছেন সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ এবং ছিনতাইকারীদের পক্ষে। আগে সরকারের শীর্ষ নেতারা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা বলতেন আর এখন টেলিফোন করেন ধৃত সন্ত্রাসীদের ছেড়ে দেয়ার জন্য। পত্রপত্রিকায় এসব বিবরণও ছাপা হচ্ছে। সুতরাং এ কথা বলতে দোষ নেই যে, সরকার তাদের প্রতিপক্ষ এবং জনগণকে শায়েস্তা করার জন্য প্রতিহিংসার নীতি গ্রহণ করেছে। অথচ এই সরকারই অহিংসনীতির পক্ষে মুখে মুখে প্রচারণা চালাচ্ছে।

নোয়াখালীতে গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধনকালে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ গান্ধীর অহিংসনীতিকে মানবপ্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। প্রেসিডেন্ট গান্ধীর অহিংসনীতির উল্লেখ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশেষ অধ্যায়ের দৃশ্যপট উন্মোচন করেছেন। তিনি সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন ঊনবিংশ

www.pathagar.com

শতাব্দীর প্রথম দিকে। সহস্রাব্দ শেষে এসে সেই শতকের গোড়ার দিকের ঘটনা আলোচনা করা হয়তো নিরর্থক নয়। তখন ছিল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের রক্তক্ষরা সময়। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী যে সহিংস আন্দোলন অনুশীলন সমিতি দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এই অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে দমনমূলক রৌলট বিল পাস হয়। ১৯১৫ সালে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে ভারতীয় কংগ্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ এবং রৌলট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। পরিণতিতে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ১৯২০ সালের মে মাসে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর মিত্র তুরস্কের সুলতান ও ইসলাম জগতের খলিফার পরাজয়ের প্রেক্ষিতে শেবার্সের সন্ধি শর্তে ইসলামের খেলাফতের করুণ পরিণতির প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় মুসলমানরা খেলাফত আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এই সময় মন্টেগু চেমসফোর্ডের শাসন সংস্কারে ভারতের সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে কংগ্রেস অত্যন্ত রুষ্ট হয়। মি. গান্ধী ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের যে সুযোগ খুঁজছিলেন এই সময় তা এসে যায়। তিনি খেলাফত আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে ১৯২০ সালের ১ আগস্ট ঘোষণা করেন যে, খেলাফত দাবির প্রতি সুবিচার করা না হলে তিনি অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করবেন। ১৯২০ সালে ২৮ মে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম খেলাফত সম্মেলনে মওলানা আবুল কালাম আজাদের অসহযোগ প্রস্তাব এবং গান্ধীর সত্যাগ্রহ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সরকারি খেতাব ত্যাগ, সরকারি অনুষ্ঠান বর্জন, সরকারি বিদ্যালয় ত্যাগ ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, আদালত বর্জন, সালিশী-কাচারি গঠন, নতুন ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন ত্যাগ, নির্বাচন বর্জন ছিল ঐ আন্দোলনের অস্ত্র।

তুরস্কে যখন নব্যতুর্কীরা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে খেলাফত উচ্ছেদের সশস্ত্র সংগ্রামরত ভারতের মুসলমানরা তখন জামালউদ্দিন আফগানি প্রচারিত প্যান ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত খেলাফত আন্দোলনরত। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস তাদের সহায়তা করছিল। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ইংল্যান্ডের যুবরাজ অষ্টম এডওয়ার্ড যখন ভারত সফরে আসেন, তার প্রতিবাদে ১৯২১ সালের ২১ নভেম্বর ভারতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সরকার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বেআইনি ঘোষণা ও ব্যাপক ধরপাকড় করে। দেশময় ইংরেজবিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে গান্ধী ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমবেতভাবে এই প্রথম দেশজুড়ে ইংরেজবিরোধী ব্যাপক রাজনৈতিক ও গণআন্দোলনের সৃষ্টি করে। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে করাচি খেলাফত কংগ্রেসে রাজদ্রোহী বক্তৃতার অভিযোগে ঐ বছর অক্টোবর মাসে আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে দু'বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়। ১৯২২ সালের মে মাসে যুক্ত প্রদেশের চৌরিচৌরা থানায় জনতা ও পুলিশের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে জনতার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদে গান্ধী তার আন্দোলনকে হিমালয় পর্বত প্রমাণ ভুল আখ্যা দিয়ে তা বন্ধ করে দেন। কলকাতা কংগ্রেসের ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন যে, অসহযোগ সফল হলে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ্য আসবে। কিন্তু স্বরাজ্য এলো না। ১৯২২ সালের ১০ মার্চ গান্ধীজী গ্রেফতার হন এবং ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২১ সালের শেষের দিকে আহমেদাবাদ কংগ্রেসে হসরত মোহানী প্রথম ভারতের স্বাধীনতা প্রস্তাব উত্থাপন করেন, কিন্তু গান্ধীজীর বিরোধিতায় ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় জন্ম নেয় স্বরাজ্য দল।

১৯৪১ সালে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হবার পর কংগ্রেস যে অহিংসনীতি গ্রহণ করেছিল সে

www.pathagar.com

সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদ। তিনি যা লিখেছেন তার মর্মার্থ এইরূপ যে, গান্ধীজী ও তার শীর্ষস্থানীয় অনুচরগণ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অহিংসনীতি মেনে চলতেন সত্য; তবে তা কেবল তাদের সুবিধামতই। যাহোক, গান্ধীজীর পালিত অথবা ঘোষিত সেই ঐতিহাসিক অহিংস বাণীর কথা যখন আবার উচ্চারিত হয় তখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি তা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। দেশে বর্তমানে এমন এক সরকার ক্ষমতায়, যারা নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে দাবি করলেও গণতন্ত্রের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধও নেই। যদি তা থাকতো তাহলে অন্তত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সাধারণ শর্ত বিরোধী দল সম্পর্কে কথাবার্তা বলার সময় হলেও হুমকি-ধামকি প্রদর্শন না করে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভাষায় কথা বলতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রী যখন হত্যার পরিবর্তে পাল্টা হত্যা করার হুমকি দেন তখন তাকে আর গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলে মনে হয় না। একজন ব্যক্তি গণতন্ত্রী না হলে তিনি হয়ে উঠেন ফ্যাসিস্ট। ফ্যাসিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসহিষ্ণুতা। এর ফলে সে কাউকে এমন কি নিজের ছায়াকেও সহ্য করতে পারে না। কারণ প্রতিপক্ষ নিধনই তার প্রধান চরিত্র হয়ে উঠে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন চলছে সেই চরিত্রের উলঙ্গ বহিঃপ্রকাশ। হাটে-মাঠে, পথে-ঘাটে, জনসভায় যেখানেই সরকারি দলের নেতানেত্রীরা বক্তৃতা দিচ্ছেন সেখানেই হুমকি দিচ্ছেন নির্মূল করার। আর চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন পাকিস্তানিদের। নোয়াখালীতে গান্ধী স্মৃতিযাদুঘর উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট অহিংসনীতির কথা একবারও ভেবে দেখেছেন কি, এই দেশে এই নীতির কোনো চর্চা হচ্ছে না। যদি হতো তাহলে গান্ধীর স্মৃতি সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের যে সব জায়গায় সফর এবং অবস্থান করেছেন সে জায়গাগুলোর স্মৃতি সংরক্ষণ করাও অন্যতম দায়িত্ব ছিল। কিন্তু আমরা তা না করে জিন্নাহ হল বা জিন্নাহ এভিনিউ নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হিংসাত্মক রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছি। পাকিস্তান নিয়ে কোনো আলোচনা নয়। শুধুমাত্র ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক নন্দিতনায়ক গান্ধী প্রসঙ্গ উঠতেই জননন্দিত জিন্নাহর প্রসঙ্গ আমরা উপস্থাপন করলাম। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা ফিরে আসতে চাই। জিন্নাহ আলোচনা না করে গান্ধীজীর অহিংসনীতিকে মানবপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা তুলে ধরতে চাইলে সবার আগে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গান্ধীর অহিংসনীতির মর্মার্থ বুঝানো দরকার। দেশের প্রেসিডেন্ট যদি এই কাজটি অন্তত করতে পারেন তাহলে অনেক মায়ের বুক খালি হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। এবং সমাজ প্রতিহিংসার বহ্নিশিখা থেকে মুক্তি পাবে। জাতি গণতন্ত্রের স্বাদ অনুভব করতে পারবে। মহামান্য প্রেসিডেন্ট গান্ধী স্মৃতিজাদুঘর থেকে যে অহিংস শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তা অন্তত প্রধানমন্ত্রীকে বিতরণ করবেন এই বিশ্বাস আমরা করতে চাই।

ছয়

হতে পারে দেশের প্রথম প্রধান বিরোধী দল তথা চারদলীয় জোটের রাজধানীর বাইরের জনসভাসমূহে আশাতীত সফলতার প্রেক্ষিতে অথবা নতুন কোনো প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সরকারি দল ও সরকারের গতিপ্রকৃতিতে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারি দল চারদলীয় জোটের বিকল্প হিসাবে জনসভার জন্য মুক্তিযোদ্ধাজনতা নামক একটি ব্যানার ব্যবহার করতে শুরু করেছে। সরকারদলীয় পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী এসব সমাবেশে

www.pathagar.com

লোক সমাগমও নাকি হচ্ছে অনেক। কারো কারো ভাষায়, অত্যন্ত 'সুশৃঙ্খল' এই সব জনসভায় উপস্থিত জনতা নাকি শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শোনার জন্যই অধির আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। এরকম একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনাজপুরে। এর আগে হয়েছিলো ময়মনসিংহে। দুটি জনসভাই অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐ এলাকাসমূহে চারদলীয় জোটের মহাসমাবেশের পর। চারদলীয় জোট ও সরকারি জনসভার মধ্যে মিল ও অমিল দুটোই রয়েছে। মিলের মধ্যে হলো লোক সমাগম। কার পক্ষে বেশি লোক তা দেখানোই যদি এই সব সমাবেশের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে এ লক্ষ্যে বিরোধী দলই বিজয়ী হয়েছে। কারণ, তারা ঘোষণা দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে জনসমাবেশ এবং সরকারবিরোধী বক্তব্য প্রদানের পর সরকারি দল তাদের পেছনে ধাওয়া করছে। এ দেশে সরকারি দলের জনসমাবেশ নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। ক্ষমতায় থেকে দরিদ্র দেশে সমাগম দেখানো কোনো কষ্টকর ব্যাপার নয়। সেই বিবেচনায় সরকারি দলের জনসভাকে শুধুমাত্র দর্শক সমাবেশ না বলে কোনো উপায় নেই। সরকারি দলের এই সমাবেশের প্রশ্নে সরকারের রাজনৈতিক সমর্থক একটি দৈনিকের রিপোর্ট এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। পত্রিকাটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, মানুষের সাথে আওয়ামী লীগের দূরত্ব বেড়েছে। সর্বত্রই প্রশ্ন উঠেছে, চার বছর কোথায় ছিলেন? রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, দলের আগামী গুরুত্বপূর্ণ সময় নাকি এ সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হতে পারে। সে যাই হোক, সরকারি দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কোনো আলোচনা নয়, দৈনিকের রিপোর্টটি যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে মানুষ ও আওয়ামী লীগের যে দুই আলাদা সত্তার জন্ম হয়েছে তার সমন্বয় সম্ভবত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথাটা নিরর্থক নয়। মানুষের মধ্যে যে দয়া, মায়া, মহব্বত, ভালোবাসা এবং সর্বোপরি বিবেকের অস্তিত্ব থাকে আওয়ামী লীগের মধ্যে তা নেই। দৈনিকটির শিরোনাম দেখে এদেশের বাংলা ভাষার আর একটি জনপ্রিয় বাংলা দৈনিকের অনেক দিনের পুরনো একটি শিরোনামের কথা মনে পড়ে গেলো। জনৈক বিড়ি মেম্বারকে গরু গুঁতা দিলে দৈনিকটির রিপোর্টে শিরোনাম করা হয়েছিলো: 'চিনিলো কেমনে'। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জেনারেল আইউব প্রবর্তিত ব্যাসিক ডেমোক্রেসি (বিডি) পদ্ধতির সমালোচনা করার জন্যই এই শিরোনাম করা হয়েছিলো। গরু যে-কাউকেই গুঁতা দিতে পারে। কিন্তু বিডি মেম্বার অর্থাৎ আইউব খানের সমর্থককে দেওয়ার কারণেই সংবাদপত্র যে শ্লেষাত্মক শিরোনাম করেছিলো তার নেপথ্য অর্থ ছিলো আইউবকে গালি দেওয়া এবং এর পরিণতি ছিলো ৬৯-এর গণবিস্ফোরণ। আমরা অনেক দিনের পুরনো কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বর্তমান সময়ে সাবেক পরিস্থিতি ও পরিবেশের আদৌ কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা দেখা দরকার।

গত চার বছরে আওয়ামী লীগ মানুষ থেকে দূরে চলে যাবার অর্থ হচ্ছে, এই দলটি এখন গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে লোক সমাগম হচ্ছে কিভাবে অথবা যারা আসছেন তারা প্রচলিত অর্থে মানুষ কি না? প্রশ্নটির সরাসরি হয়তো কোনো জবাব পাওয়া যাবে না। তবে প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিককালে তার জনসভার জন্য আওয়ামী লীগের পরিবর্তে মুক্তিযোদ্ধাজনতা নামের ব্যবহারে যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, জনগণ আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ব্যাপারটি সরকার নিজেও হয়তো টের পেয়েছেন যে, আওয়ামী লীগের নামে সমাবেশ করে কোনো লাভ নেই। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী সিলেট, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, লক্ষ্মীপুরের মতো ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ও দলের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঐ সব এলাকায় যা ঘটেছে তার সারমর্ম

www.pathagar.com

এই যে, সরকারদলীয় সন্ত্রাসীদের কাছে গোটা এলাকার জনগণ জিম্মি হয়ে পড়েছে। দলের এই ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার খবর প্রধানমন্ত্রী যে জানেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আওয়ামী লীগের নামে সমাবেশ ডাকার বদলে মুক্তিযোদ্ধাজনতা নামের ব্যবহার দেখেই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, প্রধানমন্ত্রী কি ক্ষমতার একজন হয়ে নাকি সাধারণের একজন হিসাবে এই দায়িত্ব নিয়েছেন? তিনি কার বুদ্ধিবিবেচনা অথবা পরামর্শে মুক্তিযোদ্ধা জনতার সমাবেশ করছেন, তা তিনিই ভালো বলতে পারবেন। তবে ব্যাপারটি গোলমেলে। দলের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবার কারণে যদি তিনি এ কাজ করে থাকেন, তাহলে তার প্রথম দায়িত্ব ছিলো দলের সদস্যপদ ত্যাগ করা। কারণ তার নির্দেশনা ও পরিচালনায়ই গত চার বছর ধরে গণবিরোধী নাটকের মঞ্চায়ন হচ্ছে। তিনি যদি অনুভব করে থাকেন তার নাটক গণমানুষের নয়, তাহলে তো ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত অথবা তিনি যদি একথা অনুভব করে থাকেন যে, আওয়ামী লীগ দিয়ে দেশের মানুষকে শাসন করা সম্ভব নয়, তাহলে তো তার 'পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকে সমর্থন করা প্রয়োজন। সরকারি দল অতীতে এবং বর্তমানে নানা কথার ছলছুতায় ওই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকে গণবিরোধী বলে প্রমাণের চেষ্টা করছেন। আসলে ঐ ঘটনা ছিলো রাজনীতি সম্পর্কীয়। বাংলাদেশের জনগণ বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেশটিকে স্বাধীন করেছিলো। সাড়ে তিন বছরের মুজিবী শাসনে জনগণ শুধু হতাশই হয় নিই বরং এমন ধারণার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলো যে, জীবনকে বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার প্রতিযোগিতায় নামাটা সম্ভবত সঠিক ছিলো না। সোজা কথায় বলতে গেলে জনগণকে দেশপ্রেম বিবর্জিত করে তোলার যে অপচেষ্টা করা হয়েছিলো তার প্রতিবাদে দেশপ্রেমের বিস্ফোরণ ঘটেছিলো।

সত্যি বলতে কি, দেশে এখন এমন এক অবস্থা বিরাজ করছে যা দেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন না। তাই হয়তো পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা স্তর অতিক্রম করার চেষ্টা করছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেই জাতিকে সিদ্ধান্তহীনতার অতলান্ত সাগরে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। সৃষ্টি করা হয় 'ওলোট পালোট করে দে মা লুটেপুটে খাই' পরিবেশ।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের সাথে যখন আওয়ামী লীগের ব্যবধান বেড়েছে, সন্ত্রাস যখন গোটা জাতিকে আতঙ্কিত করে তুলেছে তখন প্রধানমন্ত্রী ছদ্মবেশ ধারণের চেষ্টা না করে গণদাবির প্রতি সম্মান দেখানোই সঙ্গত।

সাত

একজন লোককেও না খেয়ে মরতে দেওয়া হবে না—এরকম একটি দম্ভোক্তির কথা দেশবাসীর সম্ভবত মনে রয়েছে। '৭৪ সালে বাংলাদেশে যখন চরমদুর্ভিক্ষ এবং এই দুর্ভিক্ষকে পুঁজি করে তৎকালীন সরকারি দল আওয়ামী লীগ যখন রিলিফ চুরির রাজত্ব কায়েম করেছিলো সে সময় তৎকালীন মুখ্য রাষ্ট্রপরিচালক শেখ মুজিবুর রহমান এই উক্তি করেছিলেন। প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে মিথ্যার বেসাতি যে দীর্ঘ সময় করা যায় না তা কিছুদিনের মধ্যেই টের পাওয়া গেলো। শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের জনগণ জেনে গেলো যে, বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষে এবং সরকারি বাহিনীর রিলিফ লুটপাটে বাংলাদেশে চরম দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হলো। যদিও এখানে বলে রাখা দরকার যে, লুটপাটের গল্পটা শুরু হয়েছিলো আরো আগে অর্থাৎ

www.pathagar.com

'৭২ সাল থেকেই। দুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বিশ্বমানবতা থেকে যে সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিলো সরকারি দল ও তাদের চ্যালাচামুণ্ডাদের সহযোগিতায় তার প্রায় সবটাই সীমান্তের ওপারে জমা হয়েছিলো। ভারতের পশ্চিম বাংলার ফুটপাথে এ সব পণ্য দেখে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক কর্মসূচির সমর্থক আব্দুল গাফফার চৌধুরীও আঁতকে উঠেছিলেন। দেশ যে তখন 'চোর ও চাটার' দলে ভরে গিয়েছিলো এ কথা শেখ মুজিব নিজেও স্বীকার করেছেন। এই চোর ও চাটার হাত থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে তিনি নাকি বাকশাল করে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি যাই বলেন না কেন, ততোদিনে বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি হিসাবে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলো। বাংলাদেশের তখনকার নির্মম বাস্তবতা এখন আর ততোটা উচ্চারিত নয়। কারণ, সেই ইতিহাস জনগণকে ভুলিয়ে দেয়ার জন্য বর্তমান সময় এমন অনেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে কাজ করছেন, যারা ঐ সময়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংগ্রামে জড়িত ছিলেন। বর্তমান ও সেই সময়ের মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য আছে বলে বর্তমান শাসনামলের ভুক্তভোগীরা মনে করেন না। যদিও সময়ের ব্যবধানের মধ্য দিয়ে অনেকের মধ্যেই নতুন মেরুকরণ হয়েছে। বর্তমান সরকার এই নয়া মেরুকরণকেই অভিহিত করে থাকেন 'মুক্তিযোদ্ধা-জনতা' বলে। অবশ্য ৭৫ থেকে ৯৬ প্রায় দু'যুগ পর আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসীন হলো তখন প্রথম দিকে বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনি বিরোধীদলীয় নেত্রী নন। শুধু তিনি নন আরো দু'একজনের অবস্থাও এরকম ছিলো। তারপরে স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার ও বর্তমান আওয়ামী সরকারের কৌশলে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য কারা যায়। বর্তমান আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য ধীরে-সুস্থে হাঁটতে শুরু করলো। তথ্য বোমাছেড়ে। গণতন্ত্রের ভাব দেখিয়ে প্রকৃত স্বৈরাচারের দিকে যাত্রা শুরু করলো এবং আস্তে আস্তে আওয়ামী স্বচরিত্রে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করলো। বর্তমান সময়কে মোটামুটি সরকারের প্রকৃত স্বরূপ বলা না গেলেও নখরদন্ত বিস্তারের সময় বলা যেতে পারে। সন্ত্রাস, দলীয়করণের রাজনীতিকে আত্মীকরণ করার মধ্য দিয়ে দুর্দান্ত প্রতাব যেভাবে প্রদর্শিত হতে শুরু করেছে, তা থেকে জনগণের আর বুঝতে বাকি নাই যে, তিনি তার পিতার শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া লাল ঘোড়াকে আবার নামাতে শুরু করেছেন। ঘোড়ার দাপট কোথায় কিভাবে হবে তা হয়তো এখনই বলা যায় না, শুধু এইটুকু বলা যায় যে, ঘোড়ার খুর এবং চালকের বুলেটে দেশপ্রেমিক জনগণের বারটা বাজবে।

হুংকার-বুলেট অথবা ভয়ভীতি যা-ই থাকুক না কেন, জনগণ তাদের সিদ্ধান্ত সময়মতো ঠিকই গ্রহণ করেন। এ কথা হয়তো সরকারি দলের মাথায়ও রয়েছে। তারাও হয়তো অনুমান করে থাকবেন যে, ভোটাররা তাদের উপর আস্থা হারাতে শুরু করেছে। জনগণের ওপর যে সরকারি দলের আস্থা কমে এসেছে তার প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী নিজে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার পর এখন আস্তে আস্তে ক্ষমতা না ছাড়ার ফন্দিফিকির করছেন। ক্ষমতা না ছাড়ার এই পরিকল্পনার সমর্থনে অনেকেই সরকারের প্রশাসনসহ নানা জায়গায় পরিবর্তনের উদাহরণ উল্লেখ করে থাকেন এবং এ ধারণাও অনেকে পোষণ করেন যে, ক্ষমতার বিন্দু থেকে বৃত্ত পর্যন্ত পুরোটাই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে শাসক দল। সে যাই হোক, কে কোথায় কিভাবে কাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন সে কথা সকলের জানার নয়। তবু বলা যায়, নিয়ন্ত্রণেরও নিয়ন্ত্রক আছে। মানুষ শুধুমাত্র ঘটনার পুতুলমাত্র।

যে কথা আমরা বলছিলাম তা হলো বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতার না খেয়ে মরতে না দেবার দম্ভোক্তির পরিণতিতে লাখো আদম ভুখা ছিলো। ঠিক তেমনি যেন বর্তমান

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীর কথাও অন্তঃসার শূন্য।

প্রধানমন্ত্রী দেশের বিরোধী দল নির্মূল-নিশ্চিহ্ন করে নিজেকে পাকাপোক্ত করার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেক্ষেত্রে হয়তো কোনো এক পর্যায় পর্যন্ত সফাও হেতে পারেন তবে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র যেভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তা দেখে হয়তো এ কথা মনে হতে পারে যে, তিনি স্বরূপে, স্বমহিমায় বহাল রয়েছেন। আমরা সে দিকে না গিয়ে তার একটি ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরতে চাই। এই ব্যর্থতার পেছনে ফ্রিডম পার্টি, জামায়াত, শিবির বা রাজাকার আলবদরদের কোনো হাত আছে কি না অবশ্যই তা সরকারি দল খুঁজে বের করবেন। তবে সিটি কর্পোরেশনের প্রেস বিফিং-এ কাউকে দায়ী না করেই বলা হয়েছে রাজধানীতে ভয়াবহ ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাসে আক্রান্ত সাত মাসের শিশু ডলির সন্ধান পাওয়া গেছে। এর ফলে ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করার পরিকল্পনায় বাধা পড়লো। বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য দেশের কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে গোলটেবিল বৈঠক বা সমঝোতার প্রয়োজন ছিলো না। দরকার ছিলো শুধুমাত্র উদ্যোগ গ্রহণের। এই উদ্যোগে কেউ বাধা প্রদান করেছে বা করতে পারে এরকম সম্ভাবনা কখনোই ছিলো না বরঞ্চ একজন মেধাবী ছাত্রকে পোলিওমুক্ত করার জন্য গোটা দেশের জনগণ সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। তবুও সরকার এই কর্মসূচিতে ব্যর্থ হয়েছে কেন? আসলে সরকার তার সকল উদ্যোগ আয়োজন শুধুমাত্র প্রতিপক্ষ নিধনের জন্য নিয়োজিত রাখার কারণেই অন্য কোনো দিকে খেয়াল করার সুযোগ পাচ্ছে না। বাংলাদেশ পোলিওমুক্ত হোক এই আকাঙ্ক্ষা দেশের সকল নাগরিকের থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হয়তো সেদিকে নজর নেই। আর সেই কারণেই জনগণের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে দুরারোগ্য পোলিও এবং রাজনৈতিক নির্যাতনের অবসান হোক।

পোলিও প্রতিশেধকমূলক রোগ, তাই জন্মের পরপরই এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। রোগ-বালাই প্রকৃতিদত্ত হলেও এর ওপর মানুষের গবেষণা এবং জ্ঞানলব্ধ শিক্ষাও একেবারে কম নয়। কেউ কেউ হয়তো প্রকৃতির শিক্ষা ভুলে যায়, আবার কেউ কেউ মনেও রাখে। আমরা যখন পোলিওমুক্ত দেশগড়ার সিদ্ধান্তের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি তখন এই রোগের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার অর্থ প্রকৃতির রাজ্যে আমরা আসলেই অসহায়। আর এই সত্যকে যদি আমরা জীবনের প্রয়োজনে স্মরণ করি তাহলে বলতেই হবে, মানুষ পরিকল্পনা করতে পারে কিন্তু বাস্তবায়নের অধিকার তার নেই।

আট

একটি পুরনো গল্প মনে পড়ে গেলো। এক ক্রেতা দোকানে গিয়ে মালামাল ক্রয় করার পর বিক্রেতাকে দশ টাকা কম দিতে চাইলে দোকানি জবাব দিলো, টাকা কম না দিয়ে গালে একটা থাপ্পড় মেরে যান। কথা না বাড়িয়ে বিক্রেতা তার মালামাল ক্রেতার হাতে তুলে দিলে ক্রেতা নির্ধারিত মালামাল বুঝে নিয়ে বিক্রেতার গালে একটা কষে থাপ্পড় বসিয়ে দিলো। ব্যাস, ঘটনা নতুন মোড় নিলো। আশপাশের দোকানিরা ভিড় জমালো, অন্যেরাও মুখ খুললো। ক্রেতা নির্বিকার। শেষমেশ সকলের মুখের শব্দ বন্ধ হয়ে গেলো। দোকানিও নীরব-নিথর হয়ে গেলো। পরিস্থিতি শান্ত বিবেচনা করে ক্রেতা নিরাপদে স্থান ত্যাগ করলো। পাঠক পরিস্থিতিটি অনুমান করুন। সমাজের সর্বত্র যদি এ অবস্থা চলে বা চলতে

www.pathagar.com

থাকে তাহলে কি দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়।

পুরনো এই গল্প মনে পড়ে গেলো সাম্প্রতিকালের বাংলাদেশের দুটি আলোচিত ঘটনার সূত্র ধরে। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে অমিতের কথা। ওয়াইল্ড পোলিও রোগে আক্রান্ত অমিতের জীবন বাঁচাবার জন্য দেশবাসীর মনে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিলো। যার যা সম্ভব তাই দিয়ে অমিতকে সাহায্য করেছিলো। সাথে সাথে সরকারের প্রশাসন, মন্ত্রীসহ প্রায় সকলেই অমিতের জন্য কিছু করা যায় কি না তার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলো। পরিণতিতে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ দুর্লভ চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে অমিত তার শ্বাসপ্রণালী স্বাভাবিক করলো। অমিতের সফল অস্ত্রোপাচরের পর একজন ডাক্তার অমিতকে অপরেশনের ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা স্থানীয় একটি দৈনিকে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, আমাদের জন্য এই অভিজ্ঞতা নতুন। অমিতের শ্বাসপ্রণালী স্বাভাবিক থাকলেও সারাজীবনই তাকে হুইল চেয়ারে কাটাতে হবে। পোলিও রোগের আক্রমণের ক্ষত হয়তো কোনোদিনই তার জীবন থেকে কাটবে না। ডাক্তারের এই বক্তব্যের পর অমিতের বিষয়টি গুরুতর আকার ধারণ করেছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। লাখ লাখ টাকা খরচ করে যে অমিতকে কৃত্রিমভাবে বাঁচাবার চেষ্টা করা হলো সে আসলে যদি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে না পারে তাহলে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটবে কি না বলা মুশকিল। সর্বশেষ অমিতকে বাঁচাবার জন্য দোয়াদূরত পড়ানো হচ্ছে–১৪ জানুয়ারি ২০০২ যদিও আধুনিক বিশ্বে প্রায় সকলেই বিজ্ঞানী হকিং-এর কথা জানেন যিনি, সর্বদিক থেকে অচল হওয়া সত্ত্বেও চলমান বিশ্বে বিজ্ঞানকে এক নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছেন।

অন্য গল্পটিও আমাদের সকলের জানা। গল্পের নায়িকা জরিনা। কোনো সুন্দরী রূপকথার জরিনা সে নয়। একেবারে সাধারণ এক জরিনা। মাত্র সেদিন জরিনা তার খোয়া যাওয়া কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করলো। ভাগ্যবিড়ম্বিত জরিনা সুপ্রসন্ন ভাগ্যের আশায় মধ্যপ্রাচ্যে অমানবিক কঠোর পরিশ্রম করে যে দুপয়সা সঞ্চয় করেছিলো দেশের মাটিতে পা দেবার সাথে সাথে জিয়া বিমানবন্দরে সংঘবদ্ধ চোর ডাকাতরা কৌশলে তা ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, জরিনার বাড়ি যাবার ভাড়াও তার হাতে ছিলো না। হয়তো কারো পরামর্শে অথবা নিজের বিবেকতাড়িত হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে এসে সাংবাদিকদের কাছে আকুতি-মিনতি করার পর তার দুঃখের বারমাসি ছাপা হলে, সেই সুবাদে ওমান এয়ারলাইন্স এবং বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে তাকে সত্তর হাজার টাকা দিয়েছে। টাকা পেয়ে জরিনা সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছে, আল্লাহর কাছে সে সাংবাদিকদের জন্য দোয়া করবে। জানি না আল্লাহ জরিনার এই দোয়া কবুল করেছেন কি না অথবা করবেন কিনা। তবে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা এখন ভালো নেই। সরকারের সমর্থক অথবা সরকারবিরোধী যে মতের কথাই বলা যাক না কেন কেউ ভালো নাই। সরকারবিরোধী মতের সাংবাদিকদের অবস্থা কি তা তো দেখাই যাচ্ছে। একটার পর একটা সংবাদপত্রের ওপর চলছে হামলা-মামলা। শুধু সংবাদপত্রের ওপরই নয় বিরোধীমতের পত্রিকায় কাজ করা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও চলছে নানা অত্যাচার। এমনকি হত্যা মামলা পর্যন্ত ছাপানো হচ্ছে। সুতরাং পাঠক, জনগণ অথবা বিশ্বকে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সরকারবিরোধী সাংবাদিকরা কেমন আছে। আর সরকারপন্থী সাংবাদিকদের অবস্থা একটু ভিন্ন রকম। বর্তমানে এমন অনেকেই সাংবাদিকতার খাতায় সরকারি আনুকূল্যে বড় বড় পোস্ট দখল করে আছেন যারা কখনোই হয়তো এ পেশায়

www.pathagar.com

কোনো দায়িত্বে ছিলেন না। এমন অনেকে রয়েছেন, যাদের নিয়োগ এবং বেতনভাতা সরকারি আইনে কভার না করলেও ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে চাকরির নামে মাসোহারা গ্রহণ করছেন। সরকারি দলের কোনো কোনো সাংবাদিক বলে থাকেন এ সব তো চাকরি নয়, সম্মানী প্রদান করা হচ্ছে। তবে এ অবস্থা যাদের জন্য নয়, তারা ভিন্ন কথা বলছেন। সরকারের সমর্থক এমন পত্রপত্রিকা রয়েছে যেখানে সাংবাদিকরা নাকি ভৃত্যের চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছেন। সম্প্রতি সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সরকারি সাংবাদিক দলের এক নেতা তো সরকারের রাজনৈতিক কর্মসূচির সমর্থক অধিক প্রচারিত কোনো কাগজের নাম ধরে বলেই ফেললেন, 'দেখে নেবো'। আসলে সাংবাদিকরা এখন ভালো নেই, না থাকার প্রধান কারণ দেশে গণতন্ত্রের অবস্থা ভালো নয়। যে ভাবে ল্যাংড়া-খোঁড়া হয়ে গণতন্ত্র কোমরভাঙ্গা অবস্থায় চলছে, সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের অবস্থাও তেমনি। এবং এটাই হওয়া স্বাভাবিক। গণতন্ত্র কেমন চলছে, তা বুঝতে হলে বিরোধী দল এবং সংবাদপত্রের চেহারাটাই প্রধান দর্পণ। তবে আমাদের দেশে বর্তমানে গণতন্ত্রের এমন প্র্যাকটিস চলছে যা দেখে মনে হয়, সরকারি দলের নির্যাতনে কতজন বিরোধী দলের নেতাকর্মী নিহত হলো এবং কতটা সংবাদপত্র ঘায়েল হলো, সেটিই যেন বড় কথা। পরিস্থিতি এমন যে গণতন্ত্র যেন স্বৈরাচারের চেয়েও ভয়ঙ্কর কোনো কিছু।

এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা যদি গণতন্ত্রবিরোধী না হয়ে দেশের বিরাজমান নৈরাজ্য ও রাহাজানিবিরোধী হতো তাহলে হয়তো দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হতো। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লাগেজ যখন বিমানবন্দর থেকে হারিয়ে যায়, তখন নিশ্চয়ই সরকারকে বুঝিয়ে দেবার দরকার নেই যে, দেশ সংঘবদ্ধ চোর-ডাকাতে ভরে গেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনেক বড় বড় ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত এবং অনেক বিষয় নিয়ে নানা কথায় সময় কাটাবার ফলে হয়তো এই সব চোর-ডাকাতদের নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছেন না। অথবা হয়তো, এমন হতে পারে যে, চোর-ডাকাতদের হয়তো তিনি চিনি ফেলেছেন কিন্তু নানা কারণে মন্তব্য করছেন না। সরকারি দলের অন্যতম সন্ত্রাসী মুরগি মিলনের নিহত হবার পর প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছিলো, বিমানবন্দরে চোরাচালানির সবচেয়ে সংঘটিত দলের নেতৃত্ব দিতো মুরগি মিলন। সে ছিলো সরকারি দলের এক যুবনেতা। তার মৃত্যুর পর ঐ রাজ্যে কে প্রবেশ করেছে তা জানা যায়নি, তবে জরিনার ঘটনার পর সরকার কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যা আলোচিত হতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার নাকি লাগেজ আনলোডিং এলাকায় বিশেষ ক্যামেরা এবং বিশেষ গোয়েন্দা নজরদারকির ব্যবস্থা করেছেন। ইতিমধ্যে জরিনার ঘটনায় অভিযুক্ত করে কয়েকজনকে নাকি দোষীও সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ জরিনার ঘটনার পর সাংবাদিকরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে এসব ব্যাপার নিয়ে কথা বললে কোনো কোনো কর্মকর্তা এমন ভাব দেখিয়েছেন যে, এসব ঘটনার ক্লু খুঁজে বের করার মতো সাধ্য ও যোগ্যতা কোনোটাই তাদের নেই। ব্যাপারটা যদি সেরকমই হতো তাহলে নেই বরং এরশাদ সাহেবের সাথে যারা দুর্নীতির বাহুবন্ধনে আবদ্ধ ছিলো তাদেরই খুশি হবার কথা বেশি। বেগম জিয়া যে খুশি হবে না তার প্রমাণ এর আগের বার যখন এরশাদ সাহেবকে গ্রেফতারের চেষ্টা হয়েছিলো তখন বেগম জিয়া এবং এরশাদ সাহেবের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো। সুতরাং বলা যায় আন্দোলনের প্রধান দল হিসাবে বিএনপি এবং বিএনপি নেত্রী বেগম জিয়ার জন্য বর্তমান সিদ্ধান্ত একটি দুঃসংবাদ। রাজনৈতিক হিসেব বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকাশ্য জনসভায় যেভাবে

www.pathagar.com

কবিতার ছন্দে এরশাদ সাহেবকে জেলে পাঠাবার কথা বলেছিলেন, বর্তমান সিদ্ধান্তে তার মনোবাসনাই পূর্ণ হয়েছে এবং সেই খুশির খবরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন ঐক্যমতের সরকারের মন্ত্রী সম্পাদিত কাগজের মাধ্যমে। আসলে খুশিটা ঐক্যমতের ঐ দুই দলেরই। এ কথা যদি আগবাড়িয়া বলা বলে মনে করা হয়, তাহলে বলতে হবে সবচেয়ে বেশি খুশি হওয়ার কথা মঞ্জু সাহেবদের। কারণ, এরশাদ সাহেব এখন তাদেরই প্রধান টার্গেট। আর সে কারণেই নিজের খুশি আরো দুএকজনের সাথে ভাগাভাগি করার জন্যই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর খুশির খবর ছেপেছেন। তবে এই ঘটনা জোটের ওপর তেমন কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে. ২৩ নভেম্বরের চারদলীয় সমাবেশে যেখানে এরশাদ সাহেবের বক্তৃতা করার কথা ছিলো সেখানে বক্তৃতা করেছেন রওশন এরশাদ। এমনি জোটের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। বর্তমান সরকারের আঁতাতকারী এবং এরশাদ সাহেবের সরকারের সহায়তাদানকারীরা যদি নিজেদের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করে নেন তাতে অন্যদের বলার কিছু নেই। তবে আপত্তি এইখানে যে, নিজের আনন্দ অন্যের নামে চালানোর কৌশল সুস্থ রাজনীতি সম্পন্ন হবার কথা নয়।

নয়

বাংলা কাব্যে ছন্দের অপব্যবহার আলাপ করতে গিয়ে অনেকে 'রাস্তাটি সরু/আমরা দু'ভাই গরু' লাইন দু'টির উল্লেখ করে থাকেন। মিলের দিক থেকে কোনো সমস্যা না থাকলেও অর্থের সমস্যা আছে। কবিতার খাতিরে কবিদের শব্দ ব্যবহারের ব্যাপক স্বাধীনতা থাকলেও সম্ভবত কোনো কবিই এই ধরনের মিলাত্মক শব্দ ব্যবহার করে কোনো চরণ রচনা করবেন না। সেদিক থেকে মিলবদ্ধ চরণ দুটি অর্থহীন। সাহিত্যে এ ধরনের প্রয়োগ না থাকলেও রাজনৈতিক অঙ্গনে এরকম মিলের লক্ষণ রয়েছেন। চলমান রাজনীতিতে জোটবদ্ধ আন্দোলনে বর্তমান পর্যায়ে কিছু নতুন উপসর্গের জন্ম হয়েছে। জোটের অন্যতম শরিক দল জাতীয় পার্টি প্রধান সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচ. এম. এরশাদের দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা নতুন পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। মামলা তাব বিরুদ্ধে পুরনো। যখন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন তখনকার দুর্নীতি নিয়ে মামলা হয়েছিলো বিএনপি'র আমলে। প্রেসিডেন্ট এরশাদের শাসনামলের বিরুদ্ধে যেসব কারণে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিলো তার মধ্যে অন্যতম ছিলো দুর্নীতি। রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐ সময়ে যারা সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলেন তাদের মধ্যে দলগতভাবে প্রধান ভূমিকা ছিলো বিএনপির। এরশাদ সাহেবের ন' বছরের শাসনামলের পুরো সময়টাই বিরোধিতা করেছে বিএনপি। ১৯৮২ সাল থেকে শুরু করা আন্দোলনের এক পর্যায়ে যুগপৎ আন্দোলন ভেঙে ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে গিয়েছিলো আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রশক্তিগণ। আবার দু'বছর পর সরকারে থাকার সাধ পূরণ হওয়ার পর '৮৮ সালে আন্দোলনে ফিরে আসে। পরবর্তী সময়গুলোতে বিএনপির সাথে আন্দোলনে শরিক থেকে ৯১-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে নির্বাচনে বিজয়ী হলে সরকারবিরোধী আন্দোলনে জাপা ও আওয়ামী লীগ কাছাকাছি অবস্থান নেয়। ৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় জাপা তাদের সমর্থন দেয়। সাথে থাকে জাসদ। এই তিন শক্তি অর্থাৎ আওয়ামী লীগ-জাতীয় পার্টি এবং জাসদ মিলেই এরশাদ সাহেবের নয় বছরের শাসন পরিচালিত হয়েছিলো। ঘুরিয়ে দেখলে এভাবে বলা যায় যে,

www.pathagar.com

এরশাদ সাহেব যখন সামরিক শাসন দেন তার পর সর্বপ্রথম আন্দোলনে নামে এদেশের ছাত্রসমাজ। ডাকসুর নেতৃত্বে পরিচালিত সেই আন্দোলনে গোটা দেশ জেগে উঠলেও ডাকসু-র তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন বাবলু এরশাদ সরকারের সাথে হাত মিলান। তার সভাপতি আকতারুজ্জামান বর্তমানে আওয়ামী লীগের এমপি। জনাব বাবলু জাসদ-বাসদ হয়ে যোগ দিয়েছিলেন জাপায়। এরশাদ সাহেবের সাথে পরবর্তীকালে জাসদের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম আসম আবদুর রব জুটেছিলেন অনুগত বিরোধী দল হিসাবে। রাজনৈতিক ইতিহাসে সম্ভবত তিনি একমাত্র বিরোধীদলীয় নেতা যিনি গণআন্দোলনে সরকারের পতনের পর নিজেকে আত্মগোপন করে রেখেছিলেন। এরশাদ সাহেবের সাথে জাসদের অনেক নেতাই সেদিন যোগ দিয়ে জাপায় সক্রিয় রাজনীতি শুরু করেছিলেন। জাসদের এই ঐক্য প্রক্রিয়ার পেছনে যে বিশেষ রাজনৈতিক সূত্র কাজ করেছে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। '৭৫ সালের ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সিপাহি-জনতার বিপ্লবে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নবরূপে ক্ষমতাসীন হন। ঠিক তখন কর্নেল তাহেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে—এই অভিযোগ তুলে জাসদের যে অংশ প্রেসিডেন্ট জিয়া বিরোধী অবস্থান নেন তারাই এরশাদ সাহেবের সাথে হাত মিলান। কারণ প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন বিএনপির ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট সাত্তারের কাছ থেকে। এরশাদ সাহেবের সাথে শুধু জাসদই নয় এরকম আরো অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তি নানা ইকুয়েশনে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। যার ফলে এরশাদ সাহেবের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগসাজশকারীদের সাথে জনগণের ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রকৃত অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, সরকারি পক্ষ ছিলো গণতন্ত্রবিরোধী এবং বিরোধী পক্ষ ছিলো গণতন্ত্রপন্থী। গণতনেন্ত্রর পক্ষ-বিপক্ষ লড়াইয়ে বিএনপি তথা গণতন্ত্রপন্থীরাই বিজয়ী হয়। কেউ কেউ বলে থাকেন, রাজনীতিতে নাকি শেষ কথা বলে কিছু নেই। যারা রাজনীতি করেন তাদের মূল লক্ষ্য যদি দেশ ও জনপ্রেম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই জনগণের প্রতি ভালোবাসাই শেষ কথা হওয়া উচিত। রাজনীতিবিদরাই ঠিক করে নেবেন তারা আসলে কি চান। চলমান রাজনীতিতে যেটুকু পরিবর্তন এসেছে তাহলো চারদলীয় জোট এককভাবে নির্বাচনের অঙ্গীকার করেছে। এই জোটের অন্যতম শরিক জাতীয় পার্টি। আন্দোলনে জাতীয় পার্টির অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে জাপায় ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে। জাপা প্রতিষ্ঠাতা এরশাদ সাহেব এবং জিয়াউর রহমানের আমলে পিপিআর-এ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে দুটি জাপা গঠিত হয়। এর মধ্যে দ্বিতীয় অংশ সরকারের সাথে কথিত মতৈক্যে আছে। মন্ত্রী পদে বহাল রয়েছেন এই অংশের জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। এরশাদ সাহেবের নয় বছরের শাসনামলের অন্য মিত্র জাসদ এখনো বর্তমান সরকারের সাথে মিলেমিশেই হুমকি-ধামকি দিয়ে যাচ্ছে। এরশাদ সাহেবের চারদলীয় জোটে অংশগ্রহণ নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকলেও জোটের প্রতি তার বর্তমান অঙ্গীকারের প্রশ্নই সর্বাধিক আলোচিত। তিনি জোটবদ্ধ নির্বাচনের ব্যাপারে তার একাত্মতাও দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন। সম্ভবত এখানেই অন্যদের আপত্তি। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই আপত্তির প্রধান ভাগিদার যে মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঐক্যমতের সরকারের প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন, এরশাদ জেলে যাবে। মামলার রায়েও তা প্রমাণিত হয়েছে। এরশাদ সাহেব জেলে গেছেন, আগামী পাঁচ বছর তার নির্বাচন প্রশ্নেও নানা জটিলতার জন্ম হয়েছে। কিন্তু এতে বেগম জিয়ার খুশি হবার কারণ হয়েছে বলে মনে না

www.pathagar.com

হলেও সরকারি মহল থেকে এই কথাই বলা হচ্ছে। ঐক্যমতের মন্ত্রী সম্পাদিত কাগজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সাক্ষাৎকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এরশাদ সাহেবের শাস্তিতে বেগম জিয়াই নাকি সবচেয়ে খুশি। সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ যখন তার পুরনো মিত্রদের ছেড়ে রাজনীতির গণতান্ত্রিক ধারার সাথে যুক্ত হয়েছেন, দেশপ্রেমিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছেন, তখন তার দুঃসংবাদে জাতীয়তাবাদীদের খুশি হবার কারণ নেই। বিএনপির আমলে যে মামলা হয়েছিলো সেই মামলার রায় প্রকাশিত হওয়াতে বেগম জিয়ার খুশির কোনো কারণ, বিশ্বের বহু দেশে মাটির নিচ দিয়ে ডবল টিউব লাইন এবং সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে রেল যাতায়াতের মতো ব্যবস্থা সন্দেহাতীতভাবে সফলতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই যিনি দোষী বলে সাব্যস্ত হবেন তাকে সনাক্ত করা দরকার। যদি কাউকেই এরকমভাবে দোষী হিসাবে না পাওয়া যায় তাহলে অন্তত সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এই মর্মে একটি প্রেসরিলিজ ইস্যু করা প্রয়োজন যে, পল্টন এলাকায় বিরোধী দলের বিশাল বিশাল সমাবেশ করার কারণে জনতার পদভারে আন্ডারপাস ফেটে গেছে। যানজট নিয়ে আলোচনা উঠলেই ইদানীং আন্ডারপাসের কথা ওঠে। কিন্তু যানজট নিরসনের পূর্ণ পরিকল্পনার আওতায় আন্ডারপাস নির্মাণের দেড় বছরের মধ্যেই যদি গোলযোগ দেখা দেয় তাহলে যানজট নিরসনে ভবিষ্যতে যে সব পরিকল্পনা চালু হতে পারে তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি কোথায়? অন্য দিকে নগরীর দ্বিতীয় আন্ডারপাসটিতে যদি ফাটল দেখা দেয় তাহলে নগর জীবনের অবস্থা কি দাঁড়াবে তা সম্ভবত ভাবতে গা শিউরে ওঠে।

দেশের কর্তাব্যক্তিরা যেনতেনভাবেই যারতার সাথে গরম দেখাচ্ছেন। তাদের এ গরমভাবের কারণে এবং রক্তচক্ষুর ভয়ে দেশের সন্ত্রাসীরা সন্ত্রস্ত না হয়ে আশ্বস্ত হলেও গণতন্ত্র নিধনে সরকারি বাহিনী কিন্তু বেশ তৎপর। পরিস্থিতির আলোকে এ কথাই সত্য যে, শুধু গণতন্ত্র নিধনের পরিকল্পনা না করে সংবিধান ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করাও সরকারের দায়িত্ব ছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই। তাই জনগণের কোটি কোটি টাকা যারা অপব্যয় বা অপচয় করেছেন তাদের মনে রাখা উচিত অবশ্যই এজন্য জবাবদিহি করতে হবে।

দশ

ফার্মগেটের পার্কের পাশেই আমাদের পাবলিক ক্যারিয়ারটি দাঁড়িয়ে পড়লো। সামনে ট্রাফিক সিগন্যাল। আমাদের গাড়ির সামনে এবং পেছনে হরেক কিসিমের যানবাহনের বিরাট মিছিল। ক্লান্ত ও বিরক্তিকর মন নিয়ে ক্যারিয়ারের বাইরে তাকিয়ে দেখলাম সবজিভর্তি ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে এক ভদ্রলোক, সম্ভবত সবজির মালিক হবেন, ঘনঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন আর ট্রাফিক পুলিশের হাত ধরে কাকুতি-মিনতি করছেন। এরপর পার্কের ভেতর থেকে কেউ একজন বেরিয়ে এলো এবং সবজির মালিক তার হাতে কিছু গুঁজে দিলেন। অতঃপর সিগন্যাল ডাউন হলে সবজির ভ্যান রওয়ানা দিলো। এই নাটকের আগে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিক সার্জেন্টের সাথে ট্রাফিক পুলিশ ইশারায় কিছু বললো।

এই দৃশ্যে মনটা বিষিয়ে গেলো। যদিও খুব ভালো একটা মন নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে ছিলাম, সে দাবি করা যাবে না, অন্য দিকে এই দৃশ্যও নতুন কিছু নয়। তবু খারাপ লাগলো

www.pathagar.com

এই কারণে যে, আইনের সাথে সঙ্গতিহীন এরূপ দৃশ্য দেখে নিজেকে একটি স্বাধীন দেশের অসহায় নাগরিক বলে মনে হলো। শুধু সবজিওয়ালা কেনো, প্রতিদিন যারা পাবলিক ক্যারিয়ারে যাতায়াত করেন তারা প্রায় সবাই কোনো না কোনো স্পটে এরকম দৃশ্য অবলোকন করে থাকেন। পুলিশ সার্জেন্ট পাবলিক ক্যারিয়ার ধরছেন, ছাড়ছেন আর এর মাঝে একশ' থেকে দেড়শ' টাকায় ফয়সালা হচ্ছে। পাবলিক ক্যারিয়ারের সাথে সার্জেন্টদের আচরণের বিষয় নিয়ে আলাপ করেছিলাম সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের সাথে। পাবলিক ক্যারিয়ারের কয়েকজন চালককে এ নিয়ে প্রশ্ন করলে তারা কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। তাদের প্রায় সকলেই বলেছেন, পয়সা না দিয়ে রাস্তায় গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। তবে কেন তারা পয়সা দেন এ বিষয়ে সন্তোষজনক কোনো জবাব তারা দেননি অথবা গাড়ি এবং চালকের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক আছে কি না এ প্রশ্নেরও সন্দেহাতীত কোনো জবাব তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনের কারণেই তারা মামলা করেন। গাড়ির চালকপক্ষ পুলিশকে ঘুষ দেয়ার কথা স্বীকার করলেও পুলিশরা তা সত্য বলে মানেন না। এ প্রসঙ্গে হোক যাত্রীদের বক্তব্য অন্য যায়গায়। যারা পয়সা দিয়ে পাবলিক ক্যারিয়ারে যাতায়াত করেন, তাদের বক্তব্য হচ্ছে, যদি কাগজপত্র ঠিকঠাক না থাকে তাহলে প্রতিদিন এই হয়রানি কেন? অথবা ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি প্রতিদিন রাস্তায় চলছে কিভাবে? আসলে এ একধরনের আঁতাত এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের বখরা আদায়ের ব্যবস্থা। শুধু যে রাস্তায় যানবাহন নিয়ে এই বখরা আদায়ের ব্যবস্থা আছে তা নয়। দেশের সর্বক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কয়েকদিন আগে সরকারের রাজনৈতিক কর্মসূচির সমর্থক একটি দৈনিক ভারতীয় দ্বিচক্রযানের চোরাচালান নিয়ে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, বাংলাদেশের বাজারে চালু থাকা যে সব ভারতীয় দ্বিচক্রযান ৬০ থেকে ৬৫ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে সেই সব গাড়িই চোরাই পথে এসে সীমান্ত অঞ্চলে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আবার গাড়ি চোরাই হলেও নতুন গাড়ির মতোই রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুধু নতুন গাড়ি চোরাই হচ্ছে না বরং চোরাই গাড়িও এ পদ্ধতিতে হরদম বিক্রি ও রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে। যদিও রিপোর্টে একটি বিশেষ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, চোরাই গাড়ির রেজিস্ট্রেশনে যে এলাকার উল্লেখ থাকে গাড়ি সে এলাকায় চলে না। কথা যাই হোক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা চোরেরা যেভাবে সমাজে বিচরণ করছে তা দেখে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, তাদের এই নিরাপদ বিচরণ আর কতোকাল? রিপোর্ট উল্লেখ না থাকলেও এ কথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, প্রকাশ্য চোরদের সাথে ক্ষমতার কোথাও না কোথাও একটা সম্পর্ক রয়েছে। নিশ্চয় তারা নিয়মিত বখরা পান। দেশের বর্তমান অর্থনীতিতে এই চোরদের অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপটই সবচেয়ে বেশি। সীমান্তের ওপারে যারা রয়েছে, তাদের এজেন্ট রয়েছে এ পারে। এদের চেনা যায় কিন্তু ধরা যায় না। এরা ওঁৎ পেতে থাকে কিন্তু কেউ এদের দেখে না। এই তো সেদিন রমযানের আগে হঠাৎ করে বাজারে পেঁয়াজের দামে আগুন লাগলো। অমনি ভারতীয় পেঁয়াজের অবাধ আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। পেঁয়াজের আমদানি হলেও দামের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। বাংলাদেশের অনেক ব্যবসায়ীই প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন যে, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের চোরাচালান নীতির কারণে অন্য কোনো দেশের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব। দেখা যায়, এক টাকার মাল যদি আসে বৈধ পথে তিন টাকার আসে অবৈধ পথে।

www.pathagar.com

ফলে অন্য দেশের সাথে বৈধ চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। ভারতীয় বেনিয়ারা এই কাজটি এতোটাই সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করেন যে, গোপন তথ্য কখনোই প্রকাশিত হয় না। কারণ, এর মাঝখানে রয়েছে মধ্যস্বত্বভোগীদের বখরা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক মন্দাভাব যেখানেই প্রকট হয়ে উঠছে ঠিক সেখানেই ভারতীয় অর্থনৈতির দালালেরা গেড়ে বসেছে। আর এই অর্থনৈতিক দালালরাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্রমান্বয়ে তাদের আসন পাকাপোক্ত করে নিচ্ছে।

অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি যেদিকেই তাকানো যায় না কেন সেখানেই ভারতীয় পুঁজিবাদীদের তল্পিবাহক এই দালাল শ্রেণীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের যানবাহন, মুদ্রণ শিল্প, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন উপাদান থেকে শুরু করে ডানে-বামে যেদিকেই তাকানো যাক না কেন, সেখানেই ভারতীয় পণ্যে সয়লাব। এছাড়াও ভাত, মাছ, তরকারি, ফুল, বাল্ব এমনকি রান্না ঘরের সসপ্যান পর্যন্ত ভারতের পণ্য। ইসলাম-অনইসলাম সকলেই ঝুঁকে পড়ছে ভারতীয় বেনিয়াদের প্ররোচিত এই লুম্পেন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে। কারণ, প্রকাশ্য হালাল কারবারে যে লাভ হয় তাতে ব্যবসায়ীদের ঠাট-বাট রক্ষার কোনো পথ খোলা নেই। আইন-কানুনের নানা কৌশলে অফিশিয়াল মানির প্রায় সবটাই চলে যায় সরকারি খাতে। আর সে কারণেই বাড়তি আয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে অন্যরা।

এই মধ্যস্বত্বাভোগীরা রাজনীতির ক্ষেত্রেও আসন গেড়ে বসে আছে। সভা-সমাবেশ, মিটিং-মিছিল থেকে শুরু করে যেখানেই দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে সেখানেই এই শ্রেণীর পদচারণা। এরা ভিড় জমায়, আসর জমায়, বিচিত্র খেলায় জড়িয়ে যায়। আসলে এরা গোটা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে ব্যস্ত। এদের কারা কখন কার হয়ে খেলে তা বলা মুশকিল। কখনো পক্ষে বা বিপক্ষে এদের পাতানো খেলায় গোটা জাতি এখন বিভ্রান্ত। এরা কখনো পাকিস্তানি ইস্যু কখনো মুক্তিযোদ্ধা ইস্যু অথবা কখনো মৌলবাদের উত্থানের ছুতা ধরে উন্মত্ততা প্রদর্শন করে। প্রধানত সরকারের শীর্ষেই এদের যোগাযোগ। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রায় পুরোটাই দখল করে আছে এই মধ্যস্বত্বাভোগীরা। টিভি খুললেই চোখে পড়ে এদের দাপট। নানা রঙে ও বর্ণে এদের দেখা যায়। আলাদা কোনো পরিচিতি নেই। এদের একটাই কাজ তা হলো বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের বিরোধিতা করা, বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা। হিন্দি চ্যানেলগুলোর কথা বাদ দিয়ে যদি বাংলা স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর কথাই ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে, স্বাধীন বাংলাদেশ সেখানে উপেক্ষিত। উপেক্ষিত, এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনচরণ, বিশ্বাস ও সংস্কৃতি। সম্প্রতি একটি চ্যানেলের নাটকে বোকা বানানো অর্থে টুপি পরানো শব্দকে ব্যবহার করলো পাত্রপাত্রীরা। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা যেখানে টুপি পরে নামাজের জন্য সেখানে টুপি পরানোকে বোকা বানানো অর্থে উল্লেখ করা তাৎপর্যপূর্ণ।

মোট কথা, শুধু রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ বা ট্রাফিক সার্জেন্টদের সাথেই মধ্যস্বত্বাভোগীদের দেখা যায় তা নয়, এরা গোটা দেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমি জুড়ে আছে। সত্যিকার অর্থে এদের ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই মনে হলেও আসলে ভারতীয়দের পক্ষ হয়ে এরাই নিয়ন্ত্রণ করছে দেশকে এবং দেশের প্রভাবশালী মহল ও রাজনীতির শীর্ষব্যক্তিত্বদের। আর সে কারণেই মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে বাস্তবতার এখন কোনো সঙ্গতি নেই। এই মধ্যস্বত্বভোগী লুম্পেন শ্রেণীবিরোধী সংগঠিত আন্দোলন আজ অপরিহার্য।

www.pathagar.com

এগার

ঈদের ছুটিতে বাড়িতে গিয়েছিলাম। অনেক দিন পর বাড়ি যাওয়ায় গ্রামের মুরুব্বী, সমবয়সী ও বয়োকনিষ্টদের সাথে মতবিনিময় হলো। গ্রামে ঈদের জামায়াত শহরের মতো খুব সকালে না হওয়ার কারণে এই সব ঈদের জামাতকে সত্যিকার অর্থেই সামাজিক সমাবেশ বলা যায়। ঈদের নামাজপরবর্তী কোলাকুলির চেয়ে জামাত শুরুর আগের শুভেচ্ছা, মতবিনিময় ও সংক্ষিপ্ত আলাপই অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। ঈদের জামায়াতে ধর্মীয় আলোচনা ছাড়া সমাজের এমন কিছু গুরুতর সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় যার সঙ্গে সমাজের সবাই যুক্ত থাকেন। যেহেতু ঈদের ছুটিতে প্রায় সকলেই বাড়িতে ছুটে আসেন সে কারণে আলোচনাও খানিকটা জমে ওঠে। সে যাই হোক এসব আলোচনা বা সামাজিক বিষয় নিয়ে ভাবনার কোনো অংশ আজকের বিষয়বস্তু নয়। গ্রামের বাড়িতে বসে অন্যদের সাথে কথা বলতে বলতে একটি ভিন্ন প্রসঙ্গ চলে আসে। ঋতু বৈচিত্র্যে এখন শীতকাল। বাংলা বর্ষের পৌষ ও মাঘ দু'মাসকে শীতকাল বলা হলেও শীত সময়টা আসলে অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত জুড়ে থাকে। এই হিসেবে পৌষ মাসের গুরুত্ব শীতের বিবেচনায় অত্যধিক। গ্রামের মানুষ এ মাসটিকে পিঠার মাস বলেই মনে করে। শীতের পিঠা খাওয়ানো যে সব এলাকার রেওয়াজ রয়েছে তারাও এই সময়টিকেই বেছে নেন। বিশেষ করে ধুপি, দুধ চিতই, হাতে কাটা শেমাইসহ নানা ধরনের পিঠার মৌসুম এটি। অনেক কবিও গ্রামের মানুষের এই অনুভূতিকে তাদের কবিতায় উপজীব্য করেছেন।

পিঠার মাসের অন্যতম উপকরণ বা আকর্ষণ হলো খেজুরের রস। যাদের এ রস সম্পর্কে ধারণা আছে তারা সবাই একমত হবেন যে, সত্যি এই রসের কোনো তুলনা হয় না। অভ্যাসগতভাবে গ্রামের মানুষ জানে কখন খেজুর গাছের একটি বিশেষ জায়গা পরিষ্কার করে এই রস সংগ্রহ করতে হবে। প্রকৃতির এই অবদান সত্যিই চমৎকার। যারা সূর্যোদয়ের সকালে শীতের কাঁপুনি খেতে খেতে খেজুরের রস পান করেন তাদের অনুভূতি এখন আর তেমন নেই। কারণ এখনো গ্রামে তেমন কোন শীত পড়েনি। নামমাত্র যেটুকু ঠাণ্ডা ভাব আছে তাকে পৌষের শীত না বলে অগ্রহায়ণের শীতের আমেজ বলাই উত্তম। তবুও শীতের এই আকর্ষণ খেজুরের রস এখনো পাওয়া যায়, অবশ্য তুলনামূলকভাবে কম। কৌতূহলবশত খেজুরের রস কমে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করলাম গাছি ও গাছওয়ালাদের সাথে। দুপক্ষের আলোচনা সমান্তরাল না হলেও একটা জায়গায় মিল রয়েছে তা হলো খেজুরের রস থেকে গুড় তৈরির ব্যাপারটি এখন ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়েছে। গুড়ের উৎপাদন ও বিক্রয় মূল্যের সাথে তাল রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। কিছুকাল আগেও সাধারণত ভূমিহীন বেকার কৃষকেরাই খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত থাকতো। হেমন্তে পাওয়া আমন ধানের পরিত্যক্ত অংশকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে গুড় উৎপাদন করা হতো বিধায় রস থেকে গুড় পর্যন্ত প্রায় সব কিছুই পরিশ্রমের বিনিময়ে সংগ্রহ করা হতো। এতে অর্থের প্রয়োজনীয়তা ছিলো নাম মাত্র। আর সে কারণেই এই বাড়তি আয়ের প্রতি অনেকেরই ঝোঁক এবং প্রতিযোগিতা ছিলো। বর্তমানে সে অবস্থা নেই। এখন গাছওয়ালারাই রস সংগ্রহের তাগিদে গাছিদের পেছনে দৌড়ান। কারণ, খেজুরের রস থেকে গুড় সংগ্রহ করার প্রধান উপাদান জ্বালানি এখন আর বিনে পয়সায় পাওয়া যায় না। কৃষি উৎপাদন যন্ত্রায়নের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ও পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সে

www.pathagar.com

কারণে হেমন্তের নবান্ন উৎসব, আমন ধান এবং জমিতে পরিত্যক্ত জ্বালানি আর নেই। জ্বালানি কিনে গুড় বানাবার মতো অর্থ বা সঙ্গতি যাদের নেই তারা এখন আর গাছি হন না। ব্যাপারটি শুনতে শুনতে মনে পড়ে গেলো অন্য প্রসঙ্গ। ভারত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বহমান ৫৪টি নদীর উজানে বাঁধ দিয়েছে। বাংলাদেশে পানির সংকট দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে মাছের সংকট। আরো মনে পড়ে গেলো কয়েক যুগ আগের কথা। যখন মধ্যপ্রাচ্যের তেল দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গাড়ি চলতো। সে সময় মধ্যপ্রাচ্য সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের কোনো শেষ ছিলো না। পরিণতিতে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণে তারা তৎপর হয়ে উঠলো। সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দুনিয়ার পর্যায়ক্রমিক নিয়ন্ত্রণ এতোটাই প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী হলো যে, বর্তমান সময় পর্যন্ত তা বহাল আছে। পাশ্চাত্য দুনিয়ার এই স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ন্ত্রণ রক্ষার বিনিময়ে মধ্যপ্রাচ্যের পদলেহী দেশসমূহ একেবারেই কিছু পাচ্ছে না তা নয়। তবে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী চেতনাকে ভোঁতা রাখার জন্য পশ্চিমা দুনিয়ার তৎপরতাই প্রধান। শুধু মধ্যপ্রাচ্যের তেল নয়, বরং দেখা গেলো ইরাকের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে সেখানাকার শিশুরা না খেয়ে মরছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানে সভ্যতাবিধ্বংসী যে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিলো এখনো তার সূত্র ধরে জাপানে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে। মোট কথা পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু ঘটছে যার সাথে ভুক্তভোগীর কোনো সম্পর্ক নেই। যে ঘটনার সে শিকার, সে নিজেও জানে না তার আদৌ কোনো অপরাধ আছে কি না অথবা কি কারণে সে ঘটনার শিকারে পরিণত হলো। বর্তমান বিশ্বের অবস্থাটাই এরকম। তবে ঘটনার সূত্র ধরে এগুলে অবশ্যই এর সমাধান পাওয়া সম্ভব। ধরা যাক, বাংলাদেশের পানি সমস্যার কথা। ২০ বছর পরিকল্পনা করে ভারত যখন ফারাক্কা বাঁধ চালু করলো তখনো এদেশের জনগণ ফারাক্কা বাঁধের প্রতিবাদে ঝড় তুলে বলেছিলো, ফারাক্কার পরিণাম বাংলা হবে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশের মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাঁধ, ফারাক্কা বাঁধ। কিন্তু সে সময়ের সরকারের অপরিণামদর্শিতা, অক্ষমতা, অদক্ষতা এই বাঁধের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়েছে কি না অথবা বন্ধুর বিরুদ্ধে কিছু না বলার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিষ পান করেছে কি না বলা যাবে না। তবুও এইটুকু বলা যায় যদি সেই সময়কার সরকার দেশপ্রেমিক চিন্তা করতেন তাহলে অন্তত ফারাক্কার বিকল্প গঙ্গা বাঁধ নিয়ে কার্যকর আলোচনা করতেন। অন্তত তা না হলেও জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা করতে পারতেন। সুতরাং বলা যায় যে, সমস্যার গোড়ার দিকে হাঁটলে কিছুটা অগ্রগতি হয়তো সম্ভব হতো।

খেজুর রস নিয়ে আলোচনা করতে করতে ফিরে এলাম বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে। রাজনীতি, অর্থনীতি সব কিছুই এখন পঙ্গু হয়ে পড়েছে। সরকারি ভাষায় অর্থনীতিকে যতোই চাঙ্গা বলে অভিহিত করা হোক না কেন যেভাবে ফকির, মিসকিন আর মস্তানের ছড়াছড়ি তা থেকে যে কেউ অনুমান করত পারেন যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। আর রাজনীতির প্রসঙ্গ নিয়ে যদি আলোচনা করা যায় তাহলে তো কথাই নেই। একদিকে চলছে সরকারি সন্ত্রাস অন্য দিকে বিরোধী দলের নিষ্ক্রিয়তা। বিরোধী দলের নিষ্ক্রিয়তার প্রসঙ্গে সে দিন তথ্যমন্ত্রী হুংকার ছেড়ে বললেন, ঈদের পরে আন্দোলনের হুমকি পুরনো বাতুলতা। তথ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য ভিন্ন ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, সরকার পক্ষ যদি বিরোধী দলের আন্দোলনকে নিজেদের পরিকল্পিত অপকর্মের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়ে থাকেন, তাহলে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি অবশ্যই বিবেচনার সাথে নির্ধারণ

www.pathagar.com

করতে হবে। এদিকে সরকারি মহলে কারো কারো এরকম ধারণাও রয়েছে যে, মুজিব হত্যা মামলার আসামিদের ফাঁসি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে না। তাদের মতে এই লক্ষ্য অর্জনেই সরকার কাজ করছে।

রাজনীতির মারপ্যাঁচ সম্পর্কে সকলেই সমভাবে অভিজ্ঞ নন। রাজনীতি রাজনীতিবিদদের ব্যাপার। কারণ তারাই ক্ষমতায় যান অথবা ক্ষমতাচ্যুত হন। সেদিক থেকে রাজনীতি সম্পর্কে তাদেরই স্পর্শকাতরতা বেশি। তবে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। কারণ আমাদের মতো দেশের জনগণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অধিক না থাকার কারণে তারা সবসময় খুঁজে বের করতে পারেন না যে, ঠিক কি কারণে কি হচ্ছে। কোনটা স্বাধীনতার পক্ষে কোনটা বিপক্ষে এ কথা বুঝতেও কখনো কখনো সময় লাগে। এই বুঝ না বুঝের দায়িত্ব হচ্ছে রাজনীতিক দল ও নেতানেত্রীদের। তবে এই যে, কৃষি উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে খেজুরের গুড় উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে সেটা হয়তো মেনে নেওয়া যায় কিন্তু অপতৎপরতা বৃদ্ধির কারণে রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকলে তাকে অবশ্যই মেনে নেওয়া যায় না।

বার

ভারতীয় জিটিভি নেটওয়ার্কের বাংলা চ্যানেল আলফা বাংলায় কবিতার অনুষ্ঠান শুনছিলাম। এক পার্টিসিপেন্ট কবিতা পাঠ করতে গিয়ে বললেন, 'বাবা তুমি জানো না তোমার জন্মভূমিতে এখন স্বাধীন বাংলাদেশ।' ভারতীয় কবির কবিতায় স্বাধীন বাংলাদেশ উঠে এসেছে শুনে ভালো লাগলো এই কারণে যে, বাংলাদেশ সম্পর্কে সেখানকার কোনো কোনো কবি অন্তত ভালো ধারণা পোষণ করেন। বছর কয়েক আগে ভারতের পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে নানা আগ্রহের মধ্যে বইপড়াও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। হোটেল থেকে সময় ও পয়সা খরচ করে কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের দোকানগুলোতে গিয়েছিলাম বাংলাদেশ সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার লেখকদের লেখা সংগ্রহ করতে। বইপাড়ার প্রায় সবগুলো দোকানেই খোঁজ নিয়ে দেখলাম কেউ বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো বইয়ের সন্ধান দিতে পারছে না। এমনকি পুঁথিঘরের দোকানেও বাংলাদেশ নিয়ে কোনো বই নেই। পুঁথিঘরের কথা উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, বাংলাদেশ টিভি চ্যানেলসহ বিভিন্ন ব্যানারে পুঁথিঘর বইয়ের বড় বাজার দখল করে রেখেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে সব বিক্রেতার কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে লেখা বই কিনতে গিয়েছি তারা ব্রিটিশ ভারতের নানা ইতিহাস গ্রন্থ হাতে তুলে দিয়েছেন। পরিস্থিতি দেখে হতাশ হয়েছি, বিস্মিত হইনি। স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের আগ্রহ না থাকারই কথা। এটাই ঐতিহাসিক বাস্তবতা। এই সত্য এতই নির্মম যে, যতোদিন আমাদের এই সভ্যতা টিকে থাকবে ততোদিনই ইতিহাসের একজন সাধারণ পাঠকও এই কাহিনী পড়ে বিস্মিত ও হতবাক হবেন এই জেনে যে, একই ভাষাভাষী কোনো জনগোষ্ঠী এতোটা হিংসুক ও নীচ হতে পারেন। যে জনগোষ্ঠী ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলো তারাই '৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে এতোটাই সোচ্চার ছিলেন যে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। এই দুটি ঘটনার মধ্যে এতোটা বৈপরীত্যের কারণ শুধুমাত্র সময়ের ব্যবধান নয়। ঐতিহাসিকভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রায় অর্ধশতাব্দীতে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব অনেক বেড়েছে। ব্রিটিশ আনুকূল্যে যে কথিত জমিদার শ্রেণীর জন্ম হয়েছিলো তাদের

www.pathagar.com

অধিকাংশই ছিলো হিন্দু। এই জমিদার শ্রেণী আসলে কোনো শ্রেণী ছিলো না। তারা প্রকৃতপক্ষে কিছু ছিন্নমূল মানুষ। ব্রিটিশ আনুকূল্য করপ্রদানের শর্তে নব্য দেশীয় ইংরেজ সাজার চেষ্টা করেছিলো মাত্র। একসময়কার খুবই সাধারণ নাগরিকরা রাজআনুকূল্যে রাজমনোরঞ্জনে এদেশীয় মুসলমানদের ওপর শুরু করে নির্যাতন-নিপীড়ন। ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের নীতিকে স্বনীতি হিসেবে গ্রহণ করে ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ এই ৪২ বছরে নব্য জমিদার শ্রেণীর নির্যাতন বাংলার দু'অঞ্চলের জনগণের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে নতুন পরিবর্তন সাধিত করে। যদিও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পূর্ববঙ্গ তথা এ অঞ্চলের মুসলমানদের ওপর পশ্চিম বাংলার দাদারা অন্য কারণেও ক্ষিপ্ত ছিলেন। লক্ষণ সেনের বিতাড়নের পর ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের ফলে নির্যাতন ও নিগ্রহ থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে যে সাধারণ বা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মুসলমান হয়েছিলেন, এই কাজটি ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরা সহ্য করতে পারেননি। অনেকে মনে করেন, দল ছোট হয়ে যাওয়ার কারণেই তাদের এই বিরোধিতা। আসলে তা নয়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, শোষক হিন্দুশ্রেণীর শেকল থেকে সাধারণ হিন্দুদের মুক্তি পাবার ঘটনা তারা সহ্য করতে পারলো না, দীর্ঘদিনের অনুগত শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাবার জন্যে। যাদের ঘাড়ে পা রেখে নিজেদের জাত্যাভিমান ও অন্নের সংস্থান করা হতো তারা দলত্যাগী হওয়ায় পুরনো শোষকশ্রেণীর অনেকের ভবিষ্যৎই অন্ধকার হয়ে গেলো। এই কারণেই মুসলমানদের সাথে হিন্দুব্রাহ্মণ্যবাদী শ্রেণীর অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বেরও সূত্রপাত হয়। এই দ্বন্দ্ব ধর্মীয় যুক্তিবুদ্ধির মাধ্যমে এইরূপ পরিগ্রহ করলো যে, হিন্দু-মুসলমান মানেই বৈপরীত্য। তবে দীর্ঘকাল এই ধারণা কোনো কার্যকর রূপ লাভ করতে পারেনি মুসলিম শাসনের কারণে। পলাশীর বিপর্যয়ের পর এদেশে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হওয়ায় তথাকথিত জমিদার শ্রেণী মুসলমানদের ওপর অর্থনৈতিকভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এই প্রতিশোধ এবং পূর্ব থেকে চলে আসা সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি আলাদা বৈশিষ্ট্য লাভ করে। যে কারণে ১৯০৫-এ যারা সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছে তারাই বিভক্ত ভারতবর্ষের বাস্তবতায় বঙ্গভঙ্গকেই সমর্থন করেছেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গই '৪৭-এ পূর্ব পাকিস্তান হয়ে পরে স্বাধীন বাংলাদেশ রূপ নিয়েছে। রক্তাক্ত লড়াই এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এই অর্জন কোনো বিবেচনাতেই ক্ষুদ্র নয়। এমনকি বাংলাদেশের জনগণ অন্য কোনো দেশ, বিশেষ করে ভারত শাসিত পশ্চিম বাংলার দাদাদের মুখাপেক্ষীও নয়। দুনিয়ার বুকে বাংলা ভাষা যদি এতোটুকু সম্মান লাভ করে থাকে এবং জাতি হিসেবে যদি আমাদের কোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলে থাকে তাহলে তা এ বাংলাদেশের জন্যই। কিন্তু ভারতীয় বিভিন্ন নেটওয়ার্ক বিশেষ করে গোয়েন্দা সংস্থা 'র' পরিচালিত নেটওয়ার্কগুলো দেখলে মনে হয়, বাংলাদেশ আসলে কোনো দেশ নয় এবং এদেশের সংস্কৃতির কোনো মূল্যই নেই। এমনকি এদেশের ভাষাও কোনো মর্যাদাসম্পন্ন ভাষা নয়। বিষয়টি পুরনো তবুও পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি এবং স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এই কারণে যে, আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার পরেও ভারতের কোনো মহলে এমন হীনমন্যতা রয়েছে যে, আসলে আমরা বোধ হয় সঠিক নই। হয়তো ভুল করে তারা এদেশের জন্ম দিয়েছেন। বাংলাদেশের কিছু কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীও এখন ভারতীয় নেটওয়ার্কে কাজ করছেন। তাদের একজন শমী কায়সার। বয়স এবং চিন্তা-চেতনা যাই হোক শমী আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলের অন্যতম গৌরব শহিদুল্লাহ

www.pathagar.com

কায়সারের মেয়ে। প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর আমরা এই নামটিকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। অথচ জি নেটওয়ার্কে তার ও তার বাবার নামের বানান এমনভাবে পাল্টে গেছে যে, হঠাৎ করে কেউ নামটি দেখলে বুঝতেই পারবে না এটি আমাদের শমীর নাম। মুসলমান নামের বানান ভুল করা অথবা ভুল বানান লেখা ভারতীয় কৃষ্টির অংশ কিনা আমরা বলতে পারবো না তবে বাংলায় প্রকাশিত ভারতের দৈনিকগুলোতে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, এরশাদসহ অনেক রাষ্ট্রপ্রধানের নামের বানানই ভুল করে লিখে থাকেন। এমনকি এ অঞ্চলের রাজনীতির প্রবাদপুরুষ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বানানও তারা ভুল করে লেখেন। পাঠক লক্ষ্য করলেই দেখবেন ভারতীয় নেটওয়ার্কের বিভিন্ন বাংলা নাটকে চাকর-বাকর, নিম্নশ্রেণীর অথবা কম গুরুত্বপূর্ণ পাত্রপাত্রীর ভাষা হিসাবে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ভারতের জাতীয় চ্যানেল ডিডি-৭-এর রাজনৈতিক নাটক জন্মভূমিতেও একজন প্রতারক ও জালিয়াতের ভাষা হিসাবে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভাষাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তারা এ কাজটি করছে? মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে অন্ধকার যুগ বলে যে ভুল ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছিলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা তাতে তারা সফল হননি। আজ আবার বাংলা ভাষা 'শুদ্ধ-অশুদ্ধ' শ্রেণীভেদ গড়ে তোলার চেষ্টা করে নতুন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পাঁয়তারা করছে। সেই পুরনো গল্পটির উল্লেখ করে আজকের লেখা শেষ করতে চাই। নাদুস-নুদুস কুকুরকে প্রশ্ন করা হলো, দেশে খাবার নেই তোর স্বাস্থ্য এতো ভালো কেন? জবাবে কুকুর তার খাদ্যতালিকার দীর্ঘ ফিরিস্তি তুলে ধরে বললো, আমার প্রভু আমাকে নিয়মিত এসব দিয়ে থাকেন। পাল্টা প্রশ্ন করলো— তোর গলায় এ দাগ কিসের? প্রশ্নের জবাব না দিয়ে স্বাস্থ্যবান কুকুর মুখ ঘুরিয়ে প্রভুর বাড়ির দিকে রওয়ানা করলো। নাটকের সংলাপে 'শুদ্ধ-অশুদ্ধ' শব্দের পার্থক্য শুনে ঐ দাগওয়ালা প্রাণীর কথাই মনে পড়ে গেলো।

তের

রাজধানী ঢাকা নগরীর ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। ঢাকাবাসীর ভোটে একজন নির্বাচিত মেয়র থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি যে একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে সেকথা না বললেও চলে। একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে নয়, ঢাকার মেয়র নিজেই মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি, ২০০১) নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও সেবা খাতগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে আবারও মেট্রোপলিটন সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছেন। তিনি যে দলের ঢাকা নগর সভাপতি সেই দলীয় সরকারের নিকট আড়াই বছর আগে মেট্রোপলিটান সরকার গঠনের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। বিষয়টি উল্লেখ করে মেয়র বলেছেন, আমি আমার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই দাবি করি নাই বরং আইন-শৃঙ্খলা, গ্যাস, পানি বিদ্যুৎসহ সকল খাতকে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির অধীনে রেখে নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তিনি এখনো মনে করেন, মেট্রোপলিটান সরকার গঠন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং জরুরি। আজ হোক কাল হোক সরকারকে তা মানতেই হবে। সুতরাং নগরীর মশা, ময়লা, অব্যবস্থাপনা বা নাগরিক দুর্গতি নিয়ে আলোচনা একেবারেই নিরর্থক। বলা যায়, সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব বলতে এখন আর কিছুই রইলো না। সুতরাং সিটি কর্পোরেশনের অফিসে যদি কোনো ব্যক্তি না পাওয়া যায়, অথবা দায়িত্ব পালনের জন্য কেউ

www.pathagar.com

অভিযুক্ত না হন তাহলে প্রশ্ন আসবে নগরবাসী পৌরকর কেন দেবে?

সে যাহোক, ঢাকার বর্তমান মেয়রের ক্ষেদোক্তি শুনে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কথা মনে পড়ে গেলো। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করে মেয়র পদের প্রবর্তন করেছিলেন, অনেকগুলো বিষয়কে সামনে রেখে মেয়রকে মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদমর্যাদা সম্পন্ন করার মধ্যে দিয়ে শুধু এই পদের সমান বৃদ্ধি করেছেন তা নয়, বরং মেয়রের ক্ষমতায়নের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃত সমস্যা আগের মতোই রয়েছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, দলীয় এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এই সমস্যার প্রধান কারণ। অথচ নগরীতে দলীয় ক্যাডার এবং সন্ত্রাসীকর্মীদের লালন করার জন্য সিটি কর্পোরেশনকেই স্বর্গরাজ্য হিসেবে বিবেচনা করার কারণে নগরবাসীর জন্য কর্পোরেশন নরকখানায় পরিণত হয়েছে। যেহেতু নগরপালের দায়িত্ব নির্বাচনের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়, সে কারণে সকল ব্যর্থতায় দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে। বলে রাখা ভালো যে, সাম্প্রতিককালে সিটি কর্পোরেশনের বাজেট কমে আসায়, কর্পোরেশন ভবন খানিকটা সন্ত্রাসমুক্ত হলেও দুর্নীতিমুক্ত হতে পারেনি। ঢাকার মেয়র নিয়ে আলোচনা করলাম কলকাতার মেয়র সম্পর্কিত একটি আলোচনার সূত্র ধরে। জি নেটওয়ার্কের আলফা বাংলা টিভিতে একান্ত সাক্ষাৎকারে কলকাতার মেয়র সুব্রত বাবুকে তরমুজ বলে অভিহিত করা হলো। দীর্ঘ এই সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণী আমরা উল্লেখ করতে চাই না। তবে পাঠকদের সুবিধার্থে তার নামের সঙ্গে তরমুজ ব্যবহারের বিষয়টি বলে রাখা ভালো। তরমুজের ভেতর ও বাইরের রং কখনোই এক নয়। ভেতরটা লাল, বহিরাবরণ সবুজ। যদি তরমুজ না হয়ে সুব্রত বাবু আলু হতেন, তাহলে হয়তো আলোচনার প্রয়োজন হতো না। কারণ, তরকারির মধ্যে আলু হলো সর্বঘটে বিল্বপত্র। এক সময়ের আলোচিত এবং বর্তমান কলকাতার মেয়র সুব্রত বাবু এখন কলিকাতার তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কেমন আছেন এই প্রসঙ্গ তুলতেই সুব্রত বাবু তার সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরলেন এবং নিহত ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে নিজের জীবন পর্যন্ত নানা আলোচনা করে এই সমাপ্তি টানলেন যে, রাজনীতিতে জনসমর্থনই বড় কথা। কে সিনিয়র কে জুনিয়র সে প্রসঙ্গ অনেক পরে। জনগণ যাকে যেভাবে গ্রহণ করে, তিনিই বড় নেতা। রাজনীতির হাতেখড়িতে কে কোথায় থাকেন, সে আলোচনা নিরর্থক। গণভিত্তিক রাজনীতিতে এরচেয়ে গ্রহণযোগ্য কোনো মত থাকতে পারে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। সত্যিকারভাবে জনগণের সমর্থন লাভের ভিত্তিতেই যদি নির্বাচিত হবার এবং নেতৃত্ব পাবার পথ উন্মুক্ত থাকে তাহলে জনতার নেতাই আসলে বড় নেতা।

পশ্চিম বাংলা কলিকাতায় দীর্ঘকাল পর মেয়র পদে পরিবর্তন আসলেও এখনো সেখানকার জীবন যাপনে এমন কোনো তীব্রতর সংকট পরিলক্ষিত হয়নি, যা দেখে মনে হতে পারে যে, কলকাতার কালো বা সাদা লোকদের এক এলাকা থেকে আরেক এলাকাতে চলে যেতে হবে। অথচ এই সুব্রত বাবু তার সাক্ষাৎকারে এমন একটি বিবরণ দিলেন যার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কিসের ইঙ্গিত করে তা পাঠকেরাই নির্ধারণ করবেন। নিহত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি শাসনামলে সুব্রত বাবু নাকি কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে রাতে বসে সরকারি নিয়ম-নীতি পালনের উদ্দেশ্যে সেন্সারশিপ পরীক্ষা করতেন। এমনি এক রাতের ঘটনা সুব্রত বাবুর জবানীতেই উল্লেখ করছি। ভৌতিক ভীতি আমার আগেও ছিলো এখনো আছে। সত্যি করে বলছি সেদিন স্বচক্ষে যা দেখেছি এখনো তা ভুলতে পারিনি।

www.pathagar.com

আমাদের রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢুকার সময় এক দাড়িওয়ালা মুসলমান সালাম দিতো। একদিন দেখলাম তার পাগুলো অগোছালো, তবে ছালাম দিলো। আমি উপরে এসে সিকিউরিটি ইনচার্জকে দাড়িওয়ালা সম্পর্কে জানতে চাইলে সে জানালো, ঐ দাড়িওয়ালা দারোয়ান তো কয়েক মাস আগেই মারা গেছে। এই ভৌতিক ঘটনা এখনো আমাকে তাড়িত করে। বিদেশে গেলে অথবা বাড়িতে সন্ধ্যায় যে বাতি জ্বালাই সারারাত ধরে তা জ্বলে। পরিবারের সবাই এটা মেনে নিয়েছে। সংক্ষিপ্ত আকারের এ কাহিনী শুনতে শুনতে আমার খটকা লেগেছে। কলকাতার মেয়র যখন সত্যি বলেছেন, আমি তখন মিথ্যে বলি কি করে। তবুও বলতে হয়, ভারতীয় রাজনীতিতে দাড়িওয়ালা মুসলমানরা ভূত হিসেবে চিহ্নিত হওয়া হয়তো দোষের নয় তবে তারা যে এখনো হিন্দুদের জন্য ত্রাসের কারণ এই কথাটি বিবেচনা করেই আমার খটকা লাগলো। কলকাতার অবস্থা প্রায় কমবেশি সকলেরই জানা আছে, সিপিএম-এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অথবা সুবিধাবাদী নীতি যাই হোক না কেন? কলকাতার মুসলমানরা দীর্ঘদিন থেকে অন্তত সন্ত্রাসী হামলা থেকে বেঁচে রয়েছেন। যখনই ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় তখনি সিপিএম যুব কর্মীরা তৎপর হয়ে ওঠে এবং এইভাবে কলকাতাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে রক্ষা করে সেখানে মুসলমানদের জান-মাল আব্রু রক্ষা করছে। সুব্রত বাবু যেভাবে মুসলমানদের প্রেতাত্মা দেখে ভয় পেয়েছেন তাতে আগামী দিনগুলোতে সেখানে কি ঘটতে যাচ্ছে আল্লাই ভালো জানেন।

কলকাতা বা সর্বভারতের রাজনীতি নিয়ে আলোচনার চেয়ে আমরা যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে চাই তা হলো ভারতবর্ষে মুসলমানরা এক সময় শাসন করেছে দীর্ঘকাল। অথচ সেই মুসলমানরা 'প্রেতাত্মা' হয়ে সুব্রত বাবুকে সালাম দিচ্ছে এই ঘটনা সত্যি তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের মুসলমানদের ভোটাধিকার হরণ করার তৎপরতায় একটি মহল মেতে উঠেছে। এর প্রধান কারণ, সেখানে মুসলমানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর প্রধানত নির্ভর করে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কে ক্ষমতায় থাকবে অথবা থাকবে না। এক সময় কংগ্রেস মুসলমানদের কাটা গায়ে মালিশ দেয়ার চেষ্টা করেছে আবার বিজেপিও ক্ষমতায় এসেছে মুসলমানদের ওপরই ভর করে। সুব্রত বাবু কমিউনিস্ট বা গণতন্ত্রী যাই হোন না কেন, তিনি যে একজন মুসলিমবিদ্বেষী হিন্দু সে কথা না বললেও চলে। আসলে ব্রিটিশ আমলেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মুসলিমবিদ্বেষী যে মনোভাবের জন্ম হয়েছিলো আজো তা কাটেনি। মুসলমান এই নামটি যে তারা সহ্য করতে পারেন না সে কথাই পুনর্বার ব্যক্ত করলেন সুব্রত বাবু। অথচ সাম্প্রদায়িক হিসেবে আখ্যায়িত হয় মুসলমানরাই। পরিস্থিতি দেখে একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, পশ্চিমবাংলা বা সর্বভারতের রাজনীতিতে মুসলমানদের জন্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। এবং সে কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদেরও সতর্ক হবার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

চৌদ্দ

দেখতে দেখতে সরকারের মেয়াদ শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। সময় শেষ হবার একদিন আগেও যদি বর্তমান সরকার ক্ষমতা না ছাড়ে তাহলেও সাড়ে পাঁচ মাসের বেশি ক্ষমতায় থাকার কোনো পদ্ধতি বর্তমান ব্যবস্থায় নেই। ক্ষমতার দাপট বা দাপাদাপি যতোই করা হোক না, মধ্য-জুলাইয়ের পর আর ক্ষমতায় থাকার কোনো রীতি নেই। নানা মহল অবশ্য

www.pathagar.com

এ নিয়ে নানা কথা বলছে। সেসব কথায় আমল না দেওয়াই ভালো। কারণ, ওসব দুষ্টলোকের কথা। এ সবে কান দিলেই নতুন বিপদ ঘাড়ে আসতে পারে। এসব বাদ দিয়ে আসল কথায় আসা যাক। কথা হচ্ছে ক্ষমতায় থাকাকালীন সরকার যা করেছে, তা নিয়ে না হয় প্রতিবাদ করার কেউ নেই, হয়তো প্রতিবাদ করতে চাইলে নানা রকমের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেয়া হতে পারে। কিন্তু ক্ষমতার এই জোয়াল যখন ঘাড়ে থাকবে না বরং ঘাড়ে শুধু জোয়ালের চিহ্ন থাকবে তখন সব বিষয়ই একে একে উঠে আসবে এবং প্রতেকটিরই পরিষ্কার জবাব দিতে হবে। ক্ষমতায় থেকে যতো মিথ্যাচার করা এবং অসত্য ভাষণই দেওয়া হোক না কেন, তখন সব কিছুই দিনের আলোর মতো সত্য হয়ে উঠবে। ক্ষমতাবানরা অন্যকিছু করতে চাইলেও যে সব আমলা-কামলা ফয়লা-বরকন্দাজ এখন সদাসর্বদা প্রস্তুত রয়েছে তখন তারাই এসবের সত্যতা স্বীকার করবে। অতীতের অভিজ্ঞতায় অন্তত এটাই প্রমাণ করে। কেউ কেউ হয়তো অনুগত হিসাবে পরিচিত হতে পারে তবে তাদেরও মিলে যেতে খুব বেশি সময় লাগে না। এসময় যারা ইংরেজদের দাস ছিলো তারাই পাকিস্তান আমলে দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে শূন্যস্থান পূরণ করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রালগ্নে যারা কাজ শুরু করেছেন, তাদের মধ্যে রাজাকার আলবদর যাচাই-বাছাই করার সুযোগ ছিলো। কিন্তু শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য দ্রুত তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। অন্যদিকে পদোন্নতি আটকা পড়েছে তাদের যারা বাংলাদেশ আমলে যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি নিয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই আলোচনার বাইরে। সেনাবাহিনী প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে মূল প্রসঙ্গে ফিরে এলে দেখা যাবে ক্ষমতাহীন হয়ে গেলে রাজীনীতিবিদরা কোথায় কি করেছেন, তার বিবরণ পাওয়া কষ্টকর নয়। সেদিক থেকে বর্তমান শাসনামল আরো একটি ব্যতিক্রম এই কারণে যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে যেসব বিষয়ে কমিটমেন্ট করেছিলেন, ক্ষমতায় আসার পর সেসব তারা আপনাতেই ভুলে গেছেন এবং ক্ষমতায় থাকাকালীন যে সব সংস্কার করা জরুরি ছিলো সেসব ব্যাপারেও তাদের ব্যর্থতা সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

ব্যর্থতার রেকর্ড ভঙ্গকারী দুটি খাতের, একটি আইন-শৃঙ্খলা অন্যটি বিদ্যুৎ। আইন-শৃঙ্খলার ব্যর্থতা নিয়ে অন্যেরা যতো আলোচনাই করুক না কেন, সবকিছু ছাপিয়ে উঠছে সন্ত্রাসীদের আলোচনায়। যেখানেই যে সন্ত্রাসী ধরা পড়ছে সেই স্বীকার করছে যে, আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে ঘুষ দিয়ে তাদের এই অসামাজিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদের কথা বাদ দিলেও সাম্প্রতিক কালে গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী জজমিয়ার স্বীকারোক্তিটি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। মাদকের হিংস্র থাবায় যেখানে গোটা দেশ বিপর্যস্ত সেখানে মাদক ব্যবসায়ীরা পুলিশের হেফাজতে থেকেই পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ তুলেছেন। সরকারের রাজনৈতিক কর্মসূচির সমর্থক একটি দৈনিকে জজমিয়ার প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, পুলিশকে নিয়মিত টাকা দিয়েই আমি মাদক ব্যবসা করে আসছি। মাদক ব্যবসা চালাতে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন আছে। আমাদের অস্ত্রের ভাণ্ডার থেকে গোয়ান্দা পুলিশের একজন কর্মকর্তাকে টাকার পরিবর্তে আগ্নেয়াস্ত্র দিতাম। বিনিময়ে তাদের জ্বালাতন থেকে রক্ষা পেতাম।

জজমিয়া আরো জানিয়েছে, সে যশোর সীমান্ত এলাকা থেকে ফেনসিডিল আনতো। বাহন হিসেবে কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবহার করতো। কুরিয়ার প্রতিষ্ঠান প্রতিহাজার বোতলে তিনশ টাকা ভাড়ার জায়গায় তিন হাজার টাকা করে নিতো। ফেনসিডিলের কার্টনে লেবেল

www.pathagar.com

লাগানো থাকতো গুঁড়াদুধ অথবা অন্য কোনো মালামালের। জজ মিয়ার সাক্ষাৎকার আমাদের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী ও তাদের গুরুদের গোমর ফাঁস করে দিয়েছে এতটুকু বললে সম্ভবত কম বলা হবে। বরং আমরা চলতে চাই, এদেশের জনজীবনে স্থায়ী অস্থিরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবেশী ভারতীয়রা যে চক্রান্ত করছে তার দোসরদের মাধ্যমে সেই গোপন তথ্যটি বেরিয়ে আসছে। একথা মনে করার কোনো কারণ নেই জজমিয়া বিচ্ছিন্নদ্বীপের কোনো লোক বরং এভাবে দেখলে হয়তো একটি সমাধান পাওয়া যেতে পারে যে, জজমিয়াদের একজন গুরু আছেন। তিনি দেশের ভেতরে না বাইরে সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখলে হয়তো শুধু মাদকব্যবসা নয়, আরো অনেক কিছুর সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আওয়ামী সরকার কথায় কথায় যেভাবে বিরোধী দলকে আক্রমণ করছে সেই ক্ষিপ্রগতিতে যদি দূরাত্মাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন, তাহলে জাতির কিছুটা উপকার হতে পারতো।

আমরা দ্বিতীয় যে খাতটি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি তা হলো বিদ্যুৎ। এই খাতের ব্যর্থতাও কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দরকার নেই। বরং সরকারি ব্যর্থতা সরকারকেই বিব্রত করছে। যদিও এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদ্যুৎ খাতের অনিয়ম প্রসঙ্গে সাবেক সরকার বিশেষ করে বিএনপিকে দায়ী করে অনেক বক্তৃতা-বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাবার মতো বিএনপির বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপিকে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়েছিলো এবং তার বিরুদ্ধে নাশকতার অভিযোগ আনা হয়েছিলো। যদিও দেশের সর্বোচ্চ আদালত ঐ মামলায় সরকারকেই জরিমানা করেছিলো।

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন যে জাতীয় উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত সে ব্যাপারে কোনো মহলেরই সন্দেহ নেই। তাই এই খাতের উন্নয়ন প্রশ্নেও আপসের কোনো সুযোগ নেই। প্রথম দিকে বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতের সমস্যাকে অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মুক্তির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে সাড়ে চার বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হবার পর এই খাতের উন্নয়নের জন্য তারা কি করেছেন, সে বিষয়টি খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। সরকারের মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্য সম্পাদিত দৈনিকে বিদ্যুৎ খাতের হালচিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলা হয়েছে, বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এবারও আসন্ন গ্রীষ্ম মৌসুমে সারাদেশে প্রায় চারশ মেগাওয়াট লোডশেডিং হবে। গত কয়েক বছর যাবৎ অব্যাহত এই লোডশেডিং-এর প্রশ্নে জ্বালানি মন্ত্রণালয় হতে বলা হয়েছে যে, ২০০০ সাল নাগাদ লোডশেডিং একটি সহনীয় পর্যায়ে উপনীত হবে, ২০০১ সালের মাঝামাঝি লোডশেডিং-এর কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কিন্তু বাস্তবে ২০০০ সালেও তিনশ থেকে চারশ মেগাওয়াট ছিলো এবং ২০০১ সালের গ্রীষ্ম মৌসুমেও তাই থাকবে। ১৯৯৮ সাল থেকে লোডশেডিং নির্যাতন থেকে জনগণকে মুক্তি দেবার কথা প্রতিবছরই বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অবস্থা যে তিমিরে ছিলো সে তিমিরেই রয়েছে।

সমস্যার কোনো সমাধান না হলেও আমরা মনে করি সন্ত্রাস ও লোডশেডিং-এর ক্ষেত্রে সহনীয় বক্তব্যটি বাস্তবসম্পন্ন। এক বন্ধুর একটি গল্পের কথা অনেক দিন পর মনে পড়ে গেলো। একদিন সন্ধ্যায় কথা বলতে বলতে যখন বিদ্যুৎ বাতিহীন হয়ে পড়লাম ঠিক সেই অন্ধকারে যে গল্পটি আমরা শুনেছিলাম গভীর মনোযোগ সহকারে, সেটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাই। জীবনে নিরাশ হয়ে হতাশাগ্রস্ত এক যুবক রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এক ফুটপাথ জ্যোতিষীর দেখা পেলো। পকেটের শেষ কড়িটির ওপর ভরসা করেই যুবক

www.pathagar.com

জ্যোতিষীকে হাত দেখালো। কিন্তু জ্যোতিষীর কথা শুনে সে অবাক। জ্যোতিষী জানালো, আপনার আর কোনো সমস্যা নেই। যুবক তো আকাশ থেকে পড়লো। কারণ, এই প্রথম সে তার জীবনে আশার আলো দেখতে পেলো। আর অমনি পকেট হাতড়িয়ে শেষ কড়িটি জ্যোতিষীর হাতে তুলে দিয়ে তার দু পা জড়িয়ে ধরে বললো— বাবা ঠিক করে বলেন, সামনের দিনগুলো কেমন যাবে। জ্যোতিষী যুবকের বয়স জানলো এবং তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার পর সে পুনরায় দৃঢ়তার সাথে বললো, আমি ঠিকই বলেছি। বিশদ বিবরণে সে জানালো, আপনার এখন যে বয়স তাতে আর ভালো চাকরি পাবার সুযোগ নেই। সুতরাং আরো কিছুদিন এভাবেই কেটে যাবে এরপর বার্ধক্যের টান শুরু হলে সবকিছু সহনীয় হয়ে উঠবে। সুতরাং আপনার জীবনের বাকি দিনগুলোতে আর কোনো সমস্যা নেই।

দৈনিকটিতে বিদ্যুৎসংক্রান্ত রিপোর্ট এবং মাদকব্যবসায়ী জজের সাক্ষাৎকার পড়তে পড়তে সেই গল্পের কথাই মনে হলো। অর্থাৎ ক্ষমতায় আসার পর সরকার যেভাবে অন্যদের গাল দিয়ে নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে চেয়েছে এখন সেই ব্যর্থতা নিজেদের ওপর এসে পড়েছে। সুতরাং বাকিদিনগুলোতে আর কিছু করার নেই। অর্থাৎ যতোদিন ক্ষমতা আছে ততোদিন শুধুমাত্র গালাগালি করেই কাটিয়ে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে এতে দেশের কোন লাভ হয়নি এবং হচ্ছে না; উপরন্তু ক্ষতির পরিমাণই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশ রসাতলে যাচ্ছে।

পনর

এতোদিন পর্যন্ত ছিনতাই বলতে অর্থবিত্ত ছিনিয়ে নেয়াকেই বুঝাতো। গত কিছুদিন থেকে সম্ভবত ছিনতাইয়ের সংজ্ঞা পাল্টিয়েছে। এখন জীবন ছিনিয়ে নেয়ার জন্য ছিনতাইকারীরা হামলা শুরু করেছে। এমনকি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ছিনতাই নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে। আমরা তুলে ধরতে চাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত পার্বত্য অঞ্চলে ছিনতাই করা তিন বিদেশীর কথা। অসতর্ক মুহূর্তে সদর রাস্তা থেকে তিন বিদেশীকে গভীর অরণ্যে ছিনিয়ে নেয়ার যে নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে তাতে লাভ-ক্ষতির হিসেবটা একটু মিলিয়ে দেখা দরকার। আর সেই সাথে এ প্রশ্নও করা যেতে পারে যে, ছিনতাইকারীদের আসল মদদদাতা কারা?

প্রথমত যদি ধরে নেয়া যায় যে, দেশের চলমান ছিনতাইকারীদের একটি বেপরোয়া অংশ এই ছিনতাই নাটকের সাথে জড়িত ছিলো তা হলে সম্ভবত কিছুটা ভুল বলা হবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ছিনতাই নাটক এর আগেও মঞ্চস্থ হয়েছে। তবে এখন সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিলো ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকাস্থ ভারতীয় কূটনীতিক সমরসেনের ছিনতাই। বলা হচ্ছে ঐ ছিনতাই নাটকের পেছনে সমরসেনের যেমন আগ্রহ ছিলো তেমনি ছিলো ভারতীয় কর্তৃপক্ষের। কারণ, ভারতীয় কূটনীতিকদের খোঁজার নামে তৎকালীন শর্ত অনুযায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ চষে বেড়াতে পারতো। যা হোক, সময়মতো হস্তক্ষেপের কারণে সেনা নাটক সফল হয়নি।

এবারেও যখন তিন বিদেশী ছিনতাই হলো তখন প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে তো বললেন, সরকারি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে কেন বিদেশীরা রাস্তায় বেরিয়ে ছিলো? আবার বিদেশীদের খোঁজার নামে তাদের স্বদেশীয়রা জেনে গেলো পার্বত্য এলাকার পথঘাট। ভবিষ্যতে এই ম্যাপ অন্য কোনো কাজে ব্যবহৃত হবে কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়। ভাগ্য ভালো ছিনতাই

www.pathagar.com

নাটকের দৃশ্যমান অংশের অবসান হয়েছে এবং তিন বিদেশী মুক্তি পেয়েছেন। তবে অদৃশ্য অংশের এখনো ফয়সালা হয়নি। সংশ্লিষ্ট মহল বলছে, এই ছিনতাই নাটকের মধ্য দিয়েই আসলে সম্পন্ন হচ্ছে পার্বত্য এলাকার তিনটি আসনের বিষয়। খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি। আসন তিনটির মধ্যে ক'টি শান্তিবাহিনী পাবে এ প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলছে সরকারের সাথে ইতিমধ্যেই খাগড়াছড়ির আসন নিয়ে ভাগবাটোয়ারা সম্পন্ন হয়েছে। ঐ আসনটি শান্তিবাহিনী সন্তুলারমাকে দেয়ার ব্যাপারে বর্তমান সরকার নাকি একমত হয়েছেন। কিন্তু শান্তিবাহিনী এতে সন্তুষ্ট নন। তারা তিনটি আসনই নিজেদের মধ্যে রাখতে চায়।

পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে সরকার সম্পাদিত নয়াচুক্তির বিরোধিতা করে আসছে সেখানকার অপাহাড়ি নাগরিকরা। কারণ তারা মনে করছে যে, এই চুক্তির ফলে কার্যত তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাও তাই। দেখা যাচ্ছে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ক্রমাগতভাবে সেখানকার অপাহাড়ি নাগরিকদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন বেড়েই চলছে। খুন-ধর্ষণ থেকে শুরু করে সব ধরনের বর্বরতাই তাদের ওপর চালানো হচ্ছে। অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত এই অপাহাড়ি শ্রেণী আগামী নির্বাচনে কি করবে তা হয়তো এখনই বলা যাবে না। তবে এতোটুকু বলা যায় যে, তাদের অবস্থান সংহত করার লক্ষ্যে তারা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন লাভের চেষ্টা করবে। সুতরাং সেদিক থেকে পাহাড়ি অঞ্চলের রাজনৈতিক লড়াইকে যদি ত্রিমুখী আলোচনা করা যায়, তাহলে এ দাঁড়ায় যে সেখানকার অপাহাড়িদের এক ধরনের সংগঠন এবং পাহাড়িদের বর্তমান নেতৃত্ব এবং শান্তিবাহিনীর নেতৃত্বগত দ্বন্দ্ব।

পত্রিকান্তরে খবরে প্রকাশ, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর আওয়ামী সরকার ও সন্তুলারমার নেতৃত্বাধীন সাবেক শান্তিবাহিনীর মধ্যকার শান্তিচুক্তি সম্পাদনের আগে চাঁদা ও মুক্তিপণ শোধ করতে হতো এককভাবে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র গোষ্ঠীকে। তখন বহুরকম আর্মস ক্যাডার গ্রুপের চাঁদার দাবি মিটাতে গিয়ে ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, খামারী, চাষী, জেলেরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। চুক্তির পক্ষ-বিপক্ষের অনুসারীরা নামে-বেনামে বিভিন্ন ক্যাডার গ্রুপে বিভক্ত। ক্যাডাররা চাঁদা, ডাকাতি, মুক্তিপণের টাকা দিয়ে নিজেদের গ্রুপকে ভারি করছে এবং প্রত্যন্ত পাহাড় জঙ্গলে একের পর এক ঘাঁটি জোরালো করছে। এভাবে পাহাড়ি ক্যাডারদের মাঝে চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে চলছে ব্যাপক দুর্বৃত্তায়ন এবং মেরুকরণ। তারা একেকটি এলাকাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে রীতিমতো অর্থনৈতিক যুদ্ধ চালাচ্ছে।

পরিস্থিতি থেকে আঁচ করা যাচ্ছে যে, দেশের অন্যান্য অংশের মতো পাহাড়ি অঞ্চলেও একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। সম্ভবত এই পরিস্থিতি সৃষ্টির সূত্রপাত হয়েছে তিন বিদেশীদের ছিনতাইয়ের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের পুরো রাজনৈতিক অঙ্গনে যেভাবে একের পর এক ছিনতাই নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে সে বিবেচনায় হয়তো তিন বিদেশী ছিনতাই তেমন কোনো বড় ঘটনা হিসেবে বিবেচিত নাও হতে পারে। তবে পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য এই ছিনতাই নাটকের সূত্র ধরে যদি বড় কোনো বিপর্যয় নেমে আসে তাহলে তা কোনো বিবেচনাতেই খাটো করে দেখা যাবে না। আরো স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে কোনো এনজিও এবং কোনো কোনো বিশেষ দেশের আগ্রহ অনেক দিনের পুরনো। এই অঞ্চলটিকে কায়দা করে বাংলাদেশের একটি বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করা সম্ভব হলে তাদের পক্ষে যেমন করে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা সম্ভব তেমনি সম্ভব এই

www.pathagar.com

অঞ্চলকে ঘিরে পুরো এলাকায় নতুন চক্রান্তের জাল বিস্তার করা।

আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এই পাহাড়ি অঞ্চলকে ঘিরেই রয়েছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অনেক পরিকল্পনা এবং দেশের একমাত্র সমুদ্র বন্দর। তাই তিন বিদেশী ছিনতাইয়ের ঘটনাকে শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা হিসেবে না দেখে দেশের চলমান রাজনীতি এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে দেখলে হয়তো পুরো জিনিসটারই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট মহল এসব ব্যাপার ভেবে দেখবেন বলেও আমরা মনে করি।

ষোল

বর্তমান সরকার যে দায়িত্ব পালনে নয়, বরং শুধুমাত্র অশালীন কথাতেই পারঙ্গম তার প্রমাণ বিদ্যুৎ খাত। এই কলামে ইতিপূর্বেও আমরা এই খাতের সমস্যা নিয়ে লিখেছি। শুধু আমরাইবা কেন দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিকগুলোতেও বিদ্যুৎ নিয়ে নানা খবর প্রকাশিত হয়েছে। সব খবরেরই সারাংশ হলো লোডশেডিং। বর্তমান গ্রীষ্ম মৌসুমের শুরুতেই এই বিরক্তিকর লোডশেডিং-এর মাত্রা এতো পরিমাণ বেড়েছে যে, এখন বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের কথাবার্তা কুলটা রমণীর মতো মনে হয়। বিদ্যুতের দায়িত্বে যারা রয়েছেন সেই সব কর্মকর্তারা বলেন, দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি নেই। আছে কারণগত সমস্যা। যদি এই কথা সত্য হয় তাহলে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না কেন? প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দেশের সকল জনগণই জানেন যে, দিনের বেলায় সূর্যের আলোর কারণে অন্ধকার বুঝা না গেলেও রাতের ঢাকা বিদ্যুতের অভাবে প্রায় সবসময়ই ঢেকে থাকে অন্ধকারে। হয়তো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বাসভবন ছাড়া এমন কোনো এলাকা এখন আর বাদ নেই যেখানে এই বিদ্যুৎবিহীন বিরক্তির অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় না। আগে ২৪ ঘণ্টায় হয়তো একবার অর্থাৎ ১ ঘণ্টার জন্য লোডশেডিং করা হতো আর এখন লোডশেডিং-এর কোনো সময়-নিয়ম নেই। আগে লোডশেডিং কখন কোথায় করা হবে ডেসা কর্তৃপক্ষ তা পত্রিকায় জানিয়ে দিতো। এখন সে সবেরও বালাই নেই। কোথাও একবার বিদ্যুৎ গেলে কখন আসবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।

বিদ্যুৎ বিতরণে দেশে তিন ধরনের কর্তৃপক্ষ কাজ করছে। এরা হলো—পল্লীবিদ্যুৎ এবং ঢাকায় ডেসকো ও ডেসা। যদিও উৎপাদন কর্তৃপক্ষ বলতে এখনো পিডিবিকেই বুঝায়। পিডিবির বিদ্যুৎ নিয়ে যারা বিতরণ করেন, তাদের কথা, পিডিবির বক্তব্য এবং মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সারমর্ম এক নয়। উৎপাদনকারী কর্তৃপক্ষ বলছে, দেশে বিদ্যুতের কোনো ঘাটতি নেই। তাহলে রাজধানীর বাইরের বিভিন্ন শহরে এবং গ্রামে-গঞ্জে বিদ্যুৎ থাকছে না কেন? এরপর আসে ডেসকোর আলোচনা। ডেসকোর পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা খুবই কষ্টকর। বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সুপারিশ মোতাবেক ডেসকো নামক যে কোম্পানীটিকে মিরপুর এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একবাক্যে বলতে গেলে সেই ডেসকো কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ বিতরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। খবরদারী বলতে যা বুঝায় তা তারা ষোলআনা করলেও কর্তব্য বলতে যা বুঝায় তাতে তারা পুরোটাই ব্যর্থ। মিরপুর এলাকায় সাংবাদিকদের একটি গৃহসংস্থান প্রকল্প রয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ঐ প্রকল্পে বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাবেক ডেসা আমলে একটি আলাদা ফিডারের ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করা হয়েছিলো। কিন্তু বর্তমান ডেসকো আমলে দেখা যাচ্ছে—ঐ ফিডারটির কোনো উপকারিতাই সাংবাদিকরা পাচ্ছে না। গত ১ এপ্রিল শুধুমাত্র সাংবাদিক আবাসিক এলাকায় সকাল ৯টা, দুপুর ১২টা, বিকেল ৫টা, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা এবং রাত দশটায় প্রতিবারে প্রায় ১ ঘণ্টা করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ৪ ঘণ্টাই ছিলো বিদ্যুৎবিহীন। এ নিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বললে তাদের পরিষ্কার জবাব : বিদ্যুৎ না থাকলে আমরা কি করবো। তাদের কথায় আরো জানা গেলো, কোথাও কোনো এক ট্রান্সফারমারে গোলযোগ দেখা দিয়েছে আর সেকারণেই নাকি এই বিভ্রাট। তাদের কাছে জানতে চাইলাম বিদ্যুৎ দিতে না পারলে দায়িত্ব নিয়েছেন কেন? এক্ষেত্রেও তোতাপাখির মতো একটি মুখস্থ টেপ তারা ছেড়ে দিয়ে বলেন, আমরা তো যতটুকু বিদ্যুৎ দেই ততোটুকুরই বিল নেই। ভাবখানা এমন যতোটুকু কাজ ততোটুকু পয়সা। যদি ব্যাপারটা এরকমই হয় তাহলে বিদ্যুৎ না থাকার জন্য যে পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে তার মূল্য কে দেবে? অথবা হঠাৎ করে অপ্রত্যাশিতভাবে বিদ্যুৎহীন হবার কারণে যে বৃদ্ধ রাস্তায় ছিটকে পড়েন, যে শিশু পথ হারিয়ে ফেলে, যে মা অন্ধকারে সতীত্ব বিসর্জন দেয় তার দায়িত্ব কে নেবে? কে তাদের এই ক্ষতি পূরণ করবে?

'বিদ্যুৎ পরিস্থিতি' নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে সরকারের মন্ত্রী সম্পাদিত দৈনিক ইত্তেফাকে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়—প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন গ্রীষ্মকালে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্দেশ দিচ্ছেন তখন খোদ রাজধানী ঢাকাতেই দিন-রাত যখন-তখন এমনকি মধ্যরাত এবং ভোরেও বিদ্যুৎ থাকছে না। চাহিদা বৃদ্ধি পাবার দরুন লোডশেডিং হতে পারে, কিন্তু মধ্যরাত (১২টায়), সকাল ৬টায় এবং ছুটির দিন যখন বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় অর্ধেক কমে যায় তখনও লোডশেডিং-এর কারণ কি? যদি কখনো পরিস্থিতির চাপে লোডশেডিং দিতে হয়—তবে কঠোর লোডম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে এবং পূর্বাহ্নে গ্রাহকদের তা জানিয়ে দিতে হবে। এই নির্দেশের পরপরই অঘোষিত এবং যখন-তখন এমনকি গভীর রাতে ও ছুটির দিনেও লোডশেডিং দেয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গ্রীষ্মকাল শুরু হবার পূর্বে শীতকালে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন মেরামত না করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ তথা ওভারলোডেড ট্রান্সফরমারগুলো সংস্কার বা পরিবর্তন না করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি গ্রীষ্মের আপদকালীন জরুরি সংকট মোকাবেলায় পিডিবি, ডেসা ও ডেসকোর কাছে কোনোরকম ট্রান্সফরমার মজুত নেই। ফলে কোথাও ওভারলোডেড একটি ট্রান্সফরমার বিস্ফোরিত বা বিকল হলে তা সাথে সাথে অথবা ২/১ দিনের মধ্যে পরিবর্তন করার কোনো উপায় নেই। অর্থাৎ এ পরিস্থিতিতে ট্রান্সফরমার আমদানি না করা পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মাসাধিককাল আগে ঢাকায় মোট তিনটি ট্রান্সফরমার বিকল ও বিস্ফোরিত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ ১ মাস পরেও এ তিনটি ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করা হয় নাই। তদুপরি দ্বৈত ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রান্সফরমার পরিবর্তন বা সংস্কার প্রক্রিয়া বেশ জটিল। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সঞ্চালন লাইন এবং ট্রান্সফরমারগুলো ব্যবহার করে ডেসা, আরইবি এবং ডেসকো; কিন্তু এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করে পিডিবি। এ তিনটি ট্রান্সফরমার পরিবর্তনের অভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ বৃহত্তর মিরপুর, পল্লবী, রামপুরা, উলন, গোপীবাগ, খিলগাঁও, শ্যামপুর ও পুরাতন ঢাকায় ব্যাপক তথা মেয়াদি লোডশেডিং চলছে। আরো কতোদিন চলবে সঠিকভাবে ডেসা বা ডেসকো বলতে পারছে না। সরকার যদি বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি করতে

www.pathagar.com

চায় তাহলে অবশ্যই বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সংরক্ষণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। এই সমন্বয় বলতে মাথাভারি প্রশাসন বা সরকারের ইচ্ছা পূরণকে বোঝায় না। বরং এ থেকে এ কথাই বুঝতে হবে যে, বিদ্যুৎ খাতে এমন একটি দক্ষ এবং যোগ্য প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে যাদের ওপর জনগণের আস্থা আছে এবং সাথে সাথে যোগ্যতা এবং দক্ষতাও রয়েছে। নয়তো এ কথাই মনে করা সঙ্গত যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতোই এখানেও টুপাইস কামাইয়ের একটি ব্যবস্থা রয়েছে, যার ভাগ হয়তো অনেকেই পেয়ে থাকেন। উল্লেখ করা ভালো যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদ্যুৎ খাতের ব্যর্থতার জন্য অতীত সরকার বিশেষ করে বিএনপিকে গালাগালি করা ছাড়া আর কিছুই করেননি। বিদ্যুৎখাতের সমস্যার যদি একটি করে সমাধানও বছরে হতো তাহলে গত সাড়ে চার বছরে এই খাতটি নিয়ে গর্ব করার মতো হয়তো অনেক কিছুই থাকতে পারতো। তাই বলি, সরকার যেভাবে গালভরা বুলি আর খিস্তিখেউর দিয়ে বিরোধী দলের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছে তারই বোধ হয় একআধটু অনুসরণ করে জনগণের মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। বিদ্যুৎ পাওয়া জনগণের যেমন একটি অধিকার তেমনি বিদ্যুৎ রাখা রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বর্তমান আমলে পরিস্থিতি যেভাবে দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে তাতে অন্তত এই একটি খাতের অব্যবস্থার কারণেই সরকার পদত্যাগ করতে পারে। অন্তত বিশ্বের যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশের সরকার হলে তাই তারা করতো। আমাদের দেশে যদিও এ ধরনের একটি কল্পনা অসম্ভব। কারণ, যেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে বিরোধী দলের নেতাকর্মীকে হত্যা করে দুঃখ প্রকাশ করা হয় না সেখানে জনগণের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আসলেই কেউ চিন্তা করে এরকম না ভাবাই উত্তম। তাই বলি আগামীতে যারা আসবেন তারা অন্তত এখনই প্রস্তুতি নেন কিভাবে জনগণের এই মৌলিক সমস্যা সমাধান করা যায়।

সতর

বর্ষপরিক্রমায় নববর্ষ বারবার ঘুরেফিরে এলেও এবারের নববর্ষ যেনো এসেছিলো ভিন্নভাবে। নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই শোকবিহ্বল হয়ে পড়ে দেশবাসী। বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে রমনাপার্কের বোমায় নিহত ও আহত হওয়ার কারণেই উৎসব পরিণত হয় শোকে। দেশের আপামর জনতা এ ঘটনায় মনে কষ্ট পান। অনেকেই এ ধরনের একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে এমন কল্পনাও করেননি। যদিও বর্ষবরণের অনুষ্ঠান নিয়ে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই টুকটাক গোলোযোগ চলে আসছিলো। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে যে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে মধ্যরাতে অথবা প্রত্যুষে অনেকেই ছোটখাটো লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। যদিও এ ধরনের ঘটনা দুর্ঘটনাকে অবাঞ্ছিত-অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করা হলেও অকল্পনীয় ভাবা হয়নি। হরহামেশায় আমাদের জীবনে এ সব ঘটনায় সাথে পরিচিতি ঘটে থাকে। শুধু বর্ষবরণ কেন, মেলায় গেলে অথবা শহীদ মিনারে গেলে যদি হঠাৎ করে সেখানে বাতি নিভে যায় তার পরে নারী দেহ নিয়ে মাতামাতি করার অভিজ্ঞতাও এ জাতির রয়েছে। এ সব অঘটনের নায়ক কারা? কি কারণে তারা এসব ঘটান তা নিয়ে নানা মহলে কথা রয়েছে। ৭২-এর শহীদ মিনারে বাতি নিভে যাওয়ার পর যে পৈচাশিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো তার উৎস কোথায় সে কথা আজো জানা যায়নি। তবে গেলো বর্ষবরণের ঘটনার পরপরই সরকারি মহল থেকে ঘটনার জন্য মৌলবাদীদের দায়ী

www.pathagar.com

করে বক্তব্য প্রচার করা হয়েছে এবং কাজটা যে, মৌলবাদীরাই করেছে এই সত্য প্রমাণের জন্য সর্বশেষ মসজিদের ইমামকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিবিসিসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচার করে দেওয়া হলো মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু একদিন যেতে না যেতেই পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করলো ভিন্ন খবর। দেখা যাচ্ছে—ঘটনার সাথে যুক্ত বলে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের রক্ষার জন্য সরকারি মহল থেকেই তদবির করা হচ্ছে।

নববর্ষের রমনার সঙ্গীতানুষ্ঠানে কারা বোমা মেরেছে তা নিয়ে যেহেতু এখনো সরকারি ভাষায় তদন্ত চলছে, তাই আমরা এ নিয়ে চটকরে এমন কোনো মন্তব্য করতে চাই না যা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে সরকারি মহল থেকে যেভাবে মৌলবাদীদের নাম নিয়ে আলোচনা এবং আক্রমণ করা হচ্ছে তা নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করা যেতে পারে। ঢাকার কোনো কোনো দৈনিক এ ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত বলে উল্লেখ করতে গিয়ে বিগত হজ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। আর দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশ্ন তো আলোচনা না করাই উত্তম। প্রশ্ন হচ্ছে, এখন যারা ঘটনা সম্পর্কে এতো কিছু উদ্ধার করতে পারছেন তারা পরিকল্পনার শুরুতে কোথায় ছিলেন? গত সাড়ে চার বছরে অনেক কল্পিত ষড়যন্ত্রের গল্প ফেঁদে এ যাবৎকালে অনেকেই বাহবা নিয়েছেন। নানা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করার পর মাননীয় আদালত অনেককেই ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—তারা যদি সবই জানেন, তাহলে ঘটনার আগে এরকম একটি ষড়যন্ত্র ঠেকাতে ব্যবস্থা নিলেন না কেন? যাই হোক এ প্রশ্নের সর্বোত্তম উত্তরদাতা সরকারি মহল। তারাই আসল কথা বলতে পারবেন কি তারা জানেন অথবা জানেন না। অথবা প্রকৃত অর্থেই তাদের এ সব জানার কোনো সুযোগ ছিলো কিনা অথবা ঘটনার পর দোহারের ভাষায়—আহা বেশ বেশ করছেন কি না? তবে জনমনের প্রশ্ন অন্য জায়গায় ঘটনার পরপরই টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, এই সন্ত্রাসের মধ্যে নির্বাচন হবে কি করে? রমনার বোমা এবং নির্বাচনের মধ্যে কোথাও কি তাহলে সম্পর্ক রয়েছে? যদি সংঘাতের দিক থেকে এই প্রশ্নকে তুলে ধরা হয় তাহলে একরকম অর্থ দাঁড়াতে পারে কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে বোমা এবং নির্বাচন সম্পর্কটি চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে অন্য বিবেচনায় দেখা যেতে পারে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পর থেকেই ইসলামের বিভিন্ন গ্রুপকে দায়ী করতে শুরু করলেন সরকার উৎখাতের অভিযোগে। এই অভিযোগের প্রায় সবটাই অসৎ বলে প্রমাণিত হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিন্তু থেমে থাকেনি। একের পর এক নানা অজুহাত দাঁড় করিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? মনে হচ্ছে সরকার এই সত্যই প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, দেশের ইসলামী দলগুলো বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতির বিরোধী। প্রকারান্তরে এ কথাও হয়তো সংশ্লিষ্ট মহল প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, ধর্ম এবং চলমান সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ হয়তো এক সমীকরণে আসে না। প্রকৃত প্রস্তাবে যে মহল যে ধরনের চেষ্টাই করুক না কেন? আসল উদ্দেশ্য সম্ভবত অন্যত্র। সরকারি কোনো মহলের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতেই হয়তো ঘটে যাচ্ছে এ সব অঘটন। যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে—দেশ থেকে সরকারবিরোধী বিশেষ করে আধিপত্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করা। এই নির্মূল প্রক্রিয়া নিয়ে সরকারের যে গভীর নীলনকশা রয়েছে—তা নিয়ে কোনো মহলেরই সন্দেহ নেই। আসলে নির্বাচন এবং বোমার সাথে যে সম্পর্কের কথা লেখার গোড়ায় আমরা উল্লেখ করেছি সেখানেই ফিরে আসতে চাই। নির্বাচন করতে চায় সরকার তার নিজের মতো করে এবং জিতে নিতে চায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন। সরকার তো ইতিমধ্যেই টের পেয়ে গেছে যে, সুষ্ঠু ও

www.pathagar.com

অবাধ নির্বাচনে বর্তমান সরকারি দলের কাঙ্ক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। সে কারণেই বিরোধী দলকে হটিয়ে দিয়ে অনুগত বিরোধী দল নিয়ে যেনো-তেনোভাবে একটি নির্বাচন করা যায় কি না? সে রকম একটা ধারণা হয়তো সরকারের মাথায় রয়েছে। যদিও এরকম একটি ধারণায় অভিজ্ঞ রাজনীতিকরা এখন সরকারের বগলদাবায় রয়েছেন। এক সময় ক্ষমতাসীন এরশাদ সাহেবের অনুগত বিরোধী দল হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন আ.স.ম আব্দুর রব। তিনি এখন সরকারের মন্ত্রীসভায় রয়েছেন। আর চারদলীয় জোট ভেঙে এরশাদ সাহেবকে নিয়ে যদি আরো করানো সম্ভব হয়, তাহলে তথাকথিত ক্রেডিবল নির্বাচনের নামে গোটা দুনিয়াকে দেখাবার মতো অনেক কুমির ছানা হয়তো তিনি পেয়েও যেতে পারেন। যদি এরকম একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে সে তো সোনায় সোহাগা হতে পারে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, যার একপ্রান্তে হলো আধিপত্যবাদ আর অন্যপ্রান্তে হচ্ছে আধিপত্যবাদবিরোধীরা। এরকম একটি পরিস্থিতিতে নববর্ষ পালনের মতো একটি জাতীয় দিবসে বোমা হামলার ঘটনায় সরকারবিরোধীদের জড়িত করার ঘটনাটি সত্যিই অবাক ব্যাপার। বিশেষ করে যখন সরকার সমর্থিত ছাত্রসংগঠনের নেতারা বিরোধী নেত্রীর উদ্দেশ্যে হুমকি দিয়ে বলেন, নববর্ষে নিহতদের লাশ বিরোধী নেত্রী দেখতে এলে আরো একটি লাশ বাড়বে! যদিও এই হুমকির পর সরকারি মহল থেকে কোনো উচ্চবাচ্য করা হয়নি। তাই মনে হয় বর্ষ শুরুর যে বেদনা গোটা জাতিকে শোকাচ্ছন্ন করেছে তার ভিন্ন কোনো প্রভাব জাতীয় জীবনে পড়বে কি না? অথবা এ বছর আরো কোনো শোকাবহ ঘটনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কি না? শুধু এইটুকু বলা যায় যে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সঠিকভাবে যদি রুখে দাঁড়ানো না যায় তাহলে তা হবে জাতীয় অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় বেশি শোকের। এই শোক থেকে মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করাই সবচেয়ে জরুরি।

আঠারো

দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন যে এখন আর অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনায় কেউ গুরুত্ব দিতে চায় না। হরতালের পক্ষ-বিপক্ষ, ব্যবসায়ীদের কথাবার্তা এবং সর্বোপরি সরকারি দলের টাল-মাটাল পরিস্থিতি নিয়েই আলোচনা চলছে সর্বত্র। কয়েকদিন আগে হঠাৎ করে আওয়ামী সরকার পদত্যাগের কথা বলে জনমনে পদত্যাগের সম্ভাবনার যে আশার সঞ্চার করেছে এখন সরকার উল্টো বললেও তা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। জনগণ ধরেই নিয়েছে বর্তমান সরকার আর ক্ষমতায় নেই। থাকলেও এদের আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। এ ধারণা ইদানীং আরো শক্তিশালী হয়েছে সীমান্ত অঞ্চলের কারণে। রৌমারী সীমান্তে বিএসএফ-এর আক্রমণ প্রতিহত করার পরেও সরকার যেভাবে চুপ মেরে গিয়ে ভারতের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে তাদের আর এ কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না যে, বাংলাদেশের ক্ষমতায় প্রকৃত অর্থে কোনো বাংলাদেশী সরকার রয়েছে। জনমনে ধারণা যাই হোক, সরকার যে আছে এবং সময় শেষ হবার আগে ক্ষমতা ছাড়ার কোনো পরিকল্পনা যে তাদের নেই একথা দিবালোকের মতোই সত্য। সদ্য সমাপ্ত হরতালে সরকারি পুলিশ বাহিনীর তৎপরতাও এ কথাই জানান দেয় যে, যতোদিন আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় থাকবে ততোদিনই জাতীয়তাবাদী শক্তির ওপর জুলুম, নির্যাতন অব্যাহত রাখবে। পদত্যাগের সময়ের কথা বারবার জানান দিলেও সরকার যে

www.pathagar.com

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মরিয়া হয়ে উঠেছে তার বড় প্রমাণ বায়তুল মোকাররমের খতিব অপসারণ চেষ্টা। ইসলামী ফাউন্ডেশনের ডিজি, বিতর্কিত মওলানা আবদুল আওয়াল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, বয়সের কারণে বায়তুল মোকাররমের খতীব সর্বজন শ্রদ্ধেয় মওলানা ওবায়দুল হককে অপসারণ করা হয়েছে। শুধুমাত্র নির্বোধরাই যে এ ধরনের কাজ করতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ৭২ বছর বয়সী সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদকে নিয়ে যদি রাজনীতির খেলায় মেতে উঠতে সরকারের কোনো আপত্তি না থাকে, ৮৫ বছর বয়স্ক সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম আল্লামা আজিজুল হকের বিরুদ্ধে যদি হত্যা মামলা দিতে দ্বিধান্বিত না হয় সরকারের; তাহলে ৭৩ বছর বয়স্ক সুস্থ একজন আলেম নামাজ পড়াবার অযোগ্য হন কিভাবে। আহাম্মকির একটা শেষ থাকা উচিত। এ ধরনের নির্বোধদের অবশ্য কিছু বলাও বিপদ। কারণ এদের চোখ আছে কিছু দেখে না, কান আছে তবু শুনে না। এদের চোখ-কান-হৃদয় সবই বন্ধক রয়েছে অন্যত্র। এদের প্রভু রয়েছে দেশের বাইরে। তাই এদেশের কোনো কিছুতেই এদের কোনো আগ্রহ বা ভালোবাসা নেই। বায়তুল মোকাররমের খতিবের ওপর এদের রাগ কেন? তিনি তো সরাসরি কোনো রাজনীতি করেন না। তার কোনো দল নেই। এমনকি কোনো রাজনৈতিক দলের গ্রুপের সাথেও তিনি উঠাবসা করেন না। সরকারবিরোধী আন্দোলনে ছিলেন বা তাঁকে কেউ কখনো দেখেছে সম্ভবত এ সাক্ষ্য কেউ দিতে পারবে না। তবুও তাকে কেন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। জবাব খুব সোজা। কারণ তিনি প্রকৃত দ্বীন ও ধর্মের কথা বলেন। প্রতি জুমার আগে জাতীয় মসজিদে সমবেত হাজার হাজার মুসল্লিদের প্রকৃত ইসলামের কথা বলেন এবং সত্যিকার মোমেন হওয়ার আহ্বান জানান। এখানেই তার সাথে বিরোধ।

দেশে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন সেই আওয়ামী সরকারও জনগণকে এক ধরনের ধর্ম শেখায়। তারাও পবিত্র কোরআন-হাদিস উদ্ধৃত করে জনগণের সামনে এমনভাবে তা উপস্থাপন করে যেন সত্যি কথাই বলছে। আসলে এরাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম ব্যবসায়ী। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না দিয়ে এমনভাবে ইসলামকে উপস্থাপিত করছে যেন সবই ঠিক আছে। আবার পবিত্র হজ পালন করেও প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে তারাও ধর্ম মানে। মুখে তারা যাই বলুক ধর্ম সংক্রান্ত ভীতি তাদের পেয়ে বসছে সে কথা আওয়ামী সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেদিন তার দলীয় সভায়ও বলে ফেলেছেন। যারা আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচন করতে চান তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে মসজিদে যেতে। যাতে গ্রামের মানুষ মনে করে যে এরাও নামাজ-রোজা করে। অর্থাৎ সোজা কথায় ইসলাম বিক্রি করে রাজনৈতিক কার্য হাসিলের অপকৌশল-এ যদি ধর্ম ব্যবসা না হয় তবে আর কাকে ধর্ম ব্যবসা বলা যাবে? প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য পত্রিকায় দেখে জার্মান দেশের একটি গল্প মনে পড়ে গেলো। একবার নাকি গির্জায় ধর্ম শিক্ষা দেয়া সন্তানদের তিন অভিভাবকের ওপর অন্তরা রেগে গেল এবং জিজ্ঞেস করলো তোমাদের মতো নাস্তিকরা এখানে ভিড় করছো কেনো। কেনইবা তোমাদের সন্তানদের গির্জায় পাঠিয়ে আমাদের সন্তান নষ্ট করছো। নাস্তিক তিন অভিভাবক প্রথমে কিছুই বললো না, পরে পীড়াপীড়িতে তারা জবাব দিলো, আমরা চাই আমাদের সন্তান আমাদের মতো যেন অবিশ্বাসের অশান্তিতে না থাকে। আসলে আওয়ামী লীগ নিজেও হয়তো ইতোমধ্যেই টের পেয়ে গেছে যে, জনগণ তাদের ইসলাম ধর্মবিদ্বেষী বলেই মনে করে। তাই প্রকাশ্যে ধর্মপালনের ঢং দেখিয়ে মানুষের বিশ্বাসে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছে। আসলে কখনো মেকি দিয়ে আসলকে ঢেকে রাখা যায় না। স্বরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটবেই। নয়তো বায়তুল

www.pathagar.com

মোকাররমের খতিবের ওপর এ নজিরবিহীন আক্রমণ কেন? এ যাবৎকাল বায়তুল মোকাররমের কোনো খতিবকেই অপসারণ করা হয়নি। খতিব প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে আমৃত্যু এ পদে আসীন থাকেন যদি না ধর্মীয়ভাবে তিনি অচল হয়ে না পড়েন অথবা ইমামতির অযোগ্য না হন। কারণ খতিব পদটিকে কেউ চাকরির শর্তে বিবেচনা করে না বরং সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথেই দেখে থাকে। সাধারণভাবে তো দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরই জুমার নামাজে ইমামতি করার কথা। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক অর্থাৎ খলিফারা তাই করছেন। দেশের সাধারণ নাগরিকরা জুমার নামাজে খলিফাকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেতেন। খলিফা কোনো হুমকি ধামকি না দিয়ে মুসল্লিদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করে নামাজে ইমামতি করতেন। নিঃসন্দেহে দেশের বর্তমান কর্ণধারদের নামাজ পড়াবার মতো যোগ্যতা আছে কিনা এ প্রশ্ন তোলা যায়। যদি নামাজ সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণাও থাকতো তাহলে ইমাম নিয়ে নিশ্চয়ই বিতর্কে যেতেন না। যারা জাতীয় মসজিদের ইমাম নিয়ে বিতর্ক তোলেন, মসজিদের ইমামকে নানান বোমাবাজি এমনকি কথিত সরকার উৎখাতের আন্দোলনেও জড়িত করেন তারা আর যাই হোক প্রকৃত ঈমানদার নন। তাদের জানা উচিত—একজন ঈমাম শুধু তার নিজের নয় বরং তার পিছনে থাকা অগণিত মুক্তাদীদের নামাজের দায়িত্ব পালন করেন যা ঈমান আকিদার বিবেচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এখানে একথা উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশে এমন অনেক ধর্মদ্রোহী রাজনীতিক রয়েছেন, যারা ধর্মকে আশ্রয় করে নিজেদের অসৎ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে মসজিদের ইমামতি পর্যন্ত করেছেন। এই শ্রেণীর রাজনীতিক নেতাদের হাতে ঈমান, আকিদা নিরাপদ থাকতে পারে না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের তৌওহিদি জনতা যদিও সতর্ক রয়েছে তবুও প্রয়োজন রয়েছে চোখ-কান খোলা রাখার, আরো সতর্কতার। যাতে এমন কোনো ভুল না হয়ে যায় যে পথে ঐ ধর্মবিদ্বেষীরা আবার ক্ষমতার মসনদে ভিড় জমায়।

উনিষ

মে মাসের শেষ সপ্তাহ চলছে। আর কদিন পর জুন মাস। বলতে গেলে নিয়মানুযায়ী আর এক/দুই মাস পর হয়তো ক্ষমতার বদল হতে পারে। ভিন্ন কিছু না ঘটলে হয়তো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবে। দেশে আবার একটি নতুন নির্বাচন প্রস্তুতি শুরু হবে। ইতিমধ্যে তার আলামতও শুরু হয়েছে। বিরোধী দলের নেত্রী খালেদা জিয়া ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনায় বলেছেন, বড় কিছু না ঘটলে তিনি আগামী দু'মাসে হরতাল দিবেন না। বিদেশীদের সাথে করমর্দন করে দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, হরতাল না করার ঘোষণা দেয়ার জন্য বিরোধী নেত্রীকে ধন্যবাদ। তবে তিনি একথা বলেননি যে, উল্লেখিত দু'মাসের মধ্যে তিনি ভিন্ন কিছু করবেন না। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর গত ১৮ মে প্রকাশিত পত্রিকার খবরানুযায়ী দেখা যায় যে তিনি আগামী ১৯ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের শিশু সংস্থার বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন বলে জাতিসংঘ মহাসচিবকে জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কি করতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে আগে অনুমানভিত্তিক খবরও প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে নানা ধরনের আলামতও এই ব্যাপারে পরিষ্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কোনো কোনো সংবাদপত্রে এমন আভাসও দেয়া হয়েছে যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকার অনুকূলে নানা দেশের উদাহরণ গ্রহণ করে তা থেকে ফায়দা আদায়ের চেষ্টা করছেন। যতো ব্যবস্থাই তিনি গ্রহণ করুন না কেন অথবা যা কিছুই তিনি করতে চাচ্ছেন, তার আসল

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যটা তিনি নিজেই জনসভায় প্রকাশ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য জনসভায় আরেক টার্ম ক্ষমতায় থাকার কায়েশ ব্যক্ত করেছেন তিনি। মনের আশা প্রকাশ করতে যেমন কোনো দোষ নেই, তেমনি ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করাও অন্যায় নয়। শুধু প্রশ্ন হচ্ছে তিনি এ কাজটি গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণে করছেন, না অন্য কিছু। এক টার্ম ক্ষমতায় থেকে দেশ এবং জনগণের যে হাল তিনি করেছেন, আরেক টার্ম ক্ষমতায় যাওয়ার পরে দেশের হাল কি হতে পারে সে কথা ভাববার সুযোগও সম্ভবত এখন আর নেই। তবুও বলা যায় ক্ষমতা ছেড়ে সত্যিকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিন এবং নির্বাচনে যদি বিজয়ী হন তাহলে আবার আসবেন, আর নয়তো যা হবার তাই হবেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর উচিত ক্ষমতা ছেড়ে একজন সাধারণের বেশে নির্বাচনের মাঠে নেমে নিজের খায়েশের কথা ব্যক্ত করা। কিন্তু মনে হচ্ছে ক্ষমতা ছাড়ুন বা না ছাড়ুন নিজেকে ক্ষমতাবান রাখার যে চেষ্টা তিনি করছেন, সে আলামত খুব ভালো মনে হচ্ছে না। ক্ষমতা ছেড়ে অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় নিজেকে ক্ষমতাবান রাখার এই প্রচেষ্টায় দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ভিন্ন দিকে মোড় নিতে পারে। হয়তো এমনও হতে পারে যে, তিনি নিজেকে তার অন্যদের চেয়ে আলাদা ভেবে একটি আলাদা অবস্থান গড়ার যে চেষ্টা করছেন তার পেছনে নানা কারণ থেকে থাকতে পারে। যাহোক, হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই পুরো ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আরো এক টার্ম ক্ষমতায় থাকার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর খায়েশের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ আরো দু'টি ঘটনা এ মাসেই ঘটেছে। একটি হলো, এ মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হটিয়ে সাবেক সেনাপ্রধান লে. জে. নাসিম রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন ১৯৯৬ সালের ২০ মে এবং ১৯৮১ সালের ৩০ মে সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমান শহীদ হন। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে এ দুটি দিনকে কোনো অবস্থাতেই খাটো করে দেখা যাবে না। দুনিয়াব্যাপী মে মাসের গুরুত্ব ১ মে'র জন্য। ঐ দিন মার্কিন মুল্লুকে সংঘটিত শ্রমিক হত্যার বিরুদ্ধে আজো দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ ফুঁসে ওঠে। বাংলাদেশের সাধারণ এবং শ্রমিক শ্রেণীর মানুষেরা এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালন করে থাকে। বিশ্বের দেশ ও জাতির চেয়ে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এ মাসের গুরুত্ব বেশি হবার কারণ, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ১৯৮১ এবং ৯৬ সালের মধ্যে ব্যবধান ১৫ বছর হলেও জিয়া হত্যা এবং জেনারেল নাসিমের অভ্যুত্থান চেষ্টার মধ্যে ঐক্য রয়েছে। যে কারণে ৮১ সালের ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করা হয়েছিলো, সেই কারণে এবং তাদের প্রেক্ষাতাই ৯৬ সালের ২০ মে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলো। এখনো এই ইতিহাসের অনেক কথাই অজানা রয়েছে। সেই সব ঘটনার সাথে যারা যুক্ত ছিলেন, তাদের অনেকেই এখনো সামরিকবাহিনীতে রয়েছেন। তবে ঐ ঘটনা থেকে যে প্রকৃত সত্যটি বেরিয়ে এসেছিলো তা হলো, একটি দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে তদস্থলে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলো এমন এক শক্তি যাদের রাজনৈতিক আনুগত্য ছিলো দেশের বাইরে। যারা সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে মদদ দিয়েছিলেন তাদের অনেকেই নানা কথার ছলে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নিন্দা করে থাকেন। তারা বলে থাকেন, একটি গণতান্ত্রিক সরকার নাকি উচ্ছেদ হয়েছিলো আগস্ট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। তারা এরকমও বলতে চান যে, বাকশাল বা ফ্যাসিজম যাই হোক না কেন, এটা ছিলো একটি গণতান্ত্রিক রীতি। তারা আসলে সত্যকে এড়িয়ে যেতে চাইলেও নির্মম সত্য তাদেরকে গ্রাস করেছিলো। আর সেই কারণেই ৯৬-এর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছে। সেই ঘটনার পুনর্বিবরণ এবং রাজনৈতিক

www.pathagar.com

সখ্যতার সঠিক চিত্র নির্মোহভাবে হয়তো একদিন প্রকাশিত হবে। এখানে বলা দরকার যতোটুকু জাতির সামনে প্রকাশিত হয়েছে তাও ঐ ঘটনা বুঝার জন্য কম নয়। প্রকৃত ঘটনার কারণ এবং ঘটনা অধিকাংশ সময়ই রহস্যাবৃত থাকে। তবুও ঘটনার বিস্তৃতি এবং পরিস্থিতি পরিবেশ থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা করে লাভ নেই। এটুকু বলা ভালো যে, জেনারেল নাসিম যাদেরকে ক্ষমতা থেকে হটাতে চেয়েছিলেন, তাঁরা ক্ষমতা থেকে সরেছে, তবে তার হাতে নয়।

রাজনীতির ইতিহাস বড়ই নির্মম। যিনি ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন, তিনি নয় বরং তাদের রাজনৈতিক প্রভুরাই পালাবদলের মধ্যে ক্ষমতা দখল করেছে। আর এই ক্ষমতার শেষলগ্নে এসে আবার সেই মে মাসে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আরেক টার্ম ক্ষমতায় থাকতে চাইলেন। হিসেব মিলালে দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যই আসল রাজনৈতিক চাল। কম করে অন্তত ১০ বছর আওয়ামী লীগকে কি করে ক্ষমতায় রাখা যায়, তার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিলো ১৯৮১ সালে। ৭৫-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে তৎকালীন শাসকদের যেসব পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গিয়েছিলো। তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই নতুন চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠেছিলো। বর্তমান পরিস্থিতি হয়তো সেই দিকেই যাচ্ছে। একে মোকাবেলা করতে হলে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব যাদের ওপর পড়বে তারা হলো বিরোধী দল। জনগণ অপেক্ষা করে আছে বিরোধী দল কি করে তা দেখার জন্য। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সকলের বিবেচনা করে দেখা দরকার কেন মে মাসেই বারবার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। অর্থাৎ মে মাসের গুরুরহস্য কি, কেন বাংলাদেশের ভাগ্যলিখনে মে মাস একটি কালো তিলক হয়ে আছে।

বিশ

সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচ. এম. এরশাদ-এর শাসনামলে দেশে দুর্নীতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে শুরু করে। যদিও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনামলের পর। এর আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী তিন বছর অর্থাৎ ৭২ থেকে '৭৫ সালকে বলা হয়ে থাকে গত ৩০ বছরে দুর্নীতির রেকর্ডইয়ার। ওই তিন বছরে বিদেশ থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য আসা সাহায্য ত্রাণ থেকে শুরু করে সমুদয় অর্থসামগ্রী লুটে-পুটে খেয়েছে আওয়ামী দুঃশাসকেরা। এই লুটপাট নিয়ে দেশে-বিদেশে কম লেখালেখি হয়নি। '৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ক্ষমতায় আসেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। বাংলাদেশে গত ৩০ বছরের শাসনে জিয়ার আমলকেই ভালো শাসনের রেকর্ড ধরা হয়। ওই সময়কে দুর্নীতিমুক্ত শাসন বলা না গেলেও কোনো অবস্থাতেই দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন বলা যাবে না। বিশেষ করে ৭২-৭৫ সালের বিবেচনায় গ্রহণ করলে জিয়ার আমলকে স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। যদিও ওই সময়কার সরকারের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ ঐ শাসনামলকে অন্য অভিযোগে অভিযুক্ত করে থাকে। থাক সে কথা। আসলে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ক্ষমতাসীনরা যে দুর্নীতি শুরু করেছিলো সেই দুর্নীতিতে প্রথম ছেদ পড়ে ৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। মিষ্টির হাঁড়িতে মুখ দেওয়ার পর হাড়ি গলায় আটকে গেলে একটি বিশেষ প্রাণীর যে দশা হয় ওই সময়টা ছিলো আওয়ামী লীগের জন্য তদ্রূপ। খেতে খেতে হঠাৎ করে ব্যবচ্ছেদ হয়ে গেলো তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের। কিন্তু তারা বসে থাকলো না। নানা কায়দা-কানুন করে তত্ত্বাবধায়ক

www.pathagar.com

সরকারের ওপর ভর করে আবার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় ফিরে আসে এবং পাঁচ বছরেরও অধিককাল ক্ষমতায় থাকে। এই শাসনামলেও আওয়ামী লীগ দুর্নীতির জন্য দুনিয়াব্যাপী নিন্দিত হয়েছে। তাদের ক্ষমতার শেষ দিকে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে স্থান পেয়েছে। সুতরাং বোঝা যায় যে, উল্লেখিত পাঁচ বছরে এমন কোনো দুর্নীতি নেই যা তারা করেনি। সময় আরো যদি তাদের হাতে থাকতো তাহলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আওয়ামী দুর্নীতি কোনো নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা ছিলো না। একে শুধুমাত্র আর্থিক দুর্নীতি বলে অভিহিত করে কোনো লাভ নেই। আসলে যতো ধরনের দুর্নীতি একদল শাসক নামক সন্ত্রাসীদের পক্ষে করো সম্ভব তার সবটাই তারা সম্পন্ন করেছে। সমাজকে নৈতিক অবক্ষয়ে পূর্ণ করে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক সবক্ষেত্রকেই পরিণত করেছে দুর্নীতির আখড়ায়। ধর্মস্থান থেকে শুরু করে বস্তি পর্যন্ত সর্বত্রই আওয়ামী দুঃশাসন এবং দুর্নীতি দগদগে ঘা করে রেখেছে। এ দুর্নীতি শুধুমাত্র আপাত টার্গেটকে সামনে রেখে করা হয়েছে তা হয়তো নয়। বরং একটি সুনির্দিষ্ট টার্গেট এর জন্য কাজ করেছে। এই টার্গেট সম্পর্কে ইতিমধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়েছে, তবে সামনে হয়তো বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশকে ডিমুসলিমাইজ করে এ দেশ থেকে আধিপত্যবাদ বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করাই আওয়ামী শাসকদের প্রধান টার্গেট।

সুতরাং এই টার্গেট পূরণে তারা স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসূচি যে গ্রহণ করেছে তা বুঝতে না পারার কথা নয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, '৭২-৭৫ সালে তৎকালীন ক্ষমতায় থাকার সময় যে সব চুক্তি তারা করেছিলো তার মধ্যে অন্যতম ছিলো ভারত-বাংলা ২৫ শালা চুক্তি। এই চুক্তি সম্পাদনের ২৫ বছর পর ক্ষমতায় এসে ওই চুক্তি নবায়ন না করলেও আওয়ামী শাসকরা ভারতের সাথে গঙ্গার পানি নিয়ে ত্রিশ বছরের আরেকটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। এছাড়াও কথিত-অকথিত আরো অনেক আলোচনা যে তাদের হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এসব আলোচনা সময়ের অভাবে কোনো কার্যে পরিণত হতে পারেনি। শুধু আওয়ামী শাসক নয় বরং যে সব অত্যাচারী গণদুশমনরা অতীতে দেশে দেশে ক্ষমতাসীন হয়েছে তাদের ক্ষমতাচ্যুত হবার পরেও নানা দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। পত্রিকান্তরে খবর বেরিয়েছে ফিলিপাইনের প্রায়ত একনায়ক ফার্দিনা মার্কোস ৮শ কোটি ডলার মূল্যমানের ৯শ চল্লিশ টন ওজনের খাঁটি স্বর্ণের বার উত্তর কোরিয়ার প্রয়াত নেতা কিম ইল সুং-এর নামে সুইসব্যাংকে জমা রেখেছিলেন। সিউলের একটি পত্রিকা ঐ গোপন একাউন্টের সার্টিফিকেট ছেপে বলেছে, সত্তর সালের এগার সেপ্টেম্বর কিম ইল সুং-এর নামে এই গোপন ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়। বাংলাদেশে ৯ বছর শাসন করেছে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ। তার ক্ষমতাবসানের পর এবং এখনো বিভিন্ন ব্যাংকে তার একাউন্টের খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এসব একাউন্টের অর্থ বৈধ বা অবৈধ সে প্রশ্ন অবান্তর। আওয়ামী শাসনাবসানের পরও এ প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয় যে, ঐ সরকার কত অর্থ পাচার করেছে এবং তা কোথায় রেখেছে। সে বিবেচনায় এর একটি হদিস বের করা দরকার। অনেকে বলে থাকেন নির্বাচনের জন্য নয় বরং আগামী কয়েক বছর দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যেই আওঁয়ামী শাসকরা দুহাতে অর্থ সংগ্রহ করে রেখেছে। মার্কোস এবং কিম-এর মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শের কোনো মিল না থাকলেও যেমন দুর্নীতির মিল খুঁজে পাওয়া গেছে; তেমনি ডান-বাম সত্য-মিথ্যার বিচার না করে বিগত সরকার কার কাছে কোথায় কি জমা রেখেছে তাঁ খুঁজে দেখা দরকার। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই

www.pathagar.com

লুটপাটের নীতিতে বিশ্বাসীদের অবস্থান একেবারে কম নয়। দেখা যায় ক্ষমতা হারাবার পরপরই একে অন্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে থাকে। সম্প্রতি বেগম জিয়া বর্তমান সরকাকে আওয়ামী দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন। আসলে আওয়ামী দুর্নীতির শ্বেতপত্র সরকার প্রকাশ করুক বা না করুক এই দুর্নীতির চিত্র মানুষের মনে গেঁথে রয়েছে। যদি সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের সুযোগ এ জাতির সামনে সত্যিই আসে তাহলে জনগণ ঠিকই প্রমাণ করে দেবে যে তারা বাঙালি দুর্নীতিবাজদের পছন্দ করে না। কিন্তু এ ব্যালটই শেষ কথা নয়। কমপক্ষে গত পাঁচ বছরে সাবেক আওয়ামী সরকার জনগণের কত অর্থ আত্মসাৎ করেছে তার সঠিক পরিসংখ্যান বের করে অভিযুক্তদের শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। এবং ঐ সকল দুর্নীতিবাজরা যাতে পুণরায় নির্বাচনের প্রার্থী হতে না পারে তার জন্য কিছু করণীয় থাকলে করা দরকার। ইতিমধ্যে অনেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দু'একটি কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাদের ক্ষমতার আওতা নিয়েও কথা বলতে শুরু করেছেন। এক্ষেত্রে শুধু এইটুকু উল্লেখ করা দরকার যে কোনো সরকার যখন ক্ষমতায় থাকে তখন তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে এবং এ দায়িত্ব কর্তব্যের প্রথম পদক্ষেপ হলো জনগণের সম্পদ রক্ষা করা। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি জনগণের সম্পদ রক্ষার্থে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাকে জনকল্যাণমুখী বলা যেতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই তা নিয়ে দেশপ্রেমিকদের মনে প্রশ্ন ওঠার কথা নয়। প্রকৃত পক্ষে দেশ এখন দু'ভাগে বিভক্ত। একটি আওয়ামী শিবির অন্যটি আওয়ামী বিরোধী শিবির। সুতরাং আগামী নির্বাচনে আওয়ামীমুক্ত সংসদ গঠন করা সম্ভব হলেই প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব।

একুশ

খবরটি খুব বড় ছিলো না। অন্যান্য দিনের মতোই নাম-পরিচয়হীন লাশের খবরের সাথেই ছাপা হয়েছে। প্রথম দিন খবরটি পাঠ করে মনে মনে দুঃখ অনুভব করেছি। তবে পরের দিন ফলোআপ রিপোর্ট দেখে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। নিজের মনের কাছে নিজেই প্রশ্ন করেছি— আসলে আমাদের চারপাশের সমাজে যা কিছু ঘটছে এতে কি আমাদের কিছু করণীয় আছে নাকি আমরা নিজেরাই এসব করছি। মনে হয়েছে দিনদিন পরিস্থিতি যে দিকে এগুচ্ছে তাতে কি সত্য ও মিথ্যা আদর্শ এবং নৈতিকতার কোনো বালাই থাকবে না অথবা এমন সময় কি আসতে পারে যখন সত্য-মিথ্যাকে আর চিহ্নিত করা সম্ভব হবে না।

এখন সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে রাজনীতি এবং সন্ত্রাস নিয়ে। প্রতিদিন প্রায় সব দলের নেতাকর্মীই আলোচনা করছেন সন্ত্রাস প্রসঙ্গে। পত্রিকার পাতায়ও অস্ত্র, সন্ত্রাস নিয়মিত স্থান জুড়ে আছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতো ঘনিয়ে আসছে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ ততোই যেনো প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। ইতোমধ্যেই সাবেক মন্ত্রীপুত্রের কাছ থেকে অত্যাধুনিক একে-৪৭ রাইফেল, ডাব লেবুর ট্রাক থেকে এম-১৬ রাইফেল পাওয়া গেছে। উদ্ধারকৃত এম-১৬ সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমাদের সেনাবাহিনীর কাছেও এসব অস্ত্র নেই। সুতরাং দেশের সন্ত্রাস কোন দিকে মোড় নিতে পারে এবং নির্বাচন শুরু হলে সন্ত্রাসী পরিস্থিতি কি আকার ধারণ করতে পারে এসব নিয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও পরিস্থিতি আঁচ করা কঠিন নয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে এসবের জন্য দায়ী কে বা কারা? মন্ত্রীপুত্রের কাছে পাওয়া একে-৪৭ রাইফেল নিয়ে কোনো কোনো পত্রিকা রিপোর্ট করতে গিয়ে এমন ধারণাও

www.pathagar.com

দিয়েছে যে, প্রাপ্ত অস্ত্রটি নাকি অকার্যকর এবং গোটা ব্যাপারটিই নাকি একটি ষড়যন্ত্র। মন্ত্রীপুত্রের গাড়িতে পাওয়া অস্ত্রকে ষড়যন্ত্র, আমলাদের পরিবর্তনকে অতিসূক্ষ্ম কারচুপি আর আওয়ামী লীগের বিরোধিতাকে স্বাধীনতার বিরোধিতা বলে আওয়ামী শিবির এক নতুন তথ্য সন্ত্রাস শুরু করেছে। তাদের এই ফ্যাশান নতুন নয়। '৭২ সাল থেকে এই গাজীর গীত তারা গাইছে। কথায় কথায় রাজাকার রাজাকার বলে চিৎকার করে বাজার মাত করার অপচেষ্টায় তারা অনেক দিন থেকে লিপ্ত। আসলে আওয়ামী শিবির কি চায়? এ ব্যাপারটি ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তারা বাংলাদেশকে এমন এক রাজ্যে পরিণত করতে চায় যেখানে আধিপত্যবাদবিরোধিরা কেউ থাকবে না। তাদের ভাষায় এক মহাগণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করবে। যেখানে শুধু বিচরণ থাকবে ভারতপ্রেমিকদের। এই সন্ত্রাসী ভারতপ্রেমিকরা আসলে রাজনীতিবিদ কিনা এবং তাদের সত্যিকার পরিণতি কি হতে পারে সে নিয়েই ভাবছিলাম উল্লেখিত রিপোর্ট প্রসঙ্গে।

৬ আগস্ট সোমবার রেলওয়ে পুলিশ বনানী স্টেশন এলাকার রেললাইন থেকে যুবক-যুবতীর লাশ উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত লাশের পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে, অবৈধ দেহব্যবসার বলি হলো দুই যুবক-যুবতী। নিউএয়ারপোর্ট এলাকার একটি আবাসিক হোটেলে গড়ে ওঠা দেহব্যবসার আস্তনায় ছিলো ওরা দুজন। রাতে পুলিশ হানা দিলো পাঁচতালা থেকে পড়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে। হোটেলের লোকজন লাশ ফেলে দিয়েছিলো রেললাইনের ধারে। আর পরের দিন রেলপুলিশ নাকি সে লাশই উদ্ধার করেছে। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে পুলিশের সূত্রে বলা হয়েছে, গভীর রাতে নিউএয়ারপোর্ট এলাকার ওই বিলাশবহুল হোটেলে পুলিশ হানা দিলে আতঙ্কিত দেহব্যবসায়ী, তরুণী ও খদ্দেররা ছোটাছুটি শুরু করে। হোটেলের ৪ তলায় এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ছাত্র আবদুল্লাহ আল বাকি ও তার প্রেমিকাও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং পালাতে ব্যর্থ হয়ে লুকানোর চেষ্টা করে লিফটের খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে গেলে পাঁচ তলার নিচে পড়ে যায় এবং মৃত্যু হয়। কোনোক্রমে এদের দুজনের কেউ যদি বেঁচে থাকতো তাহলে হয়তো প্রকৃত ঘটনার বিবরণ পাওয়া যেতো অথবা হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও মামলা ঠুকে দিতে পারতো।

আমাদের আলোচ্য বিষয় সেদিকে না নিয়ে আমরা বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করছি দেহব্যবসায়ী এবং প্রেমিকপ্রেমিকার পরিণতি এক হলো কেন? প্রেম কি দেহব্যবসার রূপ ধারণ করেছে? নাকি প্রেমেও একধরনের দেহব্যবসা আছে? বলার অপেক্ষা রাখে না প্রেমের একটি ব্যাপার যখন পতিতাবৃত্তির সমান সমান হয়ে দাঁড়ায় তখন সত্যিই আমাদের সমাজের চারপাশের পরিবেশ এবং সমাজপতিদের কথা ভেবে দুঃখ এবং করুণার উদ্রেক করে। সেই সাথে এই ভেবে দুঃখ আরো বেড়ে যায় যে বিগত ৩০ বছরে আমাদের সমাজে রাজনীতির নামে সমাজবিনির্মাণের জন্য যা কিছু ঘটেছে তা কি রাজনীতি নামে ভণ্ডামী। যে নীতির প্রধান হলো দেশপ্রেমের সেখানে দেশপ্রেম বর্জন করে এমন একশ্রেণীর রাজনীতি নামধারীরা মাঠে বিচরণ করছেন, যাদের কোনো অবস্থাতেই দেশপ্রেমিক বলে আখ্যায়িত করা যাবে না।

সত্যি বলতে কি বাংলাদেশ আজ যে বিশ্বের সেরা দুর্নীতিবাজ দেশে পরিণত হয়েছে তার কারণ এইসব রাজনীতিক নামধারী টাউটবাটপাররা। জোর দিয়েই বলা যায়, নিছক প্রেমালাপের জন্য কেউ যেমন নিশিরাতে অভিভাবকের কড়া চোখের পাহারা পেরিয়ে হোটেলে আসে না তেমনি রাজনীতি করার জন্যও এতো ভড়ং-এর প্রয়োজন হয় না। মনের

www.pathagar.com

পবিত্রতা নষ্ট করে অন্য কিছুই মানুষকে মনুষ্যপদবাচ্য বলে ধরে রাখতে পারে না। কারণ মানুষের সাথে অন্য সকলের পার্থক্য মন ও বিবেকের। বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে মনে হয় নির্বাচনে জয়ের জন্য অনেকেই যেনো বিবেকবোধ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে আছে।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার আগেই অতিসূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন। এরাই ৯১ সালে নির্বাচনের পর সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ তুলে সংসদ বয়কট করেছিলেন। আসন্ন নির্বাচনে তাই সকলের মনে রাখা দরকার যাতে প্রকৃত দেশপ্রেমিকরা নির্বাচিত হন। অন্তত রাজনীতির নামে পরজীবিরা যেন পুনরায় নির্বাচিত না হতে পারে সেদিকেই সকলের খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

বাইশ

হত্যা, ক্যু, সামরিক অভ্যুত্থান এই সব শব্দাবলী গত কয়েক বছরে এত শতবার উচ্চারিত হয়েছে যে, জনগণ এই সব শব্দের অর্থ এবং দেশের প্রয়োজনে সামরিক বাহিনী সংরক্ষণের মধ্যকার পার্থক্য গুলিয়ে ফেলেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রায় ২১ বছর পর বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ায় দেশের রাজনীতিতে যে গুণগত এবং মৌলিক পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের প্রতিরক্ষা। প্রতিরক্ষার বিষয়টি শুধু আমাদের দেশেই নয়, রাষ্ট্রচিন্তার শুরু থেকেই নানাভাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর মানচিত্রে যত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তার মধ্যে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেই প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চিন্তা রয়েছে। বিভাজিত বিশ্বে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞায় প্রতিরক্ষা চিন্তা একটি মৌলিক বিষয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এই ধারণা জন্মাবে যে, সকল রাষ্ট্রনায়কেরই প্রতিরক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থা ছিল। আদি সমাজ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার যতগুলো স্তরের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় সব ক্ষেত্রেই কোনো না কোনোভাবে প্রতিরক্ষা বিষয়ক চিন্তা কাজ করছে। সেই সাথে প্রতিরক্ষা বিষয় নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়নি, একথাও ঠিক নয়। একজন রাষ্ট্রশাসক বা রাষ্ট্রনায়ক যোদ্ধা কিংবা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত হবেন কিনা এ সব বিষয় নিয়েও দীর্ঘদিন বিতর্ক চলেছে। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা আমলে শাসকগণ নিজেরাই যুদ্ধবিদ্যা জানতেন বলে এবং জেহাদ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি কর্তব্য বিধায় রাষ্ট্রের নাগরিকদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মোহাম্মদ (সঃ) একদিকে যেমন রাষ্ট্রনায়ক অন্যদিকে যোদ্ধাও ছিলেন। তিনি নিজে রাষ্ট্র এবং যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সামরিক ধারণা প্রাচীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সেই ধারণা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সামরিক বাহিনী শক্তিশালী করেছে। ১৭৯৩ সালে শত্রুর বিরুদ্ধে সেনা সংগঠিত করার লক্ষ্যে ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকার মিলিটারি মবিলাইজেশানের লক্ষ্যে শক্তসামর্থ্যদের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানায়। সমাজে মিলিটারিজমের ধারণাও পুরনো। আশীরিয় সমাজে এ ধরনের বিশ্বাস ছিল যে, সমাজকল্যাণের জন্য সামরিক গুণাবলী আনুগত্য প্রয়োজন। ১৭০০ দশকে ইউরোপীয় দেশসমূহ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়। ফরাসী বিপ্লবের পর ইউরোপীয় বহু দেশে

www.pathagar.com

মিলিটারিজমের উন্নয়ন সাধন করা হয়। এমনকি দেশ শাসনের জন্য রাজনীতির সাথে সামরিক বিষয়কে যুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মিলিটারিজম রাজনীতিতে প্রবেশ করে এবং যুদ্ধের পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে ফ্রান্সের সেনাবাহিনী সেখানকার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রতিরক্ষা এবং রাষ্ট্রশাসন চিন্তার মধ্যে সমন্বয় না থাকলে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় তার উদাহরণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে। যে সকল দেশের রাষ্ট্রনায়করা তাদের রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিরক্ষাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছেন সেখানেই সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। প্রশ্নটি দেশপ্রেম এবং দেশদ্রোহিতার। এই সূত্র ধরেই বিশ্বের অনেক দেশে আধুনিককালে সামরিক শাসনের অভ্যুদয় হয়েছে। সামরিক শাসন শুধু যে সামরিক ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই হয়েছে তা নয়, বেসামরিকদের দ্বারাও সামরিক শাসন জারি হয়েছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ যখনই ব্যর্থ হয় তখন সামরিক ব্যবস্থাপনায় সামরিক আইন জারি করা হয়। আমাদের দেশ সামরিক শাসনের ধারণা প্রথম লাভ করে পাকিস্তান আমলে। ১৯৫৬ সালে মেজর জেনারেল ইসকান্দর মীর্জা পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালনের শুরু থেকেই সামরিক শাসনের আলামত শুরু হয়। প্রকৃত সামরিক শাসন জারি হয় ১৯৫৮ সালে যখন জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের সামরিক শাসনের ভিত্তি ও যুক্তি হিসেবে প্রধানত তারা বৈরী প্রতিবেশীর হুমকিকেই বিবেচনা করে। যদিও পাকিস্তানের সামরিক শাসন নিয়ে নানা আলোচনা রয়েছে। সে যাই হোক, দীর্ঘ সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভীত শক্ত হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল আইয়ুবের পতন ঘটে। গত কয়েক বছর বেসামরিক সরকার কায়েম থাকলেও সেখানে নতুন করে সামরিক শাসন জারি হয়েছে। বর্তমান সামরিক শাসন সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের জনগণ সামরিক শাসনের পক্ষেই বক্তব্য দিয়েছে। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশসমূহ চাক বা না চাক পাকিস্তানের জনগণ সামরিক ব্যবস্থাপনাকেই সঠিক বলে মনে করে।

পাকিস্তানের সামরিক শাসনবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন সূচিত হলেও ন' মাসের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় প্রস্তুতিবিহীন অবস্থাতে। সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নিরস্ত্র জনগণকে নির্ভর করতে হয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক এবং আধা সামরিক বাহিনীর ওপর। ভারত প্রবাসী অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানালেও তারা মূলত ভারতীয় প্রশিক্ষণের ওপরেই নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ফলে তখন থেকেই মিলিটারাইজেশনের ধারণায় ব্যত্যয় ঘটে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়কের সাথে মতপার্থক্যের সূত্রপাত গোড়া থেকে শুরু হয়। যার ফলে দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও নানা বাহিনীর নাম পাওয়া যায়। ভারতে অবস্থানকালে বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী যে ৭টি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ৩টি চুক্তি হচ্ছে—

এক. ভারতীয় সামরিকদের তত্ত্বাবধানে আধা সামরিক বাহিনী গঠন করা হবে। গুরুত্বের দিক হতে এবং অস্ত্রশস্ত্রে ও সংখ্যায় এই বাহিনী বাংলাদেশের মূল সামরিক বাহিনী হতে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ হবে (যথা রক্ষীবাহিনী)।

www.pathagar.com

দুই. ভারত হতে সমরোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতে হবে এবং ভারতীয় সমরবিদদের পরামর্শ অনুযায়ী তা করতে হবে।

তিন. ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে সম্পাদিত সামরিক চুক্তি অনুযায়ী ভারত যে কোনো সময় যে কোনো সংখ্যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে এবং বাধাদানকারী শক্তিকে চুরমার করে অগ্রসর হতে পারবে।

এই চুক্তির পরিমার্জিতরূপ হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্য ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ বঙ্গভবনে ২৫ বছরের 'বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর চুক্তিটি আর হুবহু নবায়ন করা হয়নি।

পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের বিবেচনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষিত কিছুটা আলাদা। বাংলাদেশ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক আয়তন নিয়েই গঠিত হয়েছে। তবে প্রধান বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়ই। যত রকম মতপার্থক্যই থাকুক না কেন এ কথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী সুষ্ঠুভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি সেক্টরের দায়িত্বে নিয়োজিত সেক্টর কমান্ডরগণ ছিলেন পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়া সামরিক ব্যক্তি। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সুরক্ষা এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার সাথে সামরিক ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলে রয়েছে।

কোনো কোনো মহল থেকে বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী দেশের কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী মনে করেন, বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর কোনো প্রয়োজন নেই। এই ধারণা যে অমূলক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সেকথা না বললেও চলে। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা আর বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব বিলুপ্তির কথা একই সমান্তরালে অবস্থান করে। সেদিক থেকে সামরিক বাহিনীবিরোধী ধারণা এবং স্বাধীনতার আপ্তবাক্য উচ্চারণ করা পরস্পরবিরোধী। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সামরিক নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে আলাপ-আলোচনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে যা থেকে বাংলাদেশের জনগণের মনে সেনাবাহিনীবিরোধী ধারণার জন্ম হতে পারে, যা মূলত আমাদের প্রতিরক্ষা ধারণার বিপরীত। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী কিভাবে গড়ে উঠবে অথবা এর বাজেট কত হবে, সামরিক বাজেট অন্য কোনো খাতের চেয়ে উপরে থাকবে কি থাকবে না—এসব বিতর্কের কোনো বিষয় হতে পারে না। বরং এই সমস্ত ক্ষেত্রে যারা জাতীয় ঐক্যমতের বাহানায় নানা প্রশ্ন তুলছেন তারা থলের বিড়াল বের হয়ে যাওয়ার ভয়ে নানা ছদ্মবেশ ধারণ করছেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সামরিক ধারণা কারো দয়ার দান নয়। এটি জনগণের রক্তে, ঘামে, শ্রমে, মেধায় গঠিত এবং বিকশিত হয়েছে। বিশ্ব আকাশে লাল-সবুজের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার দৃঢ় অঙ্গীকার রয়েছে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার। আর সে কারণেই যারা প্রতিরক্ষা ধারণার বিপরীতে অবস্থান করছেন তাদের অবশ্যই রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে মত পাল্টাতে হবে।

www.pathagar.com

তেইশ

বর্তমান সময়কে বুঝতে গিয়ে পুরনো দিনের দু'একটি কাগজের লেখালেখির দিকে চোখ বুলাচ্ছিলাম। দুজন বিখ্যাত সাংবাদিকের লেখার দিকে দৃষ্টি পড়তেই মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। এই দুজন সাংবাদিকই ব্যক্তিগত এবং পেশাগত পরিচয়ে বাংলাদেশে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। অন্য যা কিছু খারাপ করুক না কেন, এখনো তারা সাংবাদিকতা পেশায় আছেন, তবে স্থানচ্যুত হয়েছেন। প্রথম জন হচ্ছেন জনাব আবেদ খান। যখন তিনি ইত্তেফাকে কাজ করতেন তার তখনকার পরিচয় এবং বর্তমান পরিচয় এক নয়। এক সময় একজন আওয়ামী বিরোধী সাংবাদিক এবং সাংবাদিক নেতা হিসাবে তিনি যত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, সম্ভবত একজন আওয়ামী সাংবাদিক হিসাবে বর্তমানকালে তার খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা সে পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক ক্রান্তিকালে তিনি ওপেন সিক্রেট নামে ইত্তেফাকে কলম লিখে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সেই সময়কার বিডিআর প্রধান মি. সিআর দত্তের দম্ভোক্তিকে চুরমার করে দিয়ে আবেদ খান তার লেখায় জাতীয় স্বার্থ তুলে ধরেছিলেন। এ কাজ করার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবেও জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং বলা যায় তার ভাষায় কৌশল অবলম্বন না করলে তিনি হয়তো এতোদিন জীবিত থাকতেন না। তবে আজকের আলোচনা সেই সময়ের ইত্তেফাকের ওপেন সিক্রেট নয়, বরং বইয়ের ভাষায় ওপেন সিক্রেট বলতে যা বুঝায়, সেই রকম একটা কিছু হতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাকে জনাব আবেদ খান এ ধরনের একটি খবর লিখেছিলেন যে, স্বাধীনতার পর সায়েন্স ল্যাবরেটরির সামনের রাস্তায় পড়েছিল এক যুবতীর মৃতদেহ। নিহত এই যুবতী এতই সুন্দরী ছিল যে, অন্য সময় হলে হয়তো সাধারণের দৃষ্টি কুড়াত। কিন্তু স্বাধীনতার বিপক্ষে কাজ করার কারণে নিহত হয়েছে মনে করে কেউ সহানুভূতির সাথেই তাকাচ্ছে না।

অন্য লেখাটিও বেশ পুরনো তবে আলোচিত। বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক, সাংবাদিক মি. নির্মল সেনের। তিনি দৈনিক বাংলায় লিখেছিলেন, স্বাধীনতার পর মতিঝিলের রাস্তায় রাজাকার সন্দেহে পিটিয়ে মারা প্রসেঙ্গ। তার ঐ লেখায় এই ধরনের ঘটনার নিন্দা করা হয়েছিল এবং আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়ার জন্য সরকারি আহ্বানে সাড়া দেওয়ার কথা তিনি বলেছিলেন। যে বিখ্যাত লেখাটির কথা আমরা আলোচনা করছিলাম সেটি তিনি আরো পরে দৈনিক বাংলায় লিখেছিলেন। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও বাস্তবধর্মী লেখা হিসাবে সেটি স্থান পেয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই। তার ঐ লেখা সেই সময়কার সরকারের ব্যর্থতার নজির হয়েই নয় বরং তৎকালীন সময়ের সাধারণ নাগরিকদের অনুভূতির নজির হয়ে রয়েছে। যে কোনো পাঠকই ঐ লেখা পাঠ করে অনুভব করতে পারবেন যে, মি. সেন বেঁচে থাকার অধিকার না চেয়ে যখন স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি পেয়েছেন তখন স্বাভাবিক মৃত্যু যে সত্যিই কঠিন ছিল সেকথাই প্রমাণ করে। তবে এ কথাও সত্য যে, সে সময়ে প্রতিদিনের অসংখ্য মৃত্যুর খবরে অস্বাভাবিকতাই ছিলো প্রধান। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে ছিল রাহাজানি এবং প্রতিহিংসাজনিত খুন। সেই সময়টা বাংলাদেশের জন্য সত্যিই এক কঠিন সময় ছিল। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সেই দিনগুলো, যখন অস্ত্রের চেয়ে সহজলভ্য

www.pathagar.com

কোনো পণ্য ছিলো না, যেহেতু প্রায় সকল প্রাপ্ত বয়স্কেরই কোনো না কোনো অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ ছিল তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে অস্ত্রের অনুমতি না থাকলেও দলীয় ক্যাডার হিসাবে, জনযুদ্ধের সৈনিক হিসাবে, সরকারি বিপ্লবী বাহিনীর সদস্য হিসাবে অথবা লাল-নীল শব্দের মোড়কে অস্ত্র রাখাই ছিল প্রধান কথা। তখন মানুষের জীবনের চেয়ে দলীয় ক্যাডার অথবা বিপ্লবী কর্মীর দাম অনেক বেশি ছিলো। সুতরাং যে কোনো সূত্রেই সাধারণ মানুষ যে আক্রমণের শিকার হবে এতে অবাক হবার কিছু ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, কোন বাহিনী কখন কাকে টার্গেট করেছে তা জানার কোনো উপায় না থাকায় হয়তো দেখা যেত, পথ চলতে চলতে হঠাৎ উড়ে আসা বুলেটে বিদ্ধ হয়ে দেহ লাশে পরিণত হয়ে হাসপাতালের মর্গে যেত পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে অথবা ওয়ারিশ হয়ে আনজুমানের লাশবাহী গাড়িতে স্থান পেত। এই সাধারণ দৃশ্য মঞ্চায়নের প্রধান কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে, তৎকালীন সরকারের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নামে প্রশাসনিক ব্যর্থতাই প্রকট হয়ে উঠবে। অথবা বলা যেতে পারে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বলতে কি বুঝায় তা তারা বুঝতেন না। বরং প্রশাসনসহ সর্বত্র রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি করে কাউকে কাউকে নিজেদের দলে রেখে অন্যদের প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সহজ স্লোগান রাজাকার আলবদর লাগিয়ে দিয়ে নিজেরা যখন কর্তৃত্ব লাভের চেষ্টা করতেন তখনি শুরু হতো অনুসৃষ্টির পালা। ঐ সময়ে সরকার সত্যিকার অর্থে রাজাকার আলবদরদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহ দেখায়নি এবং দেখাবার মতো যোগ্যতাও তাদের ছিলো না। আসলে ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ার কারণে প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিকভাবে তারা এতোটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, সত্যিকারের কিছু ভাবার সুযোগ তাদের ছিলো না। আর সে কারণেই সাধারণের জনজীবনে নেমে এসেছিলো দুর্গতি। এই দুর্গতি লাঘব না করে আরো বাড়িয়ে তোলার অংশ হিসাবেই তারা তখন প্রতিপক্ষের নামের সঙ্গে রাজাকার জুড়ে দিয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতো।

প্রায় সিকি শতাব্দি পর সেই পুরনো কাহিনী তুলে আনাকে অনেকের কাছেই হয়তো বেখাপ্পা মনে হতে পারে কারণ সে সময় আর আজকের পরিস্থিতি এক নয় বলে অনেকে মনে করেন। অনেকেই মনে করতে চান যে, সময়ের হেরফের হলেও পরিস্থিতির খুব একটা হেরফের নেই। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে আততায়ীর গুলিতে যে অসংখ্য মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়, তার হোতা কারা? দেখা যাক, এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের পর দুই-একদিন সরকারের কেউ কেউ তৎপর থাকলেও তার পরে আর কোনো খবর নেই। দেখতে দেখতে খোদ রাজধানীতে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে এবং তার সর্বশেষ শিকারে পরিণত হলেন একজন তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল রাজনীতি সচেতন আইনজীবী। পুরনো ঢাকার এক রাজনীতিকের বাসায় পাকিস্তানি পতাকা পাওয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে নাকি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয়েছে। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে এই প্রত্যাশা সকলের। তবে আইনকে জোর করে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা গ্রহণযোগ্য নয়। পাকিস্তানি হবার জন্য যদি তারা আগ্রহী থেকে থাকে, সে অন্য কথা। তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, পাকিস্তান আমাদের স্বাধীনতার জন্য এখন আর কোনো হুমকি নয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা পাকিস্তানি পারমাণবিক আক্রমণের মুখে নষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ৪৭ সালে যে পাকিস্তান কায়েম হয়েছিল, তা ছিল আসলে একটি আদর্শ। কিন্তু ৭১ সালে রক্ষক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বর্বর সেনাদের আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে

www.pathagar.com

আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। সুতরাং ২০০০ মাইল দূর থেকে এসে পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমা তার নিকট প্রতিবেশীকে লক্ষ্য না করে আমাদেরকে আক্রমণ করবে এমনটা ভাবা উচিত নয়। অথচ আমাদের দেশে বর্তমানে পাকিস্তানি, পাকিস্তানি চরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার যে রাজনৈতিক স্ট্যান্ড নেওয়া হয়েছে, তাকে রাজনৈতিক বিকৃতি বলা ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। বিষয়টি যদি বিচ্ছিন্ন হতো তাহলে একে কারো মত বলে মনে করা যেত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যখন বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটসহ বিরোধীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের বিষোদগার করেন তখন একে আর খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। আর সেই সাথে গুপ্তহত্যা ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার প্রক্রিয়া যেভাবে বাড়ছে তাতেও অবাক হবার কোনো কারণ নেই।

হামলা-মামলা গ্রেফতারের শ্বেত সন্ত্রাসের পাশাপাশি বেসরকারি সন্ত্রাস যদি বর্তমান হারে চলতে থাকে, তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বিরোধী দল তো দূরের কথা সরকারি দলেরও কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং তখন প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী শূন্যস্থান পূরণ করবে অন্য কেউ। সম্ভবত সেরকম অবস্থা তৈরির জন্যই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তৈরি হচ্ছে নানা পরিকল্পনা।

চব্বিশ

রাজধানীর একটি থানার ওসি আসামির পিতার নাম থেকে এমপি শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য বাদীকে অনুরোধ করেছেন। মামলা থানায় দিতে হবে বিধায় বাদী ওসি সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করে যথারীতি সরকারি দল আওয়ামী লীগের এমপি বাদ দিয়েই আসামির বাবার নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। ঘটানাটি ঘটেছে ঢাকায় সাম্প্রতিককালের আলোচিত শিপু হত্যাকাণ্ড নিয়ে। গুলশানের মৈত্রী মার্কেটে নিহত ইফতেখার আহমেদ শিপুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে মামলা দায়ের করতে গিয়েই যত কাণ্ড। ঘটনাস্থলে এখনও পুলিশ পাহারায় রয়েছে। গত সোমবার ঐ মার্কেট এলাকায় গিয়ে পাহারারত পুলিশের একজন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : 'আপনারা কাকে পাহারা দিচ্ছেন? সন্ত্রাসীকে না আক্রান্তকে? নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ কর্মকর্তা মুচকি হেসে বললেন, 'নির্দেশ পালন করছি।'

যাই হোক, আমাদের মত দেশে পুলিশের ভূমিকা কী এবং কী হওয়া উচিত এ নিয়ে পরে একদিন আলোচনা করা যাবে। আজকে শিপু হত্যাকাণ্ড নিয়ে নানা মহলে শোনা নানা কথার দু'একটির অবতারণা করতে চাই। আর সেই সাথে গত কিছু দিনে ঘটে যাওয়া দু' একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। প্রায় সকলেরই মনে থাকার কথা, সন্ত্রাসের সাথে ক্ষমতাসীনদের পুত্র-কন্যা বা আত্মীয়স্বজনদের যোগসাজশের অভিযোগ নতুন নয়। কবে, কখন, কিভাবে এই সব বীর সন্তানেরা সাহসী বিজয়ের সূত্রপাত করেছিলেন তার সুনির্দিষ্ট তারিখ বলা যাবে না। তবে গবেষকগণ এ নিয়ে কাজ শুরু করলে সুনির্দিষ্ট তারিখও হয়তো পাওয়া যাবে। হয়তো তখন বেরিয়ে আসবে কোন কাগজে সর্বপ্রথম সাহসী অভিযানের খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

নিন্দুকেরা বলেছেন : একুশ বছরের জঞ্জাল পরিষ্কারের যারা দায়িত্ব নিয়েছেন তারা হয়তো পরিচ্ছন্নতার নামে কোথাও এক আধটু বেশি করে ফেলেছেন এই আর কি। তবে এই বাড়াবাড়ির ঘটনা এই প্রথমবারেই ঘটছে তা হয়তো নয়। বাংলাদেশে নানা রাজনৈতিক

www.pathagar.com

তত্ত্বের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এই ধরনের বাড়াবাড়ি অতীতেও করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের কথাই যদি আমরা বিবেচনায় আনি তাহলে দেখা যাবে ৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতার সোল এজেন্টরা যখন ক্ষমতায় চেপে বসেছিলেন ঠিক তখন তাদের উচ্ছিষ্ট ভোজে অভুক্তরা নতুন তত্ত্ব দিয়ে বসলেন যে, সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য দু'চারটা খুনখারাবি, ডাকাতি, লুটতরাজ এমন কিছু অন্যায় নয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন প্রতিবিপ্লবীর তত্ত্বকে মৌলিক নির্দেশ বলে প্রচার করে তারা সেদিন তাদের কথিত বাহিনীর মধ্যে এতটাই উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন যে, বিপ্লব এবং সন্ত্রাস-এর মধ্যকার পার্থক্য খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ছিল। সহজ তত্ত্বে তারা প্রচার করেছিলেন, লক্ষ্য যখন জনগণের কল্যাণ তখন সবকিছুই বৈধ। আসলে লাল পতাকা দিয়ে লাল পতাকা ঠেকাবার এই পুরনো কৌশল বেশিদিন টেকেনি। মূলত তারা চিহ্নিত হয়েছিলেন বি-টিম হিসেবে। সেই তত্ত্বের প্রবক্তরা এখন আবার ঐক্যমতের নামে কথিত প্রতিপক্ষের সাথেই মতৈক্য স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতির এই দুঃখজনক অধ্যায় নিয়ে গত একুশ বছর এত বেশি আলোচিত হয়েছে যে, নতুন করে এ নিয়ে কোনো উপাখ্যান রচনার প্রয়োজন নেই।

৯৬ সালে নির্বাচন পরবর্তী কিছু ঘটনায় ফিরে আসা যাক। সমস্ত ঘটনার ফিরিস্তি তুলে ধরতে পারলে ভালো হতো। তবুও পত্রপত্রিকায় দু'একটি ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে তার প্রথমটি সম্ভবত ছাপা হয়েছিল একটি বহুল প্রচারিত ইংরেজি সাপ্তাহিকে। ঘটনাটি ছিল ধানমন্ডি থানার কয়েদখানায় ঢুকে আসামিদের প্রহার। নিউ মার্কেট এলাকায় একটি গাড়ি নিয়ে সৃষ্ট সংঘর্ষের জের হিসেবে ঘটনার সূত্রপাত হয়। দুপক্ষেই ছিলো সরকারি দলের লোক। তবে মন্ত্রীপুত্র যে পক্ষে ছিলো সেই দলই ছিলো ভারী এবং তারাই হাজতে ঢুকে অন্যপক্ষকে পিটিয়েছিল। ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার রেশ বহু দূর এগিয়েছিল। দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের বৈঠকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। মজার ব্যাপার তার এই উদ্বেগের খবরেও সরকারি বার্তাসংস্থা বিএসএস এবং বঙ্গভবন থেকে প্রচারিত তথ্য বিবরণীর মধ্যে বড় ধরনের ফারাক ছিল। ঘটনাটি এতদিনে অনেকের নাও মনে থাকতে পারে। সেজন্য খুব কাছাকাছি সময়ের একটি কাহিনী তুলে ধরা যেতে পারে। সরকারি দলের একজন প্রভাবশালী নেতা এবং আত্মীয়দের একজনের পুত্র নিয়ে বেশ হৈচৈ পড়ে গিয়েছিলো। কোনো কোনো পত্রিকা প্রথমদিকে নাম উল্লেখ না করে প্রভাবশালী নেতার পুত্রের বাড়ি দখলের খবর প্রকাশ করতে শুরু করলো। এরপর সাহসের মাত্রা আরও একটু বাড়িয়ে বীরপুত্রের সাথে পিতার নামের চিফহুইপ শব্দটিও যুক্ত করে দেয়া হলো। পত্রিকাওয়ালারা যাই বলুক না কেন ক্ষমতাসীনরা কিন্তু তাদের ঢোল বড় করেই বাজাতে থাকলেন। এরপর আলোচনার টেবিলে উঠে আসলো একজন সংসদ সদস্যের পুত্রের নাম। এই সংসদ সদস্যের নামও কিছুদিন আগে অন্য এক প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছিল। তিন তার এলাকায় একটি শ্রমিক সমাবেশে যোগ দেবার জন্য রওনা হওয়ার পর পেছন থেকে নাকি মোটরসাইকেল আরোহীরা তার গায়ের উপর চড়াও হয়েছিল। সংকটজনক অবস্থায় তাকে সিএমএইচ-এ ভর্তি করা হয়েছিল। তবে ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট থানার ওসি ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছিলেন। ঐ সংসদ সদস্য সুস্থ হয়ে ফিরে এসে তার দলের একজন প্রভাবশালী নেতার নামে হত্যা-মামলা দায়ের করেছিলেন। এবার তার ছেলেকে জড়িয়ে শুরু হয়েছে হত্যা মামলা। তবে সে মামলা নিয়ে সকলেরই এখন আগ্রহ

www.pathagar.com

কমে গেছে। কারণ প্রশাসন-প্রভাবিত নিম্ন আদালতের বিচারকরা কোন কোন ক্ষেত্রে যে রায় পাঠ করেন তার কতটা তাদের বিবেকপ্রসূত আর কতটা আরোপিত এ নিয়ে জনমনে প্রচণ্ড গুঞ্জন আছে।

যাই হোক, এমপি পুত্রের পিতার নামের সাথে এমপি শব্দ বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে একেবারেই কোন যুক্তি নেই সে কথা বলা যাবে না। এমপি বা 'মেম্বার অব দি পার্লামেন্ট' বা সংসদ সদস্য বলে যাদেরকে উল্লেখ করা হয় তাদের সম্পর্কে জনমনে বিশেষ ধারণা রয়েছে। পার্লামেন্ট শুরুর ইতিহাস থেকেই দেখা যায় যে, এখানে যারা বসেন তারা আর দশজন থেকে আকারে, আকৃতিতে আলাদা ধরনের কিছু না হলেও বিশেষ অধিকারের অধিকারী। পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব এবং তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অনেকেই প্রাণ দিয়েছেন। প্রাচীন সেই ইতিহাসের দিকে না তাকিয়েও বর্তমান সময়ের দিকে চোখ রেখে একথা বলা যায় যে, দেশের বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই নির্ভর করে সংসদ এবং সংসদ সদস্যদের ওপর। আর সে কারণেই সংসদ সদস্যদের মেধা ও মননের দিকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন ওঠে একজন সংসদ সদস্য যে সময়ের জন্য নির্বাচিত হন সেই সময়ের মধ্যে তার ব্যক্তিগত জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে কোনো তফাত আছে কি না। অর্থাৎ একজন বিচারপতি যেমন অবসর নিলেও অব. লেখা হয় না, একজন সাংবাদিকের যেমন অবসর নেই, আইনজীবী অথবা ডাক্তার কারও জীবনে আমৃত্যু কোনো অবসর নেই, তেমনি একজন সংসদ সদস্য কি তার ব্যক্তিগত জীবনকে আলাদা করতে পারেন? যদি না পারেন তাহলে সংসদ সদস্যদের নামের সাথে সন্ত্রাস যুক্ত হলে জাতির সংকট বেড়ে যেতে পারে। অনেকেরই মনে আছে মোহাম্মদপুর এলাকার একজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের কর্মী হত্যার অভিযোগ রয়েছে। আবার ঢাকার রাজপথে মিছিল করতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছিলেন ঢাকার সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সাদেক হোসেন খোকা। এসব ঘটনার কারণে স্বাভাবিকভাবেই দলভেদে সংসদ সদস্যের মর্যাদা এবং অবস্থানের এই হেরফের নিয়ে প্রশ্ন থাকা অস্বাভাবিক নয়।

সংসদ সদস্য এবং সন্ত্রাস, পরস্পর বিরোধী এই সংযোজনের অবসান হওয়া প্রয়োজন। দেশের আইনকানুন নিয়ে যারা গভীরভাবে ভাবেন, দেশী-বিদেশী ডিগ্রি লাভ করেন তারা হয়তো তাদের অভিজ্ঞ মতামত দিয়ে জাতিকে আশ্বস্ত করতে পারবেন। কিন্তু থানার ওসি অপরাধের মামলা থেকে এমপি শব্দ বাদ দেয়ার যে গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন এমপি কি সেই গুরুত্ব বহন করেন? যদি করতেন তাহলে সন্ত্রাসের সাথে তাদের নাম যুক্ত না হয়ে বরং সন্ত্রাস নির্মূলে তাদের ভূমিকার কথা শোনা যেত। কিন্তু সেটা শোনা যায় না। আর এ কারণেই হয়তো বিরোধী দল থেকে দাবি উঠেছে সংসদ বাতিল ও নতুন নির্বাচনের। সংসদের পবিত্রতা বলতে ঐ ভবনের কোনো আলাদা পবিত্রতা বোঝায় না। আসলে সংসদের পবিত্রতা বলতে বোঝায় জনগণের আমানত রক্ষার অঙ্গিকার যা কিনা পবিত্র সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারের নামান্তর। যদি এই আমানত রক্ষা করা না যায় তাহলে নামের শেষে এমপি যুক্ত করে অথবা এমপি বাদ দিয় সেই মর্যাদা রক্ষা করা যাবে না। সত্যিকার অর্থে ভালোমানুষের পার্লামেন্টই দেশকে ধরতে পারে সন্ত্রাসমুক্ত।

www.pathagar.com

পঁচিশ

আওয়ামী লীগের তিন ব্যর্থতা

এক

আওয়ামী ক্ষমতাবসানের দিনক্ষণ গণনা শুরু হয়েছে। ২৯ জুন বাসস-এর খবরে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী আগামী ১৫ জুলাই (রবিবার) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। আগামী ৯ জুলাই (সোমবার) বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠক। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য সচিব বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারেও অনুরূপ ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন যে, সম্ভবত ১৩ জুলাই বর্তমান সংসদের পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ হবার দু'একদিনের মধ্যেই আওয়ামী সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে। বলা হচ্ছে, ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী সচিবদের সাথে তার বিদায়ী বৈঠক সম্পন্ন করেছেন। যদিও ঐ বৈঠকে তিনি আমলাদের চাকরির মেয়াদ বাড়াবার মূল্যে ঝুলিয়েছেন। আজকের বিষয়বস্তু সরকারের কার্যকলাপের কিছু বিবরণ।

গত ২৩ জুন আওয়ামী নির্বাচনের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেডিও-টিভিতে ভাষণ দিয়েছেন। ঐ ভাষণে তিনি তাঁর দলীয় প্রতীক নৌকায় ভোট চাইলেও জনসভার ভাষণে তিনি হুমকি দিয়েছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর দেখিয়ে দেবেন কত ধানে কত চাল। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমে প্রদত্ত ভাষণে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আওয়ামী সরকারের সফলতার নানা ফিরিস্তি তুলে ধরার পাশাপাশি ব্যর্থতার বিবরণও প্রকাশিত হয়েছে। গত পাঁচ বছরের শাসনের ব্যর্থতা হলো— ১. ইসলাম বিরোধিতা ২. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি ৩. সন্ত্রাস। বর্তমান আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানদের কৃষ্টি-কালচার ধ্বংসের অভিযোগ নিয়ে কথা উঠলেই খোদ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে তাঁর কোন কোন বরকন্দাজ রাজাকার রাজাকার বলে চিৎকার শুরু করে দেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগাররা ধর্ম মানে এই ধারণা জনমনে প্রচারের জন্য প্রধানমন্ত্রী দলীয় নেতা-কর্মীদের গ্রামে গিয়ে মসজিদে নামাজে অংশ নিতে বলেছেন। তিনি নিজেও বার কয়েক হজ করেছেন। তার দলের কেউ কেউ নামের আগে হাজী লাগিয়ে সভা-সমাবেশে বক্তৃতাও করেছেন। কিন্তু এই দলটির প্রধান লক্ষ্য যে, মুসলমানদের ঈমান-আকিদা নষ্ট করে তাদেরকে ডি-মুসলিমাইজ করা, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ৭৫ থেকে ৯৬ সাল প্রায় ২১ বছর পর আওয়ামী সরকার যখন পুনরায় ক্ষমতায় এসেছে তখনও বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে ইসলাম ধর্ম ইসলামী আদর্শকে আওয়ামী লীগ হামলার লক্ষ্যবস্তু করেছে। দেশে ইসলামের পক্ষ এবং বিপক্ষ এই দুই শিবিরের জনগণ আলাদা অবস্থান গ্রহণ করেছে। দেশ থেকে ইসলামী শক্তিকে উৎখাত করার কাজ শুরু হয় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই। বিএনপি সরকারের পদত্যাগের পর থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই নবম ও দশম শ্রেণীতে ইসলামী শিক্ষা বিষয় ১০০ নম্বরের পরিবর্তে ৫০ নম্বর নির্ধারণ করে। এরপর ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতির এতই অবনতি হয় যে, দেশে ইসলামী কৃষ্টি-কালচারের অনুসরণ করে দাড়ি-টুপি রেখে ইসলামী লেবাস নিয়ে চলাফেরা করাই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ইসলামী শিক্ষা সংকোচনের বিভিন্নমুখী অপতৎপরতা শুরু করে। সরকার ক্ষমতাসীন হবার দু'বছরের মধ্যেই দেশের প্রায় তিনশটি মাদ্রাসার স্বীকৃতি এবং ঐ সময়ের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে

www.pathagar.com

চতুর্থ বিষয় হিসাবে ইসলামী শিক্ষা বাতিল করা হয়। বিএসএস অনার্স কোর্সে সাবসিডিয়ারি হিসাবে ইসলামী স্টাডিজ নেয়ার সুযোগ বন্ধ করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলোতে ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী শিক্ষা এ দুটি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স খুলতে আপত্তি তোলা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দর্শন বিষয় থেকে মুসলিম দর্শন তুলে দেয়ার নির্দেশ দেয়। সরকারের পক্ষ থেকে আলোচিত সময়ে নতুন অনুমোদন এবং মৌখিক অনুমোদনপ্রাপ্ত কলেজগুলোতে ইসলামী বিষয় চালু করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। '৯৮-৯৯ সালে এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে, ঐ সময়ে ইসলামী শিক্ষাসহ নতুন অধিভুক্তর আবেদনকারী কলেজের সংখ্যা ১২০ হলেও অধিভুক্ত প্রদানের সংখ্যা ৮০ এবং এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষা দেয়া হয়েছে মাত্র দুটিতে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণার জন্য যে ২০০ নম্বর ইসলামী শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ছিল তা-ও বাতিল করা হয়। দেশে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সেকুলারকরণের লক্ষ্যে আলিম বিজ্ঞান শাখা থেকে আরবি ও ফিকাহ শিক্ষা বাতিল করা হয়। কোরআন হাদিসের নম্বর ২০০ থেকে কমিয়ে ১০০ করা হয়। দাখিল বিজ্ঞান শাখা থেকে হাদিস ও ফিকাহ শিক্ষা বাদ দিয়ে আরবি সাহিত্যে ২০০ নম্বরের পরিবর্তে ১০০ নম্বর নির্ধারণ করা হয়। খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে ২৫১টি মাদ্রাসায় মঞ্জুরি ও এমপিভুক্ত বাতিল করা হয়। গত পাঁচ বছরে দেশের ৩০ হাজারেরও বেশি মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রকে গ্রেফতার করা এবং জননিরাপত্তা আইনে মামলা দেয়া হয়েছে। আরো অন্তত ২৫ হাজারের বিরুদ্ধে চলছে নানা হয়রানিমূলক তৎপরতা। আওয়ামী সরকারের আধিপত্যবাদ বিরোধী ও ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষিপ্ত থাকার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কথিত হামলা এবং বোমা নাটকের কল্পিত কাহিনীর মধ্যে দিয়ে। এই অভিযোগে মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে নিরেদিতপ্রাণ ইসলামসেবীদের ঘর-বাড়ি এবং পরিবার ছাড়া করা হয়েছে। এই চক্রান্ত এবং হীন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য খুঁজতে হলে বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিকেও খানিকটা চোখ ফেরাতে হবে। বাংলাদেশের এনজিও নামক যে চক্র দারিদ্র্য বিমোচনের নামে সারাদেশে কাজ করছে তাদেরও প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে ডি-মুসলিমাইজ করা এবং এ কাজটি করা সম্ভব হলেই বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বেলেল্লাপনার লীলাভূমিতে পরিণত করা সম্ভব। আর সেজন্যই দেশের মানুষ যাতে তৌহিদি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারে সেজন্য এনজিওগুলোর সমর্থনে কাজ করছে এডিবি। এরা বাংলাদেশ থেকে ইসলামী শিক্ষার মূলোৎপাটন করে দেশটিকে এবং দেশের শাসককুলকে তাদের ক্রীড়নকে পরিণত করার লক্ষ্যেই দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে আসছে। তবে বর্তমান সরকারের সাথে তাদের আঁতাত আন্তরিক হবার প্রধান কারণ আওয়ামী লীগের অতীত ঐতিহ্য। এ দলটিই যে বাংলাদেশে ইসলাম নিধনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বিশ্বস্ত বন্ধু তার প্রমাণ রেখেছিল ১৯৫৭ সালেই। ঐ সময়ে আওয়ামী মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে যে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল তাতে মাদ্রাসা শিক্ষাকে অপচয় বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতাসীন হয় তখনও মাদ্রাসা শিক্ষাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ১৯৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত দেশে কোন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ইসলামবিরোধী সরকারের এই আক্রমণ শুধু যে মসজিদ-মাদ্রাসা এবং আলেম-ওলামাদের ওপর করেছে তাই নয়; বরং দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনেক

www.pathagar.com

ইসলামী মনোভাবসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীকে বের করে দেয়া হয়েছে। '৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল থেকে দলে দলে নামাজি ছাত্রদের পিটিয়ে বের করে দেয়া হয়েছে। কমপক্ষে অর্ধশতাধিক নামাজি ছাত্র তখন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আরও শত শত ছাত্রকে ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদর্শনের মাধ্যমে সরকারের দলে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। একইভাবে নামাজি ও পর্দানসিন ছাত্রীদের ওপরও নির্যাতন করা হয়েছে। অনেক ধার্মিক ছাত্রীকে রোকেয়া হল, সামসুন্নাহার হল, ফয়জুন্নেছা হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। রোকেয়া হলে পবিত্র কোরআন শরীফ ছিঁড়ে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে।

বর্তমান সরকারের ইসলাম বিরোধিতার স্বরূপ তিনটি। ১. দেশ থেকে ইসলামী শক্তিকে উৎখাত করার লক্ষ্যে মাদ্রাসার শিক্ষা ধ্বংস করা, ২. সমাজ জীবনের অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত ইসলামী চেতনার মূলে আঘাত হানা এবং ৩. ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দান করা। এই তিন বৈশিষ্ট্য কার্যকর করার লক্ষ্যেই রাষ্ট্র শাসনের শুরুতেই বিএনপি বিরোধিতার নামাবলী গায়ে দিয়ে বিসমিল্লাহর বিরোধিতা শুরু করে। এই ইসলাম বিরোধিতা আওয়ামীদের কোন রোগ বা বিকারগ্রস্ততা নয় বরং এটি একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে আধিপত্যবাদীদের মদদ। অর্থাৎ ভারত নামক যে বৃহৎ প্রতিবেশী আমাদের প্রায় চারদিক গ্রাস করে আছে তারা যেমন তাদের দেশে মুসলমানদেরকে ডি-ইসলামাইজ করছে তেমনি বাংলাদেশেও এই কাজটি তারা করাতে চায় শাসক আওয়ামীদের মাধ্যমে। আধিপত্যবাদী এই শক্তিটি জানে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যের শিকড় লুক্কায়িত আছে ইসলামের মধ্যে। বাংলাদেশ থেকে যদি ইসলামী শিক্ষা এবং কালচার বন্ধ করা সম্ভব হয় তাহলে সীমান্ত বিভাজন রেখে অথবা না রেখে তাদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সুতরাং বলা যায়, আধিপত্যবাদ ও আন্তর্জাতিক মোড়লদের সহায়তার ভিত্তিতে বর্তমান সরকারের এই পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে ইসলাম ধর্ম বিরোধিতার অঘোষিত যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই। এই যুদ্ধে প্রধানত বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নির্যাতিত-নিপীড়িত এবং নিগ্রহের শিকারে পরিণত হয়েছে। ১৯৭২ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যদি আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, '৭২ সালে যখন ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছিল তখন তা প্রতিহত করার জন্য মাঠে নেমেছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ প্রমুখ। '৯৬ সালে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে নেমেছিল তখন তৌহিদি জনতা তা প্রতিরোধ করেছে। গত পাঁচ বছরে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার বিরুদ্ধে যখন খড়্গহস্ত হয়েছেন সরকার তখন মাঠে নেমেছেন দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম শায়খুল হাদিস, মুফতি ফজলুল হক আমিনী, মুফতি ইজাহারসহ ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। এছাড়া উলামা-মাশায়েখদের অসংখ্য ওয়াজ মাহফিল, তাফসির মাহফিল, সিরাত ও মিলাদ মাহফিল ইত্যাদির অবদান তো রয়েছেই। তৌহিদী জনতার রক্তে ভেজা রাজপথের উত্তাপ প্রশমিত না হতেই আওয়ামী ক্ষমতাবসানোর যে ঘন্টা বেজে উঠেছে তা সত্যিকারের কার্যে পরিণত করতে হলে আগামী নির্বাচনে ইসলাম ও মুসলমানদের সিসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

ছাব্বিশ

দুই

দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচাইতে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। বাংলাদেশ সম্পর্কে এই সার্টিফিকেট বাংলাদেশের জনগণের নয়, বরং আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। যদিও আওয়ামী সরকার বলেছে, তারা এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে মামলা করবে। তবে কোথায় এই মামলা করবে অথবা এই রিপোর্ট মামলাযোগ্য কিনা সে বিবেচনা হয়ত তারা এখনও করেনি। তারা হয়ত ধরেই নিয়েছে যে, গত পাঁচ বছর যেভাবে দেশের আলেম-ওলামা এবং প্রকৃত জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে হামলা-মামলা করে তাদের নাস্তনাবুদ করেছে এবারও হয়ত তেমনটি করা সম্ভব হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল গত ২৭ জুন যে রিপোর্ট দিয়েছে তা শুনতে নতুন মনে হলেও আসলে এটি কোন নতুন রিপোর্ট নয়, বরং পুরনো রিপোর্টের নতুন মোড়ক। সত্যি কথা বলতে কি ট্রান্সপারেন্সির আগেই এই রিপোর্ট জনসমক্ষে পেশ করেছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা '৭২ থেকে '৭৫ সালে। তার দেয়া সকল ভাষণের ক্যাসেট যদি থেকে থাকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তা যদি বাজিয়ে শোনেন, তাহলে তিনি শুনতে পাবেন তার বাবা বলেছেন, আমি পেয়েছি চোরের খনি, যেদিকে তাকাই দেখি চাটার দল, আমার ভাগের কম্বল কোথায়?' তার এই উক্তির প্রতিধ্বনি হয়েছিল সে সময়ে বিদেশী সংবাদপত্রে। বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তখন বলা হয়েছিল বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন ঝুড়ি। আসলে এসব উক্তি যখন বাংলাদেশ সম্পর্কে করা হয়েছে তখন বাংলাদেশ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি সদ্য স্বাধীন দেশ। মুক্তিযুদ্ধের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত একটি জাতির স্বনির্ভর অর্জনের প্রত্যাশাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভক্ত করে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থকরণে কিভাবে লুটপাটের রাজনীতিতে উৎসাহিত করা হয়েছিল সম্ভবত উপরোক্ত কথাগুলো তার সত্যতাই প্রমাণ করে। সেদিক থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলাদেশের দুর্নীতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহল যে সার্টিফিকেট দিয়েছে সেই সার্টিফিকেট মূলত ত্রিশ বছরের পুরনো। ত্রিশ বছর পর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বের ৯১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে সবচাইতে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে উল্লেখ করে বলেছে, এই দেশে বড় ধরনের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি থাকার পাশাপাশি এই দুর্নীতি ব্যাপকভাবে নিম্নস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে দুর্নীতির মাধ্যমে জাতীয় আয়ের শতকরা ৩ ভাগ আমলা ও রাজনীতিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রের দুর্নীতিবাজরা হজম করে ফেলেছেন।

বর্তমান সরকারের পাঁচ বছরের শাসন-শোষণপূর্ণ ত্রাসের রাজত্বের দুর্নীতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১। উৎকোচ গ্রহণ ২। সম্পত্তি দখল ৩। প্রশাসনিক দলীয়করণ। ট্রান্সপারেন্সির '৯৬ সালের রিপোর্টে বাংলাদেশকে বিশ্বের চতুর্থ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। গত বছর প্রদত্ত এক রিপোর্টে বাংলাদেশের ৬টি খাতকে দুর্নীতির শীর্ষে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই তালিকার প্রথম নম্বরে ছিল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও ষষ্ঠ নম্বরে ছিল ডাক টেলিযোগাযোগ বিভাগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় ছিল শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে ছিল স্বাস্থ্য এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়।

ঐ রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, দু'হাজার সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের বিরুদ্ধে ৬ মাসে প্রকাশিত ২৭৮টি দুর্নীতির মধ্যে ২৫৪টি

www.pathagar.com

পুলিশ দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এ ছিল ঐ সময়ের আলোচিত মোট দুর্নীতির ২০.৬৭ ভাগ, রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ সময়ে স্থানীয় সরকারের দুর্নীতির হার ছিল ১১.৬৭ ভাগ। ২০০০ সালে ট্রান্সপারেন্সির রিপোর্ট অনুযায়ী কাস্টমস বিভাগে ৫শ থেকে ১ হাজার কোটি, চট্টগ্রাম বন্দরে আড়াই হাজার থেকে ৫ হাজার কোটি, সরকারি আয় থেকে ১৫শ থেকে ২ হাজার কোটি এবং বিদ্যুৎ খাত থেকে ৫শ কোটি টাকা ঘুষ নেয়া হয়েছে। ঐ সময়ের রিপোর্ট অনুযায়ী বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ সংযোগে ১০ হাজার থেকে ১ লাখ, বাণিজ্যিক গ্যাস সংযোগে ৫০ হাজার থেকে ৫ লাখ, টেলিফোন সংযোগে ১০ থেকে ২০ হাজার, ট্রেড লাইসেন্সে ১ থেকে ১০ হাজার, পরিবেশ খাতে ১০ থেকে ১৫ হাজার, বন্ডেড ওয়্যার হাউজ লাইসেন্স গ্রহণে ৫০ থেকে ৬০ হাজার, কাস্টমস অফিসকে দিতে হয়েছে সোয়া থেকে দেড় লাখ এবং আয়কর কর্মকর্তাদের দিতে হয়েছে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা। ২০০০ সালের এই রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত ঐখানে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলতি বছরান্তে তা এক নম্বরে উন্নীত হয়েছে।

আলোচ্য সময়ে টেন্ডার থেকে শুরু করে হাসপাতালে রোগী ভর্তি করা এমনকি লাশ নিতে পর্যন্ত ঘুষের প্রচলন করা হয়েছে। দুর্নীতি না বলে, বলা ভালো গোগ্রাসে গিলে খাওয়ার মত অবস্থা। একেবারে গ্রামে যাকে বলে মরা হাঁসের কুঁড়ো খাওয়ার পরিস্থিতি।

আলোচ্য আমলে সম্পত্তি দখলের ফিরিস্তি অনেক লম্বা। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া এবং দক্ষিণ তালপট্টি থেকে জকিগঞ্জ পর্যন্ত সর্বত্রই রয়েছে আওয়ামী জবর দখলের বিবরণ। ঈদগাহ, খেলার মাঠ, শিশুপার্ক, বিধবা-নাবালকের সম্পত্তি এবং সরকারি সম্পত্তির কোনটাই জবর-দখলের হাত থেকে রেহাই পায়নি। সরকারি দল, অঙ্গ দল এবং মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের লোভাতুর দৃষ্টি দেশে যা কিছু বাকি ছিল সবকিছুই গ্রাস করেছে। যেমনটা করেছিল '৭২ থেকে ৭৫ সালে। কোটি কোটি টাকার বিষয় সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। রাজধানী ঢাকার পল্লবীতে ত্রিশ বছরের পুরনো ঈদগাহ দু'ঘণ্টার মধ্যে বিলুপ্ত করে দিয়েছে, বুলডোজার ভেঙ্গে দিয়েছে ঈদগাহের মিম্বর যেখানে খুতবা দিয়েছেন ইমাম সাহেব। খিলগাঁওয়ে খেলার মাঠ, সায়েদাবাদ রেল গেটের পাশের শিশুপার্ক, ওসমানী উদ্যানে সরকারি জায়গা দখল করে নেয়া হয়েছে দলীয় সাইন বোর্ড ও ছবি লাগিয়ে। সুপ্রীম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মিরপুর দারুস সালাম রোডে একটি প্রাইভেট হাসপাতালের ৯.২৭ কাঠা জমি, আজিমপুর মোড়ে যাত্রী ছাউনি দখল করে নিয়েছে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। তেজগাঁও রেলওয়ের ৮৫ একর জমি বায়তুল মোকাররম এলাকার দোকান দখল করে নিয়েছে আওয়ামী ও যুবলীগ ক্যাডাররা, পুরনো ঢাকার শক্তি ঔষধালয়ের বাড়ি দখল করে নেয়া হয়েছে সরকারি এমপির ছত্রছায়ায়। সম্পত্তি দখল করতে গিয়ে মন্ত্রীপুত্র দিপু হত্যা মামলায় জড়িয়ে পড়েছে উত্তরায়, গুলশান মডেল টাউনে ১০ কোটি টাকা মূল্যের জমি দখল করেছে শাসকদলীয় এমপি ভুয়া দলিলের মাধ্যমে।

ধামরাই-এ ঢাকা আরিচা সংলগ্ন সড়ক ও জনপদের এক বিঘা সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে আওয়ামী নেতা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরকারের হাতে থাকা ১ হাজার ৯১ একর অর্পিত সম্পত্তি সবটাই বন্দোবস্ত নিয়েছে প্রভাবশালী মহল, দাউদকান্দিতে ভূমিহীনদের খাস জমি দখল করেছে শাসক দলের সন্ত্রাসীরা, বগুড়ার চাঁদনী বাজার এলাকায় একটি মার্কেট দখল করার জন্য জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং মন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করে। রাজশাহীতে পঞ্চাশ কোটি টাকার সম্পত্তি দখল করেছে পাঁচ প্রভাবশালী;

www.pathagar.com

চট্টগ্রামে চার কোটি টাকার সম্পত্তি মাত্র আট লাখ টাকায় নিয়ে নিয়েছে প্রতিমন্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনরা, যশোরে স্থানীয় ও প্রভাবশালীরা দখল করে নিয়েছে অভয়নগরের রাজঘাট জমিদারবাড়ি, মৌলভীবাজারে শাসকদলীয় এমপির নেতৃত্বে সরকারি সম্পত্তি, বেওয়ারিশ ও হিন্দু সম্পত্তি দখলের পর স্বাস্থ্য বিভাগ ও সদর তহশিল অফিসের সম্পত্তি দখল করে নেয়া হয়েছে। সিরাজগঞ্জে বড় বড় হাট-বাজার, গুরুত্বপূর্ণ বাস স্ট্যান্ড, খাস জমি, রেলওয়ে সম্পত্তিসহ কোটি কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি দখলের মহোৎসব করা হয়েছে। সরকার দলীয় সংসদ সদস্য পটুয়াখালী চার-এর আত্মীয়-স্বজন ও তার দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে জমি দখল ও চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। দুর্গাপুরের কমলকান্দায় পাহাড়ি জনপদের সংসদ সদস্য জালাল তালুকদার বারআনা থেকে শত কোটিপতি হয়েছেন বলে কথিত আছে।

সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, দেশের ১ লাখ ৪০ হাজার ৭৮৬ একর জমি উল্লেখিত সময়ের মধ্যে অবৈধ দখলে চলে গেছে। যেসব সম্পত্তি সরকারি সন্ত্রাসের কারণে বেদখল হয়ে গেছে, উল্লেখিত রিপোর্ট তার অংশ মাত্র। কারণ, সরকারি দখলীকরণের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কেউ টুঁ শব্দ করতে পারেনি। কারণ জনগণের আশ্রয়স্থল বলে পরিচিত থানা-পুলিশ জনগণের পক্ষে নয়; সরকারের পক্ষে অবস্থান নিয়ে জনগণকে জানিয়ে দিয়েছে সরকারি দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণে সমস্যা আছে। তারপরেও আক্রান্ত জনগণ নানাভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছে এবং যতটুকু সম্ভব সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণে তৎপর হয়েছে। উল্লেখিত সময়ে গাইবান্ধা জেলার পূর্ব পাড়ার মরহুম আব্দুল জব্বারের বিধবা স্ত্রী আছিয়া বেগম ঢাকায় এসেছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবে তার সম্পত্তি দখলের করুণ ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিতে। এতিম তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে এসে সাংবাদিক সম্মেলনে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন আরেকটি নিদানাবাদ হত্যাকাণ্ডের।

আওয়ামী ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় দিক হল প্রশাসনিক দুর্নীতি। গত পাঁচ বছরে এই দুর্নীতির বিন্যাস করতে গেলে যে তিনটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে তা হল— ১. ব্যক্তি ২. দলীয় স্বার্থ ও ৩. আধিপত্যবাদের দোসরবৃত্তি। প্রশাসনকে আওয়ামীকরণ করে ভারতানুগ করার পরিকল্পনা স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করে একটি দুর্বল প্রশাসনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার যে চক্রান্ত করা হয়েছিল তার অংশ হিসেবে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্বিশেষে প্রশাসনিক ক্যাডারে এমন অনেককে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল যাদের অনেকের সম্পর্কে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও প্রকাশ্যে অযোগ্যতার অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাতে কার্যত কোনো লাভ হয়নি বরং সেই একই ভুল করা হয়েছে বর্তমান আমলেও। গত ২০তম বিসিএস নিয়োগে মেধা ও যোগ্যতার পরিবর্তে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রায় ৫ শতাধিক দলীয় নেতা-কর্মীকে নিয়োগ দেয়ার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা নিয়েছে পুলিশ বিভাগের লোক আর মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা নিয়েছে ইতিহাসের শিক্ষক। অভিযোগ রয়েছে, জালিয়াতির মাধ্যমে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে প্রশাসনিক ক্যাডারের অনেক কর্মকর্তাকে। চাকরিতে নেই, দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং জ্যেষ্ঠতা ডিঙ্গিয়ে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে অনেক আমলাকে। শীর্ষপদে নিয়োগদানের লক্ষ্যে দলীয় সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নিমিত্তে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ কমিটি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী একজন আত্মীয়কে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রধান করার জন্য এক অখ্যাত অবস্থান থেকে টেনে তুলে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত করা হয়েছে। ঠিক যেমনটি করা হয়েছিল '৭৫ সালে। ঐ সময়ে সৈয়দ হোসেন

www.pathagar.com

নামের একজন উপ-সচিবকে পদোন্নতি দিয়ে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছিল। মেধা-দক্ষতা-যোগ্যতা-সততা-দেশপ্রেম সবকিছু তুচ্ছজ্ঞান করে আওয়ামী আমলের সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে জেনারেল মুস্তাফিজকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় হবার কারণে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশ বা এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশে দুর্নীতি একটি নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। ভারতে বোফোর্স কেলেঙ্কারি বা সাম্প্রতিক আলোচিত তেহেলকা ডটকম অস্ত্র কেলেঙ্কারির কথা সবার জানা। ৭২-৭৫ এবং ৯৬-২০০০ এই ৮ বছর বাদ দিলে বাংলাদেশ একটি দুর্নীতিমুক্ত দেশ ছিলো সে কথাও জোর দিয়ে বলা যাবে না। এই অঞ্চলে দুর্নীতির শুরু হয়েছে ইংরেজ কোম্পানির আমল থেকে। এইসব দুর্নীতি আর আওয়ামী দুর্নীতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অন্য দুর্নীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সেসব হয়েছে ব্যক্তি পর্যায়ে। কিন্তু আওয়ামী আমলে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে। দুর্নীতির প্রথম রেকি করা হয়েছে, এরপর ব্যক্তি ও দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে দুর্নীতিকে বৈধতার মোড়ক দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে ভারতীয়দের এক গভীর চক্রান্ত। কারণ বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে অপদস্ত, পরাজিত এবং নিন্দিত হলে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানা সুবিধা লাভ করা ভারতের জন্যই সহজ। আওয়ামী ৫ বছরের শাসনে বাংলাদেশ যে বিশ্বচোর বলে কুখ্যাতি অর্জন করল তার দায়ভার এসে পড়ল সাধারণ জনগণের ওপর। দেশে হয়ত একভাগ লোকও চোর নয়; অথচ ১২ কোটি জনগণই চুরির খাতায় নাম লিখাল। তাই আজ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এমন জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার, যাতে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রক্ষমতায় চোর অথবা আধিপত্যবাদের দালাল শক্তি ক্ষমতায় না আসে।

সাতাশ

তিন

সন্ত্রাস

আওয়ামী পাঁচ বছরের শাসনকে আওয়ামী শাসনের পাঁচ বছর না বলে সন্ত্রাসের পাঁচ বছর বলাই যৌক্তিকর। এই সন্ত্রাসের নানা দিক রয়েছে। শাসক সন্ত্রাসী দেশের রাজনীতির অঙ্গন থেকে শুরু করে সামাজিক সংগঠন পর্যন্ত সকলকেই আক্রান্ত করেছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রধানত বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গন থেকে দেশপ্রেম নির্বাসিত করে এমন এক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে যেখানে থাকবে এমন একশ্রেণীর নাগরিক যাদের রাষ্ট্র বা রাজ্য কোনটাতেই আপত্তি নেই। এই নীলনকশা কার্যকর করতে গিয়ে পরিকল্পিত সন্ত্রাস পরিচালনার আগে সন্ত্রাসের টার্গেট নির্দিষ্ট করা এবং একে একে আঘাত হানা হয়েছে। পৃথিবীর স্বৈরচারী শাসকরা তাদের গদি রক্ষার নামে অতীতে যে ধরনের সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছে আওয়ামী পাঁচ বছরে সেসব তো করা হয়েছেই উপরন্তু এমন কিছু নজির স্থাপন করেছে যা হয়তো ইতিহাসের ঘৃণ্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, আওয়ামী দুঃশাসনের এই পাঁচ বছরে শাসকগোষ্ঠী দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের বাতাসে বিষ ছড়িয়েছে। পরিবেশকে করে তুলেছে সন্ত্রাসী। মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয় সম্পন্ন করে জাতির ইজ্জত-আব্রু লুণ্ঠন করে গোটা জাতিকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছে এক 'বিশ্ববেহায়া' রূপে। আওয়ামী নিগ্রহ-নির্যাতন থেকে

www.pathagar.com

পীর, ইমাম, শিক্ষক, আইনজীবী, গৃহবধূ, নাবালক কেউ রক্ষা পায়নি। দলমত নির্বিশেষে ব্যক্তি বা দলীয় বিরোধিতার কারণে যে নির্যাতনের রোলার জাতিকে পিষ্ট করেছে তার প্রকৃত এবং পূর্ণ বিবরণ এখন এবং হয়তো কখনোই পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ বাংলাদেশের এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে আওয়ামী নির্যাতনের চিহ্ন নেই। এই নির্যাতন যেহেতু নানা ফর্মে হয়েছে সে কারণে অনেকেই জানতেও পারেনি যে, তারা কি অপরাধে এবং কেন নির্যাতনের শিকারে পরিণত হলো। গ্রামে-গঞ্জে আওয়ামী এমপি অথবা নেতাদের নিয়ন্ত্রণে গড়ে ওঠা সশস্ত্র বাহিনীর অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়নি অথবা আওয়ামী অত্যাচারের বিরোধিতাকারীরা অপদস্ত হননি এমন উদাহরণ পাওয়া ভার। উল্লেখিত সময়ে গোটা দেশ ছিল সন্ত্রাসের জনপদ। সন্ত্রাস পরিচালনার জন্য আওয়ামী শাসক ও ক্যাডাররা গড়ে তুলেছিল নিজস্ব বিচারালয়, বিশেষ সন্ত্রাসী মহল এবং বিশেষ ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

আওয়ামী পরিকল্পিত সন্ত্রাস বাস্তবায়নে প্রথম থেকেই আক্রমণ পরিচালনা করা হয় সংবাদপত্রের ওপর। ক্ষমতাবসানোর শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত এই হামলা অব্যাহত ছিল। আওয়ামী সরকার ক্ষমতারোহণের আগেই সর্বপ্রথম আঘাত হানে সাংবাদিক ইউনিয়নের ওপর। আওয়ামী নির্দেশনায় আওয়ামী ঘরানার সাংবাদিক নেতাদের দিয়ে '৯১ সালে প্রথমে ঢাকা সংবাদিক ইউনিয়ন এবং পরে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেয়। ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হামলা চালায় আধিপত্যবাদ বিরোধী সাংবাদিকদের ওপর। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিকল্প সংবাদ মাধ্যম গড়ে তোলা হয়। আধিপত্যবাদের অর্থানুকূল্য এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা সংবাদগুলো সরকারি সহায়তায় একে একে ভেঙ্গে দিতে থাকে আধিপত্যবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলো। দৈনিক ইনকিলাবের ওপরে নানা পরোক্ষ আক্রমণ ক্রমে প্রত্যক্ষ আক্রমণে রূপ নেয়। বিজ্ঞাপন বন্ধ ছাড়াও সর্বশেষ ঘটনা হিসেবে পত্রিকাটির সম্পাদক-প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা এবং নির্বাহী পরিচালককে গ্রেফতার করে জেলে নিক্ষেপ করা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আওয়ামী পাঁচ বছরের শাসনে সম্পাদকসহ অন্তত ৯ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। ৩৮ জন সাংবাদিককে হুমকি দেয়া হয়েছে। গ্রেফতার বা ডিটেনশন দেয়া হয়েছে ৪৮ জনকে। আক্রমণ হয়েছে ৫০ জনের ওপর। মামলা হয়েছে অন্তত ৫০ জনের বিরুদ্ধে। সাংবাদিকদের ওপর এই বর্বর আক্রমণ ও নির্যাতন পরিচালনায় সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সাঙ্গপাঙ্গ পর্যন্ত সকলেরই ভূমিকা ছিল অভিন্ন। সাংবাদিক নির্যাতনের কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে এ্যাক্রেডিটেশন কার্ডের প্রসঙ্গ তুলেছেন তেমনি জয়নাল হাজারী প্রশ্ন তুলেছেন তার বাহিনী কর্তৃক আহত সাংবাদিক টিপু সত্যিকারের সাংবাদিক কিনা। সংবাদপত্রের ওপর আঘাত অর্থাৎ মত প্রকাশের স্বাধীনতা তথা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রক্ষাকবচের ওপর আঘাত করেই সরকার নির্যাতনের সূচনা করেছিল; যেমন করেছিল তাদের পূর্বসুরি বাকশালীরা। বাকশাল গঠিত হওয়ার সময় দেশের সকল সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণে মাত্র চারটি দৈনিক চালু রাখা হয়েছিল।

প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদের নিশ্চিহ্ন করার এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে এই সরকারের যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নিধনযজ্ঞ শুরু হয়েছিল তার তথাকথিত চেতনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল বিভ্রান্তিকরভাবে মুক্তিযুদ্ধকে। বর্তমান সরকারের পূর্বপুরুষরা যখন ক্ষমতাসীন ছিলেন তখন তারাও মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা প্রশ্ন তুলে দেশকে বিভক্ত করতে শুরু করেছিল। আওয়ামী সরকারের সংসদে আশানুরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও দেশকে

www.pathagar.com

নিরংকুশ আওয়ামীকরণের লক্ষ্যে যে রাজনৈতিক নির্যাতন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল তা ছিল দ্বিমুখী। প্রকাশ্যত: হামলা-মামলা-গ্রেফতারের পথ বেছে নিলেও দ্বিতীয় পথটি ছিল এলাকা থেকে দেশপ্রেমিক শক্তিকে বিতাড়িত করা। বিরোধীদলীয় নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ অভিযোগ করেছেন যে, সরকার রাজনৈতিক নির্যাতনের জন্য সাদা পোশাকের ঈগল বাহিনী গঠন করেছেন। বিএনপির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ বিদেশে অভিযোগ করেছেন যে, আওয়ামী পাঁচ বছরে ২৫ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। অনুরূপ অভিযোগ করেছেন মুফতী ফজলুল হক আমিনীও। এক হিসাব অনুযায়ী আওয়ামী পাঁচ বছরের শাসনে সাড়ে ৩ হাঁজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পেছনে যেমন ছিল সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের মদদ তেমনি সাধারণ হত্যাকাণ্ডসমূহের পেছনে ছিল দলীয় ক্যাডার বাহিনীর হাত। চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজিসহ বিভিন্ন উপলক্ষে সংঘটিত হয়েছে অগণিত হত্যাকাণ্ড। আওয়ামী সরকার ক্ষমতাসীন হবার পরপরই সন্ত্রাসীরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করে। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী বাহিনীর গ্রুপ বিভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করে। সরকারি সমর্থনপুষ্ট শুধু একটিমাত্র সন্ত্রাসী গ্রুপই নয়; বরং সন্ত্রাসী তালিকায় ক্ষমতাসীনদের অনেক ক্ষমতাধর নেতার পুত্র-আত্মীয়দের নাম যুক্ত হয়। দেশের সর্বত্র গত ৫ বছর যেসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে তার গডফাদার হিসেবে বেশ কজন প্রভাবশালী আওয়ামী নেতার নাম রয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার খবর অনুযায়ী চট্টগ্রাম এলাকার ৫৬ জন সন্ত্রাসী ছিল সরকারি দলের ছত্রছায়ায়। সিলেটে অপরাধীদের ধরতে গিয়ে ধমক খেয়েছে পুলিশ, টাঙ্গাইলে লাঞ্ছিত হয়েছে জেলা প্রশাসক, লক্ষ্মীপুর, রংপুরের এমপি। ময়মনসিংহ, ঝিনাইদহ, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, বরিশালে আওয়ামী সশস্ত্র বাহিনী সন্ত্রাস করেছে। বগুড়ায় শিক্ষককে প্রহার করেছে আওয়ামী লীগাররা। অভিযোগ রয়েছে নাটোর, খুলনা, পার্বত্য এলাকাসহ সর্বত্রই সন্ত্রাসের নেতৃত্বে দিয়েছে আওয়ামী যুব ও ছাত্রলীগের একশ্রেণীর নেতা। তবে রাজধানী ঢাকার সন্ত্রাস ছিল সবার শীর্ষে। দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রুপ হিসেবে যে সেভেন স্টার গ্রুপের কথা ঢাকাবাসী প্রায় প্রত্যেকে অবহিত সেই বাহিনী গঠিত হয়েছিল ঢাকার ৮৩ নং ওয়ার্ডের আওয়ামী কমিশনারের ভাগ্নে সুব্রত বাইনের নেতৃত্বে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কার্যত কোন লাভ হয়নি। দিপুসহ আরো যেসব সন্ত্রাসী নগর দখলে ব্যস্ত ছিল তারাও কোন না কোন সন্ত্রাসী গ্রুপের ওপর ভর করেছিল। বিগত ৫ বছরে থানা-পুলিশের অবস্থা কি ছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় পত্রিকায় প্রকাশিত কেরানীগঞ্জের একটি রিপোর্ট থেকে। কেরানীগঞ্জ থানায় বসে সন্ত্রাসীরা পুলিশকে বলেছে, 'পান খাইবেন, গান গাইবেন, সময়মত মাল পাইবেন।' নারায়ণগঞ্জে সন্ত্রাসীদের দুর্গ গড়ে উঠেছিল আওয়ামী এমপির নেতৃত্বে। যে বিবরণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের বিরোধীদলীয় কর্মীদের ইটের ভাটায় পুড়িয়ে মারা হয়েছে। রায়পুর, লক্ষ্মীপুরের আলোচনা না করাই উত্তম। গোটা দেশ এবং বিশ্ববাসী জানে এই দুই এলাকার আওয়ামী নেতা ও সংসদ সদস্য যথাক্রমে আবু তাহের ও জয়নাল হাজারীর নৃশংস এবং বর্বর আক্রমণে কি ভয়াল রূপ ধারণ করেছে। সবকিছু ছাপিয়ে এ আমলে যে কয়টি হত্যাকাণ্ড এখনও মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে তা হলো— পীর মুজিবর রহমান চিশতির নিহত হবার ঘটনা, ফেনীতে বিএনপি কর্মী সুমনকে ড্রিল মেশিন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা, লক্ষ্মীপুরে এডভোকেট নূরুল ইসলাম, সূত্রাপুরের এডভোকেট হাবিবুর রহমান মন্ডল এবং মহসীন ও সায়েম নামে দুই যুবককে টুকরো টুকরো করে হত্যা করার ঘটনা এবং

www.pathagar.com

বিরোধীদলীয় মিছিল চলাকালে মিছিলে গুলি করে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা। এছাড়াও পুলিশী তত্ত্বাবধানে মেধাবী ছাত্র রুবেল হত্যাকাণ্ডসহ নাম জানা না জানা অসংখ্য হত্যাকাণ্ড হয়েছে। সব মিলিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গত ৫ বছরে বিশ হাজার মানুষ খুন হয়েছে। সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের ২০ লাখ সন্ত্রাসীর হাতে ১০-১৩ লাখ অবৈধ অস্ত্র রয়েছে। লেদ মেশিন ইত্যাদির আড়ালে নাকি দেশের বর্তমান ১ হাজারের মত অবৈধ অস্ত্র তৈরির কারখানা রয়েছে, যার মধ্যে ৫শই নাকি ঢাকাতে।

আওয়ামী শাসন হচ্ছে মূলত একটি বিশেষ গোষ্ঠী শাসন। এই গোষ্ঠীর সদস্য যেমন রয়েছে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী পেশায় তেমনি রয়েছে দেশের বাইরে। সে কারণেই আওয়ামী শাসন মানেই এমন এক শাসন যা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। এদের মুখে মিঠা আর হাতে বিষাক্ত ছুরি। প্রতারণা প্রধান পুঁজি। দেশের জনগণ এদের প্রতারণার শিকার হলেও প্রতিরোধ ভুলে ছিল সেকথা ঠিক নয়। আওয়ামী গোষ্ঠী যত শক্তিশালীই হোক না কেন আধিপত্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক শক্তির প্রচণ্ড উত্থান হবেই ইনশাআল্লাহ্।

ছাব্বিশ

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে এক ধরনের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে যেমনি প্রশাসনের নিরপেক্ষতা প্রমাণে পরিবর্তন সাধন করছে; তেমনি নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে যে প্রয়োজনীয় আইন তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল দেশের প্রেসিডেন্ট সেই প্রয়োজনীয়তাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনীকে ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেফতার করার অধিকার প্রদান করে অধ্যাদেশ জারি করেছেন। চলতি মাসেই ঘোষিত হতে যাচ্ছে নির্বাচনের তারিখ। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রার্থী বাছাই পর্ব শুরু হয়েছে। দেমের বিরাজমান প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে এ প্রস্তুতি ঠিক খুব জোরেশোরে চলছে তেমনটা বলা বোধ হয় সঙ্গত নয় আবার খুব ধীর গতিতে চলছে এমন বলাও অসঙ্গত হবে। গতির এই ভারসাম্য ঠিক কেন বজায় রাখা হচ্ছে তার ব্যাখ্যা কোনো মহল থেকেই পরিষ্কার পাওয়া যাচ্ছে না। নির্বাচন ভাবনা নিয়ে একটি দৈনিকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগামী নির্বাচনে গোটা রাজনীতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। একটি আওয়ামী অন্যটি আওয়ামী বিরোধী শক্তি। সত্যি বলতে কি গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই দু'টি ধারাই চলে আসছে। তখন শাসক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ মূলত আওয়ামী বিরোধী শক্তিকে ঘায়েল করার জন্য নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছিল। আওয়ামী বিরোধীদের ঘায়েল করার পক্ষে শাসক দলের যুক্তিও ছিল খুব পরিষ্কার। তারা বলতো এবং এখনও বলছে যে, '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরবর্তী ক্ষমতাসীন দলগুলো কোন না কোনভাবে আগস্টের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের অংশীদার অথবা সুবিধাভোগী। আর সে কারণেই ১৫ আগস্ট পূর্ব ও পরবর্তী এই দুই ধারায় রাজনীতিকে বিভক্ত করে আওয়ামী শাসকরা দেশ পরিচালনা করেছে। আগামী নির্বাচনের বেলাও প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ ঐ ধারায় নির্বাচনকে মোকাবিলা করার চিন্তা থেকে নিজেই এককভাবে নির্বাচন করতে চাচ্ছে। গত সংসদে যারা জিতেছে তারা যেমন নিজেদের 'কীর্তি' ধরে রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত তেমনি যারা জিতেনি তারা আওয়ামী মহিমা বিস্তার করে জেতার চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছেন। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে পারিবারিক ও দলীয় প্রশাসনে

www.pathagar.com

পরিণত করে যেখানে যতটুকু করা সম্ভব তা করে নেয়ার চেষ্টা তারা ইতোমধ্যেই করেছেন বৈ কি। মন্ত্রী সভায় যারা ছিলেন তাদের আলোচনা তো একেবারেই অর্থহীন। মন্ত্রী থাকার সুবাদে রাষ্ট্রীয় সুবিধা নেয়া থেকে মুরু করে ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রেই আখের গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছেন। ঐ সময়ের ক্ষমতাসীন মন্ত্রী, মন্ত্রীপুত্র, সংসদ সদস্যদের মহান কীর্তির কথা তখন এক-আধটু প্রকাশিত হলেও এখন বিস্তারিতভাবে একে একে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। বর্তমানে মন্ত্রীপুত্ররা অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রসহ সন্ত্রাসী অভিযোগে গ্রেফতার হতে শুরু হয়েছে। অন্যদিকে খুন, হত্যা, রাহাজানির অভিযোগ ক্রমাগত উঠতে শুরু করেছে তাদের বিরুদ্ধে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ঐ ক্ষমতাসীনদের দম্ভ এখনও শেষ হয়নি। এই তো সেদিন ফেনীর সেই বহুল আলোচিত সাবেক সংসদ সদস্য হুংকার দিয়ে বললেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার জজ কোর্ট ভবন উদ্বোধন করলে তার প্রতিটি ইট গুড়িয়ে দেয়া হবে। আসলে আওয়ামী ক্ষমতার রশি ছিঁড়লেও তার উৎস নিঃশেষ হয়নি। তারা যেহেতু মোটামুটি নিশ্চিত যে, আগামী নির্বাচনে তারা প্রায় জিতেই গেছেন; সুতরাং নির্বাচনী ভাবনা তাদের একটু কম থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। যদিও ইদানীং সূক্ষ্মের পরিবর্তে অতিসূক্ষ্ম কারচুপি ও ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন বলে আওয়ামী শিবির থেকে বলা হচ্ছে।

আওয়ামী বিরোধী শিবির বলতে এখনও দু'টি ধারাকেই বোঝায়। চারদলীয় জোট এই ধারার প্রধান স্রোত। সাবেক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের এক পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যে চার শীর্ষ নেতা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন বর্তমানে তাদের একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এবং চরমোনাইর পীরের সমন্বয়ে অন্য একটি জোট গঠিত হয়েছে। কারাগার থেকে বেরিয়ে জাতীয় পার্টি প্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জাতীয় ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট নামে যে জোট গঠন করেছেন সম্প্রতি তারা রাজধানী ঢাকায় বেশ বড় ধরনের শোডাউনও করেছে। ঐ জোট গঠনের আগেই চরমোনাইর পীর সাহেব আওয়ামী লীগকে ভোট না দেয়ার আহ্বান জানিয়ে ফতোয়া জারি করেছেন। কিন্তু এই সময়ে তিনি বলেননি কাকে ভোট দিতে হবে। কাকে ভোট দিতে হবে আগামী নির্বাচনের নেতিবাচক এবং ইতিবাচক এই দিকটিই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। বলার অপেক্ষা রাখে না, আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনের ইতিবাচক দিক তুলে ধরার চেষ্টা করছে। যা তারা গত পাঁচ বছরে পারেনি তা আগামীতে পারবে বলেও জনগণকে ওয়াদা দিচ্ছে। ইতোমধ্যে চারদলীয় জোট বা বিএনপিতে যোগদানের নতুন ধারা সূচনা করেছেন সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য জনাব মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ। মুরাদনগর থেকে হাজার হাজার লোক রাজধানী ঢাকার পুরানা পল্টন এলাকায় বিএনপি অফিসের সামনে জড়ো করে নিজের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যোগদান করেছেন তিনি। যোগদানের এই পদ্ধতিতে নতুনত্ব যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব; কারণ একজন নেতার জনপ্রিয়তাই তার অন্যতম যোগ্যতা। গত কয়েক বছর থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়ন পাবার যে ধারণা জনসম্মুখে রয়েছে এই পদ্ধতিতে তার কিছুটা হলেও ব্যত্যয় ঘটেছে। সব কথার মূল কথা হলো নির্বাচনে জয়লাভ করা। আর এ জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো মাঠ দখলে রাখা।

নির্বাচনের ফলাফল কি হবে, কাদের অনুকূলে যাবে সে প্রশ্নে আসার আগে, যে প্রশ্নের সমাধান আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা হলো জাতীয় রাজনীতিতে ইতিবাচক ধারার সূচনা করা। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে যে সংকট চলে আসছিল গত পাঁচ বছরে আওয়ামী ক্ষমতায়নের ফলে তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং প্রধান প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে জাতীয় স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব টিকবে কিনা? গত পাঁচ

www.pathagar.com

বছরের শাসনামল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশ থেকে আধিপত্যবাদবিরোধী ধারা ও চেতনাকে বিলুপ্ত করার জন্য সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টার বিরুদ্ধে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল বিএনপি মুখরক্ষামূলক কোন কর্মসূচীও গ্রহণ করেননি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিসহ গণবিরোধী নানা চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ভাব দেখালেও কার্যত কিছুই করেননি। তখন বলা হতো সরকারী নির্যাতনের ভয়ে কোন আন্দোলন করা সম্ভব হচ্ছে না। এখন তো আওয়ামী শাসনের অবসান হয়েছে এবং দেশে আধিপত্যবাদবিরোধী জনতা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আধিপত্যবাদবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে বাধা কোথায়? সুতরাং আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে জনমত গঠন এবং সংগঠিত করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অবশ্যই আসন্ন নির্বাচনের পূর্বে আধিপত্যবাদবিরোধীদের প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী প্রদান করতে হবে। সমাবেশের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা প্রমাণের কোন গুরুত্ব নেই ব্যাপারটি তা নয়; বরং জনপ্রিয়তার ভিত্তিতেই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়। কিন্তু এই জনপ্রিয়তাকে যদি আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব না হয়ে তাহলে আগামীতে গোটা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই যে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে তা প্রমাণিত হয়েছে বড়াইবাড়ীর সীমান্ত সংঘর্ষে। সুতরাং নির্বাচনে কোন শক্তি বাধা প্রদান করছে এটি প্রধান ইস্যু নয়; বরং প্রধান ইস্যু হচ্ছে এমন একটি নির্বাচন করা যার মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা টিকে থাকবে। আর এই দায়িত্ব পালনের ভার বর্তেছে আধিপত্যবাদবিরোধীদের ওপর। তারা ব্যর্থ হলে ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না।

সাতাশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হজ শেষে দেশে ফিরে নির্বাচনের জন্য বিরোধী দলের সাথে আলোচনার প্রস্তাবদানের শুরু থেকেই আঁচ করা হয়েছিল রাজনীতিতে নতুন কিছু ঘটতে যাচ্ছে। মুখে মধু হাতে বিষের ছুরি নিয়ে যে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা বিরোধী দল গ্রহণ না করায় গত ৩০, ৩১ মার্চ প্রদত্ত জনসভার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ও তার দলবলের অন্যরা যে যুদ্ধংদেহী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন ক্রমশঃ তা পরিণতি লাভ করছে। ঐ দু'দিনের ভাষণে বাংলাদেশের চলমান রাজনীতির যে বিশেষ দিকের ইঙ্গিত করা হয়েছিল তা হল ১. জামায়াত-ই-ইসলামীকে চারদলীয় জোট থেকে বের করে নেয়া, ২. ইসলামী শক্তিগুলোর ওপর হামলার হুমকি।

৩০ মার্চের জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর সভামঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল জামায়াত-ই-ইসলামী চারদলীয় জোটে থাকবে না। ৩১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী ও তার সাথের অন্যরা দেশ থেকে রাজাকার উচ্ছেদের কথা বলে প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শক্তিগুলোকে নির্মূল করার হুমকিই দিয়েছিলেন। গত কয়েকদিনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের আসল রূপ উন্মোচিত হয়েছে। হরতালকে কেন্দ্র করে জামায়াত-ই-ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেলকে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে দলের শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর প্রথম দফা এবং পরের দিন শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর দ্বিতীয় দফা আক্রমণ করে অন্তত অর্ধসহস্র নেতা-কর্মীকে গ্রেফতারের মধ্যদিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল বলছে, এই ঘটনার কারণ হতে পারে চারদলীয় জোট আহূত আগামী হরতালকে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে বিরোধী দলকে শায়েস্তা করার নিমিত্তে এই কর্মকাণ্ড পরিচালিত করা। এই মহল মনে করছে, চারদলীয় জোট গঠিত হওয়ার পর জনমনে যে আশা-

www.pathagar.com

আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে জনগণকে সরিয়ে নেবার লক্ষ্যে জোট বিরোধী কর্মকাণ্ড অনেক আগেই শুরু হয়েছে। এই কর্মকাণ্ডকে বাস্তবে রূপ দিতেই শুরু করা হয়েছে নানা ধরনের পরিকল্পনা। ৮৫ বছরের বৃদ্ধ সর্বজন শ্রদ্ধেয় আল্লামা আজিজুল হককে গ্রেফতার করে সরকারের পক্ষ থেকে এমন একটা ভাব ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল যেন ইসলামী ঐক্যজোট ছাড়া আর কারও ওপর সরকারের কোন আক্রোশ নেই। এবারের জোটের অন্য শরীক দল জামায়াত-ই-ইসলামীর ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সরকার অন্য কারও উপর ক্ষিপ্ত নয়। জামায়াত-ই-ইসলামীর ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি পর্বটি বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনের খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনী প্রধান যে বক্তব্য দিয়েছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় অবশ্যই আলোচনা করা দরকার যে, প্রধানমন্ত্রী যত রং ধরে ঢং করে বলুক না কেন তিনি আসলে আওয়ামী লীগ প্রধান। সুতরাং আওয়ামী রাজনীতির মূল ধারা থেকে তার পক্ষে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে তার বক্তব্যকে রাজনৈতিকভাবেই বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে রাজাকার নামে কোন নাগরিকের অস্তিত্ব না থাকলেও তিনি যখন রাজাকার উচ্ছেদের হুমকি দেন তখন ধরে নিতে হয় যে, আধিপত্যবাদ বিরোধীদের বিরুদ্ধেই তিনি হুমকি দিচ্ছেন। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন। প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের আওতায় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনই তার কর্তব্য। তিনি যখন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক শ্লোগানের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং সংবিধান বহির্ভূত ভাষা ব্যবহার করে দেশের জাতীয়তাবাদ বিরোধী বক্তব্য রাখেন তখন উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত। ঐ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী। তা সত্ত্বেও সেনাবাহিনী প্রধান, প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সামনে যে বক্তব্য দিলেন তা অতীতকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। দেশে প্রথম যে সংবিধান রচিত হয়েছিল '৭৫ সালে সেই সংবিধানকে ব্যবচ্ছেদ করে একদলীয় পদ্ধতি অর্থাৎ বাকশাল কায়েম করার পর সংবিধানের মূল চেহারার পরিবর্তিত হয়ে যায়। গণতান্ত্রিক সংবিধানে যেখানে সেনাবাহিনী প্রধান প্রজাতন্ত্রের একজন সেবক সেখানে বাকশাল সেনাপ্রধান একজন দলীয় কর্মী। সেই বিবেচনায় বর্তমান সেনাপ্রধান কোন সংবিধানের আওতায় বক্তব্য প্রদান করেছেন তা আমরা জানি না। যদিও বাকশালের ঐ আইনটি এখন আর বহাল নেই। তবে ৩১ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর যে হামলা শুরু হয়েছে তাকে মিলালে একটি গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের চেহারাই পরিষ্কার হয়ে উঠে।

জামায়াত-ই-ইসলামীর ওপর প্রথম দফা হামলার পর বিবিসির সাথে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে জামায়াতের আমীর বলেছেন, বিনা গ্রেফতারী পরোয়ানায় তার দলের সেক্রেটারী জেনারেলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিবিসির সাথে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বিনা অপরাধে সরকার কাউকে এমনকি রাজাকারকেও গ্রেফতার করে না (!); আর তিনি তো কারো কারো কাছে ছোটখাটো নেতাও। সরকারী এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আসলে গ্রেফতারের আসল চেহারা এবং কারণ ফুটে উঠেছে। সুতরাং বলা যায়, গ্রেফতারের প্রধান কারণ হল জোটকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। সে যাই হোক বাংলাদেশের চলমান প্রেক্ষিত এবং ৩১ মার্চ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ নিয়ে আলোচনা করা দরকার। সেই সাথে এ কথাও বলে রাখা দরকার যে, মুক্তিযুদ্ধ কোন দলীয় সম্পত্তি নয়; বরং দেশের সাধারণ জনগণের দেশপ্রেমের এক অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম লগ্নে এই মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে শুরু হয়েছিল রাজনীতির খেলা। তৎকালীন সরকারের নানাজনে নানা নামে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে

www.pathagar.com

নানা দল, উপদলে বিভক্ত করে জীবনবাজি রাখা মুক্তিযোদ্ধাদের আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে শুরু করেছিল ব্যক্তি আনুগত্যের ভিত্তিতে। এই কারণেই সেদিন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। জেনারেল হিসেবে তার পেনশন পর্যন্ত বরাদ্দ করা হয়নি। ব্যক্তি আক্রোশের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল। স্বাধীনতার পরপর তিনিই সম্ভবত প্রথম বন্দী। সেই নাটকের আবার মঞ্চায়ন শুরু হয়েছে। ৩১ মার্চের মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে আবারও উপেক্ষিত হয়েছেন জেনারেল ওসমানী। তবু উল্লেখ করা দরকার যে, সরকারী মহল থেকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যত কাণ্ড-কীর্তিই করা হোক না কেন সাধারণের মধ্যে এর কোন প্রভাব নেই। এদেশের মুক্তিযোদ্ধা এবং আপামর জনগণ সবাই জানেন যে, এদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাধিনায়ক কে? মেজর জলিল যখন সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তখন বর্তমান সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর রফিকসহ সকল সেক্টর কমান্ডার এবং আপামর জনতা মেজর জলিলের লাশ সামনে নিয়ে প্রেস ক্লাবের প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছিলেন সরকারী স্বীকৃতির জন্য। অবশেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মেজর জলিলকে সমাহিত করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, বর্তমান সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেও সম্ভবত সেই সবদিনের কথা বেমালুম ভুলে গেছেন তারা।

আসলে বর্তমান সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী জাতির নিষ্পত্তিকৃত ইস্যুগুলোকে আবার খুঁচিয়ে তুলে গোটা জাতির মধ্যে যে বিভাজন রেখাকে পরিষ্কার করছেন তা দেশে চালু থাকা সংবিধান সম্মত নয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর উন্নত, অনুন্নত সব দেশেরই একটি সংবিধান আছে। কোথাও এই সংবিধান লিখিত, কোথাও অলিখিত। লিখিত বা অলিখিত যাই হোক না কেন রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধানের কোন বিকল্প নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পরিবর্তন হলে সেখানকার আমলাদের শীর্ষপদেও পরিবর্তন আসে। কিন্তু আমাদের দেশে এ রকম কোন রেওয়াজ নেই। তা সত্ত্বেও বর্তমান আমলে দেখা গেছে যে, দেশের প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে অনেক শীর্ষপদ নিয়েই টানাটানি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তার ঘোষণা অনুযায়ী প্রস্তাবিত আলোচনা বাতিল করে ক্রমান্বয়ে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দিয়ে নিজের ঘর সামলাবার যে খেলা শুরু করেছেন তার পরিণতি কি দাঁড়াবে তা হয়ত এক্ষুণি বলা সঙ্গত হবে না। চারদলীয় জোট ঘোষিত কর্মসূচীকে সামনে রেখে সরকার যে নীতি এবং কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে তা সময়োচিত কিনা এ প্রশ্নের সমাধান পেতেও আরও দু'একদিন সময় লাগবে। তবে বর্তমান আন্দোলন প্রক্রিয়ায় জোট অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা ফেলতে শুরু করেছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। জোট ঘোষিত বিগত কর্মসূচীর সফলতা সরকারের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে এ কথা নিঃসন্দেহে সঠিক। আর সে কারণেই যে পথে সরকার হাঁটতে শুরু করেছে তা যে ঝুঁকিপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সরকারী কৌশল হিসেবে নির্বাচনে জেতার জন্য যদি এমন কোন প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন বা জাতিকে বিভাজিত করতে চান তাহলে তা থেকে কেবলমাত্র গৃহযুদ্ধেরই সূচনা হতে পারে। সরকার যদি নির্বাচনে বিজয়ের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দলীয় কর্মী হিসেবে ব্যবহারের চিন্তা করে থাকেন সেক্ষেত্রেও বিপদ কম নয়। কারণ, দলগতভাবে মুক্তিযোদ্ধারা এককভাবে সরকারী দলের নয় বরং সর্বত্রই ছড়িয়ে আছেন। প্রকৃতপক্ষ, একটি নির্বাচিত সরকারের পুনর্বার নির্বাচিত হওয়ার একমাত্র পদ্ধতি হল তার জনকল্যাণমূলক কাজ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই রীতি অনুসৃত না হলে দেশ স্বৈরাচারে পরিণত হবে। সংবিধান বহির্ভূতভাবে বর্তমান সরকার দেশের সর্বত্র যেভাবে দলীয়করণ করে চলছে তার পরিণতি খুব ভাল নয়। বলা যায়, এ কোন নির্বাচনী প্রস্তুতি না হয়ে সর্বাত্মক সাঁড়াশি আক্রমণের প্রস্তুতিও হতে পারে। আলোচনার নামে সময়

www.pathagar.com

গ্রহণ করে যে প্রস্তুতি পর্ব সরকার সমাপ্ত করেছে তার মধ্যে আরও একটি বিশেষ বিষয় হচ্ছে সরকার হয়ত ধরে নিয়েছে যে, দমন-পীড়নের মাধ্যমে চলতি মাস কাটিয়ে দিতে পারলে বিরোধী আন্দোলনের জোর কমে আসবে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন পরীক্ষাসহ বর্ষা মৌসুমও অত্যাসন্ন। সরকারের কাছে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরে ব্যাপক বন্যার যে সম্ভাবনা রয়েছে তা যদি সত্যি সত্যিই ঘটে যায়। তাহলে যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় থাকতে সরকারের আর কোন সমস্যাই হবার কথা নয়। সেদিক থেকে চলতি মাসকে গুরুতর সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকতে পারে।

সরকারী কৌশলে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে যে পরিবর্তন প্রক্রিয়া রূপ নিতে শুরু করেছে তাকে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী কৌশলই যথেষ্ট। সতর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে প্রকৃত আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে হলে অবশ্যই জনগণের ঐক্যকে ধরে রাখতে হবে। হরতালের মাধ্যমে জনগণের নিয়ন্ত্রণভার বিরোধীদলের ওপর এসে থাকলে তাকে ধরে রাখতে হবে এবং যে কোন বিবেচনায় তা সংহত করতে হবে। অন্যথা বিপর্যয় সকলের। শুধুমাত্র গ্রেফতারই নয়; বরং সরকারী প্ররোচনাতেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। আজকের দিনে তাই সকলকেই লক্ষ্য অর্জনে সন্তর্পণে এগুতে হবে।

আঠাশ

চলমান রাজনীতি বিশ্লেষণ করে মন্তব্য বলা হয়েছে দেশের দ্রুত রাজনৈতিক মেরুকরণ হচ্ছে। চলছে ভাঙ্গাগড়ার খেলা। মেরুকরণের পর চারদলীয় জোটের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গড়ে উঠতে পারে নতুন কোন বিরোধী জোট। নতুন এই মেরুকরণের পর আগাম নির্বাচনের চমক আসতে পারে বলে জানা গেছে। এই রাজনৈতিক মন্তব্য গ্রহণযোগ্য কিনা সে প্রশ্নে যাবার আগে বক্তব্যের মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বিশ্লেষকরা মনে করেন উপরোক্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষণের প্রধান প্রতিপাদ্য ১. চার দলকে আঘাত করা ২. তাদের অনুগত ও নির্ভরযোগ্য একটি বিরোধী দল গড়ে তোলা।

প্রথমতঃ যদি চারদলীয় জোট নিয়ে আলোচনা করতে হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই জোটের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বের দিকটি প্রাধান্য পাবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে, বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারের সন্ত্রাস, নির্যাতন, নিপীড়ন যখন সকল কালের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে তখনই জনমনে প্রতিরোধ স্পৃহা জেগে উঠে। যে কোন কারণেই হোক জনমনে এই চেতনা এবং রাজনৈতিক মহলেও এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, আওয়ামী সন্ত্রাসের প্রতিরোধে বিএনপি এককভাবে যথেষ্ট নয়। এই ধারণার পিছনে অনেক কারণই প্রাধান্য পেয়েছে তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে, আওয়ামীরা যেভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অভিজ্ঞ সন্ত্রাসীদের দ্বারা পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস পরিচালন করছে তার প্রতিরোধে বিএনপি সত্যিকার অর্থেই সক্ষম নয়। কার্যতঃ আধিপত্যবাদের দোসর ও তাঁবেদার শক্তিকে মোকাবিলা করতে আধিপত্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তির সমন্বিত প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাবার উদ্যোগ থেকেই জোট গঠনের বাস্তবতা গ্রহণ করা হয়েছিল। সদ্য সমাপ্ত হরতাল পর্যবেক্ষণ করলেও একথা বলা অন্যায় নয় যে, দেশের জনগণের নিয়ন্ত্রণভার প্রকৃতপক্ষে, আধিপত্যবাদবিরোধীদের হাতেই রয়েছে। আর সম্ভবতঃ এখানেই বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় ভয়। এই ভয়ে ভীত হয়েই তারা ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চাচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে সরকারের এই ভয়ের উৎস কোথায়? নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ড থেকেই তাদের অন্তরে গেঁথে আছে এই ভয়। অতি সম্প্রতি বিএনপি স্ট্যান্ডিং

www.pathagar.com

কমিটির সদস্য-কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ এমপি বলেছেন, শেখ হাসিনার আমলে দেশের ২৫ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যান কতটা সঠিক অথবা বেঠিক এ নিয়ে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিশ্ব বিবেক সরকারী নির্যাতনের যে চিত্র তুলে ধরেছে এবং নির্যাতনের প্রকৃতি নিয়ে যেসব মন্তব্য করেছে তা সরকারের চরিত্র বিশ্লেষণে গ্রহণ করা যেতে পারে। '৯৬ সালে বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর '৯৭ সালে প্রকাশিত মানবাধিকার রিপোর্টে বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে, পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন ও হত্যা, বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন নারী ও শিশু নির্যাতন, দোষীদের শাস্তি না হওয়া, বিরোধীদের ওপর বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রয়োগ, নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। ঐ রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয় যে, জেলখানার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। বর্তমানে সেখানে ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশী লোক রয়েছে। রিপোর্টে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর পুলিশের অত্যাচার বিশেষ করে শফিউল আলম প্রধানকে বৈদ্যুতিক শক দেয়া, মিসেস জোবায়দা রশিদের ওপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ রয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী '৯৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটকের পরিমাণ ছিল দু'হাজার। '৯৯ সালের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রকাশিত ২০০০ সালের এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, দীর্ঘ সময় ধরে নির্যাতনকে সরকার স্বাভাবিক আচরণ প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশের পুলিশী নির্যাতনের উল্লেখ করে ঐ রিপোর্টে বলা হয়, পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের ফলে বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। ঐ বছর জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর সময় নির্যাতনে ৪৯ জন মৃত্যুবরণ করেছে বলে জানা যায়। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০০ সালের ১১ মাসে ৬৯৩টি ধর্ষণ এবং আইন-শৃংখলা বাহিনীর হাতে ৪৫ জন নিহত হয়েছে।

চলতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসে গত বছরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে প্রকাশিত মানবাধিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ এবং আধা সামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দু'টি বাহিনী আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। সরকার প্রায়ই পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি বিরাজ করছে এবং শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তারা অনেকগুলো মারাত্মক মানবাধিকার লংঘনের জন্য দায়ী। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সরকারের মানবাধিকার রেকর্ড খারাপ এবং সরকার গুরুতর মানবাধিকার লংঘন অব্যাহত রেখেছে। পুলিশ বেশ কয়েকটি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং কয়েক ব্যক্তি সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে পুলিশ হেফাজতে প্রাণ হারায়। সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদকালে পুলিশ নিয়মিতভাবে নির্যাতন, প্রহার ও অন্যান্য ধরনের মানবাধিকার লংঘন প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়। প্রায়ই পুলিশ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের মারধর করে। নির্যাতন ও আইন গর্হিত মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের সরকার কদাচিত দোষী সাব্যস্ত ও শাস্তি বিধান করে। কারাগারগুলোর অবস্থা অধিকাংশ বন্দীর জন্য অত্যন্ত দুর্বিষহ। কারাগারে ও অন্যান্য সরকারী হেফাজতে মহিলা বন্দীদের ধর্ষণ একটি সমস্যা। এছাড়াও বিরোধ ও অন্যান্য নাগরিকদের হয়রানির উদ্দেশ্যে নিবর্তনমূলক আটক, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতিরেকে আটকের ব্যবস্থা সম্বলিত বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫৪ ধারা প্রয়োগ সরকার অব্যাহত রাখে। সরকার সমর্থকদের ওপর হামলাকারী বিরোধী দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানিয়ে সরকার হানাহানিকে উৎসাহিত করে। বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার বেশ কয়েকটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্ত অভিযোগ ভুয়া হতে পারে। বিচার

www.pathagar.com

বিভাগের বেশীর ভাগই সরকারী প্রভাবাধীন এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। ঐ রিপোর্টে পুলিশ নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ১৯ জন নির্যাতিত এবং হত্যার উল্লেখ করে বলা হয়, এর মধ্যে নির্যাতনে ৭ জন হত্যা এবং ১১ জন নির্যাতিত, ৩ জন শিশু ও ১৪ নারীসহ ১৪৪ জন হয়রানি ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার, ৭ বছরের শিশু থেকে ৩০ বছরের ১৬ জন ধর্ষিত, ১১ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে ৬০ জনের। এক সাংবাদিক নির্যাতিত, ১৪ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা এবং ২০ জনের বিরুদ্ধে হামলা এবং দু'টি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরকার নির্যাতন চালিয়েছে। ২০০০ সালে প্রকাশিত এমনেস্টি রিপোর্টে বাংলাদেশের সরকারী নির্যাতন রোধে দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে ১২ দফা সুপারিশ করেছিল। ঐ প্রস্তাবে ৫৪ ধারা এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ও বলবৎযোগ্য রক্ষাকবচ প্রতিষ্ঠা; পুলিশ কোন কারাগারীকে রিমান্ডে চাইলে ম্যাজিস্ট্রেট যাতে আসামীর দেহে নির্যাতনের চিহ্ন কিংবা নির্যাতনের অভিযোগ উপেক্ষা না করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে নির্যাতনের প্রতিটি অভিযোগ তদন্ত করা এবং যাদের অবহেলার কারণে নির্যাতনের পথ সুগম হয়েছে তাদের সনাক্তকরণের কথা বলা হয়েছিল। বলা বাহুল্য এসব সুপারিশমালা সরকার আদৌ পড়ে দেখেছেন কিনা বলা যাবে না। তবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকারী মাত্রা গত দু'তিন বছরে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছর দেশের বয়োবৃদ্ধ ইসলামী নেতৃবৃন্দসহ সর্বশ্রেণীর জনগণের ওপর নেমে এসেছে বহুমাত্রিক অত্যাচার।

বাংলাদেশ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মিশনগুলো যেসব রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন তা কার্যতঃ ছকে বাঁধা রিপোর্ট। এসব সংগঠনের অনেকেই আবার তথাকথিত মৌলবাদ নামক ভীতিতে আক্রান্ত থাকার কারণে গত সাড়ে চার বছরে সরকারী নির্যাতনের আসল চরিত্র উন্মোচন করেনি। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক একমত হবেন যে, বর্তমান সরকারের শাসনামলে আধিপত্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী এবং বহুত্ববাদবিরোধী ইসলামী শক্তি আক্রান্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশী। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই নানা অজুহাতে কল্পিত জুজুর ভয়ে মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে মুফতী পর্যন্ত কেউই রক্ষা পায়নি। প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই সরকার উৎখাতের অভিযোগ দায়ের করে কারান্তরালে নিক্ষেপ করে তাদের ঈমানী পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। ওলামা-মাশায়েখ সমাবেশে দাবী করা হয়েছে, অর্ধলক্ষ আলেমের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা রয়েছে।

সত্যি কথা হচ্ছে এই যে, ইসলাম শক্তিগুলোকে দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সরকার নানা অজুহাত দাঁড় করালেও আসলে এর কোন প্রয়োজন হয় না। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থাপিত রাজাকার তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে এ দেশকে ইসলামী শক্তিবিহীন করার চক্রান্ত করা হয়েছে। পরিস্থিতি কি আকার ধারণ করেছে তার চিত্র ফুটে উঠেছে সদ্য সমাপ্ত আওয়ামী সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায়। সংসদীয় দলের বৈঠকে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী এমপিদের জেতার জন্য মসজিদে গিয়ে সাধারণ মুসল্লীদের সাথে নামাজ আদায় করে আওয়ামী লীগ যে ধর্মদ্রোহী নয় তার প্রমাণের নির্দেশ দিয়েছে। অন্যদিকে সরকার প্রকৃত আধিপত্যবাদবিরোধীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে যাচ্ছে। প্রকাশ্যতঃ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাদের প্রীতি দেখে বিভ্রম হতে পারে যে, সরকার সম্ভবতঃ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মমত্ববোধের কারণে এসব করছেন। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, সামগ্রিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ নয়; বরং রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে শাসক দলের সাথে আত্মীকৃত কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাকে শো করে দলীয় কর্মকাণ্ডকে পার পাইয়ে দেয়ার জন্যই নতুন ছলনার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। দেশের বহু মুক্তিযোদ্ধা রাস্তাঘাটে অবহেলিত এবং কারান্তরালে জীবণপাত করলেও সরকারের মুখচেনা কিছু লোকদেরকে

www.pathagar.com

জনতাকে দেখিয়ে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধা প্রেমিক।

সরকারী নিগ্রহ ও নির্যাতনের শিকার আধিপত্যবাদী বহু বিরোধী ইসলামী শক্তি জনগণকে সাথে নিয়ে যে চারদলীয় জোট গঠন করেছে বর্তমান সরকার কোন পরিস্থিতিতেই তাদেরকে নিরাপদ মনে করছে না। আর সে কারণেই ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেও নানা টালবাহানা করছে। জোট অভ্যন্তরেও নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। কোন কোন বিষয় আন্তরিকতার প্রশ্ন প্রকাশ্যই উত্থাপিত হচ্ছে। মধ্যপন্থী, ভারতপন্থী বা যে কোন পন্থীর জোট গঠনের চেষ্টা করে সরকার যদি নিজেকে নিরাপদ মনে করেন তাহলে সেই ধরনের জোটের পরিণতি কি হবে আগামীতে তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

ইতোমধ্যেই বিরোধী দল আগামী ২৩ তারিখ থেকে আবারো লাগাতার ৭২ ঘন্টা হরতালের ডাক দিয়েছে। অর্থাৎ চলমান চারদলীয় জোটের আন্দোলন পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এদিকে আওয়ামী লীগের সংসদীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এমপিদের নির্বাচনের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, আমি হুইসেল বাজালেই যেন নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন এমন মানসিক অবস্থা তৈরি করুন। সুতরাং বাগাড়ম্বর যতই হোক রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকেই এগুচ্ছে এবং তা হলো একদিকে নির্যাতক অন্যদিকে নির্যাতিত। তাই কি প্রক্রিয়ায়, কার প্রতি আস্থা স্থাপন করে অথবা কাদের ওপর ভরসা ও ভর করে বর্তমান সরকার কেয়ারটেকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান তা একান্তই তাদের ব্যাপার। আজ জন এবং জনতার দাবী হচ্ছে অবিলম্বে কেয়ারটেকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। শেষ করতে চাই, হ্যামিলনের সেই বংশীবাদকের গল্পকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, যে ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও লোভের কারণে সেই বংশীবাদক হুইসেল বাজিয়ে হ্যামিলীনের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধ্বংস করে দিয়েছিল, না জানি আমাদের হুইসেলদাতা কোন হুইসেল বাজিয়ে জাতির ভবিষ্যতকে নষ্ট করে দেন।

উনত্রিশ

মানুষ ছাড়াও কিছু কিছু প্রাণী নিজ সন্তান ও স্বজনদের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হয় না। এমনকি নিজ জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়ার নজিরও রয়েছে এক্ষেত্রে। কিন্তু মৎস্য অর্থাৎ মাছ নামক প্রাণীটির অবস্থা হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মাছ নাকি নিজ পুত্র-কন্যাদের নিজেই ভক্ষণ করে থাকে। এরকম নিষ্ঠুর প্রাণীকে যদি স্বজন (?) দরদে অস্থির হয়ে পড়তে দেখা যায় তখন কৌতূহল জাগে বৈকি! বাংলা ভাষায় 'মাছের মায়ের পুত্র শোক' প্রবাদটি এমন অস্বাভাবিক বিষয় বুঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের আজ এই প্রবাদটি মনে পড়ছে সম্প্রতি বিএনপি থেকে জনাব আনোয়ার জাহিদ ও সালাউদ্দীন চৌধুরীকে বহিষ্কারের ঘটনায় খ্যাতিমান সাংবাদিক জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী ও জনাব আবেদ খানের প্রতিক্রিয়া দেখে। ঐ দু'জন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা বিএনপিতে থাকার কারণে বিএনপি যেন রাহুকবলিত ছিল আর সে কারণে বিএনপির অকল্যাণ চিন্তায় সাংবাদিকদ্বয় যেন এতদিন খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন এমন একটা ভাব তাদের লেখায় বিধৃত থাকায় এ নিয়ে বেশ রসালো কথাবার্তার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ২০/২১ বছর আগে তারা যদি বিএনপির দরদে এমনি বেচইন হতেন তাতে কারোর মনে কোন প্রশ্ন দেখা দিত না। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এজন্যই যে, ইতোমধ্যে তারা ডিগবাজি খেয়ে খেয়ে এমন খ্যাতি অর্জন করেছেন যে, তাঁদের এ সম্পর্কিত লেখা পড়ে 'মাছের মায়ের পুত্র শোক' প্রবাদটিই মনে এসে যায় অনায়াসে, অবলীলাক্রমে।

www.pathagar.com

কেন আমরা ২১ বছর আগের জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী ও আবেদ খান এবং আজকের জনাব চৌধুরী ও খান এক নন; এ কথা কেন বলছি তার দু'একটি কারণ উল্লেখ করে বর্তমান প্রসঙ্গে আসছি।

জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরীর বাংলাদেশে থাকার সময় '৭২ থেকে '৭৫-এর ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে অনেক লেখা লিখেছেন। তার বিলেত যাওয়ার আগে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যখন বাকশাল নামক এক দল গঠিত হল তখন এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে 'সীমাহীন বন্যতা' বলে প্রবাসে যান। এর আগে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে দেয়া বিশ্ব মানবতার ত্রাণ সাহায্য যখন কলিকাতার ফুটপাতে বিক্রি হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে তিনি দৈনিক ইত্তেফাকে উপ-সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেভেন মার্ডারের পর তার সম্পাদিত দৈনিক জনপদে এই ঘটনাকে 'সবে তো আমাদের ভুলের মাসুল' বলে উল্লেখ করেছিলেন। '৭২-এর ২১ ফেব্রুয়ারীতে শহীদ মিনারে মধ্যরাতে বাতি নিভিয়ে যে বর্বরতা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন। টাঙ্গাইলের রামপুর-কুকরাইলে পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে তৎকালীন সরকারের সমালোচনা করে লিখেছেন, "গদি নিজেদের দখলে পেয়ে তারাও পুরনো কায়দায় ক্ষমতা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। ভেবেছেন বুঝি এটাই নিয়ম। ব্যবহার না জানলে অপব্যবহারটাও কেউ দক্ষতার সাথে করতে জানে না। এখন ক্ষমতার নির্যাতন তা-ই আরো মাত্রাহীন।" "দগ্ধ লুণ্ঠিত বিধ্বস্ত গ্রামটিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়া নারী-পুরুষের পাশ কাটিয়ে হাঁটছিলাম আর ভাবছিলাম তিন বছর আগের কথা।" "আমি জানি এই কান্না বৃথা যাবে না। বাংলার দুখী মানুষের এই কান্না থেকে আবার একদিন বাষ্প হবে, মেঘ হবে। ঝড়ের অশনি সংকেতও দেখা দিতে পারে আজকের শান্ত নীল আকাশে।" কমরেড সিরাজ সিকদারকেও লাল সালাম জানিয়েছিলেন তিনি। এসব অবশ্য ২১ বছর আগেকার কথা। এরপর যখন নতুন যাত্রায় জনাব চৌধুরী লিখতে শুরু করলেন তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে, ভিন্ন রঙে আত্মপ্রকাশ করলেন। আওয়ামী শাসনকে অভিনন্দন ও রক্তিম শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করলেন তিনি এই পর্বের লেখা। তার এই লেখার মোদ্দা বিষয়বস্তু হচ্ছে, আওয়ামী সরকার যা করছে তার সব কিছুই সঠিক। সরকার নির্যাতন-নিপীড়ন অথবা মানবাধিকার লংঘন যা কিছুই করছে সে সবের পিছনে কি যুক্তি রয়েছে তা ব্যাখ্যা করে জনগণের সামনে উপস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছেন তিনি। অনেকে তার লেখনীর এই পরিবর্তনকে বেখাপ্পা মনে করলেও এতে অবাক হলেন না। কারণ সমাজতন্ত্রের স্বর্গভূমি থেকে রসদ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর চরম বামপন্থীদের চরম পুঁজিবাদীদের ভাড়াটে ও তোষামোদকারী হওয়ার নজির এ দেশে নেহাত কম নেই। সুতরাং জনাব চৌধুরীর বর্তমান চিন্তার সাথে ২১ বছর আগের চিন্তার কোন মিল না থাকলে তাতে তাজ্জব হওয়ার কিছু আছে বলে মনে হয় না। তবে প্রশ্ন আছে আরো।

জনাব চৌধুরী বৃটেনের সরকার ও বিরোধীদলের দেশপ্রেম আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'ভারত অনেক বড় দেশ। শক্তিশালী দেশ। গায়ের জোরের বদৌলতে সে অনেক সময় ছোট প্রতিবেশীর ন্যায্য দাবীও উপেক্ষা করে। তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন চীন, পাকিস্তান ও ভারতকে সমীহ করে—তাই বাংলাদেশের পাদুয়া ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্তই সঠিক হয়েছে। তার ভাষায় ক্ষমতায় থাকলে সীমান্ত সমস্যায় বিএনপি সরকার যা করতো বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার তাই করেছে। এই কাজের জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে যদি কৈফিয়ত দিতে হয় তাহলে তা আগের প্রধানমন্ত্রীকে দিতে হতো। খালেদা জিয়ার স্বামী এবং তাঁর সরকারের দীর্ঘ আমলে কেন ভারতের অপদখলে থাকা আমাদের জমি উদ্ধার করা

www.pathagar.com

হয়নি। তিনি প্রশ্ন করেছেন, পাদুয়া নামক স্থানটি ভারতের হাতে ছেড়ে দিয়ে হাসিনা সরকার কী এমন অপরাধ করেছে? অর্থাৎ ভাবখানা এমন পাদুয়া রক্ষার পক্ষে কেন জনগণ কথা বলছে এবং ভারতের বিরুদ্ধে কিছু বলা যেন সাংঘাতিক একটি অপরাধ। তিনি হয়ত আর একটু এগিয়ে ভারতীয় সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদদের মতো বলতে পারতেন যে, বাংলাদেশের বিডিআর ভারতীয় বিএসএফদের মেরে ঠিক করেনি; বরং তাদের উচিত ছিল রৌমারীতে যখন আক্রমণ করেছে তখন তাদের জামাই আদরে রাখা। কারণ, ভারত একটি বড় শক্তিশালী দেশ। কিন্তু তার তো জানার কথা যে, পৃথিবীর এতো বড় শক্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাকের ডগায় কিউবা, চীনের নাকের ডগায় তাইওয়ান এখনো টিকে আছে। নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পরও দখলদার ইহুদীদের সাথে লড়াই করে যাচ্ছে প্যালেস্টাইনিরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে টিকে আছে ইরাক, লিবিয়া। এরকম আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে-যাদের অবস্থা বাংলাদেশ-ভারতের চেয়ে নাজুক হওয়া সত্ত্বেও বড় শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। বাংলাদেশী জনগণের মনোবলও কিউবা, ফিলিস্তিন ইত্যাদি দেশের জনগণের তুলনায় কোন অংশেই কম দৃঢ় নয়। জনাব চৌধুরী বিলেতে বসে তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলেও প্রকৃত সত্য এটাই। ভারত একটি আধিপত্যবাদী শক্তি এবং তাকে প্রতিহত করতে হবে এই ধারণাই এদেশের মানুষ পোষণ করে।

সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না জনাব আনোয়ার জাহিদ ও সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীকে বিএনপি থেকে বহিষ্কারের মধ্যদিয়ে জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরীর কলমে ঐ দলের প্রতি যে দরদের প্রকাশ ঘটেছে, তা মাছের মায়ের পুত্র শোকেরই শামিল।

ঠিক এমনটাই করেছেন জনাব আবেদ খান। বাকশালবিরোধী সাংবাদিক হিসেবে যে পরিচিতি এবং খ্যাতি তিনি অর্জন করেছিলেন তা ব্যবহার করছেন বর্তমান সরকার এবং আধিপত্যবাদের দালালিতে। বাকশালবিরোধী সাংবাদিক ফোরাম থেকে তিনি যখন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন এই ফোরামের একচ্ছত্রাধিপতি ছিলেন জনাব আনোয়ার জাহিদ। জনাব জাহিদের অফিসকক্ষে যখন বাকশালবিরোধী ফোরামের সভাপতি হবর আগ্রহ ও সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন তখন তার মুখে ছিল 'জাহিদ ভাই'-এর জয়জয়াকার। তাঁর কাছে তখন জনাব আনোয়ার জাহিদের ক্যারিশমা দক্ষতা এবং জনপ্রিয়তাই ছিল নির্বাচিত হবার একমাত্র পুঁজি। ১৯৭৪ সালে সাংবাদিকদের গাড়ী ভর্তি করে বাকশালে যোগ দেয়ার জন্য যখন কোন কোন সাংবাদিকরা ঘন ঘন হুইসেল বাজাচ্ছিলেন তখনও সাংবাদিক ইউনিয়নের একজন নেতা হিসেবে বাকশালে সাংবাদিকদের যোগদানের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন জনাব আবেদ খান। তার পেশাগত জীবনে আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে ওপেন-সিক্রেট লিখেও আওয়ামীবিরোধী একজন সাংবাদিক হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছিলেন আবেদ খান। বলা হয়ে থাকে, ভারতে চক্ষু অপারেশন করতে গিয়ে নাকি তার নব্য দৃষ্টি লাভ সম্ভব হয়েছে এবং এরপর থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষের দলমত এবং আধিপত্যবাদ বিরোধীদের বিপক্ষে লিখতে শুরু করেছেন। ভাবতে অবাক লাগে জনাব খানের মতো একজন সুদর্শন ব্যক্তিত্ব কি করে 'অস্বচ্ছ ও জটিল' আনোয়ার জাহিদের সমর্থন পেতে এবং নিতে লজ্জাবোধ করেননি। এ কথাও ভাবতে অবাক লাগে যে, একজন আনোয়ার জাহিদের সাথে থেকেও তিনি কিভাবে নিজেকে তার ভাষায় পরিচ্ছন্ন দাবী করেছেন।

সেদিনের গাফফার চৌধুরী ও আবেদ খান আর আজকের চৌধুরী ও খান যে এক নন তার জন্য আর কোন নজির পেশ করার আবশ্যক আছে বলে মনে হয় না। তাই কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় আধিপত্যবাদের পথ আর একটু সুগম হলো মনে করে তারা যদি

www.pathagar.com

পুলকিত বোধ করেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তেমনি সে পথে কাউকে না নিতে পারার জন্য তারা মাতম করেন তাও সেই মাছের মায়ের পুত্র শোকেরই নামান্তর।

ত্রিশ

যুক্তরাজ্য ও বেলজিয়ামে পাঁচ দিনের সফর শেষে দেশে ফিরে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নিরাপত্তা প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। ঠিক তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গ তুলেছেন সে কথা বলা যাবে না। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি বললেন, 'বিশেষ নিরাপত্তার বিষয়টি ভারত শ্রীলংকাসহ অনেক দেশেই আছে। আমাদের দেশে হলে ক্ষতি কি'? প্রধানমন্ত্রী নিজে যখন নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলেছেন তখন শীঘ্রই হয়ত এর একটা সুরাহা তিনি করেও ফেলবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে দলীয় সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অতি প্রয়োজনীয় আইনটি পাসও হয়ে যেতে পারে। যদিও এই আইনের চিন্তা-ভাবনার স্তর থেকেই দেশের সকল মহল বিরোধিতা শুরু করেছে। এমনকি যে দুই-একজন বুদ্ধিজীবী প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা-ভাবনার সূত্র বর্ণনা করে পত্র-পত্রিকায় দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করেন তারাও এই আইনের ব্যাপারে কোন ইতিবাচক সাড়া দেননি। বিভিন্ন মহল থেকে এই আইনের ব্যাপারে উত্থাপিত অভিযোগের মধ্যে দু'টি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। তাহল, ১. এই আইনকে আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত রাখা হয়েছে, ২. একজন দলীয় প্রধান হিসেবে এই আইনের সুবিধা গ্রহণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখিও হয়েছে এবং প্রসঙ্গান্তরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তুলনামূলক আলোচনাও উঠে এসেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন করার জন্য একটি নির্বাচন করলেও সেই নির্বাচন নিয়েই সবচেয়ে বিপাকে পড়েছিলেন তিনি। তৎকালীন বিরোধী দল এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের হুমকি ও চাপের মুখে বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগ করলেও যাবার আগে নিজের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোন বিশেষ আইন প্রণয়ন করেননি তিনি। বেগম খালেদা জিয়া পুনর্বার ক্ষমতায় আসবেন কিনা সে প্রশ্ন বড় করে না দেখে দেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনের আওতায় নিজেকে সাধারণের সাথে মিলিয়ে দেয়ার একটা চেষ্টা হয়ত তিনি করেছেন। থাক সে প্রসঙ্গ। বর্তমান আলোচনায় ফিরে আসতে চাই। নিরাপত্তা আইনটির প্রসঙ্গেও সরকার ভারত শ্রীলংকার উদাহরণ টানার চেষ্টা করেছে। এ জন্য খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ঐ দু'দেশে সাবেক রাষ্ট্রপ্রধানদের নিরাপত্তা বিধানের প্রেক্ষাপট।

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রীদের নিরাপত্তার একটি আইন বছরখানেক হল কার্যকর করা হয়েছে। তামিলদের বোমায় নিহত রাজীব গান্ধীর বিধবা স্ত্রী সোনিয়া গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে গত বছর। লিবারেশন টাইগারস অব তামিল ইলম (এলটিটিই)-এর তরফ থেকে সোনিয়া গান্ধীর জীবনের উপর হুমকি সৃষ্টির পটভূমিতেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হিসাবে সোনিয়া গান্ধী ও তাঁর সন্তানরা স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ এ্যাক্টের বিধানানুযায়ী রাজীবের প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী দশ বছর নিরাপত্তার সুবিধা লাভে অধিকার প্রাপ্ত হলেন। ১৯৯৯ সালের ১ ডিসেম্বর এই সুবিধা লাভের মেয়াদ শেষ হয়। সোনিয়া গান্ধী ও তাঁর দুই সন্তান রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার নিরাপত্তা নিয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর উদ্বেগজনক রিপোর্টের প্রেক্ষিতেই '৯৯ সালের ১৯ নভেম্বর সংশোধনীর মাধ্যমে সোনিয়ার নিরাপত্তা এক বছরের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়। এই আইনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানা কথার উল্লেখ আছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের সাবেক ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর

www.pathagar.com

উপর হুমকি কেন? এ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে ৪৭ পরবর্তী শাসনামল থেকেই নিরাপত্তা প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ভারতের রাজ্য ভারত না হিন্দুদের রাজ্য হিন্দুস্থান এ প্রশ্নের জবাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভারতের রাজনীতি এবং সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানদের হুমকি প্রসঙ্গ। বর্তমান ভারতের স্থপতি মিঃ গান্ধী নিহত হয়েছিলেন কারণ তিনি ভারতের বর্তমান শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গির মত করে ৪৭ পরবর্তী ভারতকে দেখতে চাননি। তিনি সম্ভবতঃ ভারতের রাজ্য ভারতকে দেখতে চেয়েছিলেন বিধায় হিন্দুদের রাজ্য হিন্দুস্থানবাদীরা তাকে সহ্য করেনি। মিঃ গান্ধী হত্যার অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দুস্থানবাদীরা সেখানে ক্ষমতা দখল করেছে। বিগত শাসনামলে বিশাল ভারতের রাজ্যে রাজ্যে যে শোষণ, নির্যাতন ও ব্রাহ্মণ্যবাদী হামলা হয়েছে তার একপর্যায়ে নির্দয়, নিষ্ঠুর, নির্মম ও বর্বরোচিতভাবে দমন করা হয়েছে খালিস্তানের দাবীকে। এই নির্মমতার মাসুল দিতে হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী পরিবারকে। যত নির্মম সত্যই হোক একথা স্বীকার করতে হবে যে, ভারতকে 'শক্তিশালী' রাখার জন্য গান্ধী পরিবার গৃহীত নীতিমালা 'ভারতীয়রা গ্রহণ করেনি বলেই ভারতের শাসন ক্ষমতায় গান্ধী পরিবার নেই। আর সেই কারণেই বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে সোনিয়া গান্ধী তার নিরাপত্তার প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছেন। এর অর্থ এই যে, গান্ধী পরিবারের কর্মকাণ্ডে ভারতের এক বিশাল জনগোষ্ঠী এতই ক্ষিপ্ত হয়ে আছে যে, তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও তারা ঐ পরিবারকে হটাতে এবং নির্মূল করতে চান। '৪৭ সালে বৃটিশদের হাত থেকে যারা বর্তমান ভারতের চক্র পতাকা উড়াবার ক্ষমতা নিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসী শিখ সম্প্রদায়ের ঘৃণা কি শুধুই তাদের নিজস্ব নাকি এর পিছনে আরও অনেক কিছু নিহিত আছে তাও বিশ্লেষণের দাবী রাখে। প্রকৃত পক্ষে অখণ্ড ভারত রক্ষার নামে গান্ধী পরিবার গোটা ভারতে যে দুঃশাসন চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে শুধু শিখরা নয় বরং বর্তমানে অনেক ভারতবাসীই ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কংগ্রেস বিরোধিতাই ভারতে নতুন রাজনীতির জন্ম দিয়েছে এবং হিন্দুত্ববাদের ভিত্তিতে জন্ম নেয়– সেই রাজনীতি মুসলিম বিদ্বেষী নয়া আগ্রাসী শক্তি ভারত শাসন করছে।

প্রস্তাবিত আইন প্রসঙ্গে শ্রীলঙ্কার উদাহরণকেও দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কা সার্কভুক্ত একটি দেশ। এ দেশের জাতীয় আয়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করতে গেলে সে দেশের প্রয়াত রাষ্ট্রধান জুলিয়াস জয়বর্ধন-এর কথা স্মরণ করতে হয়। গার্মেন্টিস শিল্পকে কেন্দ্র করে ঐ দেশের অর্থনীতিকে তিনি এমন শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়েছিলেন যে সেখানকার গৃহযুদ্ধ দেশটির অর্থনীতির উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি।

ভারতের এককালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী শ্রীলঙ্কা সফরে গেলে সেখানকার গার্ড রেজিমেন্টের একজন নৌসৈন্য রাইফেলের বাঁট দিয়ে রাজীব গান্ধীকে আঘাত করেছিল। অথচ শ্রীলঙ্কার নিরাপত্তা ভারত দিবে এরকম ধারণাই এক সময় পোষণ করা হত। বাস্তবে দেখা গেল ভারতের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরাই শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিল। মজার ব্যাপার হল, ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তামিলরা শ্রীলঙ্কার সিংহলীদের বিরুদ্ধে আশির দশকে যুদ্ধ শুরু করলেও দেখা গেল তারাই সর্বপ্রথম ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠল। শ্রীলঙ্কায় এখন নিয়মিত সেনাবাহিনী রয়েছে।

সেখানকার সাবেক ও বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানদের নিরাপত্তার একটি বিধানও রয়েছে। অন্যান্য দেশ বলতে যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানেও সাবেক রাষ্ট্রপ্রধানদের নিরাপত্তার জন্য একটি আইন আছে। একথা বাদ দিলে বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থাই নাগরিকদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠে ভারত ও শ্রীলঙ্কার উদাহরণ ধরে কেন বাংলাদেশ অনুরূপ আইনের দিকে এগিয়ে যচ্ছে। এজন্য ভারত শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ঐক্য-অনৈক্যের ব্যাপারটি অবশ্যই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। '৭১ সালে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা

www.pathagar.com

সংগ্রামের বিজয়ের পর বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। '৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত এই দলটি ক্ষমতাসীন ছিল। তাদের আমলে শুধু '৭২-এর সংবিধানে বর্ণিত গণতন্ত্র হত্যা ছাড়াও হাজার হাজার গণতন্ত্রমনা বাংলাদেশীকে হত্যা করে যে এক নায়কতান্ত্রিক শাসন চালুর চেষ্টা হয়েছিল তার অবসান হয় '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। এর পর কেটে গেছে ২১ বছর। নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং বাস্তবতার পথ মাড়িয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার আগে জনগণের কাছে কি জন্য ক্ষমা চেয়েছিল সে কথা সম্ভবত এখন আর তাদের মনে নেই। মনে করিয়ে দেয়ার দরকার যে, সেদিন নির্বাচনী ইস্তেহার পাঠ করার পর বর্তমান শাসক দলের প্রধান জনতার সামনে চোখের পানি ছেড়ে বলেছিলেন, অতীতে যদি কোন ভুল করে থাকি ক্ষমা করে দিবেন। এই যদির মাহাত্ম্য যদিও জাতি তখন উপলব্ধি করেনি তবে গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই যদি জগদ্দল পাথরের মত ঘাড়ে চেপে বসে আছে। সেদিন যেমন তারা ভুল ধরতে ভুল করেছিলেন তেমনি গত পাঁচ বছরেও সেই ভুলের উপর দাঁড়িয়ে ক্রমাগত ভুল করে যাচ্ছেন। একের পর এক আক্রমণ করে যাচ্ছে দেশের তৌহিদী এবং আধিপত্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমীদের উপর। আক্রমণ চালাতে চালাতে এখন সময় ফুরিয়ে এসেছে। এগিয়ে এসেছে ক্ষমতা ছাড়ার সময়। আর তাই মনের কোণে উদয় হয়েছে নিরাপত্তা প্রসঙ্গ। নিরাপত্তা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা উঠলেই সে ছেলে হাসানো কথাটির মনে পড়ে যায়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিরাপত্তা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন আমার কোন নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে না। অথচ জনগণ প্রত্যক্ষ করছে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর যাতায়াতের পথে কোন নাগরিকেরই প্রবেশের অধিকার থাকে না। অবস্থা দেখে মনে হতে পারে যেন এমন কোন এক বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান যাচ্ছে যার কাছে এদেশের জনগণই প্রধান ভয়ের কারণ।

ভারত ও শ্রীলঙ্কার বর্তমান প্রেক্ষিত রচনায় যাদের হাত রয়েছে তাদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের দিক থেকে যদি বাংলাদেশকে তারা বিবেচনা করে থাকে তাহলে বলতে হবে ঐ দু'টি দেশের সাথে বাংলাদেশের পার্থক্য অনেক। বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে এক ও অভিন্ন ভাষার দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ এক দেশ ও জাতি। এর এক প্রান্তে কাঁটা বিঁধলে অন্য প্রান্তে বেদনার চিৎকার শোনা যায়। এটি এমন এক দেশ যেখানে শতকরা ৯০% মুসলমান যাদের ঈমান, আকিদা, বিশ্বাস, চিন্তা ও চেতনা এক ও অভিন্ন। সেই দেশের শাসকদের মনে জনগণ নিয়ে এত সংশয় কেন? যে ফর্মে, যে পদ্ধতিতে অথবা যে আবরণেই শাসক দল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করুন না কেন, তারা যে জনগনকে আস্থায় আনতে পারছেন না এটাই চূড়ান্ত সত্য। সত্যি বলতে কি, জনগণ ও বর্তমান শাসক দলের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের এই রুমাল কোথায় নিয়ে যাবে সে প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে প্রস্তাবিত নিরাপত্তা আইন নিয়ে।

একত্রিশ

আওয়ামী পার্লামেন্টের শেষ অধিবেশন শুরু হয়েছে। এ মাসের ৭ তারিখে অধিবেশন শুরু হলেও তা শেষ হবার কথা আগামী ১২ জুলাই। ঠিকঠাক মত চললে এটাই এই পার্লামেন্ট-এর দীর্ঘ অধিবেশন হবে বলে বলা হয়েছে। যদিও বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে এটাই একমাত্র দীর্ঘ অধিবেশন নয়। তবু চলতি অধিবেশন থেকেই আওয়ামী সরকারের বিদায় রাগিণী ও আনন্দধ্বনি বেজে উঠবে। বর্ণাঢ্য করা হবে বিদায়কে। বর্তমান সরকারের এই সংসদ অধিবেশনকে কেন গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয়েছে তার প্রচারণা ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। আওয়ামী সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলোর ভাষায় স্বাধীন

www.pathagar.com

বাংলাদেশে এই প্রথম একটি সরকার তার পার্লামেন্ট এর মেয়াদ পূরণ করতে যাচ্ছে বিধায় এই অধিবেশনটি অতীব তাৎপর্যময়। অর্থাৎ এর আগে যারা ছিলেন তারা সবাই তাদের মেয়াদ অপূর্ণ রেখে গেছেন। তাদের সমর্থকরা বিষয়টি শুরু করেছেন এভাবে যে, '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রথম সংসদের অধিবেশন বাতিল হয়ে যায় ৩ বছরের মাথায়। এর পর জিয়া, এরশাদ, বেগম জিয়া-এর কোন সরকারই সংসদের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি। তাদের সমর্থকরা যা বলছেন সে কথায় পরে আসি, তবে তার আগে পূর্ণতার কারণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। শুরুটা যদি '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ধরা যায়, তাহলে একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ঐ সময়ের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে সংসদ বাতিল করা না হলেও পরবর্তীকালে ঐ সংসদ বাতিল হয়েছিল। ১৯৭২ সালের সংবিধানে যে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রধান ছিল সেই গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছিল '৭৪ সালের ২৫ জানুয়ারী। ঐ দিন সংসদের মাধ্যমে কায়েম করা হয়েছিল বাকশাল নামক একদলীয় স্বৈরশাসন। সেদিক থেকে ১৫ আগস্টের পূর্ব সূত্র হচ্ছে বাকশাল। বাকশাল কেন কায়েম করা হয়েছিল এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর জনগণ পায়নি। বলার অপেক্ষা রাখে না, ঐ সংসদে সত্যিকার অর্থে কোন বিরোধী দল ভাল না। আর সংসদীয় বিরোধী দল বলতে আসলে যা বুঝায় তার কোন অস্তিত্ব তখন দেশে ছিল না। তৎকালীন সংসদে আধিপত্যবাদ বিরোধী এমন কোন রাজনৈতিক দল ছিল না তারা দেশকে সরকারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পরিচালিত করার লক্ষ্যে কোন দিকনির্দেশনা দিতে পারতেন। সংসদে সেদিন যারা ছিলেন তারা সত্যিকার অর্থে ছিলেন নিজেরা নিজেরা। তা সত্ত্বেও কয়েক মিনিটে সেদিন যে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছিল তার জন্য অবশ্যই দায়ী ছিলেন তৎকালীন সরকার প্রধান। কোন গভীর বিশ্লেষণ ছাড়াই এ কথা বলা যায় যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য বিরোধী দলের অস্তিত্ব শাসকদল সহ্য করতে পারেনি। বিরোধিতা সহ্য করার যে মানসিকতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা না থাকার জন্যই সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সেদিন কবর দেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের সংসদীয় পদ্ধতির কবর রচনায় যাদের অবদান সবচেয়ে বেশী তারা হলেন বর্তমান আওয়ামী শাসকদের পূর্বসূত্র অর্থাৎ তাদের গুরু। তাদের কারণেই প্রথম সংসদ মেয়াদ পূর্ণ করেনি।

এরপর যদি জিয়ার শাসনামল প্রসঙ্গ আলোচনা করা যায় তাহলে অনেক কথা উঠে আসবে। ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তন থেকে জিয়াউর রহমানের সংসদ পর্যন্ত, অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটেছে। তার পরেও তার সংসদে অবসান ঘটেছিল '৮১ সালের ৩০ মে'র ঘটনার কারণে। ঐদিন বাংলাদেশে কি ঘটেছিল তা আর কারো অজানা নয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জিয়াউর রহমান উত্থান এবং নিহত হবার ঘটনা সত্যি তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিষয়টি বাংলাদেশের চলমান গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারায় বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে, মুজিব যেখানে গণতন্ত্রের হত্যাকারী জিয়া সেখানে গণতন্ত্রের মুক্তিদানকারী ছিলেন। মুজিবের বাকশালের মাধ্যমে যেখানে গণতন্ত্র হত্যা করা হয় জিয়ার সামরিকতন্ত্রের মাধ্যমে সেখানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেয়া হয়। বলা যায়, জিয়ার সামরিক শাসন যেমন With a different nature তেমনি মুজিবের গণতন্ত্র ছিল With a brutal nature. এই পার্থক্য ও বিভাজন রেখাকে মিলিয়ে দেয়ার জন্য তৎকালীন জননন্দিত শাসক জিয়াকে হত্যা করা হয়েছিল। সুতরাং জিয়ার শাসনামলে যে সংসদ কার্যকর রূপ নিতে পারেনি সেজন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী তারা যারা আসলে গণতন্ত্র হত্যা করেছিল এবং নতুন করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এরশাদ সাহেব ক্ষমতা আরোহণের পর ৩য় সংসদ গঠিত হয় '৮৬ সালে। বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ধারার সূচনা পর্ব মূলতঃ '৮৬ সাল

www.pathagar.com

থেকেই। '৮২ সালে জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পরবর্তী ২/১ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রকাশ্যতঃ আধিপত্যবাদের পক্ষ এবং বিপক্ষ শক্তিও জন্ম হয়। কথিত সরকারবিরোধী আন্দোলনে দেশের রাজনৈতিক শিবির মেরুকরণে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং আওয়ামী নেতৃত্বে আধিপত্যবাদী শক্তি সংগঠিত হয়। এরশাদ সরকার যখন গণ-আন্দোলনের মুখে পদত্যাগের প্রহর গুনছিলেন ঠিক তখনই রাতের অন্ধকারে সরকারের নির্বাচনী টোপে ধরা দিয়েছিল আওয়ামী শিবির। তবে বলে রাখা ভাল, এমনটি যে তারা করতে পারে সে আলামত শুরু থেকেই ছিল। '৮২ সালে এরশাদ সাহেব যখন সামরিক শাসন জারি করেন তখন আওয়ামী লীগের মুখপত্র দৈনিকটিতে এরশাদ সরকারের সাফাই গাওয়া হয়েছিল। '৮৬ সালের সেই বিতর্কিত সংসদ টিকে থাকেনি প্রধানতঃ আধিপত্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক শক্তির আন্দোলনের কারণে। তবে ঐ নির্বাচনে এরশাদ সরকারের সাথে আঁতাতকারী আওয়ামী লীগও সংসদ টিকিয়ে রাখার পক্ষে কাজ করেনি। বরং বলা যায়, সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। '৮৮ সালে সংসদ যখন গঠিত হয়, তখনই ধারণা করা হয়েছিল এ সংসদ রাখার জন্য নয়। '৯০-এর গণ-আন্দোলনের পর '৯১ সালের নির্বাচনে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী বিএনপি আমলে গঠিত ৫ম সংসদ ভেঙ্গে গিয়েছিল তার মেয়াদ শেষ করার কিছুদিন আগে। কারণ ঐ সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সংসদীয় কর্মকাণ্ডে সরকারকে সহযোগিতা করার পরিবর্তে বিরোধিতা করেছিল। সর্বাত্মক বিরোধিতার এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সংসদ থেকে পদত্যাগ করলেও বিএনপি সংসদ চালিয়ে যেতে থাকে। তবে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বিএনপিকে ঐ সংসদ ভেঙ্গে দিতে হয়েছে। সেদিক থেকে বলতে হয় ৫ম জাতীয় সংসদ ভাঙ্গতে হয়েছিল আওয়ামী লীগের একগুঁয়েমির জন্য। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ মূলতঃ গঠিত হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য। সুতরাং ঐ সংসদের মেয়াদকাল নিয়ে আলোচনা নিরর্থক।

বর্তমান সংসদ তার মেয়াদকাল পূর্ণ করতে যাচ্ছে বা পারছে এ কথা সত্যি। তবে এই সত্যের পেছনে আরও অনেক কিছু নিহিত রয়েছে। প্রথমতঃ বলা যায়, বর্তমান সংসদে প্রধান বিরোধী দল বার বার পদত্যাগের হুমকি দিয়েও পদত্যাগ করেনি। দ্বিতীয়তঃ বলা যায়, বিএনপির ৫ম সংসদে বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বিধায় হয়ত বিএনপির পিছুটান থাকতে পারে। তৃতীয়তঃ গত ৫ বছরে জাতীয় রাজনীতিতে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যে ক্ষেত্রে সংসদের পরিষ্কার ভূমিকা থাকার কথা থাকলেও তা হয়নি। চতুর্থতঃ কোন মহলের এমন কিছু ইচ্ছা অভিলাষ থেকে থাকতে পারে যার বাস্তবায়ন এখনও সম্ভব হয়নি বলে সংসদ তার পূর্ণ মেয়াদ অতিক্রম করছে। বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি এবং চলমান সংসদীয় রাজনীতি পর্যালোচনা করলে এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই গণতান্ত্রিক ধারাকে ব্যাহত করছে আধিপত্যবাদী শক্তি। এই শক্তি তাদের ক্রীড়নকে পরিণত করতে চেয়েছে দেশ ও জাতির একটি বিশেষ অংশকে। অতীতে গণতন্ত্র হত্যা করে একদলীয় পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে যে বিশেষ নীল নকশা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তির চেষ্টা চলছে পুরো মাত্রায়। যে গণতন্ত্র তারা হত্যা করেছিল সেই হত্যার কালিমাখা হাতকে আবার তারা নতুন কোন প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে আনতে চায় কিনা দীর্ঘ অধিবেশনের বৈঠক সে আশঙ্কাকেও জাগিয়ে তোলে। বলা কষ্টকর, এই অধিবেশন জাতির জন্য দুঃশাসন দীর্ঘায়িত করবে না প্রকৃত গণতন্ত্রের পথ সুগম করবে। বলে রাখা ভাল, সংসদের দীর্ঘ অধিবেশনের কোন দোষ নেই, কারণ, সংসদ হচ্ছে জনগণের সংকট সমস্যা সমাধানের একমাত্র ফোরাম। জনগণের অর্থে

www.pathagar.com

সংসদ অধিবেশন জনগণের স্বার্থে ও কল্যাণে কিছু করা হলে তা নিয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোন কারণ নেই। অতীতেও দেখা গেছে সংসদের দীর্ঘ অধিবেশনগুলো মূলতঃ কেটেছে অহেতুক বাক্যালাপে। এমন উদাহরণও বাংলাদেশে রয়েছে যে, মধ্যরাত অব্দি সংসদ অধিবেশন চলেছে একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব গ্রহণের জন্যে। বর্তমানের দীর্ঘ অধিবেশনটি যখন চলছে তখনও এই সংসদে সরকারী দল ছাড়া প্রকৃত পক্ষে কেউ উপস্থিত নেই। সুতরাং জাতীয় জীবনে যে সকল সঙ্কট রয়েছে তার কোনটাই এখানে আলোচনার সুযোগ নেই। তবু আপন ঢোল পেটাবার জন্য যে সমস্ত দোহার শ্লীল-অশ্লীল, শ্রাব্য-অশ্রাব্য, শালীন-অশালীন ভাষায় তথাকথিত গরম ভাষণের নামে অধিবেশন চালিয়ে যাবেন তাদের মনে রাখা উচিত জাতীয় অর্থের অপচয় ঘটাবার কোন নৈতিক অধিকার কারোর নেই।

বত্রিশ

যবন শব্দটি অর্থগতভাবে দোষের নয়। মধ্যযুগে গ্রীকের ইয়েনী দ্বীপের অধিবাসীদের বোঝাবার জন্য বিদেশী অর্থে শব্দটির ব্যবহার শুরু হলেও বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রতিপালিত হিন্দুত্ববাদীরা এই শব্দটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে গালি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। শব্দটি হঠাৎ করেই রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে উঠে। বলার অপেক্ষা রাখে না, সে সময় মুসলমানদের নাম উচ্চারণ না করে তাদেরকে গালি দেবার জন্য এই শব্দটি মুসলিম বিরুদ্ধবাদীরা প্রকাশ্যে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ভারতবর্ষের মুসলমানরা বিদেশী ছিল না। আরব বংশোদ্ভূতরা ইসলাম প্রচার করতে ভারতে এলেও সত্যিকার অর্থে ভারতীয় মুসলমানদের প্রায় সকলেই জন্মসূত্রে ছিল ভারতবাসী। ভারতীয় মুসলমান এবং ভারতের অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য এই ছিল যে, মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব, গণতন্ত্র, সহমর্মিতা ছিল প্রবল, যা অমুসলিম সমাজে ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ইসলামী ঈমান-আকিদা এবং তদভিত্তিক জীবনাচার এবং প্রতিটি মানুষের সমান মর্যাদা, ইসলামে স্বীকৃত হবার কারণে বর্ণাশ্রয়ী সমাজের সাথে মুসলমানদের পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। বৃটিশ মুসলমানদের হাত থেকে যেহেতু রাষ্ট্রক্ষমতা ইংরেজরা দখল করেছিল তাই মুসলমানরা যাতে পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতায় না আসে তা নিশ্চিত করা ইংরেজ ও তাদের অনুগ্রহধন্য অন্য সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য দিত। এই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের আঁতাত হয়েছিল ইংরেজ ও হিন্দুদের মধ্যে। এই ধারাবাহিকতায় '৪৭-পূর্ব পরিস্থিতি এতই উত্তপ্ত ছিল যে, কৃষ্টি-কালচারের বৈপরিত্যের ভিত্তিতেই উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে গেল। কিন্তু এই বিভক্তি রেখা পূর্বোক্ত লক্ষ্যকে দমিয়ে দেয়নি। বিশেষ করে ভারতে। বিষয়টি প্রথম থেকেই দানা বাঁধতে থাকলেও ক্রমান্বয়ে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, হিন্দুস্থানে মুসলমানদের মর্যাদা নিয়ে বসবাস অসম্ভব ব্যাপার। গত কয়েক যুগে মুসলমান এবং মসজিদসহ মুসলমানদের অন্যান্য পবিত্র স্থানগুলোতে ভারতীয় শাসক এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সুসংগঠিত বর্বরোচিত হামলা এবং নিধনযজ্ঞের প্রেক্ষিতে এ নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মুসলমানরা সেখানে এতিম জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় জন্মশাসন আইন থেকে শুরু করে বহু সামাজিক আইনই সেখানে প্রণয়ন করা হচ্ছে যার লক্ষ্যই হলো মুসলমানদের সামাজিকভাবে নিশ্চিহ্ন করা। সাধারণভাবে বলা যায়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিকভাবে ভারতীয় মুসলমানদেরকে নির্মূল করার লক্ষ্যেই গ্রহণ করার হচ্ছে নানা পরিকল্পনা। সামাজিকভাবে ভারতীয় মুসলমানদের সব ধরনের ঐতিহ্যকে গুঁড়িয়ে দিতে সেখানে যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার

www.pathagar.com

প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় ভারতীয় বিভিন্ন টিভি চ্যানেল-এ। ভারতীয় প্রচার মাধ্যমে এমন সব সেক্টরে মুসলমানদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে যেগুলো মুসলিম কালচারবিরোধী। হিসাব করলে পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে যে, ভারতীয় মুসলমানদের নামটুকু টিকিয়ে রেখে চিন্তায়-চেতনায় ডি-মুসলিমাইজ করাই হলো ভারতীয়দের একমাত্র লক্ষ্য। এই মিশন হাতে নিয়েই সম্ভবতঃ দিল্লীর কূটনৈতিক মহল প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর নতুন আগ্রাসনের নীল নকশা বাস্তবায়ন করতে উঠেপড়ে লেগেছে।

নিকট প্রতিবেশী বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতীয় নীতি নিয়ে আলোচনায় আসার আগে সম্প্রতি নেপালের ঘটে যাওয়া নৃশংসতার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। নেপালের রাজবংশের দেশপ্রেমিক অংশের নিধন সম্পন্ন হয়েছে। কে বা কারা এই নিধনযজ্ঞ চালিয়েছে তা নিয়ে খোদ নেপালেই এখনো বিভিন্ন মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে এক-আধটু বাইরে লেখার কারণে সেখানকার সাংবাদিকরা গ্রেফতার হয়েছিলেন। তবে নেপালের ঘটনায় সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া। তদন্তের আগেই তিনি সর্বপ্রথম টের পেয়ে গেছেন যে, নেপাল রাজবংশের হত্যাকাণ্ড রাজপুত্রই করেছে। সম্প্রতি ফরেনসিক পরীক্ষায় নেপাল রাজপুত্রের রক্তে মদের অস্তিত্ব না পাওয়ায় হত্যা রহস্য অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করেছে এবং আসল খবর না পাওয়া গেলেও এ কথা বুঝতে কারোরই হয়তা বাকী থাকবে না যে, দেবযানীকে কেন্দ্র করে হত্যা ঘটনা ঘটেনি বরং পর্দার অন্তরালে যারা এই নাটকের ইন্ধন যুগিয়েছে তারাই নাটকের শেষ দৃশ্যে মহাম্মদী বেগের ভূমিকা পালন করেছে। নেপালকে নিয়ে ভারতীয় শাসকদের মাথা ব্যথা অনেক দিন থেকে। এই কারণে সেখানে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়নি সেকথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। নেপালকে ভারতের একটি করদরাজ্যে পরিণত করার প্রধান অন্তরায় ছিলেন নেপালের নিহত রাজা। সুতরাং এই নিধনযজ্ঞের পিছনে প্রধান হাত যে ভারতীয়দের থাকতে পারে সে কথা সম্ভবতঃ অন্ধেরও না বোঝার কথা নয়। বর্তমান নেপাল আর হত্যাযজ্ঞের আগের নেপাল যেমন এক নয়, তেমনি আবার এক হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। সার্ক দেশভুক্ত এই দেশটি মহান রাজার হত্যার মধ্য দিয়ে একটি দেশের স্বাধীনতার চেতনাকেই যে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে তা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। হিমালয় কন্যাকে ভারতভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা ভারতের অনেক দিন আগে থেকেই দেখা দিয়েছে। কারণ তার লক্ষ্য হচ্ছে চীন ও পাকিস্তান। চীনের দিকে তাক করা কামান ও যুদ্ধাস্ত্রের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই ভারতকে নেপালের ভূমি ব্যবহার করতে হবে। এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই নেপালে একজন লেন্দুপ দর্জির প্রতিষ্ঠা অনেকদিক থেকেই জরুরী হয়ে পড়েছিল।

'৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পরবর্তী তিন বছরের ইতিহাস প্রায় সকলেরই জানা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় সমর্থনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ নিয়ে গত ত্রিশ বছরে কম আলোচনা হয়নি। ভারত ও বাংলাদেশ দু'পক্ষের আলোচনা মিলালে এটাই সত্য হিসাবে প্রতীয়মান হয় যে, ভারত তার পূর্বাঞ্চলের সামরিক ব্যয় কমিয়ে বাংলাদেশের এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে যেখানে থাকবে না কোনো ভারত-বিরোধিতা; বরং সেখানে বইবে ভারত-প্রীতির বাতাস। ভারত যা চাইবে বাংলাদেশে তাই হবে। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রেই থাকবে ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য। এই আধিপত্য, প্রতিপত্তি তাদের বহাল ছিল না বা এখনও নেই সে কথা ঠিক নয়। তবে '৭২ থেকে '৭৫ সময়ে বাংলাদেশের ক্ষমতায় যারা ছিলেন তাদের সাথে ভারতীয় সরকারের সম্পর্ক যে কত মধুর ছিল তা নিয়ে গভীর কোন পর্যালোচনা না করেও সরাসরি বলা যায় দু'দেশের মধ্যে আন্তরিকতার মূল লুক্কায়িত ছিল

www.pathagar.com

ইসলাম বিরোধিতার মধ্যে। দু'দেশের সংবিধানেই ছিল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ইসলামের অনুপস্থিতি। ভারতকে খুশী করার জন্যই অত্যন্ত সফলতার সাথে স্বাধীনতা-পরবর্তী আওয়ামী সরকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে যে অবজ্ঞা করেছিল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী আওয়ামী লীগের মৃত্যু হয়েছিল বাকশাল গঠনের মধ্য দিয়ে। নতুন করে বর্তমান আওয়ামী লীগের জন্ম হয় মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে পিপিআর-এর বদৌলতে। সম্প্রতি আব্দুল গাফফার চৌধুরী যে নতুন ও পুরাতন আওয়ামী লীগের আলোচনা করেছেন, তা নিয়ে অর্থাৎ '৭৫-পূর্ব এবং '৭৫-পরবর্তী আওয়ামী লীগের ধরন-ধারণ এবং মিল-অমিল নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা সেদিকে না গিয়ে তিনি আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার যে বিষয়টি আলোচনায় এনেছেন সেদিকে দৃষ্টি ফেরাব।

জনাব গাফফার চৌধুরী দু'দেশের নাগরিক। তার বর্তমান ঠিকানা বাংলাদেশের চেয়ে বৃটেন বলাই উত্তম। গত নির্বাচনে তিনি কেন বৃটেনের লেবার পার্টিকে ভোট দিয়েছেন এবং কেন বেলার পার্টি জিতেছে তা মূল্যায়ন করতে গিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন। তার ভাষায় এবারে যে লেবার পার্টি জিতেছে তা সেই সমাজতান্ত্রিক লেবার পার্টি নয়; বরং এ যেন লেবার পার্টির মোড়কে নতুন রক্ষণশীল দল। তার ভাষায় লেবার পার্টির নীতিতেও পরিবর্তন ঘটেছে ব্যাপক। এই পরিবর্তনের কারণে তিনি ভোট না দিতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত লেবার পার্টিকে ভোট দিয়েছেন এবং হয়তো এই ধরনের নেতিবাচক ভোট পেয়েই লেবার পার্টি বিজয়ী হয়েছে। বিষয়টির আলোচনা তিনি করেছেন বাংলাদেশের নির্বাচন সামনে নিয়ে। তার ভাষায় বর্তমান আওয়ামী লীগ যদিও আগের আওয়ামী লীগ নয় তবু তার মধ্যে পুরনো আওয়ামী লীগের যে অসম্প্রদায়িক চেতনা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজে ইসলাম বিরোধিতার ধারাবাহিকাত রয়েছে তার জন্যই তিনি বাংলাদেশে ভোটার থাকলে আওয়ামী লীগেই ভোট দিবেন। একজন ভোটার হিসাবে তিনি তার অধিকার প্রয়োগের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেন না সে কথা বলা যাবে না। তবে তিনি যে ভোটারদের প্রভাবিত করতে চেয়েছেন সে বিষয়টি লক্ষণীয়। সম্প্রতি ভারতের পশ্চিম বাংলার নির্বাচন নিয়ে সেখানকার টিভি চ্যানেলগুলো যে প্রপাগান্ডা শুরু করেছিল তার অন্যতম অংশীদার ছিল জি নেটওয়ার্কের একটি বাংলা চ্যানেল। এই চ্যানেলটিতে নির্বাচনের ওপর প্রচারিত ধারাবাহিক প্রতিবেদনে একটি প্রশ্ন প্রায় সকলকে তাড়িত করে ফিরেছে, তাহলো কাকে ভোট দিবেন। সেখানকার শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, সাধারণ এবং দিনমজুরসহ সবাই একবাক্যে বলেছে, কাকে ভোট দেব তা বলবো না, ভোট কেন্দ্রে গিয়ে গোপনে দেব। গাফফার চৌধুরী সাহেবদের মত যারা ভারতে হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী বৃটেনে থাকেন এবং তথাকথিত ইসলাম বিদ্বেষী রোগে ভোগেন তারা হয়তো নির্দ্বিধায় আগামী নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে চাইতে পারেন এবং করবেন। এটাই স্বাভাবিক। বর্তমান সরকার যদি নির্বাচনের নামে প্রহসন করে অথবা নির্বাচন বানচালের জন্য ক্রমাগত বোমার ব্যবহার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের তালিকা বাড়িয়ে দেয় অথবা অন্য কোন কৌশল গ্রহণ করে তখনও হয়তো এই মহল বলবেন কাজটা ঠিকই হয়েছে, কারণ মৌলবাদ ঠেকাতে এই কাজটি এই অঞ্চলের আধিপত্যবাদের প্রতিভূ ভারতের অত্যন্ত পছন্দনীয় হয়ে উঠতে পারে।

যবন তাড়াবার মধ্য দিয়ে বৃটিশ ভারতে মূলতঃ ইসলাম এবং মুসলমান বিতাড়নের যে নীল নকশা গ্রহণ করা হয়েছিল তার অংশ হিসাবে যদি প্রভুদের নির্দেশে তাদের দেশী-বিদেশী বশংবদরা মাঠে নেমে থাকেন তাহলে তাদেরকে আগামী নির্বাচনের ফলাফল পর্যন্ত অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শুধু এটুকু বলা যায় যে, বাংলাদেশের

www.pathagar.com

রাজনীতিতে '৭৫-পূর্ব এবং '৭৫-পরবর্তী যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ইসলাম ও মুসলমানদের স্বীকৃতি। ইনশাআল্লাহ আগামী নির্বাচনেও প্রধান ইস্যু হবে মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকবে কি টিকবে না। যখন নির্বাচন আসবে তখন আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট চাওয়ার জন্য এই কথা জোরেশোরে প্রচারিত হবে যে, আওয়ামী লীগ সংবিধানে বিসমিল্লাহ এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের বিরোধী। সম্ভবতঃ টের পাওয়া যাবে এবং অনুভূত হবে বাংলাদেশের সত্যিকার পরিস্থিতি কি।

তেত্রিশ

তত্ত্বাবধায়ক কোন নতুন ধারণা নয়। বরং আমাদের সমাজে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে এর বাস্তবতা অনেক পুরনো। যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন বর্তমান পর্যায়ে ছিল না তখন গ্রামের একজন বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যক্ত, অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা কম পরিচিতিজনের কাছে চিঠি বা টাকা পাঠাতে সাধারণত অধিক পরিচিত, খ্যাত ব্যক্তির নামের ব্যবহার করা হত। প্রাপকের নামের সাথে In care of বলে শব্দক'টি জুড়ে দিয়ে যে নামটি ব্যবহার করা হত তার সাথে প্রাপকের সম্পর্ক কোন সুনির্দিষ্ট রীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকত না। শুধু এইটুকু সত্য যে তত্ত্বাবধায়ক কোন না কোনভাবে প্রাপকের পরিচিত ছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক কখনো সততার সাথে আবার কখনো সততার সাথে সম্পৃক্ত না হয়েও প্রাপকের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতেন। শুধু তাদের কথাইবা কেন? নাবালকের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দেখার দায়িত্ব দেশের আদালতের। বিষয়টিকে আরো খোলাসা করে দেখলে দেখা যাবে, আমাদের মত সমাজে মা-বাবাও সন্তানের তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। সুতরাং তত্ত্বাবধানের বিষয়টি প্রধানত নির্ভর করে তত্ত্বাবধায়কের দৃষ্টিভঙ্গির উপর।

তত্ত্বাবধায়নের সাথে আমানতদারীর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামীণ সমাজের তত্ত্বাবধায়ক উদাহরণ এখন আমাদের রাষ্ট্রীয় সমাজে উঠে এসেছে। জামায়াত-ই-ইসলামী দাবী করে তাদের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বর্তমান কেয়ারটেকার সরকারের প্রস্তাবক। কেয়ারটেকার সরকার গঠনের দাবীতে অনড় থেকে দেশ অচল করে দিয়ে বিএনপি'র সরকারের মাধ্যমে কেয়ারটেকার সরকারের আইন পাস করাতে বাধ্য করেছে আওয়ামী লীগ। বিএনপি এই আইন পাস করার মধ্য দিয়ে দেশের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলই কেয়ারটেকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। সুতরাং দেশে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া অন্য কোন বিকল্প যে নেই সেকথা দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো মেনে নিয়েছে এবং এই আইনের প্রতি জনগণের যে সমর্থন রয়েছে বাস্তবে তা প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য একটি নির্বাচন পরিচালনায় অনির্বাচিত সরকার গঠনের যৌক্তিকতা নিয়ে কিছুটা প্রশ্ন এই কারণে থেকে যায় যে, জনগণের স্বার্থে যারা দেশ পরিচালনা করতে চান, তারা নির্বাচন পরিচালনায় অক্ষম কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে অবশ্যই বাংলাদেশের রাজনীতির গোড়ার দিকে ফিরে যেতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন ছিল একটি জাতীয় সরকারের। কিন্তু তখন সে দাবীকে অস্বীকার করে দেশ শাসনে নিয়োজিত ছিল এমন এক রাজনৈতিক শক্তি যাদের শাসন ছিল বিতর্কিত। '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে '৭৩-এর সংসদ নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে যে সরকার ছিল সেটি মূলত প্রবাসী সরকারের ধারাবাহিকতা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত সরকার নিয়ে আলোচনা না করেই এ মন্তব্য করা যায় যে, '৭১

www.pathagar.com

সালের ১৬ ডিসেম্বর পরবর্তী সরকার মুক্তিযুদ্ধের মত দেশপ্রেমকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। একটি প্রভাব বলয়মুক্ত আত্মনির্ভর গণতান্ত্রিক দেশ গড়ার যে চেতনা নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা ব্যর্থ করে দিয়ে ব্যক্তি শাসনের দর্শন বাস্তবায়নে এগিয়ে গিয়েছিল তৎকালীন সরকার। ঐ সরকার তথা বাংলাদেশের প্রথম সরকার ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন যে কারচুপির আশ্রয় নিয়েছিল তা সর্বজনস্বীকৃত। শুধু নির্বাচনইবা কেন? তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, মুক্তিযুদ্ধের পর যেভাবে একটি দেশকে স্বাধীন রাখার চেষ্টা করা প্রয়োজন ছিল তা না করে এমন এক সরকার গঠন করা হল যাকে 'পাপেট' বলাই উত্তম। বলা যায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংঘাত এবং সংঘর্ষের সূত্রপাত সেখান থেকেই। এরপরের রাজনৈতিক ইতিহাস এগুতে থাকে ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয়করণকে কেন্দ্র করে। ইদানীং অনেকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে সেই সময় সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। কেউ বলছেন, ঐ সময় ছিল খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের। ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। তাই সবকিছু হয়ে ওঠেনি। সব ঠিক থাকলে কি হতো বা হতে পারতো সে আলোচনা অন্যত্র করা যাবে তবে তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা পর্যালোচনা করলে এই বক্তব্য ধোপে টিকে না যে, ঐ সরকার আরও এগুলে বাংলাদেশের জনগণ নিরাপদ হতো বা হবার কোন সম্ভাবনা ছিল। যারা তখন এবং এখন নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চ্যাম্পিয়ন বলে দাবী করছেন, তারা কি এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারবেন যে, মুক্তিযুদ্ধের দেশপ্রেমের চেয়ে আরও কোন বড় দেশপ্রেম কি আছে, যা দিয়ে জাতিকে সংগঠিত করে জাতীয় বি-নির্মাণ সম্ভব? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর মুক্তিযুদ্ধের চ্যাম্পিয়ন দাবীদাররা দেবেন না। কারণ, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এবং এর সমাপ্তিতে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনালে ওসমানীকে নিয়ে বিতর্ক তুলে আওয়ামী শিবির বাংলাদেশের হৃদয়ে যে কীট প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে সেই কীট কুরে কুরে খেয়েছে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে। সত্যি বলতে কী, বাংলাদেশে অসহিষ্ণু সহিংস রাজনীতির উদ্‌গাতা আওয়ামী শাসকরাই। পরবর্তীতে এই ধারা বিস্তার লাভ করেছে সর্বত্র। কেউ বেঁচে থাকার জন্য সন্ত্রাসী হয়েছে, কেউ সন্ত্রাসী হবার জন্য সন্ত্রাসী হয়েছে আর কেউবা স্বাধীনতা বিলুপ্ত করার জন্য সন্ত্রাসী হয়েছে। যেভাবেই দেখা যাক না কেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে সন্ত্রাসের বয়স প্রায় বাংলাদেশের সমান; অর্থাৎ বাংলাদেশের সন্ত্রাস শিশু, কৈশোর পাড়ি দিয়ে এখন ভর যৌবনে পা রেখেছে।

বিদ্যমান এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যোগ্য ও সৎ নেতৃত্বের শূন্যতা দেখা দিলে সন্ত্রাস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে কখনো রাজনীতির মাঠ দখলের নামে আবার কখনো ব্যক্তিস্বার্থের কারণে। ফলে, এই পরিস্থিতি সামাল দেয়া রাজনীতিকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল; কারণ, এরাই তার গডফাদার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে নির্বাচন নামক একটি বিষয়কে পাড়ি দেবার জন্য দাবী উঠল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। নির্বাচনের কাজ এবং দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক নামক একটি সরকারের ঘাড়ের উপর পা রেখে পাড়ি দেয়া আর কি। বাংলাদেশের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে আওয়ামী লীগের চাপ ছিল অত্যন্ত প্রবল তাদের আয়নার তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গটি দেখলে ভিন্ন চিত্র দেখা যাবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় ৫ম জাতীয় সংসদে। এই সংসদ মানতে চাননি আওয়ামী লীগ নেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বার বার বলেছিলেন, ঐ নির্বাচন কোন নির্বাচন নয়। যদি তার এ কথা সত্য হতো, তাহলে যে নির্বাচন কোন নির্বাচন নয়, সে নির্বাচনের রায় দিয়ে গঠিত কোন ব্যবস্থা কি সঠিক হতে পারে? এ প্রশ্নের কোন জবাব তিনি কখনো দেননি; বরং তত্ত্বাবধায়ক

www.pathagar.com

সরকারের অধীনে নির্বাচন করে তিনি ৫ বছরের অধিক সময় ক্ষমতাসীন থেকে গেলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত ধারণা ভারতবর্ষে নতুন নয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামল থেকেই রাষ্ট্রীয়ভাবে তত্ত্বাবধায়ক ধারণা কার্যকর রয়েছে। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবুর তাঁর পুত্র হুমায়ুনের জন্য এমন এক রাজ্য রেখে গিয়েছিলেন যা কেবলমাত্র নিরন্তর যুদ্ধ দ্বারাই সংরক্ষণ সম্ভবপর ছিল। হুমায়ুন সেই রাজ্য সংরক্ষণে সফলতার পরিচয় দেননি। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আকবর মাত্র ১৩ বছর বয়সে যে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাকে সিংহাসন বলা যাবে না। মূলত তিনি তাঁর পিতার বন্ধু খান-ই-খানান বৈরাম খানের সহায়তায় সিংহাসনে আসীন হন মাত্র। মূল সম্রাট আকবর হলেও সাম্রাজ্য চালিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বৈরাম খান। তৎকালীন বিপদাপন্ন মোগল সম্রাজ্যকে বিপদমুক্ত করার এককভাবে কৃতিত্ব ছিল বৈরাম ধানের। তবে সম্রাট আকরব বৈরাম খান মুক্ত হবার পরও আরও কয়েক বছর কাটিয়েছেন অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে। সব মিলে ক্ষমতাসীন হবার পর ৬ বছর তিনি অভিভাবকত্বে কাটিয়েছেন। মোগল সাম্রাজ্যের বয়স যদি ২০০ বছর ধরা হয়, তাহলে প্রায় ৫০ বছর শাসন করেছেন সম্রাট আকবর এবং যার ভিত তৈরী করে গিয়েছিলেন তত্ত্বাবধায়ক বৈরাম খান। সমাজ সংসার বা রাষ্ট্র যে প্রসঙ্গেই আলোচনা করা যাক না কেন, তত্ত্বাবধায়কের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্ভবতঃ একটি কথাই বলা যায় যে, নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাবালকত্ব অর্জন না করা পর্যন্ত অবশ্যই তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এই অপেক্ষার সাথে নির্দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্ক থাকলেও নিরপেক্ষতা বলতে কি বুঝায় তা বোধহয় বলা যাবে না। কারণ, তত্ত্বাবধায়ক সব সময়ই তার মূল কর্তৃত্বের পর্যবেক্ষণ করেন। এই পর্যবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে তাদের কাছ থেকে যারা মূল কর্তৃপক্ষকে চেনেন না বার তার অনুরূপ নয়। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো প্রমাণ করেছে যে, তারা দেশে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা টিকিয়ে রাখার মত সাবালকত্ব অর্জন করেনি। এই স্বীকৃতির সাথে এটাও স্বীকৃত যে, পর পর দু'বার নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন করার পরও জাতির প্রধান প্রধান সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। প্রথমবার নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আওয়ামী লীগ বলেছিল নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। দ্বিতীয়বার পুরোটা দখল করে নিয়েছে। সুতরাং বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলের নির্বাচন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল কিনা সে প্রশ্ন উড়িয়ে দেবার নয়। রাজনৈতিক নাবালকত্ব এড়িয়ে যাবার লক্ষ্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে অতীত অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে তাতে াসহায়ত্ব আরও বেড়েছে। '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পরবর্তী সময়ে যে জাতি হনন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এখন তা বিকশিত হচ্ছে।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন সাবেক ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নিয়ে তাদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দু'একটি কর্মকাণ্ড দেখে। অর্থাৎ বর্তমান সরকার সাবেক সরকারের সাজানো ছকের দু'একটি ঘুঁটি এদিক-ওদিক করছেন তাতেই আপত্তি তুঙ্গে উঠেছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা কার পক্ষে, কার বিপক্ষে সে বিতর্কের চেয়ে বড়কথা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে হলে একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিস্থিতি পরিবেশ অবশ্যই তৈরী করতে হবে। এই পরিস্থিতি তৈরী করতে কতদিন সময় লাগবে সে সম্পর্কে কোন ধারণা হয়ত অনেকেরই নেই। একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরী করতে অনেক ক্ষেত্রেই যে আমূল পরিবর্তন

www.pathagar.com

করতে হবে সে কথা না বললেও চলে। দু'একজন সচিবকে স্থানচ্যুত করলেই পরিস্থিতি পাল্টে যাবে বিষয়টি হয়ত তা নয়। বরং বিষয়টি এরূপ যে, বর্তমান ব্যবস্থাপনায় আধিপত্যবাদ বিরোধীদের সংখ্যা হয়ত এত নগণ্যে নামিয়ে আনা হয়েছে যে, পরিস্থিতির উন্নতি না করলে গোটা রাজনৈতিক আবহের পরিবর্তন সম্ভব নয়। আওয়ামী শিবির থেকে প্রশ্ন উঠেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ কিনা। হয়ত এ নিয়ে আরো কিছু দূর এগুলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে তা বলা যায় না। শুধু এইটুকু মন্তব্য করা যায় যে, অর্ধেক গ্লাস পানিকে পূর্ণ বা শূন্য কি হিসেবে বলা যাবে তা নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির উপর। যখন বাংলাদেশের রাজনীতির ৩০ বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে আজ সেই সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়ে যে নিরপেক্ষ নির্বাচন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে তাকে যথার্থ অর্থে বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই তাকে দেশপ্রেমের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করতে হবে। সম্ভবতঃ জাতির কোন সদস্যই এ ব্যাপারে আপত্তি করবেন না, বরং শক্ত হাতে সন্ত্রাস এবং জাতিবিরোধী অপতৎপরতা নিরোধে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করলে জাতি তাকে অভিনন্দন জানাবে।

চৌত্রিশ

নির্বাচনী জ্বরে কাঁপছে বাংলাদেশের জনগণ। আজ যদি ভয়াবহ রকমের কিছু না ঘটে তাহলে ইশাল্লাহ আগামীকাল বাংলাদেশের মানুষ গোপন ব্যালটে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পেয়ে যাবেন। অষ্টম জাতীয় সংসদের জনগণ তাদের পছন্দনীয় প্রার্থীদের বিজয়ী করে পাঠাতে সক্ষম হবেন। ইতোমধ্যে প্রার্থীরাও তাদের প্রচার-প্রচারণা সমাপ্ত করেছেন এবং ভোটাররাও হয়তো তাদের মনস্থির করে ফেলেছেন কাকে এবং কেন ভোট দেবেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের যেহেতু কোন বিকল্প নেই, তাই নির্বাচন এলেই জনগণ নানা কথা জানার এবং জবাবদিহিতার সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন। বাংলাদেশে এবার যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তকন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভিন্ন আকার ধারণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনে হামলার সূত্র ধরে গোটা বিশ্বের মতো বাংলাদেশে কোন মার্কিন ঘাঁটি না হওয়ায় পরিস্থিতির তেমন কোন হেরফের হয়নি। বিশ্ব অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে মার্কিন হামলা পরিকল্পনা সারা দুনিয়ায় এবং আমাদের দেশে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলেও আগামীকাল জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিধায় কোন অজুহাতেই নির্বাচন প্রসঙ্গকে হেলাফেলা করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ইতিপূর্বে আন্তর্জাতিক মহলে যতোটা সাড়া পড়েছিল হয়তো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাতে কিছুটা ভাটা পড়েছে এবং সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার না আসার সিদ্ধান্ত নেয়ায় পরিস্থিতির হয়তো কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে জিমি কার্টার না থাকলে অনেকেই পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। যদিও ফেমাসহ আরও কয়েকটি পর্যবেক্ষক টিমকে কোন কোন মহল থেকে হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে। থাক সে কথা। নির্বাচনকে সামনে রেখে বোমা হামলা, অস্ত্র পাচার বৃদ্ধি এবং কোন কোন সংবাদপত্রের প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা থেকেও কারো কারো মনে এরকম ধারণার জন্ম হতে পারে যে, আসলেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কি—না।

নির্বাচন নিয়ে জনমনে এই আশংকার বহিঃপ্রকাশ প্রধান দুই নেত্রীর বক্তব্যেও রয়েছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার বিভিন্ন জনসভার ভাষণে সন্ত্রাস উপেক্ষা করে নির্বাচন করার প্রতি যেমনি গুরুত্ব দিয়েছেন; তেমনি চারদলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও বলেছেন, যথাসময়ে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবেই। সেদিক থেকে

www.pathagar.com

সকল অশুভ কামনা পদদলিত করে শুভ কামনা করে এ কথাই বলা যায় যে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবেই। তারপরও সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটবে না। অনেকেই মনে করছেন, নির্বাচনের দিন অন্তত ৫০টি আসনে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যাতে ঐ সকল আসনের ফলাফল স্থগিত করা জরুরী হতে পারে। ৫০টি আসনে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার অর্থ হচ্ছে প্রায় ১ কোটি নাগরিক কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অথবা ক্ষতিগ্রস্তের আওতায় পড়া। খোদা না করুক এরকম একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তাহলে তাকে গোটা পরিস্থিতি খাটো করে দেখার কোন সুযোগ থাকবে না। আশার কথা, সেনাবাহিনী নিয়োগের প্রথম দিন থেকেই অস্ত্র উদ্ধারে যতটুকু সফলতা দেখা যাচ্ছে তা যদি অব্যাহত থাকে এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সত্যিই আন্তরিক হন তাহলে অন্যকিছু নাও ঘটতে পারে।

নির্বাচন প্রচারণার শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে প্রচারাভিযান শুরু করেছে। তিনি দেশে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান ও সন্ত্রাস বন্ধের লক্ষ্যে কাজ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। নির্বাচনী জনসভা করতে গিয়ে স্থানীয় নানা সমস্যা তুলে ধরে তিনি আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে নৌকা-মার্কায় ভোট দিতে জনগণকে আহবান জানিয়ে বলেছেন, ধানের শীষ কেটে নৌকায় তুলে আনুন। সভানেত্রীর বক্তৃতা-বিবৃতির পাশাপাশি আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরাও এবারের নির্বাচনকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা প্রমাণ করার কসরত করছেন যে, আওয়ামী লীগ মানেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা করতে হলে আওয়ামী লীগকেই ভোট দিতে হবে। আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের এই বক্তব্য দলী সভানেত্রী সমর্থন করে বলেছেন, জোট হলো খুনীদের। খুনী বলতে তিনি '৭৫-এর ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনের হোতাদের বুঝিয়েছেন। তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতায় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গেরও অবতারণা করেছেন। জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন, খালেদা জিয়ার রাজনীতি দেশের জন্য নয়। ক্ষমতায় গেলে তারা দেশ বেচে দেবেন। তিনি এ-ও বলেছেন যে, বিএনপিকে ভোট দিলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনষ্ট হবে এবং ক্ষুণ্ন হবে দেশের সার্বভৌমত্ব। যদিও তার ভাষায়, জয়নাল হাজারী আছে এবং থাকবে।

নির্বাচনী জনসভা, চারদলীয় জোটের প্রতীক ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লা এবং প্রার্থীদের সমর্থনে দেশব্যাপী প্রচারাভিযান ও জনসংযোগ করেছেন চারদলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়া। দেশজুড়ে লাখো লাখো মানুষের সমাবেশে ভোট চাওয়ার পাশাপাশি দেশ থেকে সন্ত্রাস-দুর্নীতি উচ্ছেদ করে তার বিপরীতে শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে, স্বাভাবিক ঘুমের গ্যারান্টি নিশ্চিত করতে এবং সন্ত্রাসীদের নৌকায় তুলে বিদায় করতে চারদলীয় জোটকে জয়যুক্ত করার আহবান জানিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া। দেশকে অপমান এবং সন্ত্রাসমুক্ত করার অঙ্গীকার ঘোষণায় দৃঢ়তার সাথে তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগের দুঃশাসনই আমাদের বিজয়কে নিশ্চিত করবে ইনশাল্লাহ এবং নির্যাতিত মানুষের বদদোয়া আর চোখের পানিতে এবার নৌকা ডুববে।

স্বাধীনতা রক্ষা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রশ্ন আওয়ামী শিবির থেকে তোলা হলেও এর কোন সমাধান তরা দিতে পারেনি; বরং নিজেদের পক্ষে সাফাই গাওয়ার মতো কিছু আবোল-তাবোল বলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে নির্বাচন সম্পন্ন করতে চাচ্ছেন তারা। আওয়ামী লীগ বা তাদের মহল থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কোন কিছু বলা না হলেও দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার নয়। বরং খুবই গুরুত্বের সাথে বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। বিগত ৫ বছরের শাসনামল এবং চলমান রাজনৈতিক

www.pathagar.com

প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দেশের অভ্যন্তরে প্রধানত তিনটি ধারা বিরাজমান। ১। আধিপত্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী, ২। আধিপত্যবাদবিরোধী ইসলামী এবং ৩। আধিপত্যবাদপন্থী ধারা। এই তিন ধারার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণকারী এবং স্বাধীনতা বিলুপ্তকারীদের সমর্থক। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম প্রহর থেকে শুরু করে বর্তমান প্রেক্ষিত পর্যন্ত বিবেচনায় আনলে কারো বুঝতে অসুবিধা হওয়ায় কথা নয় যে, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অনুকূল শক্তি কারা। সোজা কথায় বলা যায়, যে সকল ব্যক্তি বা শক্তি ভারতীয় আধিপত্যবাদের নীল নকশার অনুকূলে দাঁড়ায়নি তাদের সমর্থন করেনি তারাই চেয়েছিল একটি প্রভাব বলয়মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে এই চেতনাবোধকে অবদমিত করে যে রাজশক্তি ক্ষমতা গ্রহণ করে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে দেশে লুটপাটের রাজনীতি চালু করে দেশকে পরনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। গোটা বিশ্বে বাংলাদেশ তখন একটি দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে তলাবিহীন ঝুড়ির দেশে পরিচিতি লাভ করেছিল। ঐ লুটপাটের অর্থনীতি চালু করে ব্যক্তিবিশেষের কতটা তরক্কি হয়েছে, কি হয়নি সে প্রশ্ন না তুলেও একথা বলা যায় যে, ঐ সময়টায় যখন দেশ গড়ার সুযোগ ছিল; তা না করে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচিত করানো হয়েছিল ডাকাত হিসেবে। এমনকি মেজর জলিলের মতো আধিপত্যবাদবিরোধী মুক্তিযোদ্ধাকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং সেই যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জন্ম দেয়া হয়েছে আজও তা অব্যাহত আছে।

মুক্তিযুদ্ধের ময়দানে আধিপত্যবাদবিরোধী যে জাতীয়তাবাদী শক্তির জন্ম হয়েছিল সেই শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে '৭৫-এর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর থেকে। নানা কারণে এই সমন্বিত ধারা সম্মিলিতভাবে চলার সুযোগ পায়নি। তবে এবারের নির্বাচনে চারদলীয় জোট খানিকটা হলেও এ ধারার মিলিত স্রোত। জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তির বিভাজন ও বিভক্তির রন্ধ্রপথে বিকশিত হয় আধিপত্যবাদপন্থীরা। নিঃসন্দেহে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং গণতন্ত্রে নামাবলী গায়ে দিয়ে এই শক্তির উত্থান ত্বরান্বিত হয়। এই শক্তির কাছে জেনারেল ওসমানী, মেজর জলিল, মেজর জিয়া যেমন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নয়, তেমনি নয় বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট। ঐ মহল যা ভাবুক বা বলুক না কেন, বাংলাদেশে আজ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সুশাসনের। এই প্রয়োজনীয়তা রক্ষায় একদিকে যেমন দরকার সৎ মানুষের তেমনি—অপরিহার্য হয়ে পড়েছে আধিপত্যবাদবিরোধী নেতৃত্বের। আগামী দিনগুলোতে তাই বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার্থে আধিপত্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির জোটবদ্ধতার কোন বিকল্প নেই। যদিও এবারের নির্বাচনে জাতীয় ইসলামী ঐক্যফ্রন্টসহ ১১ দলীয় বাম জোটও অংশগ্রহণ করছে। বাম জোট কোন ফ্যাক্টর না হলেও ফ্রন্ট খানিকটা হলেও সমস্যার সৃষ্টি করতো পারে। নির্বাচনের আগে এ বিষয়ে কোন আলোচনা না করে শুধু এইটুকু বলে শেষ করতে চাই যে, দেশ স্বাধীনতা রক্ষায় দেশ বাঁচাতে নির্বাচনে এবং নির্বাচন পরবর্তীতে জোটবদ্ধতার কোন বিকল্প নেই।

পঁয়ত্রিশ

পাদুয়া ও রৌমারীর ঘটনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা দিয়েছে নিঃসন্দেহে এবং সেই সাথে একথাও বলা যায় যে, এই ঘটনা বাংলাদেশের জনগণের মনে ধিক্কারের জন্ম দিয়েছে। আস্তে আস্তে এই দু'টি ঘটনা জনমনে যে বিস্তৃতি লাভ করতে শুরু করেছে তার আলামতও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংঘর্ষ এই প্রথম নয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ—ভারত সীমান্ত বিরোধের বয়স অর্ধ শতাব্দীর অধিক। লাগাতার সংঘর্ষ চলছে অন্ততঃ সিকি শতক ধরে। '৭৫-এর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর তালপট্টি ও মুহুরীরচর নিয়ে প্রচণ্ড উত্তেজনা শুরু হয়। অন্যান্য সীমান্তেও উত্তেজনা শুরু হয় তখন থেকেই। কিন্তু তা এবারের মত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেনি। সরকার বৃহৎ প্রতিবেশীর সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের স্বার্থে তখন বিতর্ক জিইয়ে রেখে ভারতীয় চণ্ডনীতির বিরোধিতা করে।

বাংলাদেশে ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদে কার্যকর প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠে গঙ্গা নদীর পানির হিস্যা নিয়ে। অন্যায়ভাবে ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে একতরফাভাবে ভারত গঙ্গার পানি আটকে দেয়ার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ যখন মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছিল ঠিক তখনই বাংলাদেশের মানুষ ফুঁসে উঠে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক ফারাক্কা লংমার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, একে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রথম ভারতবিরোধী ব্যাপক গণজাগরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে এই জাগরণ স্থায়ী হয়নি। না হওয়ার অনেক কারণ আছে। প্রধান কারণ হলো ঐ সময়ে যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন জনগণ তাদের হাতেই ভারত বিরোধিতার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। সেদিক থেকে এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। রাষ্ট্রশক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন না তুলেই সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিতরা প্রাণ দিয়ে তাদের শপথ ও দেশরক্ষা করেছেন। জনগণ এই দায়িত্ব পালনকে স্বাগত জানিয়েছেন। দেশ রক্ষার জন্য এই বীরদের জানিয়েছে লাখো সালাম। বিষয়টি শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের কোন কোন মহল ও তাদের সমর্থিত সংবাদপত্রে দেশ রক্ষায় বিডিআর-এর ভূমিকা এবং জনগণের সচেতনতায় উষ্মা প্রকাশ করলেও দেশের সচেতন মহলকে এই ঘটনা যে ভিন্নভাবে নাড়া দিয়েছে সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। একটি দু'টি চিহ্নিত দল ছাড়া দেশের রাজনৈতিক মহলেও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে পাদুয়া ও রৌমারীর ঘটনা। রাজনৈতিক দলসমূহের সাম্প্রতিক কালচারের এই প্রভাব অনুভব করা যায়।

পাক্ষিক চিন্তা পত্রিকা আয়োজিত সীমান্ত সংঘর্ষ ও উপমহাদেশের গণতান্ত্রিক মৈত্রীর ভবিষ্যৎ শীর্ষক আলোচনা সভায় মতবিনিময় করেছেন দেশের বিভিন্ন মত ও পথের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক। সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তবে প্রায় সকলেই একমত পোষণ করেছেন যে, সীমান্ত আক্রমণের জন্য ভারতই দায়ী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সমর্থনের কারণে এর দায় থেকে তাদের মুক্তি দেবার কোন সুযোগ নেই। যদিও ঐ আলোচনায় বর্তমান ভারত শাসকদের শ্রেনী চরিত্র কি এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল। ভারত সাম্রাজ্যবাদ না আধিপত্যবাদ এ নিয়েও নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা এবং আগ্রাসনের যে কলাকৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে তাকে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে আধিপত্যবাদ বলাই উত্তম। বর্তমানে যে ইউরোপকে কেউ কেউ আধুনিক গণতান্ত্রিক এবং সভ্যতার মডেল বলে উল্লেখ করে থাকেন সেই ইউরোপে প্রায় দু'শ' বছরের এই গৃহযুদ্ধের পিছনে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, আমলাতন্ত্র থেকে শুরু করে নানা বিষয় কাজ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ৪১ বার ইউরোপীয় মানচিত্রের পরিবর্তন হয়েছে।

কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠার এই লড়াইয়ের রাজনীতি আধিপত্যবাদ বলে পরিচিত। সুতরাং আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য জয় যেহেতু বাধ্যতামূলক নয় সে কারণে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদীরা আধিপত্যবাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিবেশীসহ আঞ্চলিক দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এই ধারায় ভারত বর্তমান যুগের একটি আধিপত্যবাদী দেশ। ভারত বাংলাদেশসহ তার অন্যান্য প্রতিবেশীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তৎপর। ভারতের এই অসৎ চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে পাদয়া ও রৌমারীতে। ভারতের সাথে স্থলপথে বাংলাদেশের যে

www.pathagar.com

৪৪২৭ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে তার মধ্যে ৪৪২০.৫ কিলোমিটার সীমান্ত এ যাবতকাল পর্যন্ত চিহ্নিত হয়েছে। '৭৪ সালের পর থেকে গত ২৬ বছরের উল্লিখিত সীমান্ত এলাকা চিহ্নিত করা গেলেও ৬.৫ কিলোমিটার সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। বিবদমান এই সীমান্ত অঞ্চল চিহ্নিত করতে দু'দেশের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা ব্যর্থ হয়েছেন। বিরোধপূর্ণ সীমান্ত এলাকা দুই কিলোমিটার রয়েছে ফেনী জেলার বিলোনিয়া এবং মুহুরীরচর এলাকায়। এই সীমান্ত চিহ্নিতকরণে বাধা এসেছে ভারত থেকে। '৭৪ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে যে চুক্তি হয়েছিল তা বাস্তবায়নে ভারতের গড়িমসির কারণেই সমস্যা গভীর হয়েছে এবং পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। ঐ চুক্তি অনুযায়ী সীমান্ত নদীগুলোর সীমানা চিহ্নিত করার কথা ছিল নদীর মধ্যস্রোতকে জিরো লাইন করে। কিন্তু গত ২৬ বছরে ভারত সেই সীমানা নির্ধারণ না করে ১৫টি স্পার নির্মাণ করে মুহরী নদীর স্রোতধারাকে বাংলাদেশের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। ফলে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে দেখা দিয়েছে তীব্র ভাঙ্গন। সরকারী ভূমি দফতরের হিসাব মতে, মুহুরী নদী ৬০০ গজের বেশী বাংলাদেশের ভূখণ্ড ভেঙ্গেছে। অন্যদিকে সমপরিমাণ ভূমি ভারতীয় ভূখণ্ডে জেগে উঠার মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে। ভূমি জরিপ অধিদফতর বলছে, তাদের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা '৭৪ সালের চুক্তির আলোকে ভারতের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে মোট ৪.৭৮ কিলোমিটার সীমান্ত চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। মুহুরীরচর প্রশ্নে ভারত এখন বলছে মধ্যস্রোত ধরে ভাগ করতে। ভারতীয় পক্ষ তাদের সৃষ্ট সমস্যাকে বিবেচনায় আনতে অথবা এই সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় পদ্ধতি মানতে চাচ্ছে না। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বলা আছে, নো-ম্যান্স ল্যান্ডের দু'পাশে ১৫০ গজ করে ৩০০০ গজের মধ্যে কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না, সীমান্ত নদীকে শাসন করা যাবে না। এছাড়া চুক্তি মোতাবেক মুহুরী নদীর ভাঙ্গনরোধ প্রতিরোধে বাঁধ নির্মাণের তোয়াক্কা না করে ভারত নদীর গতিপথ পাল্টানোর মত সহায়ক স্থাপনা স্পার নির্মাণ করেছে।

স্থলপথে বিরোধপূর্ণ অন্য এলাকা হল কুড়িগ্রাম জেলার দইখানা নামক স্থানের দেড় কিলোমিটার। সীমান্ত সমতলে অবস্থিত এই এলাকার সমস্যার গোড়ায় রয়েছে র‍্যাডক্লিপের ফাঁদ। এই এলাকার জনসংখ্যা তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অবস্থানকে বিবেচনায় না এনে এমনভাবে সীমান্তরেখা টানা হয়েছে যার ফলে কারো বাড়ীর-টয়লেট আর আঙ্গিনা আলাদা হয়ে গেছে। এক ভাই ভারতে অন্য ভাই বাংলাদেশের ভূখণ্ডে রয়েছে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের স্থলপথে বিরোধপূর্ণ বাকী তিন কিলোমিটার রয়েছে মৌলভীবাজারের লাঠিটিলা নামক স্থানে পাহাড়ী জনপদে একটি টিলার দাবী নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হবার কারণেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া অপদখলীয় বাংলাদেশের ভূমিতো রয়েছেই।

স্থলপথের কথা বাদ দিলে বাংলাদেশের নৌপথের সাথে ভারতের প্রধান বিরোধের সূত্রপাত হয় '৭১ সালের স্বাধীনতার পর থেকেই গাঙ; ব-দ্বীপের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমারেখার প্রায় মধ্যভাগের বঙ্গোপসাগরের অগভীর উপকূলীয় সমুদ্রাঞ্চলের জেগে ওঠা দক্ষিণ তালপট্টি নিয়ে, দ্বীপটির জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের সাথে বিতর্ক চলছে। বাংলাদেশের নেয়-সীমানার মধ্যে জেগে উঠা সত্ত্বেও দীপটি নিয়ে বিতর্ক থেমে নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে এই দ্বীপটি ভারতীয়দের চোখে পড়ে। সেই থেকে শুরু করে ১০ বছর পরে ১৯৮১ সালের দিকে দ্বীপটির মালিকানা প্রশ্নে ভারত-বাংলাদেশ প্রায় সংঘর্ষের পথে এগিয়ে যায়। সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় ঐ বছরের মে মাসে। ঐ সময়ে ভারত দ্বীপটিতে সন্ধ্যায়ক নামক একখানা জাহাজ প্রেরণ করে। বাংলাদেশ ভারতের ঐ একতরফা তৎপরতায় ক্ষুব্ধ হয় এবং তীব্র প্রতিবাদ জানায়। দক্ষিণ তালপট্টি থেকে বাংলাদেশ ভারতীয়

www.pathagar.com

জাহাজ ও সরঞ্জামাদি প্রত্যাহার দাবী করলেও এ দাবী ভারতীয়রা কোন ভ্রূক্ষেপ না করে দ্বীপ এবং পার্শ্ববর্তী ভারতীয় ভূখণ্ডে শক্তিশালী নৌ-ঘাঁটি স্থাপনে সচেষ্ট হয় এবং এখন পর্যন্ত তা দখল করে রেখেছে। এছাড়াও বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের ২৭১ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে, এর মধ্যে ৭১ কিলোমিটার নাফ নদীর সীমানা।

আকাশপথের আলোচনা নিরর্থক। সাধারণ অর্থে বলা যায়, আমাদের আকাশপথ শত্রুমুক্ত রাখার লক্ষ্যে এমন কোন শক্তিশালী ব্যবস্থা এখনও গ্রহণ করা হয়নি যা দিয়ে শত্রুকে মোকাবিলা করা সম্ভব। বাংলাদেশের সীমান্ত জুড়ে ভারতের আগ্রাসী থাবার যে বাস্তবতা থেকে মোকাবিলার প্রশ্ন যখন সবদিক থেকে উঠেছে তখন অবশ্যই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন আমরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কি করতে পারি। সকল মহলই এটা স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মবিশ্বাসই সীমান্তের আগ্রাসী শক্তির থেকে আলাদা করে রেখেছে। সেদিক থেকে ধর্মবিশ্বাসই আমাদের স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। এই বিশ্বাসকে কেউ কেউ মৌলবাদী চেতনা বলে অভিহিত করলেও কিছু আসে যায় না। কারণ, আমাদের প্রতিবেশী আধিপত্যবাদের শক্তিশালী দুর্গ গড়ে উঠেছে সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বহুত্ববাদী ধর্মীয় চিন্তার উপরেই এবং ভারতীয়রা তাদের ঐক্য এবং সংহতি বজায় রাখতে এই চেতনাবোধকেই কাজে লাগাচ্ছে।

ভারতীয় পুঁজি এবং রাষ্ট্রীয় শোষণ বন্ধ করা এখন জরুরী হয়ে পড়েছে। একথা যে কেউ স্বীকার করবেন। যে, ভারতীয় পুঁজির শোষণ এতটাই বাংলাদেশে বেড়েছে যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির দাসে পরিণত হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানবিহীন এই লুম্পেন পুঁজি বাংলাদেশে তৈরী করেছে ভারতের তল্পিবাহক নয়া দালালশ্রেণী—যারা ব্যবসার নামে জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং আগামী শতাব্দীতে বাংলাদেশ যাতে কখনওই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে সেই নীল নকশা বাস্তবায়নে রাজনীতিতে পোষা হচ্ছে এক ধরনের দাস। সুতরাং বাংলাদেশ থেকে অবশ্যই ভারতীয় পুঁজির শোষণ স্থায়ীভাবে বন্ধ করার যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব এসেছে জনগণের উপর। সীমান্ত হামলা প্রসঙ্গে বক্তব্য দিতে গিয়ে চারদলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, তাদের ভোট দিলে সীমান্ত রক্ষিত হবে। এই বক্তব্যকে যদি জাতীয় স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে পাদুয়া ও রৌমারীর ঘটনার আলোকে বিচার করতে হয় তাহলে অবশ্যই একথা মেনে নিতে হবে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন আধিপত্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তির কার্যকর সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। এই ঐক্যকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় শক্ত করা না গেলে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার শ্লোগান অর্থহীন হয়ে যাবে। অভিজ্ঞতার আলোকে একথাই বলা সঙ্গত যে, সীমান্ত রক্ষার আওয়াজ তুলে সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনীয় দিক উপেক্ষিত থাকলে বাংলাদেশের ভাগ্যে আগামীতে দুর্দিন নেমে আসতে পারে। যে দেশের প্রধান এবং বৃহৎ প্রতিবেশী বৈরী ও পারমাণবিক শক্তিধর তাদের মোকাবিলা করতে একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী কোন বিবেচনাতেই যথেষ্ট নয়; বরং দেশের জনগণ এবং সেনাবাহিনীর মিলিত চেতনাই দেশকে স্বাধীন রাখতে পারে। পাদুয়া এবং রৌমারীর ঘটনা যে জাতীয় চেতনাবোধের জন্ম দিয়েছে আগামী নির্বাচনে যাতে তা ধরে রাখা যায় সে লক্ষ্যে প্রকৃত আধিপত্যবাদীর বিরোধীদের অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

www.pathagar.com

ছত্রিশ

বিরোধীদল যা করছে তাতে একজন নাগরিক হিসেবে মোটেও স্বস্তি পাচ্ছি না বললেন বিশিষ্ট নাগরিক ও কলামিস্ট সাদেক খান। তাঁর কথা শেষ হবার আগেই লুফে নিলেন আরেকজন। পাল্টা প্রশ্ন করলেন সাদেক খানকে, আর কি করা যেত? প্রথম থেকেই চারদল ঢাকায় মিছিল করছে, ভারতীয় পতাকা, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি পুড়িয়েছে, সিলেটে সমাবেশ করেছে। জবাব পছন্দ হলো না খান সাহেবের। তিনি উঠে গেলেন। তবে প্রসঙ্গ থেমে যায়নি। আরেক বামপন্থী প্রবীণ সাংবাদিক জনাব খানের প্রসঙ্গ ধরে বললেন, আসলেই বিরোধী দল যা করছে তাকে করা বলা যায় না। অনেকটা মুখ দেখানো। এবারও কথা মাটিতে পড়লো না। আরেকজন লুফে নিয়ে বললেন, দেখুন ৭২ সালের পর বেরুবাড়ী ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, ফারাক্কা চালু করা হয়েছে। ইতিহাস খুলে দেখুন তখন তেমন কিছুই হয়নি। তবে '৭৫-এর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর মওলানা ভাসানী যখন ফারাক্কা মিছিল করেছিলেন তখন ব্যাপক সাড়া পড়েছিল। এ সময় অবশ্য ক্ষমতায় ছিলেন জিয়াউর রহমান। এর পর প্রসঙ্গ আরও এগুতে থাকলো তবে ঝড় ও অন্যান্য শব্দের কারণে আলোচনা হারিয়ে গেল। এ কোন আনুষ্ঠানিক গোলটেবিল বৈঠক নয়, জাতীয় প্রেস ক্লাবের গোলটেবিলের সদস্যরাই এ আলোচনা করছিলেন।

সীমান্ত এখন নিত্যদিনের প্রসঙ্গ শুধু প্রেস ক্লাব কেন, পথে-ঘাটে, বাসে, রেস্টুরেন্ট, বিনোদনের পার্কে যেখানেই কেউ বসছে সেখানেই সীমান্ত আলোচনা অন্যান্য আলোচনাকে হটিয়ে দিয়ে নিজের আসন করে নিচ্ছে। প্রায় সবক্ষেত্রেই আলোচনা শেষ হয় এভাবে যে, একটা কিছু করা উচিত। এই কিছুটা কি? তা নিয়েই নানা মত। মতের ভিন্নতারও যে নানাকরণ রয়েছে, সেতো সবারি জানা। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির কারণ ক্ষমতায় এমন এক সরকার যারা ভারতপন্থী বলে জনমনে ধারণা রয়েছে। এ ধারণার পিছনে অন্য যেসব কারণই থাকুক না কেন, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সীমান্ত ঘটনা তাঁর প্রধান কারণ। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আক্রমণের পর ভারতীয় বিএসএফ বাংলাদেশের বিডিআর এর হাতে মার খাওয়ায় ভারতীয়দের জ্যাত্যাভিমানে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে। আর সে কারণে সেখানকার রাজনীতিক বুদ্ধিজীবী মহল এমন সব মন্তব্য করতে শুরু করেছেন যা শুনলে মরা মানুষেরও গা ঘিন ঘিন করে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংঘর্ষের পর গত ২৩ এপ্রিল ভারতীয় পার্লামেন্টের অধিবেশনে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশবন্ত সিং মুখ খোলেন এভাবে যে, ভারত সরকার মনে করে ইউনিফর্মধারী বিএসএফ সদস্যদের যেভাবে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাতে ইউনিফর্মে কলংকের দাগ লেগে আছে। আর ইউনিফর্ম কলুষিত হওয়ায় ভারত প্রজাতন্ত্রই কলুষিত হয়েছে। সুতরাং ভারত এ বিষয়কে হালকাভাবে নিতে পারে না। ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে পার্লামেন্টে ঘটনার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে আশা প্রকাশ করেন, বিএসএফ সদস্যদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যার জন্য যারা দায়ী, বাংলাদেশ যেন তাঁদের বিচার নিশ্চিত করে। সরকারী জোটের শরীক দল সমাজবাদী দলের সভাপতি মোলায়েম সিং যাদব বলেন, আমরা ঢাকার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে কিন্তু তা ভারতীয় সৈন্যদের লাশের বিনিময়ে নয়। শিবসেনা এমপি সনজয় নিরুপম বলেন, বাংলাদেশ রাইফেলস প্রধান মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান যদি ভারতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার হেড কোয়ার্টার বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় জনতা দলের এমপি প্রেমচাঁদ সেনগুপ্ত বলেন, অন্ততঃ ফজলুর রহমানের হেড

www.pathagar.com

কোয়ার্টার সর্বাগ্রে ধ্বংস করতে হবে। তার পরেই কেবল তদন্ত নিয়ে কথা চলতে পারে। তেলেঙ্গ দেশম পার্টির নেতা বলেন, বিএসএফকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ঢুকে ১৬ জন জওয়ানের পরিবর্তে ৩২ জন বিডিআর সদস্যকে হত্যা করে আসার সুযোগ দিতে হবে।

এ ধরনের অসংখ্য মন্তব্যের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো। ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের পুরোটাই এখন জুড়ে আছে বাংলাদেশে বিরোধিতায়। এর মধ্যে কে কাকে কি বলছেন সেটিই বড় কথা নয়, শুধু এইটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে নিজেদের দোষ ঢেকে রাখার নিমিত্তে তারা নানা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। এসব বিভ্রান্তির প্রধান দিক হলো ভারতীয়রা বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণ ও বিডিআর-এর মধ্যে পার্থক্য রেখা টানার চেষ্টা করছে। এমন ধারণাও তারা দিতে চাচ্ছে যে, ভারত এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে তেমন কোন মতপার্থক্য নেই, বরং বাংলাদেশের সরকার ও বিডিআর-এর মধ্যে রয়েছে মতপার্থক্য। এটা যে সর্বৈব মিথ্যা তা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষ্কার করে দিয়েছেন। মোদ্দা কথা ভারতীয়রা দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশে আগ্রাসনের ব্যাপারে আজ ঐক্যবদ্ধ। আর এ কারণেই তারা ভুলে গেছে তেহেলকা ডভকমের তোলা ঘুষ কেলেঙ্কারির কথা। ভুলে গেছে, নিজেদের মধ্যকার সব বিরোধ। যেমনটা গিয়েছিল ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের পর। অথবা বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার সময় যেমন ওরা একমত পোষণ করেছিল ভারতীয় মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে। আবার কংগ্রেস আমলে যখন কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুঙ্গে উঠেছিল তখন বিজেপির তৎকালীন সভাপতি ডঃ মুরালি মোহন যোশী কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারতীয় ঐক্যের সমর্থনে মিছিল করেছিলেন। কারগীল যুদ্ধেও সকল ভারতীয়রা একাট্টা হয়েছিল; যেমনটা হয়েছে বাংলাদেশের প্রশ্নে।

বাংলাদেশকে নিয়ে যে বাড়াবাড়ি তারা করছে তা হয়তো একটু আলাদা। কারণ বাংলাদেশকে তারা তাদের পাশে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র মানতে যেন কষ্ট পান। তাদের ধারণায় বাংলাদেশ যেন তাদেরই কোন আশ্রিত রাষ্ট্র। তাদের এই ধারণার ক্ষেত্রেও যে ঐক্য আছে তার গন্ধ গাওয়া যায় ১৯৭১ সাল থেকেই। '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন তৎকালীন আরএসএস মুখপাত্র যুগান্তরের শিরোনাম ছিল নিয়াজির "নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ঃ বৃহস্পতিবার ঢাকায় দলিল স্বাক্ষর"। কংগ্রেস মুখপাত্র বলে পরিচিত দৈনিক আনন্দ বাজারের শিরোনাম ছিল "পাকিস্তান নত"। যুগান্তরে কলিকাতা ১৭ ডিসেম্বর ডেড লাইনে পরিবেশিত খবরে বলা হয়, "গতকাল অপরাহ্নের দিকে এসেছিল সেই শুভ সংবাদ। ভারত জয়লাভ করেছে"। ঐ কাগজের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ এবং অতঃপর শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত লিখেছেন, একই সাথে সহজ হয়ে গেল আমাদের (ভারত) সীমান্ত রক্ষার সমস্যা। অবিভক্ত পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে সীমান্ত রেখা ছিল তার অর্ধেকের বেশীই ছিল পূর্ব ভূ-খণ্ডে। সীমান্তের সেই অংশ সম্পর্কে আমরা এখন নিশ্চিত হতে পারি। এটা একটা মস্ত বড় স্বস্তি। এ স্বস্তি যাতে আরও নির্ভরযোগ্য হতে পারে সেজন্য যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের সাথে ভারতের একটি সীমান্ত চুক্তি করে নেয়া যেতে পারে। আগেকার পাকিস্তান সরকারের সাথে ছিটমহলগুলো সমেত বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে ভারতের পূর্ব সীমান্তে কিছু বিরোধ ছিল, সেগুলো ঢাকার সরকার-এর সাথে বসে মিটিয়ে নেয়া আদৌ কঠিন হবে না। বাংলাদেশ একটি নতুন বাণিজ্য সম্ভাবনাও বটে।

১৯০৫, ১৯৭১ এবং ২০০১ সালের মধ্যে ভারতীয়দের কাছে দর্শনগত পার্থক্য নেই বললেই চলে। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা, বাংলাদেশের সমর্থন এবং বাংলাদেশ বিরোধিতার একই সমীকরণে হয়েছে। ১৯৭৪ সালে ভারত-বাংলাদেশ যে সীমান্ত চুক্তি করেছে তাও তারা মানেনি বরং বাংলাদেশের পুরোটাই দখল করে নেয়ার পাঁয়তারা করেছে এবং করছে। ভারতীয়রা এবং

www.pathagar.com

ভারতপ্রেমিরা একে ভারতীয়দের দেশপ্রেমের অংশ বলেই অভিহিত করছেন। দেশপ্রেম প্রশ্নটি আজকের বাংলাদেশেও যে উঠেনি সে কথা বলা যাবে না। সীমান্ত রক্ষায় অকুতভয় ৩ শহীদের প্রকৃত উত্তরাধিকার আমরা কিনা-এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন আরও আছে। কারণ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উপর ভর করে গঠন করেছেন এক নয়া মোর্চা। যার নাম মুক্তিযোদ্ধা-জনতা। চার দলীয় জোট তথা বিরোধী জোট গঠিত হবার পর এই মুক্তিযোদ্ধা-জনতা প্লাটফর্মকেই প্রধানমন্ত্রী ব্যবহার করছেন পাল্টা জোট হিসেবে। তিনি এই প্লাটফর্মে দেশব্যাপী জনসভা করে জনগণকে নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সীমান্তে শহীদ হওয়া এই ৩ বিডিআর প্রশ্নে তার ও তার মোর্চার দৃষ্টিভঙ্গি কি এবং স্বাভাবিকভাবে সীমান্ত রক্ষা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী কিনা অথবা '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০০১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরস্পরবিরোধী কিনা অথবা এই চেতনা চৈতন্যবাদী কিনা সে প্রশ্নও অমূলক নয়। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক মরহুম জেনারেল এমএজি ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে বুঝাতেন প্রভাব বলয়মুক্ত একটি বাংলাদেশ। যদি এই চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে ধরে নেয়া যায় তাহলে বলতেই হবে প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং চৈতন্যবাদীদের চেতনার মধ্যে পার্থক্য অনেক। চৈতন্যবাদীরা যদি দেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষের হতেন তাহলে সীমান্ত হামলার প্রতিবাদে আর কিছু না করলেও পুলিশ প্রহরায় যেভাবে হরতাল বিরোধী মিছিল করে সে রকম একটি মিছিল অন্তত করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তারা যা করছেন তা জাতীয় লজ্জার।

সরকারের কেউ কেউ সীমান্তবর্তী এলাকায় নিজের ঘর-বাড়ীতে গিয়ে শহীদ বিডিআরদের বাঘের বাচ্চা বললেও রাষ্ট্রীয়ভাবে এক লাক টাকা করে দেয়া হলো তাতো ভিক্ষার সমান। এদের পরিবারের সান্ত্বনার জন্য কোন সার্টিফিকেট পর্যন্ত বিতরণ করা হলো না। এই না পারার মধ্যেই দেশপ্রেমের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। সরকারী দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের কর্মসূচীকেও সাদেক খানের ভাষায় যা করছে তাকে করা বলা যায় না। কারণ এদের দেশপ্রেমের চেয়ে মুখরক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। বর্তমানের অবস্থা '৭৪-এর মত নয়। '৭৪ ছিল' একটি যুদ্ধ-উত্তরোত্তর বাংলাদেশের প্রাথমিক অবস্থা এর পর প্রায় ৩০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। নাবালক শিশু যদি এতদিন সাবালক না হয়ে থাকে, তাহলে সে দায়িত্ব তো দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল এবং নেতাকেই গ্রহণ করতে হবে। কারণ এ ব্যর্থতা তাদের সীমান্তে যদি বিডিআর প্রাণ না দিত তাহলে হয়তো বাংলাদেশ টিকে নাও থাকতে পারতো বাংলাদেশীরা হয়তো ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুদের মতো নতুন কোন সমস্যার মুখোমুখি হতো। কারণ আমাদের সংবিধানে যুদ্ধ ঘোষণার কার একক কোন এখতিয়ার নেই। সংবিধানের চতুর্থ অনুচ্ছেদের ৬৩ (১) ধারায় বলা হয়েছে, সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না, কিংবা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। বাংলাদেশের সংসদ ডেকে যুদ্ধ ঘোষণার মতো সিদ্ধান্ত নেয়া যে কত জটিল তা নিশ্চয়ই এখন আর কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। বর্তমান এবং বিগত সংসদের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেই এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, যুদ্ধ ঘোষণার মতো জরুরী বিষয় কখনো উপস্থিত হলে সংসদ আদৌ কেউ ডাকবে কিনা তা বলা কষ্টকর। অন্তত: সাম্প্রতিক উদাহরণ থেকে বলা যায় যে সীমান্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্যও কোন সংসদ অধিবেশন ডাকা হয়নি। অথচ এমনও অভিযোগ রয়েছে যে, অশ্লীল আলোচনার জন্যও জনগণের অর্থ নষ্ট করে সংসদের অধিবেশন ডাকা হয়েছে। যদিও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রেরণের ব্যাপারে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে সংসদের অনুমতি নেয়া হয়েছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারতের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য

www.pathagar.com

গড়ার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো না। বাংলাদেশের রাজনীতিকর যদি ভারত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন তাহলে তারা অবশ্যই দেশ ও জাতির এই সংকটে দেশপ্রেমের মহান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন। জনগণের দেশপ্রেমের কোন কমতি নেই। আর সে কারণেই সীমান্তে জনগণ যখন ভারতীয় বিএসএফ-এর দ্বারা নির্যাতিত হন তখন তারা বিডিআর-এর সফল অভিযানকে অভিনন্দিত করেন। কিন্তু আমাদের জাতীয় নেতারা বিডিআরকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে আমাদের ভূমি থেকে পিছে হটিয়ে নেন। তারা যদি মনে করে থাকেন যে, ভারতীয়রা আমাদের ছাড় দিয়েছে তাহলে তারা আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছেন। নিদেনপক্ষে যারা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা বিডিআর হেডকোয়ার্টার দখলের হুমকি দিয়েছে তারা ছেড়ে দেবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। ছলে-বরে, কৌশলে এর প্রতিশোধ যে তারা গ্রহণ করবে তাতেও সন্দেহ নেই।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে দেশপ্রেম এবং দেশপ্রেমিক সরকারের। জনগণের দেশপ্রেম নিয়ে সন্দেহ না থাকলেও যারা তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের স্কোর দেখা প্রয়োজন। কারণ দেশপ্রেমের পরীক্ষায় ৯৯ পেয়ে কোন লাভ নেই। ১০০% নম্বর পেতে যা যা চাই তার সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে জাতীয় নির্বাচনের এখনো কয়েক মাস বাকী। দেশপ্রেমিকদের নির্বাচিত করতে জনগণের আরও কিছু দিন সময় লাগবে। কিন্তু এই সময় পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে জনগণকেই সদাসতর্ক থাকতে হবে।

সাইত্রিশ

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার প্রতাপপুর সীমান্তের বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত রেখার ২৫০ গজ দূরত্বে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে পাদুয়ার অবস্থান। এই পাদুয়ার ২৩০ একর ভূমি গত ৩০ বছর ধরে ভারত জবরদখল করে রেখেছিল। বিএসএফ-এর কবল থেকে পাদুয়ার সেই ভূমি গত ১৫ এপ্রিল মুক্ত করে আনে আমাদের সাহসী বিডিআর। এর মাত্র ৩ দিন পরে ১৮ জানুয়ারী পাদুয়া দখলের প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে কুড়িগ্রাম জেলার বড়াইবাড়ী এলাকায় বিএসএফ অতর্কিত আক্রমণ চালায়। বাংলাদেশ সীমান্তের অভ্যন্তরে এ অবৈধ অনুপ্রবেশ ও হামলার মোকাবেলা করে সাহসী বিডিআর। এতে অন্তত ৩ জন বিডিআর সদস্য শহীদ হন আর কমপক্ষে ১৬ জন বিএসএফ সদস্য নিহত হন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ার মধ্যে এ নিয়ে গত ২২ এপ্রিল দিবাগত রাতে টেলিফোনে সংলাপ হয়। এই সংলাপে শেখ হাসিনা এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এই দুঃখ প্রকাশ নিয়ে এখন প্রশ্ন ওঠেছে—বাংলাদেশ অভ্যন্তরে ভারতীয় বিএসএফ-এর অনুপ্রবেশ, বাংলাদেশের সীমান্ত চৌকি ও জনগণের ওপরে হামলা চালিয়ে তো অপরাধ করল বিএসএফই, এজন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে তা ভারতীয় কর্তৃপক্ষকেই, উল্টো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দুঃখ প্রকাশ কেন? দেশের ভূখণ্ড রক্ষা করতে গিয়ে, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা করতে গিয়ে জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিডিআর কি কোন অন্যায়-অপরাধ করেছে?

ভারত একটি বড় দেশ, ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দান করেছে অথবা ভারতের দয়া ছাড়া ক্ষমতায় থাকা সম্ভব নয়—এইসব কারণে যদি নতজানু নীতি অনুসরণ করতে হয় তাহলে বিবেচনায় আনতে হবে এই সকল ঘটনায় বাংলাদেশের জনগণের প্রাপ্তি কতটা। ভারত একটি বড় দেশ, বিশ্বের অন্যতম পারমাণবিক শক্তিধর। এই দেশটির কোন প্রতিবেশীর সাথেই

www.pathagar.com

সুসম্পর্ক নেই। তবে বাংলাদেশের সাথেই তার সমস্যা সর্বাধিক। সীমান্ত, পানি এবং পুশ-ইন সমস্যা এগুলোর অন্যতম। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর থেকেই। সেই সমস্যার আজ পর্যন্ত কোন সমাধান হয়নি বরং আরও বেড়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের স্থল সীমান্ত হচ্ছে ৪,৪২৭ কিলোমিটার। ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে বাংলাদেশের ৫১ ছিটমহলসহ ১০,০০০ কিঃ মিঃ ভারতের দখলে রয়েছে। শুধুমাত্র গত ৫ বছরের বিএসএফ অন্তত ৩ হাজারবার বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে, সাড়ে ৩শ' বার গুলী চালিয়েছে। এসব হামলায় ১৪৭ জন বিডিআর সদস্যসহ ১শ' ৪৭ ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন। অন্য এক তথ্য মতে, গত ১৬ বছরে দুই সীমান্তে সংঘর্ষ হয়েছে ৫১ বার। এতে বাংলাদেশের ৪৫ জন মারা গেছে ও আহত হয়েছে ৩৭ জন। বিএসএফ বাংলাদেশ থেকে ৩০০ বাংলাদেশী এবং অসংখ্য গরু-ছাগল অপহরণ করেছে। বার্তা সংস্থা ইউএনবির খবরে বলা হয়েছে গত ২৫ বছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর হাতে ৪১৫ জনের মত বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিহত বাংলাদেশী নাগরিকের লাশ ফেরত দেয়া হয়নি। এদিকে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত জুড়ে এখনো রয়েছে রেড এলার্ট তথা সর্বোচ্চ সতর্কতা। বিবিসি বলছে ফেনী-করিমগঞ্জ সীমান্তসহ বিতর্কিত সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় ব্যাপক প্রস্তুতি থাকলেও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে 'উত্তেজনা' প্রশমনে সীমান্ত থেকে বিডিআর প্রত্যাহার করা হয়েছে। গঙ্গার পানিসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে পানিশূন্য মরুভূমিতে পরিণত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বৃহৎ প্রতিবেশীর দাবী এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাদানই বাংলাদেশ গ্রাসের ভারতীয় পুঁজি। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে বাংলাদেশের নিজস্ব লড়াইয়ের ভারত যে কৌশলগত কারণে বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়েছে সে সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীও বাংলাদেশকে সমর্থন সম্পর্কে নানামত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান প্রেক্ষিতে সে কথা না উঠালেও শুধু এইটুকু বলা যায় যে, 'সীমান্তের ওপারে ভারত' ৭৪-এরপর থেকেই যে সচেতন দৃষ্টি রাখছিল' '৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধে সমর্থন তারই অংশ। কিন্তু সে যাই হোক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থন খাঁটো করে দেখার কোন কারণ নাই বিধায় আমদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ জাতি তা স্বীকার করে প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশীরা অকৃতজ্ঞ নয়। কিন্তু তাই বলে এই সমর্থন দানের অর্থ বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতি সহ্য করা নয়।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় কারা টিকে থাকবে বা থাকবে না এ আলোচনা নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রক্ষমতার সাথে সীমান্ত সংঘর্ষ আলোচনা করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হতে পারে বিধায় রৌমারী সীমান্ত আলোচনায় ফিরে যাওয়া যায়। এ সংক্রান্ত প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, পাদুয়া সংলগ্ন রাস্তা নির্মাণে বিডিআর আগেভাগেই বাধা প্রদান করেছিল। এ ছাড়াও বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলের ভূমি ভারতীয় দখলমুক্ত করা নিয়েও ভারতে দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কোন ফলাফল হয়নি। উপরন্তু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকার জন্য বলা হলেও ভারতীয় পক্ষ কিন্তু যথারীতি যা করার তাই করেছে অর্থাৎ বাংলাদেশের ভূমি দখলে চেষ্টা করছে। বরাইবাড়ী এলাকায় কৌশলগত লড়াইয়ে ভারত বাংলাদেশীদের পরাস্ত করতে চাইলেও ভারতীয় আক্রমণকারীরাই নাস্তানাবুদ হয়েছে। পাদুয়া রৌমারী থেকে রাজধানী পর্যন্ত জনগণ সীমান্ত জয়ের জন্য বিডিআরকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এবং বাহবা দিয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধে বাংলাদেশ কি আসলে জিতেছে? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হলো ভারতের বেসামরিক সমর বিশেষজ্ঞ রবিরিখির একটি বইয়ের সূত্র ধরে। চটি ধরনের বইটির বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'যে যুদ্ধে ভারত কখনো জিতেনি'। বইটিতে ভারত-চীন, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থেকে শুরু করে

www.pathagar.com

'৭৫ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ভারতীয় ভূমিকা পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন কোন যুদ্ধেই ভারত জয়ী হয়নি। তাই বুদ্ধি দিয়ে ভারতকে জয়ী হওয়ার পরামর্শই তিনি দিয়েছেন ঐ বইতে। ভারতের পারমাণবিক শক্তি অর্জনের আগে লিখা এই বই। এখন লিখা হলে এই বইতে বর্তমান পরিস্থিতিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হতো বলা যায় না। তবে বাংলাদেশে বসে মনে হয়, বাংলা-ভারত সীমান্ত যুদ্ধে আগ্রাসী ভারতীয় অধিক পরিমাণ সৈন্য নিহত হওয়ার পরেও কূটনীতিতে তারাই জিতেছে। বাংলাদেশ যদি জিততো তাহলে তো অন্তত প্রধানমন্ত্রী একবার হলেও সীমান্ত সফর করতেন, সীমান্তযুদ্ধ জয়ীদের প্রশংসা করতেন। নিদেনপক্ষে বিডিআর প্রধানকে ডেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেন। বাস্তবে মনে হচ্ছে, তার উল্টোটা ঘটতে যাচ্ছে। ক্রিকেট যুদ্ধে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভের পর প্রধানমন্ত্রী যতটুকু উল্লসিত হয়েছিলেন এবারে সম্ভবত তারচেয়ে অনেক বেশী ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছেন। শুধু তিনিই নন তাঁর সাথে যারা দোহার আছেন তারাও সেই একই বোলে অন্য কিছু খোঁজার ধান্দায় আছেন। নাকে নানা গন্ধ শুঁকে শুঁকে এমন অবস্থা হয়েছে যে, গোলাপের গন্ধে এখন আর রুচি ধরে না। এই শ্রেণীর পক্ষ থেকেই বাংলাদেশে একটি ভারসাম্যমূলক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার আপত্তি তোলা হয়েছে বহুবার। এদের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী নামক দেশপ্রেমবিবর্জিত কতিপয় পরগাছা মন্তব্য করেছেন, 'ভারতের সাথে আমাদের ৯০% সীমান্ত। আমার মনে হয় না বাজেটের পুরো টাকা খরচ করলেও সম্মুখযুদ্ধে আমরা জিততে পারবো।' ঐ সেমিনারে এমনও মন্তব্য করা হয়েছে, 'সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে আগামী ১০ বছরের জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্প্রসারণ স্থগিত এবং একটি সময়ের জন্য কোন অফেনসিফ অস্ত্র কেনা মুলতবী করা উচিত।' বাজেট আসলেই সেনাবাহিনী প্রসঙ্গে যেসব আলোচনা এরা করে থাকেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভারতীয় জুজুর ভয়, ইসলাম ধ্বংসের ভয় দেখিয়ে প্রগতি ঠেকাবার জন্যই সেনাবাহিনীর বাজেট বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

আসলে এ মহল সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তাকেই খাটো করে দেখতে চান। তারা দেশ রক্ষার ইতিবাচক অথবা ভৌগোলিক দিক থেকে এ প্রশ্নটি তুলেন না। যদি তাদের মাথায় দেশরক্ষা বিষয়টি থাকতো তাহলে যুদ্ধ অথবা শান্তি যে কোন সময়েই সেনাবাহিনীর যে প্রয়োজনীয়তা আছে এ কথা বিবেচনায় আনতেন। ধরা যাক চীন-ভারত যুদ্ধের কথা। '৬২ সালের যুদ্ধে ভারতের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল মাউন্টেন ডিভিশন না থাকা। গত ৩৯ বছরের চীনের সাথে একবার যুদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও ৬ থেকে ৭টি মাউন্টেন ডিভিশন তৈরী করে রেখেছে ভারত। বাংলাদেশ কোথা থেকে আক্রান্ত হতে পারে এ ধারণা থেকেই বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি উপেক্ষা করে ঐ সকল বুদ্ধিজীবীরা ভারতের পরিবর্তে চীন-পাকিস্তানকে শত্রু ভেবে মাতামাতি করছেন।

সরকারও মাঝে মাঝে প্রতিরক্ষার বিষয় নিয়ে চটকদার কথাবার্তা বলে থাকেন। বর্তমান আমলে সোভিয়েতে নির্মিত সুপারসনিক মিগ-২৯ ক্রয় করে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সরকার খুবই তৎপর। মিগ-২৯ কেনার সময় সাবেক সেনাপ্রধান লেঃ জেঃ মাহবুবুর রহমান প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর কথা যদি বাদও দেয়া যায় তাহলেও এ প্রশ্ন তোলা অন্যায় নয় যে, যে যুদ্ধাস্ত্রের পার্টস ভারত থেকে কিনতে হবে সে অস্ত্রে আমাদের লাভ কি? সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সীমান্ত সংঘর্ষ এই সত্যই কি প্রমাণ করে না যে, চীন, পাকিস্তান, আমেরিকা কোনটিই নয় বরং ভারত ও বার্মা থেকেই রয়েছে আমাদের ভয়। সুতরাং প্রতিরক্ষা নীতির প্রশ্নে আন্তরিকতা এবং দেশপ্রেমই যে বড় কথা এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

www.pathagar.com

পারমাণবিক শক্তিধর ভারত বাংলাদেশের হাতে মার খেয়েছে এ কথা ভারতীয়দের কাছে স্বীকৃত হওয়ার পর ভারতে বাংলাদেশের পতাকা পোড়ানোর হিড়িক পড়ে গেছে। ভারতীয় সংসদে বয়ান করতে গিয়ে ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সীমান্ত সংঘর্ষের মূল কারণ নিয়ে কোন বক্তব্য না দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লাশ বিকৃতির অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সরকারীভাবে এই পরিস্থিতি নিয়ে কোন বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়নি। এমনকি সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমগুলোতেও এ সংক্রান্ত কোন খবর পরিবেশন করা হয়নি। যে সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দেশের আধিপত্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য হরহামেশাই জাতীয় প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করছেন, হরতাল হলে হরতালের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন, অথচ গোটা বিশ্বে যে খবর স্থান পেল বাংলাদেশ সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমে তার কোন স্থান হলো না। দেশ বাঁচলে তো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। এই কথায় সম্ভবত দেশের বিরোধী দলগুলোও খুব গুরুত্ব দিতে চান না। দেশে বর্তমানে সরকার বিরোধী যে আন্দোলন চলছে তাকে ইতিপূর্বে যে দুই ধারায় বিভক্ত করা হয়েছিল। তা হলো আধিপত্যবাদের পক্ষ এবং বিপক্ষ। বিরোধী দল থেকে সরকারকেই আধিপত্যবাদের দোসর হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এই অভিযোগ যদি সত্যই হয়ে থাকে তাহলে তা প্রমাণের জন্য বর্তমান সময়ই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত। কিন্তু বিষয়টি বিরোধী দল কতটা গুরুত্বের সাথে দেখছেন সে প্রশ্নও অমূলক নয়। বাংলাদেশের ভিতরে এবং বাইরে যখন আগ্রাসী শক্তি একাত্ম হয়ে দেশের অভ্যন্তরে নির্যাতত-নিপীড়ন চালাচ্ছে ঠিক তখনই সীমান্তের ওপার থেকে আগ্রাসন শুরু হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দল খুব শক্তিশালীভাবে জনগণকে সাথে নিয়ে এগুচ্ছেন—এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। বাংলাদেশের কোন কোন সংবাদপত্র ইতিমধ্যেই সীমান্ত সংঘর্ষকে দুঃখজনক বলেও বর্ণনা করেছে। কোন কোন রাজনীতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাংলাদেশকেই কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের পরমার্শ দিয়েছে। চার দলীয় জোটের পক্ষ থেকে সরকারী ভূমিকাকে নতজানু নীতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে তবে কোন প্রতিবাদ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়নি।

অন্যায়ভাবে ভারতে যেভাবে বাংলাদেশের পতাকা পোড়ানো হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সরকারীভাবে তার কোন প্রতিবাদ জানানো হয়নি। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায় যে, সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় টিকে থাকার লক্ষ্যেই আধিপত্যবাদীদের তোষণ করে চলেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানে যে জনগণকে ক্ষমতার উৎস হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যাদের জান-মাল ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার্থে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব যে সরকারকে দিয়েছে তারা যদি জনগণের চেতনার সাথে একাত্ম না হয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন অথবা বিরুদ্ধে অবস্থান নেন তাহলে অবশ্যই সেই ভূমিকাকে সঠিক বলে মনে করা যাবে না। বর্তমান প্রেক্ষিতে গোটা বাংলাদেশের জনগণ একাকার হয়ে গেছে। সর্বত্র আওয়াজ উঠেছে সীমান্ত রক্ষা কর, ভারতীয় আগ্রাসনকে রুখে দাঁড়াও। সে বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারতের কাছে দুঃখ প্রকাশই দুঃখজনক নয় কি? বাংলাদেশের জনগণ আজ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক দল যারা আধিপত্যবাদকে সমর্থন করছে আর অন্য দল যারা আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করছে।

মোট কথা দেশের স্বাধীনতাই আসল। স্বাধীনতা গেলে সবই যাবে। আর এ কারণেই বর্তমান প্রেক্ষিতে দেশে এমন একটি প্রতিরক্ষা নীতি আবশ্যিক হয়ে পড়েছে; যার মূলকথা হবে আক্রান্ত হলে জনগণ ও তাদের সশস্ত্র বাহিনী একত্রে নিজের অস্ত্রে বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে আক্রমণকারী শত্রুকে ঠেকাবে এবং তাকে পরাভূত করবে। নিজ অস্ত্র তৈরীতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোন ধরনের শৈথিল্য অথবা শৈথিল্যের পক্ষে কাজ

www.pathagar.com

করার অর্থই হবে দেশের আজাদী ভারতের হাতে তুলে দেয়ার পক্ষে কাজ করা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমান সরকার অথবা অনুরূপ কোন সরকারের পক্ষে কার্যকর প্রতিরক্ষা নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর এ জন্য প্রয়োজন নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় একটি দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন সরকারের প্রতিষ্ঠা।

আটত্রিশ

প্রথম প্রহর কেটেছে পুরানা পল্টন এলাকায়। তার দিনভর টানটান উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম ঐ সময়ের জন্য অপেক্ষা শুধু আমার একার ছিল তা নয় অনেকেই প্রতীক্ষায় ছিলেন ঐ সময়ের জন্য। কারণ এটি ছিল বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক বিশেষক্ষণ। অসময়, সময়ের মধ্যে যে ব্যবধান নির্ণয় করা যায় ঐ সময়টা ছিল ঠিক তদ্রূপ। আমরা ক'জন সাংবাদিক বন্ধু দু'এক দিন আগে থেকেই পরিকল্পনা করে নিয়েছিলাম ঐ সময়টা পুরানা পল্টন এলাকায় থাকবো বলে। কারণ ঐ প্রথম প্রহরে চারদলীয় জোটের জনসভা এবং মিছিলের তারিখ ছিল।

যথারীতি সন্ধ্যার পর প্রেসক্লাবে আড্ডায় থাকা অবস্থায় মনে পড়ল সরকারের শেষ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ দেবার কথা। সাথে সাথে ভিড় জমালাম টেলিভিশনের সামনে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনার পর মনের অভিব্যক্তি প্রাসঙ্গিক কারণে চেপে রেখে ভাবতে লাগলাম পুরানা পল্টন এলাকার কথা। রাত ৯টার দিকে সংসদ অধিবেশন শেষ হবার কারণে পরিস্থিতি যে ভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে তা আঁচ করছিলাম। কারণ ১৪ জুলাই-এর প্রথম প্রহরে জনসভার প্রধান আকর্ষণ ছিল সংসদমুখী মিছিল। আমরা ধারণা করে নিলাম মিছিল হয়ত আর হবে না তবু সভা এবং জনতার প্রতিক্রিয়া দেখা দরকার। এই মাঝরাতের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে বিশেষ করে নগরে যুক্ত হয়েছে কয়েক বছর থেকে। এ নিয়ে অন্তত তিনটি প্রথম প্রহর আমাদের কেটেছে রাজধানীর প্রধান সড়কগুলোতে, বিশেষ করে সচিবালয়, প্রেসক্লাব, পুরানা পল্টন এলাকায়। প্রথমটি কাটে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের শেষ দিন। বিবিসির খবরে যখন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগের খবর ঘোষণা করা হয় তখন রাজধানীতে শুরু হয়েছিল বিজয় উৎসব। পদত্যাগের কয়েকদিন আগে থেকেই রাজধানী হয়ে উঠেছিল অশান্ত। এই অশান্ত পরিবেশকে শান্ত করার জন্য পর্দার অন্তরালে যাই ঘটুক না কেন পদত্যাগ ঘোষণায় নগর জীবনে নেমে এসেছিল আনন্দের বন্যা। ঐ আন্দোলনে কাদের বিজয় হয়েছে এ নিয়ে নানা প্রশ্ন এখনও আছে। কারণ বিজয় মিছিলগুলো দেখে মনে করার কোন উপায় ছিল না যে, ঐ আন্দোলনের প্রধান শক্তি ছিল আধিপত্যবাদ বিরোধীরা। দীর্ঘ নয় বছরের এরশাদ শাসনামলের ইতিহাস পর্যালোচনা আজকের বিষয়বস্তু নয় তবু এটুকু বলে রাখা ভালো যে, রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্ষমতা বা অক্ষমতা এই আন্দোলনের প্রধান উপাত্ত ছিল না। গণতন্ত্র পাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আন্দোলন হলেও আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিল অক্ষশক্তির বিরোধিতা। বলার অপেক্ষা রাখে না, তৎকালীন সামরিক শাসনকে আওয়ামী লীগ কর্তৃক সমর্থনের কারণেই গোটা ন'বছরের পরিস্থিতি ভিন্ন আকার ধারণ করেছিল। বিশেষ করে '৮৬-এর নির্বাচনে এই সত্য আরও প্রকট করে তোলে যে দু'পক্ষের মধ্যে সত্যিই একটি গোপন আঁতাত আছে। যদিও এরশাদ সাহেবের শাসনামলে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো এবং ভারতীয় পত্র-পত্রিকা সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে মৌলবাদী বলে গালি দিয়ে তার বিরোধিতায় সক্রিয় হয়ে উঠে। এরশাদ সাহেবের আমলে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার বিরুদ্ধে ভারতীয় আনন্দবাজার

www.pathagar.com

পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিরূপ সমালোচনা করা হয়। তবু সব মিলিয়ে এটাই সত্য যে, এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক জনসমর্থের লাভ করেছিল।

এরশাদ সাহেবের পদত্যাগের সেই রাতের পর আরও দু'টি প্রথম প্রহর তথা মধ্যরাত দেখার সৌভাগ্য এই জাতির হয়েছিল। দ্বিতীয়টি হয়েছিল বিএনপির পদত্যাগের সময়। বিএনপি শাসনামলের শেষদিকে বিশেষ করে ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের পর দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। আওয়ামী লীগ এবং সরকারবিরোধী জোটের টানা হরতালে দেশের পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, প্রায় সকলের মধ্যেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল, সরকারের পদত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। কারণ ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন করার সময়ই এ ধারণা সকলের মধ্যে জন্মেছিল যে, কেবলমাত্র কেয়ারটেকার সরকার গঠন করার জন্যই একটি নামমাত্র নির্বাচন করা হচ্ছে। চতুর্থ সংসদ থেকে আওয়ামী এবং সরকার বিরোধীদের টানা অনুপস্থিতি এবং তৎজনিত শূন্যতার কারণে তৎকালীন বিএনপি সরকার সাংবিধানিক সঙ্কটে পড়েছিল। সে কারণে একটি নির্বাচন করা জরুরী হয়ে উঠেছিল। যদিও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিএনপি শাসনামলের ঐ ভুলের কারণ তাদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা। বিশেষ করে বিএনপির একশ্রেণীর নেতার সমর্থনে ও মদদে সে সময়ে গড়ে উঠা গণআদালত গঠনের কারণে ঐ সরকার যে গণবিচ্ছিন্ন এবং নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল সে কারণেই তাকে রাজনৈতিক মাসুল দিতে হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গণআন্দোলন পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর বিএনপির নীতি-নির্ধারকসহ অনেকেই এমন ধারণা পোষণ করতে থাকেন যে, বিএনপির প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের কর্মসূচী তারা বাস্তবায়িত করলে আওয়ামী লীগ হয়ত রাজনৈতিক এতিম হয়ে পড়বে। কিন্তু তারা এ সত্য অনুধাবনে ব্যর্থ হন যে, বিএনপি আওয়ামী লীগের কর্মসূচী গ্রহণ করলে প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ সমর্থনের মাত্রাই বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত বিএনপির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই অপরিপক্কতার সুবাদেই আওয়ামী লীগ তথা এই গোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে এতটাই সক্রিয় হয়ে উঠে যে তখন জনগণের সামনে প্রধান বিবেচ্য হয়ে দাঁড়ায় বিএনপির পদত্যাগ। কিন্তু এই পদত্যাগ কতটা গণরোষজনিত তা বলা মুস্কিল। তবে বিএনপির পদত্যাগের সময় কতিপয় আমলা নিয়ে গঠিত তথাকথিত জনতার মঞ্চে অংশগ্রহণকারী আমলাদের সম্পর্কে বিএনপির দায়িত্বশীল নেতাদের বক্তব্য যে অপরিপক্ক শাসকদের মতই ছিল সেকথা এখন আর না বললেও চলে। সেই সাথে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিএনপির শাসনামলে সেনাবাহিনী নিয়ে তারা এমন এক আত্মঘাতী খেলায় মেতে উঠেছিল যাকে দলীয়করণের চেয়েও জঘন্য বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে আরও উল্লেখ করা দরকার যে, বিএনপি সরকারকে জনগণ দেখতে চেয়েছে প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনের সাথে তুলনা করে। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এদেশের এ যাবতকালের সর্বাধিক জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। জিয়াউর রহমানের শাসন বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তিনি সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয় করে দেশপ্রেমভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও এর পেছনে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন বাংলাদেশের রাজনীতির বন্ধ্যা সময় '৭২-'৭৫ সালের পর। ঐ সময়ে গণতন্ত্রের কবর দিয়ে যে বাকশালী শাসন কায়েম করা হয়েছিল সেই শাসনের অবসানের পর প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমল থেকেই বর্তমান গণতান্ত্রিক ধারা চালু করা হয়। '৭২-এর সাথে '৭৫ পরবর্তী ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর দেশের প্রচলিত রাজনীতির সাথে ধর্মীয় অধিকারকে সমন্বিত করে পবিত্র

www.pathagar.com

সংবিধানে বিসমিল্লাহ যুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ঈমান, আকীদা, বিশ্বাসের সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই সংস্কারকে দেশের জনগণ সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নির্যাতন-নিপীড়ন সব ভুলে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে প্রাণঢালা সমর্থন দিয়েছিলেন। এই সমর্থনের প্রমাণ পাওয়া যায় প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিহত হবার পরবর্তী ঘটনার মধ্যে। প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হবার খবর প্রচারিত হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে শুরু হয়েছিল প্রেসিডেন্ট জিয়ার পক্ষে মিছিল এবং সর্বশেষ মানিক মিয়া এভিনিউতে বিশাল জানাযা প্রমাণ করে যে, জিয়া এবং ইসলামী মূল্যবোধের রাজনীতির সাথে এদেশের জনগণের সম্পৃক্ততা ছিল অত্যন্ত নিবিড়। প্রেসিডেন্ট জিয়ার সেই শাসনের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে '৯১-এর বিএনপির শাসনকে দেখল ভিন্ন চিত্র ভেসে উঠবে। তসলিমা নাসরিন এবং গণআদালত ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিএনপি আমলে সরকারী মহলে প্রধানত কোণঠাসা হয়ে পড়ে ইসলামী শক্তিগুলো। ফলে বিএনপির বিরুদ্ধে ইসলামী দলগুলোকে সোচ্চার হতে হয়। পর্যায়ক্রমে এই আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে বিএনপি সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। বিএনপির সেই পদত্যাগের দৃশ্য জনমনে এখনও অনেকের জাগরুক কাছে। পদত্যাগের ক্ষেত্রে বেগম জিয়ার সিদ্ধান্ত ছিল খুবই রাজনৈতিক প্রজ্ঞাপূর্ণ। তিনি সাদামাটাভাবে অথবা একটি ভাষণ দিয়ে পদত্যাগ করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে পুরানা পল্টনে জনসভা করে নিজের জনসমর্থনের যে প্রমাণ দিয়েছিলেন তার প্রভাব পড়েছিল পরবর্তী নির্বাচনে। '৯৬-এর নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হবার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলে যেতে শুরু করে। সংসদে অধিকসংখ্যক সদস্য থাকা সত্ত্বেও বিএনপি প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী শাসনের বিরুদ্ধে কোন গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। কেন পারেনি তা নিয়ে সে সময় এবং এখনও নানা মত আছে। কেউ মনে করেন, এটা বিএনপির ব্যর্থতা, কেউ মনে করেন এটা ছিল বিএনপির কৌশলগত যুদ্ধ অর্থাৎ, লোকক্ষয় না করে রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করা। প্রকৃত কি হয়েছে এবং হয়নি সে প্রসঙ্গে এখনই মন্তব্য করা সঠিক নয়। ইতোমধ্যেই চারদলীয় জোট নেত্রী ১৪ জুলাই প্রথম প্রহরে ঘোষণা করেছেন আগামী নির্বাচনে জোট দুই-তৃতীয়াংশের বেশী আসনে বিজয়ী হবে। যেভাবেই বিবেচনা করা যাক না কেন, আগামী নির্বাচনে বিজয়ের লক্ষ্যে অবশ্যই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোককে এই জোটের পক্ষে রাখতে হবে।

১৪ জুলাই প্রথম প্রহরে পুরানা পল্টনের লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে চারদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আওয়ামী সরকারের বিদায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, আওয়ামীরা ন'টার সময়েই বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, তাই আর মিছিলের প্রয়োজন নেই। সুতরাং ঐ রাতে কোন মিছিল হয়নি। জনতা ঐ দিনের মেঘ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে সমবেত হয়েছিল বেগম জিয়ার নির্দেশ পালনের জন্য। সেদিক থেকে আগামী সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার লক্ষ্যে প্রথম ভাষণ যদি প্রথম প্রহরে ঘোষণা হয়ে থাকে তাহলে সেই পুরাণ প্রশ্ন আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে যে, বিএনপি ও আওয়ামী শাসনের মধ্যে এমনকি মৌলিক পার্থক্য যে কারণে আওয়ামী লীগকে ভোট না দিয়ে বিএনপি নেতৃবৃন্দ জোটকে দিতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, গত দু'টি সরকার গঠন ও তিনটি সরকারের পদত্যাগে এদেশের ইসলামী শক্তিগুলো সক্রিয় ছিল। তারা একদিকে যেমন সরকার গঠনে সহযোগিতা দিয়েছে তেমনি সরকারের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে সরকারবিরোধী আন্দোলনও গড়ে তুলেছে। বিগত আওয়ামী বিরোধী আন্দোলনে দেশের আলেম-ওলামার ত্যাগ সবচেয়ে বেশী। এই নিগ্রহ ভোগের পিছনে আলেশ-ওলামার কোন ব্যক্তিগত লোভ-লালসা বা কোন ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব কাজ করেনি। তাঁরা আল্লাহর জমিনে

www.pathagar.com

আল্লাহর আইনের বিরোধিতাকারীদের বিরোধিতা করেছেন। আর সে কারণে এহেন নির্যাতন নেই যা তাদের বিরুদ্ধে করা হয়নি। বেগম জিয়া ১৪ জুলাই -এর প্রথম প্রহরের ভাষণে এই ত্যাগের স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত দেননি এবং তিনি নির্বাচিত হলে ইসলাম পরিপন্থী কোন আইন করবেন না এই ঘোষণাটুকুও করেননি। তবে ভাষণ শুরু করেছেন বিসমিল্লাহ দিয়ে। ইসলামের পক্ষে কথা বলা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষে নয়; বরং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ঈমান-আকীদা তথা বিশ্বাসের পক্ষে বলা এবং প্রকৃতপক্ষে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে বলা। এই সত্যটুকু যদি প্রেসিডেন্ট জিয়ার উত্তরসুরিরা অনুভব না করেন তাহলে রাজনীতি এবং নির্বাচনের মাঠে সত্যিকারে কি ঘটবে তা নিয়ে মন্তব্য করা সঠিক নয়। আওয়ামী শক্তি প্রকাশ্যতই আগামী নির্বাচনে ইসলামবিরোধী স্ট্যান্ড নিয়ে মাঠে নামার ঘোষণা দিয়েছে। সেদিক থেকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে আগামী নির্বাচনে বিএনপি নেতৃবৃন্দ জোটকে বিজয়ী হতে হলে অবশ্যই ইসলামের পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার করতে হবে।

উনচল্লিশ

অষ্টম জাতীয় সংসদের যাত্রা শুরু হয়েছে ইনশাআল্লাহ। সংসদে প্রথম অধিবেশনের নিয়ম অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলে উল্লেখ করে নির্বাচন সংক্রান্ত আওয়ামী আব্দার প্রত্যাখ্যান করে আওয়ামী পাঁচ বছরের দুঃশাসনে বিক্ষত ও বিধ্বস্ত বাংলাদেশের নাতিদীর্ঘ ফিরিস্তি তুলে ধরে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে মেদহীন ভাষণে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনমনের চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বক্তৃতায় দু'একটি বাড়তি শব্দ না থাকলে তাঁর এ ভাষণকে নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ বলে অভিহিত করা যেত। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক রীতিতে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা হয়েছে। নিন্দুকের সমালোচনা এবং ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে চারদলীয় জোট সরকারের নেতৃত্বাধীন এই যাত্রা শুভ হোক এ প্রত্যাশা প্রেসিডেন্ট-এর মত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণেরও। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে প্রেসিডেন্টের ভাষণের ধারা অনুসৃত হলেও স্বাধীন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের যাত্রা বলতে গেলে কখনই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই গণতন্ত্রের যাত্রা পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকার ও সংগ্রামকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হলেও ক্ষমতাধরদের প্রচণ্ড ও দোর্দণ্ড প্রতাপে গণতন্ত্রের শিশু প্রায় সবসময়ই মুখ ফুটে কিছু বলতে না পেরে অব্যক্ত বেদনায় গুঙিয়েছে। গণতন্ত্রের লেবাসপরা স্বৈরাচারী শাসনের নির্মম আঘাতে গণতন্ত্রের কোমল দেহ যেমন বার বার ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তেমনি ষড়যন্ত্রের জালে বার বার আটকা পড়ে মুক্তির আকুতিতে গগনবিদারী চিৎকার করেছে। নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক এই শিশু কখনই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। হয়ত বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার চেতনা, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা গণতান্ত্রিক চেতনাবোধে সম্পৃক্ত থাকার কারণেই স্বৈরাচারের কষাঘাতে পীড়িত হয়েও বার বার জেগে ওঠার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্র এবং সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এর পরিণতিতে জাতীয় জীবনে যে ভয়াবহ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে সম্ভবত সে কথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক তথাকথিত গণতান্ত্রিক শক্তি একবারও বিবেচনায় আনার চেষ্টা করছে না। অথবা হয়ত বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যই এই অবস্থার সৃষ্টি করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

অষ্টম জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশন জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগকে সংসদে যোগ দেয়ার আহবান জানিয়ে বলেছেন, আমরা সকলের সহযোগিতা চাই। প্রধানমন্ত্রী যে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন এটা গণতান্ত্রিক রীতি, গণতন্ত্রের শিক্ষা। কারণ, সংসদকে কার্যকর এবং প্রাণবন্ত রাখার জন্য যে শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে যেস ক্ষেত্রে বিরোধী দলবিহীন শক্তিশালী সংসদ কল্পনা করাও যায় না। প্রধানমন্ত্রী যখন সংসদে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ঠিক কি করছিল তা জানা না গেলেও ঐদিন বিকেলে পল্টনে এক বিশাল জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তাঁর ভাষণে বিদেশীদের হাতে গ্যাস তুলে দেয়ার বিরোধিতা করে বলেছেন, 'বিদেশীদের হাতে গ্যাস সম্পদ তুলে দিলে জনগণই তার বিচার করবে। জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।'

প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী দু'জনের বক্তৃতাই পরের দিন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিরোধী দলীয় নেত্রীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের যে বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে এক্ষুণি আলোচনা না করে সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের দিকে চোখ ফেরানো যেতে পারে। ঐ সংসদে বিরোধী দল ছিল বিএনপি। ১১৬ আসন নিয়ে বৃহত্তর এই বিরোধী দল সংসদের প্রথম অধিবেশনে যোগ দিয়েছিল, তবে তারা সংসদের বিভিন্ন কক্ষে স্পীকারের অনুমতি ছাড়াই মরহুম শেখ মুজিবরের ছবি উত্তোলন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসসহ তিনটি বিষয়ে বিএনপি সদস্যদের আনীত বিশেষ অধিকার ও মূলতবি প্রস্তাব সম্পর্কে স্পীকারের কাছে জানতে চাইলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় এবং বিএনপি ওয়াকআউট করে। ঐ সংসদের নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করলেও তিনি বলেন, আমরা বিরোধী দলে থাকলেও জনগণের জন্য কাজ করব। পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, তৎকালীন বিরোধী দল (আ'লীগ)-এর কাছ থেকে সহযোগিতার বদলে পেয়েছি ধাক্কা, ফাইল ছুঁড়ে মারা, জুতা প্রদর্শন এবং এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে না দেয়ার হুমকি। বেগম জিয়া অবশ্য গণতন্ত্রের স্বার্থে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, আমরা কাউকে ধাক্কার রাজনীতি শেখাতে চাই না। '৯৬-এর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের শাসন পর্যালোচনা করলেও সম্ভবত এ কথা সত্যে পরিণত হবে যে, হয়তো গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থেই বিএনপি আওয়ামী লীগকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা বা এমন কোন কর্মসূচী প্রণয়ন করেনি যা ঐ শাসন আমলে অগণতান্ত্রিক বলে বিবেচিত হতে পারে। গণতন্ত্রে উত্তরণের স্বার্থেই হয়তো একটি নির্বাচনের সময় পর্যন্ত বিএনপি অপেক্ষা করেছে। যদিও শুধু বিএনপি নয়, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে চারদলীয় জোট নির্বাচন করেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, বিএনপি চেয়ারপার্সন সংসদের প্রথম অধিবেশনে গণতন্ত্র রক্ষার যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা রক্ষার মানসিকতা হয়তো তিনি প্রদর্শন করেছেন। '৯৬-পরবর্তী ৫ বছরে বিএনপি সংসদে যোগ না দিলেও সংসদকে অকার্যকর করার মতো পরিবেশ তৈরী করেনি এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হবার সুযোগ দিয়ে '৯১-এর বিরোধী দলের তুলনায় দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছিল, অথচ '৯১-এর সংসদ মেয়াদ পূরণ করতে পারেনি আওয়ামী সদস্যদের জন্যই। তাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতি সংসদ পরিচালনায় সাংবিধানিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের দিনে সংসদে না গিয়ে আওয়ামী লীগ রাজপথে জনসভা করেছে। অন্যদিকে সপ্তম জাতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন দলের প্রধানমন্ত্রী হয়েও উদ্বোধনী ভাষণে তিনি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নিয়ে সমালোচনায় মুখর ছিলেন। ঐ ভাষণে ষষ্ঠ সংসদের নাম নেয়া ঠিক

www.pathagar.com

কি বেঠিক এ বিতর্কেই তিনি জড়িয়ে ছিলেন বেশী সময়।

বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রথম সংসদে মূলত আওয়ামী লীগের ছিল ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ সত্ত্বেও ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে ;৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী বাকশাল নামক এক দল গঠন করে সংসদীয় রাজনীতি তথা স্বাধীনতার চেতনায় সম্পৃক্ত গণতান্ত্রিক রাজনীতির কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছিলেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রধান। সেই পেরেক তুলে গণতন্ত্রকে রাহুমুক্ত করতে শুরু হয় নব প্রক্রিয়া। ১৫ আগস্ট হয়ে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত নানা প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে সামরিক শাসন বহাল রেখে গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার মোকাবিলা করে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ধারা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে চালু করা হয়। প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতেই সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে আব্দুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ নামমাত্র আসন পাবার পরও তখন তারা ঐ সংসদে যোগ দিয়েছিল। '৯১ সালে বিএনপি সরকার যে নয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু করে সেই সংসদকে অচল করতে আওয়ামী লীগ লাগাতার সংসদ বর্জন শুরু করেছিল। '৯৬ সালের সংসদে 'কথা বলতে না দেয়ার' প্রতিবাদে বিএনপি সংসদ অধিবেশন বর্জন করেছিল। আওয়ামী নির্যাতনের প্রতিবাদে জনতার নীরব বিপ্লবে অষ্টম জাতীয় সংসদ বিএনপিসহ চারদলীয় জোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বর্জন করল—যা বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

সংসদকে পাশ কাটিয়ে যে 'বিশাল সমাবেশে' তিনি দেশাত্মবোধের পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করেছেন তা কিন্তু প্রশ্নাতীত নয়। কারণ, ১৩ কোটি মানুষের দেশে ১ কোটি লোক ঢাকায় সমবেত করে জনপ্রিয়তা প্রমাণের চেয়ে সংসদে জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় তুলে ধরাই সঙ্গত। মনে রাখা দরকার, গণতন্ত্রে রাজপথের গুরুত্ব থাকলেও একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের পর মুহূর্তে এ ধরনের সমাবেশ কোন গুরুত্ব বহন করে না। আরও মনে রাখা দরকার যে, এ রকম শত শত সমাবেশ পেরিয়ে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বাকশাল গঠন করে স্বাধীনতার চেতনায় সম্পৃক্ত গণতন্ত্রের গায়ে স্বাধীনতার চেতনাধারীরা যে কলঙ্ক লেপন করেছিল সংসদের প্রথম অধিবেমন বর্জন করে সেই কলঙ্কের উপর আরও এক পোঁচ দেয়া হল। সত্যিকার অর্থে এই ঘটনা অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড হিসেবেই বিবেচিত হবে এবং ভবিষ্যতে এই ঘটনা বাকশাল কলঙ্কের সাথে আরও একটি দাগ বলে চিহ্নিত হতে পারে।

চল্লিশ

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিএনপির শাসনামলে তার কথিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে শ্বেতপত্র প্রকাশের হুমকি দিয়েছেন সাংবাদিক সম্মেলনে। ঐ হুমকিতে তিনি আরও জানিয়েছেন যে, নিতান্ত সংযম প্রদর্শন করেই নাকি ক্ষমতায় থাকাকালে বিএনপির শাসনামলের শ্বেতপত্র প্রকাশ করেননি। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা কথার পৃষ্ঠে কথা নাকি অন্য কিছু অথবা আদৌ এর কোন সারবস্তু আছে কিনা তা বুঝতে হয়তো আর একটু সময় নেবে। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালীন এমন অনেক কথা বলেছেন যা শুনতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও তার কাছে এসব কথার কোন গুরুত্বই ছিল না। যেমন—তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে বলেছিলেন, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সম্পত্তির হিসাব নেবেন, নেননি। ঐ সময়

www.pathagar.com

শেষ ওমরাহ সম্পন্ন করে পবিত্র নগরী মদীনা থেকে যখন ক্ষমতা ছাড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন, সে তারিখে করেননি। তার ক্ষমতা ছাড়ার শেষ দিনগুলোর দিকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশকে ১ নং দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে উল্লেখ করার পর তিনি ঘোষণা করেছিলেন ট্রান্সপারেন্সির বিরুদ্ধে মামলা করবেন, করেননি। তিনি বলেছিলেন, সন্ত্রাসী আমার দলের হলেও রেহাই নেই, অথচ তিনি দলীয় সন্ত্রাসীদের এবং সন্ত্রাসের গডফাদারদের গ্রেফতার না করে নির্বাচনী প্রচারণার সময় ফেনী ও লক্ষ্মীপুরের সন্ত্রাসের গডফাদারের নাম উল্লেখ করে মন্তব্য করেছিলেন এরা আছে, থাকবে। তিনি ক্ষমতায় যাবার আগে কখনও বলেননি যে, ক্ষমতায় গিয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকিদা ধ্বংসের চেষ্টা করবেন অথবা দেশের আলেম-ওলামা, ইমাম-মোয়াজ্জিনরা তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে; কিন্তু তার শাসনের ৫ বছরে তাই হয়েছে। এমনকি তার শাসনামলে পবিত্র ফতোয়ার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রায় ঘোষিত হলেও জনগণের অর্থে পরিচালিত এটর্নি জেনারেল কো ও দাঁড়িয়ে ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য দেননি। বলার অপেক্ষা রাখে না আওয়ামী লীগ প্রধান ঠিক কোন কাজটি করার জন্য বলছেন অথবা না বলেই কোন কাজটি করে ফেলবেন তার কোন ঠিক নেই। এ ব্যাপারে তিনি ছাড়া অন্য কেউ খাঁটি মন্তব্য করতে পারবে বলেও মনে হয় না।

আওয়ামী সমালোচকরা এবং আওয়ামী রাজনীতি বোদ্ধারা সাধারণত একটি কথা বলে ও লিখে থাকেন যে, আওয়ামী লীগ পজিশনের চেয়ে অপজিশনে ভাল খেলে। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে শাসন ভাল না করলেও গোলমাল বাধাতে নিশ্চয়ই আওয়ামীরা ব্যর্থ হবে না। ইতোমধ্যে দলটির রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়নে নানা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনী ফলাফল প্রচারিত হবার সাথে সাথেই নির্বাচন প্রত্যাহার ও সংসদে যাবার যে ঘোষণা তিনি দিয়েছিলেন আস্তে আস্তে এখান থেকে পিছু হটে আন্দোলনের দিকে হাঁটি হাঁটি পা করে এগুতে শুরু করছেন। সংসদের সদস্যপদ ধরে রাখার প্রয়োজনে শপথ নিয়েছেন তবে সংসদে না গিয়ে অধিবেশনের দিন জনসভায় ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। এমনকি উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দু'রকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি। বলার অপেক্ষা রাখে না, রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণে আঁটঘাট বাঁধা এবং কোমরের শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাজার পরীক্ষার জন্য ময়দানে নামার যে চেষ্টা তিনি করছেন তার অংশ হিসেবেই আপোষ ও আন্দোলন সম্ভবত এই নীতি তিনি গ্রহণ করেছেন বিধায় শ্বেতপত্র প্রকাশেরও হুমকি দিয়ে ফেলেছেন। যদি তিনি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে পারেন অথবা করতে পারতেন তাহলে হয়ত জনগণ জানতে পারতেন বাংলাদেশে শাসকদের মধ্যে কারা সবচয়ে বড় সন্ত্রাসী এবং দুর্নীতিবাজ। '৯৬ সালে বিএনপি সরকারের পতনের কারণ হিসেবে যতটা দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অভিযোগ ছিল তার চেয়ে বড় ছিল ষড়যন্ত্রের অক্টোপাস। আর আওয়ামীদের প্রত্যাখ্যানের পিছনে কাজ করেছে তাহলে জনগণের ঘৃণা। অক্টোবরের নির্বাচনে জনগণের সম্মিলিত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, কোন দল এবং কোন দলের নেতারা অধিকতর সন্ত্রাসী। জোট সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১০০ দিনের যে কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল আওয়ামী দুঃশাসনের শ্বেতপত্র প্রকাশ। জাতি আশা করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই শ্বেতপত্র প্রকাশিত হবে। তবে শ্বেতপত্র বা অন্য যা কিছুই প্রকাশ করা হোক না কেন, তা কখনই কোন শাসনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ হতে পারে না; বিশেষ করে তা যদি ফ্যাসিবাদী ও একনায়কবাদী শাসকের হয়। কারণ, এই ধরনের শাকরা লিখিতভাবে যা কিছু বলেন তার চেয়ে বেশী বলেন মুখে মুখে। এ ধরনের শাসকরা দেশ পরিচালনা করেন এমন এক সন্ত্রাসী ব্যবস্তায় যার ফলে জনমন এবং প্রশাসনে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে অবস্থায় বড় কর্তাদের নির্দেশের যৌক্তিকতা প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না। এ ধরনের শাসনের ভীতি সাধারণ এবং স্বাধীনচেতা মানুষের মনে

www.pathagar.com

এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যা তার ব্যক্তি জীবনকে বিষিয়ে তোলে এবং জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ। সরকারের এই নির্যাতনের অন্যমত শিকার ছিলেন মরহুম আকবর ইমাম। পেশাগত জীবনে তিনি একজন দক্ষ এবং দেশপ্রেমিক সাংবাদিক ছিলেন। তিনি হঠাৎ করেই সেদিন সকালে আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। ক্লাবের বন্ধুরা তার এই মৃত্যুকে মৃত্যু না বলে হত্যা বলতেই বেশী আগ্রহী। যারা আকবর ইমামকে জানেন তারা সকলেই একমত হবেন যে, গত ৫ বছরে সম্ভবত তিনি সেই সব দেশপ্রেমিক সাংবাদিকদের একজন; যারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে আওয়ামী দুঃশাসনের নানা চিত্র তুলে ধরেছিলেন নির্লিপ্তভাবে। তার প্রধানতম কর্মস্থল ইংরেজী সাপ্তাহিক হলিডেতে নামে-বেনামে যে কয়টি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তিনি প্রকাশ করেছিলেন তার মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। এমনকি বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও তার কোন কোন রিপোর্টের উপর ইতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন। ধানমণ্ডি থানায় ঢুকে তৎকালীন ডাক ও তারমন্ত্রীর ছেলে আসামীদের প্রহারের যে বিবরণ তিনি প্রকাশ করেছিলেন সে সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমেদ ঐ রিপোর্টের উল্লেখ করে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট যা-ই করে থাকুন না কেন, আকবর ইমামের জীবনে সেই থেকে শুরু হয় মানসিক নির্যাতনের নানা কৌশল। ঐ নির্যাতনের এমন বিবরণও পাওয়া গেছে যে, তিনি হয়ত একাকী কোন নির্জন এলাকায় রিকশা দিয়ে চলছেন অমনি সরকারী কোন বাহিনীর লোকেরা সাদা পোশাকে রিকশায় উঠে পরে তাকে অকথ্য গালিগালাজ করে ভয় দেখিয়ে সন্ত্রস্ত করে ফেলতেন। পরিস্থিতি এতই গুরুতর আকার ধারণ করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়া তার ছেলেটির স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। মেয়েটিকে তিনি স্কুলে নিয়ে যেতে পারতেন না। দহন ও যন্ত্রণার শেষ পরিণতি হিসেবে একটি অসহায় পরিবারকে দেশ ও সমাজের হাতে ছেড়ে দিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন তিনি।

আকবর ইমামের মত এ ধরনের মানসিক নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছে হয়ত দেশের অগণিত নাগরিক। আওয়ামী সন্ত্রাসের কাছে মাথানত না করার অপরাধে দেশের হাজার হাজার মানুষ যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে. তেমনি পঙ্গু হয়েছে অনেকের জীবন। ধীরে ধীরে উঠে আসছে এসব বিবরণ। ৫ বছরের মৃত্যু উপত্যকার ফেনীর নির্যাতন সম্পর্কে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, সেখানে সাবেক সরকার দলীয় সংসদ সদস্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে জীবন দিতে হয়েছে ১২০ জনকে। এমন কি হত্যা করার পরও কবরে বোমা মেরেছে সন্ত্রাসীরা। আস্তে আস্তে হয়ত গোটা বাংলাদেশের মৃত্যু উপত্যকার চিত্র ফুটে উঠতে থাকবে; ঐ শাসনামলে গোটা দেশ এবং প্রশাসন কিভাবে তাদের কৃতদাসে পরিণত হয়েছিল। তার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে বাংলাদেশ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন-এর একটি চিঠিতে। চলতি বছরের জুন মাস অর্থাৎ আওয়ামী সরকারের ক্ষমতা ছাড়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ব্যাটালিয়নের ডিআইজি মঈনউদ্দিন চিশতী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বলা হয় যে, "খুলনাস্থ এপিবিএন-এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফান্ডে বৃহত্তর বরিশাল জেলার সদস্যদের নিয়োগ না দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। তিনি ঐ চিঠি লিখেছেন পুলিশ হেড কোয়ার্টারের এআইজি (সেল) মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে। দেলোয়ার হোসেন তার নোটে উল্লেখ করেন যে, পুলিশ কর্মচারীগণ বৃহত্তর বরিশাল জেলার বাসিন্দা এবং নবম এপিবিএন-এর গুরুত্বপূর্ণ ফান্ডে নিয়োজিত থেকে দলবাজি করছেন। অভিযোগ সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রমাণিত না হলেও টাকা গ্রহণের জনশ্রুতি আছে। খুলনাস্থ এপিবিএন-এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফান্ডে বৃহত্তর বরিশাল জেলার সদস্যদের নিয়োগ না দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হল।" এ ধরনের নির্দেশ একটি স্বাধীন দেশে অসম্ভব মনে হওয়ায় এআইজি দেলোয়ার হোসেনের সাথে ফোনে আলাপকালে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এবং বলেন, এ ধরনের চিঠির আর কোন নজির নেই, তবে ঐ

www.pathagar.com

সিও-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকায় উপরের নির্দেশে এ চিঠি দেয়া হলেও এ ধরনের চিঠি বিধিসম্মত নয়। তার এই বক্তব্যের পর কে সেই উপরওয়ালা তা জানার কোন আগ্রহ না থাকায় তাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিনি। শুধু মনের মধ্যে প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে যে, গত ৫ বছরে বিধি-নিয়ম ও প্রথা-বহির্ভূত আরও কত নির্দেশ কোথায়, কিভাবে জারি হয়েছে এবং এতে কোথায় কার ভাগ্যে কি পরিণতি ঘটেছে একমাত্র আল্লাহই তা ভাল জানেন।

বিএনপিসহ চারদলীয় সরকার ক্ষমতাসীন হবার পরপরই কোন কোন মহল থেকে এমন একটা ভাব শুরু হয়ে গেল যে, সরকারকে যেনবসতে দেয়া হবে না। এ রকম একটি প্রচারণার অংশ ছিল বাঙ্কু মোল্লা। কিন্তু সর্বশেষ দেখা গেল পুরো ঘটনাটিই ভিত্তিহীন। আর যে কাগজের সাংবাদিককে নিয়ে এত ঘটনা সেই কাগজটি খবর পরিবেশনের সময় যাচাই-বাছাই না করে এখন সেই সাংবাদিককে অব্যাহতি দিয়ে নিজেদের গা-বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। নির্বাচনের পরপর যেসব ঘটনা ঘটতে শুরু কছে আস্তে আস্তে হয়ত সবগুলোর জটই খুলে যাবে। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যে সকল ঘাপটিমারা আধিপত্যবাদের দালালরা তৎপর হতে পারেনি এখন হয়ত তারাই মাথা উঁচু করতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া তাঁর প্রথম ভাষণে জোট নির্বাচনকে দ্বিতীয় অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের রায় বলে উল্লেখ করেছেন। যদি এই যুদ্ধে সত্যিকারের বিজয়ী হতে হয় তাহলে অবশ্যই ঘাপটিমারা আধিপত্যবাদের দালাল এবং আওয়ামীদের পাতা ফাঁদে পা দেয়া যাবে না। বলার অপেক্ষা রাখে না, জোট সরকারের প্রকৃত গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র আওয়ামী সন্ত্রাস এবং অপকৌশলকে প্রতিহত করা সম্ভব। অন্য কোন কৌশল অথবা আপোষকামিতা জোট চেতনাকে চোরাবালির খাদে আটকে দেবে যা নতুন বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে।

একচল্লিশ

শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটি এবং সাংবিধানিক সাংসদ শব্দের পরিবর্তে সংসদ সদস্যের প্রবর্তন সত্যিই জনগনের আকাঙ্কার প্রতিফলন। সিদ্ধান্তের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ আলাদা। সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে শুক্রবার সরকারী ছুটি ঘোষিত বার পর '৯৬-এ আওয়ামী ক্ষমতাসীন হবার পূর্ব পর্যন্ত তা বহালই ছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার তোড়ে অথবা অন্য কোন কারণে কিনা তা বোঝা না গেলেও আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবারের পরিবর্তে রবিবার করার পক্ষে আব্দার ও ধোয়া তোলা হয়। সাপ্তাহিক ছুটির পরিবর্তন নিয়ে পত্র-পত্রিকায় রিপোর্টও প্রকাশিত হয়। চারদিকে যখন ছুটির দিন পরিবর্তত হয়ে যাচ্ছে এরকম গুঞ্জন শুরু হয় তখনই সাপ্তাহিক ছুটি একদিনের পরিবর্তে দু'দিন নির্ধারণ করা হয়। এ পরিস্থিতিতে প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠে যে, সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবারের পরিবর্তে রবিার করার জন্যই দু'দিন করা হয়েছে। কারণ, এভাবেই রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার নির্ধারণ করা হয়েছিল। সরকারের পরিকল্পনা আঁচ করতে পেরেই হয়ত জনগণ বেঁকে বসেছিল, আর তাই হয়ত ছুটির দিন পরিবর্তিত হওয়ার পরিবর্তে দু'দিনই সাপ্তাহিক ছুটি থেকে গেল। এই দু'দিন সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় গত ক'বছরে যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত ছুটির ঘণ্টা বেড়ে গিয়েছিল তেমনি অর্থনৈতিক লোকসানের মাত্রাও সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। বর্তমান সরকার পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এবং জোট চেতনার অনুকূলে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা করে যেমন করে সাপ্তাহিক কর্ম ঘণ্টাকে একটি নিয়মের মধ্যে এনেছে তেমনি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রাণের দাবীকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। শুক্রবার পবিত্র জুমার দিন হওয়ায় ঐদিন মুসল্লীরা

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় সময় ও প্রস্তুতি নিয়ে জুমার নামাজে অংশ নিতে পারবেন বিধায় জোট সরকারের প্রতি হয়ত তাদের দোয়ার পরিমাণ বেড়ে যাবে।

সংসদের প্রথম অধিবেশনের মুলতবি পরবর্তী প্রথম দিনের বৈঠকে স্পীকার সাংসদ শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একদিক থেকে যেমন সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেছেন তেমনি জাতীয় সংস্কৃতির অনুকূলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। বিগত ক্ষমতাসীনদের সংসদে এই শব্দটি হুট করেই অনুপ্রবেশ করেছিল। দু'একটি পত্রিকায় বারকয়েক ব্যবহৃত হবার পরই কেন যেন তখনকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্য শব্দটি লুফে নিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত শব্দটির উত্তরণ ঘটেছিল। অবশ্য শব্দটির ব্যবহার নিয়ে তখন থেকেই কথা উঠেছিল, তবে কেউ তাতে গা করেনি। কথা অবশ্য শুধু একটি শব্দ নয়, আরও অনেক শব্দের ব্যবহার নিয়ে উঠেছে। যেমন-রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, আচার্য, উপাচার্য, ন্যায়পাল, স্নাতক এরকম আরও অনেক শব্দ রয়েছে যার সঠিক ব্যবহারবিধি না জেনেই স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসেবে বাঙালীকরণ প্রকল্পের আওতায় ঢুকে পড়েছে। আসলে এ সব শব্দ আমাদের স্বাধীন দেশে নিয়ে আসা হয়েছে ভারত থেকে। সেই সময়ে উন্মুক্ত সীমান্ত নিয়ে বাংলাদেশের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দেয়ার একটা চেষ্টাও হয়েছিল এবং এর সাথে অনেক শীর্ষ ব্যক্তিও প্রতক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। সেই সময়ে এমন একটা ধারণা চালু করার চেষ্টা হয়েছিল যে, ইসলাম, মুসলমান মানেই ঘৃণ্য কোন বিষয়। আর সে কারণেই কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে ইসলাম পর্যন্ত কেটে দিয়ে তাকে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালীকরণের চেষ্টা করা হয়েছিল। অবশ্য সে সময়ের কোন সংসদে এসব নিয়ে কোন আলোচনা যেমন করা হয়নি, তেমনি কোন স্পীকারের রুলিংয়েরও প্রয়োজন হয়নি; বরং, মহল বিশেষের ইন্ধন ও ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবেই এসব করা হয়েছিল। সে বিবেচনায় ভোটে মাননীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম সংসদে 'সাংসদ' শব্দের সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন তুলে একটি মৌলিক প্রসঙ্গই উত্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে তিনি যে শুধু চারদলীয় জোট রাজনীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন তা নয়, বরং একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের ভূমিকা রেখেছেন। এখানে এটুকু বলে রাখা দরকার যে, যেসব শব্দাবলী আমাদের সংস্কৃতি চেতনার অনুরূপ নয় তার জোরপূর্বক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং জাতীয় সংস্কৃতির অনুরূপ শব্দাবলীর স্বাভাবিক ব্যবহার প্রয়োজন। অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের এই বক্তব্যের মধ্যদিয়ে আরও একটি বিষয় প্রতীয়মান হয়েছে যে, এক সময় পার্লামেন্ট যেভাবে 'জী হুজুর'-এ পরিণত হয়েছিল সম্ভবত সে অবস্থা এখন আর নেই। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এই পার্লামেন্টে এক সময় এমন অবস্থা ছিল যখন নিজ দলীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে তো দূরের কথা বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদেরও কথা বলতে দেয়া হতো না। এমন অনেক প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন যাদের টেবিল চাপড়ানোর শব্দেই বিরোধী দল নীরব হয়ে যেতে বাধ্য হতো। অষ্টম জাতীয় সংসদের শুরুতে যে ধারা শুরু হয়েছে তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে অবশ্যই জাতি একটি সত্যিকারের দিক-নির্দেশনা পেতে পারে এবং তাহলে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য।

জোট সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কার্যকর রূপ দিতে হলে নিঃসন্দেহে নির্ভর করতে হবে আমলাদের উপর। জোট রাজনীতির অনুরূপ কর্মী বাহিনী প্রশাসনে না থাকলে জাতীয় জীবনে এর প্রকৃত সুফল পাওয়া কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। জোট সরকার গঠিত হবার পর

www.pathagar.com

একটি তারিখ থাকলেও এর সূচনাকাল দিন-তারিখের ফ্রেমে বেঁধে দেয়া খানিকটা কষ্টকর। জাতীয় জীবনের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে জাতি যখন মুক্তির কোন সুনির্দিষ্ট পথ খুঁজে না পেয়ে ক্রমাগত হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হচ্ছিল, খাবি খাচ্ছিল; ঠিক সে সময় জাতীয় বিবেকের মুরব্বী ও প্রতিনিধিরা যে দেশপ্রেম ও ঈমানের দায়িত্ব নিয়ে জাতীয় ঐক্যের আহবান নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছেন নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ডিঙ্গিয়ে তাই শেষ পর্যন্ত বিরোধী রাজনৈতিক অঙ্গনে চারদলীয় জোটে রূপ নেয় এবং জোট ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে জোট গঠিত হবার মধ্য দিয়ে যে মেরুকরণ শুরু হয় তার অনুকরণে দেশের শ্রেণী-পেশা এবং সর্বমহলে গড়ে উঠতে থাকে ঐক্য প্রক্রিয়া। সারাদেশে কোথায় কত ঐক্য গড়ে উঠেছে তার সকল বিবরণ হয়ত কখনই উঠে আসবে না, তবে চারদলীয় জোটের রাজনৈতিক বিজয় অর্জনে আমলাদের ঐক্যের বিষয়টি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার বলার অপেক্ষা রাখ না। খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ষষ্ঠ সংসদে রায় বাতিল করতে সেদিন আমলারা তাদের চাকরিবিধি এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে জনতার মঞ্চ নামে জনারণ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। অগণতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক পন্থায় গঠিত মঞ্চবাসীদের দাপট ও প্রভাবে বিগত পাঁচ বছর জনগণ আতঙ্ক ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। ঐসব আমলারা নিজেদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে 'সংরক্ষণের' লক্ষ্যে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যার পরিণতিতে নিজেরাই এক সময় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আওয়ামী পাঁচ বছরের এই নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেশের অভিজ্ঞ এবং দক্ষ আমলারা যখন দিক-নির্দেশনাহীনতায় ভুগছিলেন ঠিক সে সময়ে জোট তাদের মধ্যে নতুন আশার আলো সঞ্চারিত করে। আর এই আলোকে অমানিশার বিকল্পে নিরাশার অবসান লক্ষ্যে আন্তঃআলোচনা ও পর্যালোচনার প্রক্রিয়ায় নিজেরাও গড়ে তোলেন একটি মোর্চা। সাবেক, অভিজ্ঞ, দক্ষ ও প্রবীণ শ্রেণী-পেশার এই মোর্চা কাজ করে মূলত চারদলীয় জোটের প্রধান শরীক দল বিএনপিতে যোগদানকারী একজন সাবেক সচিব সুসাহিত্যিকের নেতৃত্বে। এই মোর্চার একজন পদস্থ আমলার ভাষ্য অনুযায়ী, আওয়ামী সরকারের পতনের অন্তত চার মাস আগে থেকে ৩০/৩৫ জনের একটি পরীক্ষিত দল মগবাজার রেললাইন এলাকার একটি বাসায় সপ্তাহে অন্তত দু'বার বৈঠক করে সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতো। শ্রেণী-পেশার এই বিশেষ প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত টীম যে নির্বাচনী সফলতার অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা জাতীয় জীবনে ঐতিহাসিক সফলতার স্বাক্ষর বহন করে।

'৯১ এবং ২০০১-এর নির্বাচন-পূর্ব ও পরবর্তী পরিস্থিতি এক ও অভিন্ন নয়। '৯১ সালে যে প্রেক্ষিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০১-এর প্রেক্ষিতে অনুরূপ তো নয়ই বরং, একটি ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছিল। এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে মূলত দেশ এবং গণতন্ত্রকে রাহুমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে। চারদলীয় জোটের যে সরকার বর্তমানে ক্ষমতাসীন তার দু'দিক রয়েছে। প্রথমতঃ বাস্তব অবস্থা, দ্বিতীয়তঃ ভাবগত বাস্তবতা। বাস্তব দিক দিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, নির্বাচনের অংকে বিএনপি প্রায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রয়েছে। কিন্তু, এই নির্বাচন বিজয়ের ভাবগত দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে, বিজয়ের পেছনে সবচেয়ে যে বিষয়টি কাজ করেছে তাহল জগণের আস্থা ও বিশ্বাস। জনগণ এই প্রথমবারই দেশের অস্তিত্ব নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল তা নয়; এর আগেও জতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। তবে, একুশ বছর পর আওয়ামী সরকার দেশে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যা থেকে আদৌ মুক্তি সম্ভব কিনা এ নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন

www.pathagar.com

উঠেছিল। আর সে কারণেই আস্থা ও বিশ্বাসের প্রশ্নটি জরুরী বিবেচ্য বিষয় ছিল। নির্বাচনী বিজয়ের পর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছেন, আওয়ামী লীগের ব্যর্থতাই আমাদের বিজয়। নিরপেক্ষ নির্বাচনের সফলতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্বাহী বিচারপতি লতিফুর রহমান মন্তব্য করেছিলেন দায়িত্ব গ্রহণের আগে থেকেই করণীয় সম্পর্কিত ওয়ার্ক আউট করেছি। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হবার আগে তাদের কোন ওয়ার্ক আউট ছিল কিনা অথবা থেকে থাকলে সেই পরিকল্পনায় কোন গোল বেঁধেছে কিনা অথবা গোল বেঁধে থাকলে তার কারণ কি এসব জনগণের জানার কথা নয়। আওয়ামী বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিদের একজন পদস্থ কর্মকর্তা '৯১ ও ২০০১-এর পরিস্থিতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বলছিলেন, '৯১ সালে ক্ষমতাসীন সরকারের নাম ব্যবহারকারী কোন কোন আমলার ভূমিকা জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে ছিল কিনা তা বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। এনজিও ব্যুরোর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তৎকালীন এনজিও ব্যুরোর ডিজি ঐ সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। কারণ, তিনি এনজিওদের জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবিরোধী কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছিলেন।

মোটকথা, মনে রাখা দরকার, জোট সরকারের প্রধান শক্তি অংক নয়, জনগণের আস্থা। জোট গঠনে যারা আন্তরিক ছিলেন, নির্বাচনী বিজয়ী হতে যারা সক্রিয় ছিলেন তারা যেমন ব্যক্তি, তেমনি সহায়কশক্তি। জনগণের নিরঙ্কুশ ম্যানডেট প্রাপ্ত ক্ষমতাসীন চার দলীয় জোট সরকারের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক, প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আস্থায় সঙ্কট সৃষ্টি করা যাবে না।

বিয়াল্লিশ

আশির দশকের কথা। সবেমাত্র ইরানে শাহতন্ত্রের পতন হয়েছে। দুনিয়ার সকল মানুষের সৃষ্টি যখন ইরানের নয়া সরকারের উপর ঠিক তখনই সেখানে ঘটে গেল নতুন ঘটনা। বিশ্বের দৃষ্টি মোড় নিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। শাহতন্ত্রের পতনের পর আটকে পড়া মার্কিনীদের মুক্ত করতে মার্কিন প্রশাসন গোপনে হেলিকপ্টার হামলা চালিয়েছিল ইরানে। এক অলৌকিক ঘটনায় সে আক্রমণ পণ্ড হয়ে যায়। কিন্তু ওই গোপন আক্রমণের তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর দুনিয়াব্যাপী মার্কিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় উঠেছিল। ওই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন জিমি কার্টার। জিমি কার্টার এবং ইরান সরকারের মধ্যকার পরিস্থিতি লিখতে গিয়ে বাংলাদেশের তৎকালীন একজন বিশিষ্ট কলামিস্ট মরহুম জহুর হোসেন চৌধুরী লিখেছিলেন, "খোমেনীর ফাটা বাঁশে কার্টারের অণ্ডকোষ আটকে গিয়েছে।" শুনতে যতই খারাপ লাগুক ওই সময়কার মার্কিন-ইরান পরিস্থিতি বিশ্লেষণে এর চেয়ে ভাল কোন উদাহরণ ব্যবহার করা হয়ত সম্ভবপর ছিল না। মার্কিন প্রশাসনের ব্যর্থতার দায়ভার কার্টার সাহেবকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে হয়েছিল। তার দুর্ভাগ্য তিনি দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হননি। তবে তিনি সারাবিশ্বে এবং বাংলাদেশেও আলোচিত হয়েছিলেন। এরপরও কার্টার সাহেব আরো কয়েকবার বাংলাদেশে এসেছেন তবে তার সাম্প্রতিক সফর যেভাবে আলোচিত হয়েছে এবং হচ্ছে আগে তা হয়নি।

বাংলাদেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তিনি নাকি অনেক চেষ্টা করে গেছেন। সফর পরবর্তী আলোচনায় একথা স্বীকৃত হয়েছে যে, দুই দলই নাকি কতিপয় ব্যাপারে সুষ্ঠু

www.pathagar.com

ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তাঁর সাথে একমত হয়েছে। যদিও কার্টারের আগমন এবং আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে অনেকেই নির্বাচন নয়; বরং তেল, গ্যাসকেই গুরুত্ব দিতে চান বেশী। সম্প্রতি আওয়ামী লীগ প্রধান তার নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এ অভিযোগ করেছেন যে, বিএনপি কার্টার সাহেবের কাছে গ্যাস বিক্রির অঙ্গীকার করেছে। তিনি অবশ্য তাঁর দলের সাথে এ ব্যাপারে কোন আলোচনা হয়েছে কিনা অথবা হলে কি হয়েছে সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। কথা যাই হোক, বাংলাদেশ থেকে তেল, গ্যাস রফতানী করতে বাংলাদেশের জনগণের যে অনুমোদন লাগবে একথা না বললেও চলে। নির্বাচন প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নাকি এই মর্মে সম্মত হয়েছে যে, নির্বাচনের রায় যাই হোক না কেন, উভয় দল মেনে নেবে এবং সংসদ বর্জন ও হরতাল করা থেকে তারা বিরত থাকবে। নির্বাচনের ফলাফল কে মেনে নেবে এবং না নেবে সে সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য অবশ্যই জাতিকে অন্ততঃ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি পহেলা অক্টোবর শুভে লাভে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন হয় তাহলেই দেখা যাবে যে, নির্বাচনের ফলাফল অনুকূল বা প্রতিকূলের কারণে কি অবস্থা দাঁড়ায়। সংসদ বর্জন এবং এ প্রসঙ্গে হরতাল না করা নিয়ে কার্টার সাহেবের নিকট আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতি যাই দেয়া হোক না কেন, সে প্রতিশ্রুতি যে তারা মানছেন না অথবা ভিন্নভাবে দেখছেন সে ব্যাপারে এখন আর কোন দ্বিধা নেই। ইতোমধ্যেই আওয়ামী লীগ গ্রহণযোগ্য অথবা অগ্রহণযোগ্য যে ইস্যুই হোক না কেন হরতাল, অনিষ্ট, ভাঙচুর এবং ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। ক্ষমতা ত্যাগের পরপরই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর আওয়ামী লীগ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে শুরু করে এবং বর্তমানে তা বিরূপ আকার ধারণ করতে শুরু করছে। ক'দিন আগেই প্রকাশ্য জনসভায় আওয়ামী লীগের একটি অঙ্গসংগঠনের শীর্ষ নেতা হরতালের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। আওয়ামী সভানেত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কড়া সমালোচনা করে বলেছেন, তাদের শেষ রক্ষা হবে কিনা, সম্মানজনকভাবে বিদায় নিতে পারবে কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তিনি যখন এই আশংকা ব্যক্ত করেছেন সেই সময়ে জেলা আওয়ামী রীগ ও ছাত্রলীগের ডাকে ফেনী ও নেত্রকোনায় হরতাল চলছিল। হরতাল শেষে ফেনীর বহুল বিতর্কিত আওয়ামী নেতা জয়নাল হাজারী তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নতুন করে হুমকি প্রদান করছেন। ফেনীর বর্তমান জেলা প্রশাসকের বদলীর দাবীতে জেলা আওয়ামী লীগ আহূত হরতালের দুই দিনে একশ' গাড়ী ভাঙচুর করা হয়েছে। স্থানীয় জেলা আওয়ামী লীগের দাবী হচ্ছে ফেনীর জেলা প্রশাসককে পাল্টাতে হবে। তারা মনে করে জেলা প্রশাসকের পরিবর্তন হলেই জয়নাল হাজারী মুক্ত হয়ে যাবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, আওয়ামী হরতাল এবং আন্দোলনের নমুনা মোটামুটি এরকমই। '৯৬ সালে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে এই দলটি যখন লাগাতার হরতাল শুরু করেছিল তখন ঘোষণা দিয়েছিল সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরবে না। পরবর্তী নির্বাচনে অবশ্য তারা সরকার গঠন করেছিল। বলে রাখা ভাল, শুধু ফেনীতে নয়, নেত্রকোনায় জেলা ছাত্রলীগের সৃষ্ট সন্ত্রাসে একজন এএসপিসহ ১৩ জন পুলিশ আহত হয়েছে এবং ঘটনা ক্রমাগত বিস্তৃতি লাভ করছে। অন্য একজন খুনের আসামী যিনি আওয়ামী লীগের হয়ে আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তার জামিন বাতিল হলে ওই অঞ্চলেও হরতালের হুমকি দেয়া হয়েছিল।

আওয়ামী ক্ষমতাসীন আমলে যে কয়টি ইস্যু সর্বাধিক আলোচিত ছিল তার মধ্যে জয়নাল হাজারী অন্যতম ছিল। ফেনীতে হাজারী বাহিনীর অত্যাচার, সন্ত্রাস, রায়পুরায় আবু তাহেরের সন্ত্রাস বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়েছে। এডভোকেট নূরুল ইসলাম, ঢাকার রুবেল,

www.pathagar.com

সূত্রাপুরের জোড়া খুন, সজল, শিপু হত্যাকাণ্ড কোন অজানা ঘটনা নয়। নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপির সিনিয়র নেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী শাবাশ বাংলাদেশ নামে যে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেছেন সেই অনুষ্ঠানে রুবেলের মা, নূরুল ইসলামের স্বজন, সূত্রাপুরের জোড়া খুনের আত্মীয়দের যে করুণ বিলাপ টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে উঠেছে তা জাতির সামনে কতিপয় প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রশ্নোত্তরে নিহতের আত্মীয়-স্বজনরা বলেছিলেন, 'যে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বান্ধবী বা কর্মীরা হত্যাকাণ্ড চালায় সেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিচার চেয়ে লাভ কি'? 'যেখানে সন্ত্রাসীরাই প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে সেই প্রমাসনের কাছে বিচার চাওয়ার কি কোন অর্থ আছে'? অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ডাঃ চৌধুরী আওয়ামী সন্ত্রাস বন্ধ করার লক্ষ্যে বিএনপি'র কর্মসূচীতে জনতার সমর্থন দাবী করেছেন। নিঃসন্দেহে ব্যালটের রায়ে বুলেট বন্ধ করা গেলে তার চেয়ে আর উত্তম কোন সিদ্ধান্ত হতে পারে না। কিন্তু জোটের নির্বাচনী বক্তব্যে সন্ত্রাসী, আধিপত্যবাদী দেশ বিক্রির রাজনীতির বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার আদৌ কি কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে? জনগণের এই প্রশ্নের পাশাপাশি তাদের দৃষ্টি অন্যদিকেও পড়েছে। দৈনিক ইনকিলাবে চট্টগ্রাম থেকে ইবনে মাহবুব লিখেছেন, "আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকা অবস্থায় বিটিভি বিভিন্ন সময় বিরোধী দলের বিভিন্ন কার্যকলাপের উপর ভিডিও করে সত্য-মিথ্যা অনেক কিছু সাজিয়ে "জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন" নামক একটি অনুষ্ঠান আগ্রহসহকারে প্রচার করত। অনেক সময় একই অনুষ্ঠান একই দিনে একাধিকবারও প্রচার কত। সেসব অনুষ্ঠানে কিছু সত্য যেমন থাকত তেমনি থাকত কিছু মিথ্যার রং। কিন্তু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগের কোন নেতা-কর্মী বা তাদের পুত্ররা কোন সন্ত্রাসী কার্যকলা কিংবা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভার্সিটি হল দখলকরণ, অস্ত্রবাজি ইত্যাদি করলেও বিগত ৫ বছরে সেরকম একটি অনুষ্ঠানও বিটিভি প্রচার করেনি। তত্ত্বাবধায় সরকারের আমলে ফেনীর সোনাগাজীতে হাজারী বাহিনী একদিনে দশজনের মতো মানুষ খুন করলেও বিটিভি জাতির বিবেকের কাছে কোন প্রশ্ন কেন রাখলো না তা বিটিভি কর্তৃপক্ষই ভাল জানেন। আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের উপর ঐ রকম কয়েকটি অনুষ্ঠান তৈরী করে জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখার জন্য টিভি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করছি। শুধু ইবনে মাহবুব নয়, গোটা জাতির কাছেই প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে যে, আওয়ামী আমলে সন্ত্রাসের বিবরণ জাতির সামনে সরকারীভাবে তুলে ধরা হচ্ছে না কেন? ফেনীর ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা খানিকটা হলেও মুখ খুলেছেন। ফেনীর জজকোর্ট ভবন উদ্বোধন-অন্তরায় আলোচনা করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। কি পরিস্থিতিতে সেখানে কম্বিং অপারেশন জরুরী হয়ে পড়েছিল তার ব্যাখ্যাও মোটামুটি দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা না দিলেও ওই অপারেশনে তারকাচিহ্নিত সন্ত্রাসীর বাড়ী থেকে যা পাওয়া গেছে তা প্রমাণ করে যে, অপারেশন জরুরী ছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেই বাহিনী এবং তাদের দলপতিরা এখন জেলা প্রশাসকের বদলী বাহানা তুলে সন্ত্রাসের তাণ্ডব চালাচ্ছে। অথচ এই হরতাল ও সন্ত্রাসের ক্ষয়ক্ষতি প্রচার করে জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখার আগ্রহ কোন প্রচারমাধ্যমে যেমন নেই তেমনি নেই কোন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষেরও। বলার অপেক্ষা রাখে না, আওয়ামী লীগ যা কিছু করছে তার পিছনে রয়েছে গভীর চক্রান্ত। তারা মুখে যাই বলুক, আগামী নির্বাচন নিয়ে তাদের রয়েছে নানা পরিকল্পনা। যে হরতালের হুমকি দিয়ে তারা শুরু করেছিল সেই হরতাল চালু করে দিয়েছে এবং হরতাল সৃষ্ট সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য কোতায়, কোন দিকে মোড় নেবে এবং কোন্ ইস্যুতে দেশ অচল হবে এখন তা বলা যাবে না। সেই সাথে এটাও আশংকার কথা যে, আওয়ামী লীগের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বলে দাবীদার বিএনপি জাতীয় স্বাধীনতা,

www.pathagar.com

ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণে এখনও এমন কোন শক্তিশালী দাবী তোলেনি যা থেকে আওয়ামী সৃষ্ট নৈরাজ্যের হাত থেকে জাতি রক্ষা পেতে পারে। তাই আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেখা দিয়েছে অস্ত্র ও টাকার খেলার বিরুদ্ধে জাতির বিবেককে জাগ্রত করা। যে পক্ষ যাই বলুক না কেন, জাতিকে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেয়ার দায়িত্ব যেহেতু বর্তমান সরকারের তাই জাতির বিবেককে জাগ্রত করে হত্যা, লুটেরা অর্থনীতির ধারক-বাহক ও তলপিবাহকদের মুখোশ উন্মোচন করতে যেমন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে তেমনি বিএনপি তথা চারদলীয় জোটকেও কোন আপোষকামী ভূমিকা নয়, বরং জাতি রক্ষায় শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগণকে সাহসী করে তুলতে হবে।

ভোট বিপ্লব

পহেলা অক্টোবর বাংলাদেশের নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে। অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ গোপন ব্যালটে বিএনপি তথা চারদলীয় জোটকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দান করে যে বিপ্লব সম্পন্ন করেছেন তাকে বিপ্লব না বলে জনগণের আকাঙ্ক্ষার এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিফলন বলাই সর্বোত্তম। ব্যালট যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অন্যদিকে চারদলীয় জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে শোকরগুজারী করে জনগণকে এই বিপুল সমর্থনদানের জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

বিজয়-পরবর্তী প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে বেগম জিয়া বলেছেন, 'আশার চেয়েও বেশী পেয়েছি তাই জনগণের কাছে আমরা আরও বেশী কৃতজ্ঞ।' ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি চারদলীয় জোটের বিজয়ের তিনটি কারণের মধ্যে একটি আওয়ামী ব্যর্থতাকে উল্লেখ করেছেন। সঙ্গতভাবেই তিনি হয়তো এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ ৫ বছরের আওয়ামী শাসনে জনগণ এতটাই বিগড়ে গেছে যে, তারা এর পরিবর্তনে মৃত্যুপণ করেছিল। সম্ভবতঃ সে কারণেই অশীতিপর বৃদ্ধ থেকে নববধূ পর্যন্ত সকলেই সকাল থেকেই ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিল ভোট দিতে। অনেকের এমন ধারণাও হয়তো ছিল যে, সকাল থেকে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত না থাকলে হয়তো প্রতিপক্ষ কেন্দ্র দখল করে নিতে পারে। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অনেকেই এমন প্রত্যাশা করেনি যে, আওয়ামী লীগ আসলেই বলতে গেলে জনসমর্থনহীন হয়ে পড়বে। ব্যাপারটি অনেকের কাছেই যেমন আচমকা মনে হয়েছে তেমনি এ কথাও এখানে বলে রাখা ভাল যে, গত ৩০ বছরে বাংলাদেশে এমন একটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শোচনীয় পরাজয়বরণ করলো যে নির্বাচন সম্পর্কে দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক—কূটনীতিকদের কথা বাদ দিলেও ঐ দলের নেতারাও স্বীকার করেছেন যে, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে।

পহেলা অক্টোবর রাতে বিবিসি'র সাথে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে আওয়ামী নেতারা স্বীকার করেছেন যে, দৃশ্যতঃ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচনের নিরপেক্ষতায় দৃশ্যতঃ এবং কার্যতঃ বলতে আলাদা আলাদা করে কি বুঝায় সে সম্পর্কে ঐ আলোচনায় কোন ব্যাখ্যা না থাকায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী নির্বাচন সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাকেই উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, নির্বাচনে স্থূল কারচুপি হয়েছে। তার ভাষায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমেই এই কারচুপি সংঘটিত হয়েছে। বলা কষ্টকর একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যে অভিযোগ করেছেন তা আইনগত না নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত। যদি বিষয়টি আইনগত হয় বা হতো তাহলে তিনি

www.pathagar.com

হয়তো এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই ব্যবস্থা নিতেন অথবা সেরকম কিছুর চিন্তা করে থাকবেন। কিন্তু প্রশ্ন অন্যত্র। নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ যদি আইনগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো তাহলে অবশ্যই এতগুলো আসনে ফলাফল ঘোষণা করা সম্ভব হতো না। কারণ প্রতিটি কেন্দ্রের নির্বাচনকার্য সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে যে আইনগত পদ্ধতি রয়েছে তাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। এই ভূমিকা প্রত্যেকে পালন না করলে যেহেতু নির্বাচনী ফলাফলও ঘোষণা সম্ভব হতো না সে কারণেই কারচুপিগত বিষয়টি অবিশ্বাস্য প্রশ্ন হয়েই থাকবে। কারচুপির প্রশ্ন যদি উঠে সেক্ষেত্রেও একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসে না থেকে বরং কিছু উদাহরণ তুলে ধরাই বাঞ্ছনীয়। নির্বাচন উপলক্ষে ফপ (ফেয়ার অবজারবেশন ফোরাম)-এর পক্ষ থেকে বিশেষ পর্যবেক্ষণ টীমের সদস্য হয়ে ঢাকার কয়েকটি এলাকার নির্বাচন দেখা এবং নির্বাচন-সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলা ও মতবিনিময়ের সুযোগ হয়েছিল। সেই সুবাদে খিলগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাল ভোট দিতে এসে গ্রেফতার হওয়া মজিবরের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। কেন্দ্রে ঢোকার আগেই কেন্দ্রের বাইরে অবস্থানরত লোকজন জানিয়েছিলেন জাল ভোট ধরা পড়েছে। কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মিঃ সরকারের কাছে মজিবের অবস্থান জানতে চাইলে তার পাশেই প্রহরীর হাতে আটকে থাকা যে যুবকটিকে দেখিয়ে দিলেন সেই আসলে মজিবর। তাকে জিজ্ঞেস করি আপনি জাল ভোট দিতে এলেন কেন? মজিবর খোলামেলা জবাব দিয়ে বললো শাহাজানপুর বস্তি থেকে আওয়ামী ছেলেরা ধরে নিয়ে এসেছে। ঐ এলাকার আরেকটি কেন্দ্র সেন্ট প্রাকটিস গ্রামার স্কুল। সেখানেও দুপুরের আগেই ৩ জন জাল ভোট দিতে এসে ধরা পড়েছিল। এর মধ্যে দু'জনকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঢাকা-৪ আসনের একক কেন্দ্রের সামনে প্রচুর জনসমাগম দেখে ভিতরে প্রবেশ করি। দেখলাম জাল ভোট দিতে আসা আবুল কালামকে হাতে দড়ি লাগিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। আবুল কালামের বক্তব্য সে জাল ভোট দিতে আসেনি। কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারের সাথে এ নিয়ে আলাপ করলে তিনি জানান, ছেলেটি তিনবার একই কারণে বুথের ভিতরে প্রবেশ করেছে। প্রথমবার সন্দেহজনক প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। দু'ঘন্টা পর আবার এসেছে। এভাবে তৃতীয়বার বুথে প্রবেশ করলে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বুকে একটি বিশেষ দলের স্টিকার লাগানো ছিল। ঢাকা-১১ আসন থেকে নির্বাচিত এস এ খালেক নির্বাচনের দিন অভিযোগ করেছেন যে, একটি বিশেষ দলের মার্কার পক্ষে জাল ভোট দেয়ার সময় তিনি হাতেনাতে ধরে কর্তৃপক্ষের কাছে সোপর্দ করেছেন। পর্যবেক্ষক থাকার সুবাদেই ঢাকার কয়েকটি কেন্দ্রে ভোট গণনার শেষ সময় পর্যন্ত থাকার সুযোগ পেয়েছি। স্থানীয়ভাবে ফলাফল জানার পর উভয়পক্ষের এজেন্টদের কাছে জানতে চেয়েছি নির্বাচন কেমন হলো? আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকেই জবাব দিয়েছেন যে, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। এরপরও যদি নির্বাচন সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আওয়ামী লীগের থাকতো তাহলে সে ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের া করে 'স্থলভাবে কারচুপি'র অভিযোগ তুলতো না তারা। আওয়ামী লীগ সঠিক ও সুনির্দিষ্টভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করলে হয়তো জনগণ জানার সুযোগ পেত যে, আসলেই ভিন্ন কিছু ঘটেছে কিনা। তবু বলি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগের কোন সত্যতা থাকে তাহলে অবশ্যই তারা তার জবাব দিবেন। প্রসঙ্গ নিয়ে অন্য আলোচনা অর্থহীন।

জনগণ চারদলীয় জোটকে ভোট দিয়ে যে বিপুল পরিমাণ আস্থায় নিয়েছে তাতে যেহেতু সংসদে আইন প্রণয়ন থেকে অন্য যে কোন কার্যক্রম পরিচালনায় অসুবিধা হবে না তাই অন্য জটিলতায় না গিয়ে আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। নতুন করে উল্লেখ না করলেও একথা সত্য যে, আওয়ামী শাসনের ব্যর্থতা, নৃশংসতাই চারদলীয় জোটের বিজয়ের প্রধান ভিত্তি।

www.pathagar.com

গত ৫ বছর আগে আওয়ামীরা যখন ক্ষমতায় এসেছিল তার পরপরই অনুভূত হয়েছিল যে, এককভাবে তাদের বিরুদ্ধে কারো কিছু করা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে আওয়ামী-বিরোধীদের মধ্যে চেতনার জন্ম হতে থাকে আর অন্যদিকে জাতির বিবেক বলে পরিচিত ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহ জাতীয় নেতাদের মধ্যে তথাকথিত মতপার্থক্য নিরসন করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার যে চেষ্টা করতে থাকেন সময়ের প্রয়োজনে এই উদ্যোগই একসময় বাস্তবে রূপ নেয়। যার রাজনৈতিক পরিচিতি চারদলীয় জোট। ভোটভিত্তিক আন্দোলন জোরদার না হলেও জনমনে আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হতে থাকে তা ক্রমশ পুঞ্জীভূত হতে হতে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো বিস্ফোরিত হয় এবং এই বিস্ফোরণ চারদলীয় জোটের নেতা-নেত্রীদের ধারণা-কল্পনাও ডিঙ্গিয়ে যায়—যা বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নয়া মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, নির্বাচনের এই ফলাফল জাতির মনে এক নয়া আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার চেতনাবোধ থেকেই এর জন্ম হয়েছে। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা যে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের চেতনার মধ্যে নিহিত রয়েছে সে কথা সম্ভবত তারা ভুলে গিয়েছিলেন। আর সে কারণেই বিভাজন রেখার বিপরীতে জাতীয় ঐক্যের শ্লোগানে জনগণ সম্মতি প্রদান করেছে এবং ব্যালট বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। আলোর মধ্যে যেমন অন্ধকারের অস্তিত্ব আছে তেমনি ঐক্যের মধ্যেও ঐক্য বিরোধীবাধ থাকতে পারে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঐক্যপন্থী চেতনাবোধের শক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলেও নানা কারণে তাদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্পন্ন হয়নি। '৭৫ সালের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর বাংলাদেশে যে বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং ইসলামী মূল্যবোধের প্রবর্তন করা হয় সেই ধারা অব্যাহত থাকলেও সমন্বিত কোন বিকশিত রূপ লাভ করেনি। এই ধারার কর্ণধারদের ব্যক্তিগত মতপার্থক্যই এই সমস্যার প্রধান কারণ ছিল। গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিবর্তিত রূপ নয়া মেরুকরণের প্রয়োজনীয়তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বিধায় বিভক্তি ও বিভ্রান্তির মধ্যেও জন্ম হয় আজকের বাস্তবতা। এই বাস্তবতা প্রকৃতপক্ষে একটি নির্বাচনের জন্য নয়; বরং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার অঙ্গীকারেই যেহেতু রচিত হয়েছে তাই জনগণের রায়কে খাটো করে দেখার কোন কারণ নেই। আশার কথা চারদলীয় জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়তার সাথেই বলেছেন, সরকার গঠনের জন্যই চারদলীয় জোট গঠিত হয়েছে। এই রাজনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জোট নিয়েই মন্ত্রিসভা গঠিত হবে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেছেন। মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়াই শেষ কথা নয়, শেষ কথা দেশ রক্ষা। সে কারণে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্যই চোখ-কান খোলা রাখা অধিকতর জরুরী হয়ে উঠেছে। জোট ভাঙ্গাই জোট বিরোধীদের এখন প্রধান লক্ষ্য বিধায় তাদের প্রধান কাজ হলো ব্যর্থতা খুঁজে বেড়ানো। যদি এই খোঁজাখুঁজিতে তারা সফল না হয় তাহলে একটি নয় বরং কোন একক আধিপত্যবাদবিরোধী সত্যিকার রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুদয় না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ থাকা সম্ভব।

আগামী পাঁচ বছর জোট দেশ শাসন করবে। একথা বলে শেষ করতে চাই না। শেষ করতে চাই এই বলে যে, জোটের শাসন যেন আওয়ামী শাসনের কোন বিকল্প না হয়; বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্য, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তি এবং হত্যার বিপরীতে রক্ষার গণতন্ত্র যেন চালু থাকে। এটাই আজকের বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা।

---

www.pathagar.com